প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণের লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই, ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

প্রথম পরিমার্জিত সংস্করণ ঃ জুলাই, 2015

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক বাংলা **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম ঃ EBG ঃ 04

	পাঠ রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় ১৪	অধ্যাপক হীরেণ চট্টোপাধ্যায়	অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক
পর্যায় ১৫	অধ্যাপিকা রূপা বন্দ্যোপাধ্যায়	অধ্যাপক বুদ্ধজীবন চক্রবর্তী
পর্যায় ১৬	অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত	ড. মনন কুমার মণ্ডল
পর্যায় ১৭	অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত	ড. দিলীপ কুমার নন্দী

প্রুফ সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনঃসম্পাদনা ঃ ড. অনামিকা দাস

তত্ত্বাবধায়ক ঃ ড. মনন কুমার মণ্ডল

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EBG — 4

স্নাতক পাঠক্রম

পর্যায় 14

একক 53 ❑ বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্যকীর্তি 7—9

একক 54 ❑ উপন্যাস ঃ বিষয় ও শ্রেণিবিভাজন 10—17

একক 55 ❑ কপালকুণ্ডলা ঃ উপন্যাস পাঠ 18—65

পর্যায় 15

একক 56 ❑ লেখক পরিচিতি — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 66—72

একক 57 ❑ কাহিনি পরিচিতি 73—81

একক 58 ❑ চরিত্রায়ণ 82—100

একক 59 ❑ উপন্যাসের গঠন কৌশল 101—114

পর্যায়
16

একক 60	❑ বাংলা ছোটগল্প	115—123
একক 61	❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ‘‘স্ত্রীর পত্র’’	124—144
একক 62	❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ‘‘ধ্বংস’’	145—156
একক 63	❑ রাজশেখর বসু (পরশুরাম) ঃ চিকিৎসা সঙ্কট	157—175

পর্যায়
17

একক 64	❑ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পুঁইমাচা	176—195
একক 65	❑ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তারিণী মাঝি	196—216
একক 66	❑ বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) ঃ গণেশ জননী	217—228
একক 67	❑ সুবোধ ঘোষ ঃ সুন্দরম্	229—251
একক 68	❑ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ টোপ	252—275

একক ৫৩ ❑ বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্যকীর্তি

গঠন

৫৩.১ উদ্দেশ্য

৫৩.২ প্রস্তাবনা

৫৩.৩ লেখক পরিচিতি

৫৩.৪ লেখকের সাহিত্য কীর্তি

৫৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বঙ্কিমচন্দ্রের সামগ্রিক রচনা সম্পর্কে আপনার একটি ধারণা জন্মাবে।
- বাংলা সাহিত্যে তাঁর বহুবিচিত্র অবদান সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

৫৩.২ প্রস্তাবনা

বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত। মেধা ও বুদ্ধিমত্তায় যেমন তিনি পেশাগত জীবনে সাফল্য লাভ করেছিলেন, সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রেও তেমনি খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশ স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একই সঙ্গে উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং বিচিত্র ব্যক্তিগত রচনাধর্মী গ্রন্থ— নানাধরনের সৃষ্টি সম্ভার তাঁর মতো বিরল প্রতিভাব স্বাক্ষর বহন করে। 'কপালকুণ্ডলা' তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। সাহিত্যসৃষ্টিতে তাঁর নিজস্ব শৈলী সমকালীন পর্বে এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, পরবর্তীকালে বিখ্যাত-হয়ে-ওঠা অনেক লেখকই তাঁদের সাহিত্যজীবনের প্রথমপর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আসুন, বাংলা সাহিত্যের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাকারের পারিবারিক জীবন, পেশাগত জীবন এবং সাহিত্যচর্চার পর্বটিকে চিনে নেবার চেষ্টা করি।

৫৩.৩ লেখক পরিচিতি

'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থটি একটি বাংলা উপন্যাস। এই গ্রন্থের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বলা হয় বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ। তিনি যে সময়ে উপন্যাস রচনা শুরু করেন তখন, এমনকি তার আগেও, এই ধরনের গ্রন্থ কিছু রচিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন এই স্বীকৃতি দেওয়া হয় সেটা আমাদের নিশ্চয়ই জানতে হবে। তবে তার আগে আসুন, বাংলা সাহিত্যের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের সঙ্গে একটু পরিচিত হওয়া যাক।

বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুন তারিখে। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চার পুত্র, তিনি তৃতীয়। অন্যান্য পুত্রদের নাম—জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ, মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের

জন্মস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটির কাছে কাঁঠালপাড়া গ্রাম। সেখানেই শিক্ষার শুরু, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয় ছয় বছর বয়সে পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে এসে। সেখানে কয়েক বছর ইংরেজি স্কুলে শিক্ষালাভ করে এগারো বছর বয়সে কাঁঠালপাড়ায় ফিরে এলেন এবং বিবাহ হল পাঁচ বছর বয়সী এক বালিকার সঙ্গে।

কৃতিত্বের সঙ্গে সাতবছর হুগলি কলেজে পড়াশুনা করে ১৮৫৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন আইন পড়বার জন্য। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৮ সালে বি. এ. পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করলে তিনি পরীক্ষা দেন এবং যদুনাথ বসুর সঙ্গে প্রথম স্নাতক হিসাবে উত্তীর্ণ হন। পরে আইন পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মজীবন শুরু হয় ১৮৫৮ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র, যশোহর, খুলনা এবং উড়িষ্যার কটকেও তাঁকে বদলি করা হয়েছে। এভাবে তেত্রিশ বছর চাকরি করে তিনি ১৮৯১ সালে অবসর গ্রহর করেন। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর ওপরওয়ালা সাহেব কর্মচারীরাও তাঁকে সমীহ করতেন। তাঁর কর্মদক্ষতার জন্যই তাঁকে বিভিন্ন সময় অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, সেক্রেটারি ইত্যাদি করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ সরকারের রায় বাহাদুর এবং সি-আই-ই উপাধিও লাভ করেছিলেন।

প্রান্তলিপি

C. E. Buckland তাঁর Bengal under Lieutenant-Governors গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৭৭ পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন, তার একটু খানি অংশ পড়ে নিতে পারেন ঃ He rendered good service in a number of districts and also acted as Personal Assistant to the Commissioners of the Rajshahi and Burdwan Divisions … while in charge of the Khulna sub-division (now a district) he helped very largely in suppressing river dacoities and establishing peace and order in the eastern canals.

১৮৫৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী মারা যান। পরের বছর রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সেবাযত্নের দ্বারা দ্বিতীয় পত্নীও তাঁর অত্যন্ত আপন হয়ে উঠেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাস্থ্য শেষ জীবনে খারাপ হতে থাকে এবং ১৮৯৪ সালে তিনি পরলোকগম করেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান স্ত্রী ও তিন কন্যা—শরৎকুমারী, নীলাব্জকুমারী এবং উৎপলকুমারী।

৫৩.৪ লেখকের সাহিত্য কীর্তি

একজন লেখকের একটি গ্রন্থ পাঠ্য হলেও তিনি অন্যান্য যেসব বইপত্র লিখেছেন সেগুলির নামও আপনাদের জেনে রাখা দরকার। এর ফলে তিনি ঠিক কী ধরনের রচনা বেশি লিখতেন এবং যে-বই আমাদের পাঠ্য, সেরকম বই আরো লিখেছেন কি না সেসব কথা অন্তত জানা যাবে। তাতে লেখক হিসাবে তাঁর সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আমাদের একটা ধারণা জন্মাবে।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'-এ কিছু গদ্য এবং পদ্য রচনা দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনায় হাতে খড়ি। ১৮৬৪ সালে তিনি 'Rajmohan's Wife' নামে ইংরেজিতে একটি উপন্যাস লেখেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হয় ১৮৬৫ সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রকাশের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় উপন্যাসে 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে। তিন বছর পরে প্রকাশিত হয় তৃতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী'। এরপর তাঁর উপন্যাস রচনায় সাময়িক বিরতি দেখা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের তো বটেই, বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ সালে এই পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং প্রথম চার বছর সম্পাদনা করেন। এর মধ্যে অবশ্য তিনি বেশ কিছু ইংরেজি প্রবন্ধ রচনা করেন। তার অনেকগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান রচনাগুলি এখানেই প্রকাশিত হয়, পরে তা বই হিসাবে বের হয়। এখানে পর পর যে উপন্যাসগুলি তাঁর প্রকাশিত হয় সেগুলি হল—'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'রাধারাণী', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী' এবং 'সীতারাম'। এদের মধ্যে 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়' এবং 'রাধারাণীকে' ছোট উপন্যাস বা খণ্ডোপন্যাস বলাই ভালো। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনা করেছেন মোট এগারোটি এবং খণ্ডোপন্যাস লিখেছেন তিনটি।

প্রান্তলিপি

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে কী বলেছেন তা পড়লেই এই পত্রিকার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন ঃ ''বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ'। এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিবহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আসন্নবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। . . . বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।''

উপন্যাস ছাড়া উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধও বঙ্কিমচন্দ্র অনেক লিখেছেন। সেগুলির কথাও আপনাদের জেনে রাখা দরকার। ছোট আকারের বেশির ভাগ প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে দুখণ্ড 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে। এ ছাড়াও তাঁর প্রবন্ধের কিছু বই—'বিজ্ঞানরহস্য', 'সাম্য', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব' এবং 'শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা'। গল্পের মত করে লেখা তাঁর তিনটি বিচিত্র ধরনের প্রবন্ধ গ্রন্থ—'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত্র'।

একক ৫৪ ❑ উপন্যাস ঃ বিষয় ও শ্রেণিবিভাজন

গঠন

৫৪.১ উদ্দেশ্য

৫৪.২ প্রস্তাবনা

৫৪.৩ উপন্যাস ঃ আধুনিক কালের সৃষ্টি

৫৪.৪ উপন্যাসের ভাগ ঃ নভেল ও রোমান্স

৫৪.৪.১ রোমান্সের দু'টি ভাগ

৫৪.৪.২ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ

৫৪.৪.৩ সার-সংক্ষেপ

৫৪.৫ বঙ্কিমচন্দ্র ঃ উপন্যাসের পৃথিকৃৎ বলা হয় কেন?

৫৪.৫.১ সমসাময়িক বাংলা

৫৪.৫.২ বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব

৫৪.৬ সারাংশ

৫৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- উপন্যাসের চরিত্রলক্ষণ এবং সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভবপর্ব কোন্‌টি তা চিনে নিতে পারবেন।
- উপন্যাসের কাহিনি এবং চরিত্রাবলী অনুযায়ী যে শ্রেণিভেদ আছে, সেগুলিকে অনুধাবন করতে পারবেন।
- বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত উপন্যাসগুলিকে এই শ্রেণিভেদ অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে পারবেন।
- বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে বাংলা আখ্যানকেন্দ্রিক গদ্যসাহিত্যের ধারা কেমন ছিল তা জানতে পারবেন।
- সমসাময়িক অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তা বুঝতে পারবেন।

৫৪.২ প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের জন্মপর্বটি ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। সেদিক থেকে দেখলে, সাহিত্যের এই ধারাটির বয়স আমাদের বাংলাসাহিত্যে তেমন বেশী কিছু নয়। কিন্তু উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, অত্যন্ত দ্রুততায় এই ধারাটি তার প্রাপ্তবয়স্কতায় পৌঁছে যায়। আধুনিক যুগের মানুষ অদৃশ্য দেবদেবীর কাল্পনিক ক্ষমতার অতিরঞ্জিত কীর্তন ছেড়ে, আগ্রহী হয়ে ওঠে দৃশ্যমান, বাস্তব, মানবজীবনের ছবি দেখতে ও দেখাতে। এইসময় আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে পরিচিতিও বাঙালী লেখক ও পাঠককুলকে অনেকখানি মানবমুখী করে তোলে। এরই

অবধারিত ফলশ্রুতিতে উপন্যাসের জন্ম, তার বিষয় ও ভাষারীতি নিয়ে বিভিন্ন লেখকের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র সহ আরও কিছু শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের হাতে উপন্যাসের সর্বাঙ্গীন পরিণতি।

৫৪.৩ উপন্যাস ঃ আধুনিক কালের সৃষ্টি

প্রথমেই আপনাদের এ কথা জানতে হবে যে, উপন্যাস একেবারেই আধুনিক কালের সৃষ্টি। উপন্যাসে যেরকম নিটোল গল্প থাকে, অনেক আগেকার দিনের লেখা কিছু কাহিনিতেও আপনারা সেরকম গল্প পড়ে জানতে পারেন, যেমন ধরুন আমাদের পঞ্চতন্ত্রের গল্প, মনসাদেবীর গল্প, মা চণ্ডীর গল্প, আরব্য রজনীর গল্প, বিক্রমাদিত্য ও বেতালের গল্প, বিভিন্ন রূপকথার গল্প, আরো কত কী। এই সব গল্পের সঙ্গে যদি উপন্যাসের কোন পার্থক্য না থাকে তবে উপন্যাসকে আধুনিক কালের গল্পই-বা বলবো কীকরে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তার প্রকৃত উদ্ভব ঘটেছিল, এ কথাই-বা বলা যাবে কেমন করে। কাজেই সাহিত্য হিসাবে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যটা আসলে কী, সেটা আমাদের বুঝতেই হবে। বৈশিষ্ট্য অবশ্য একটা নয়, অনেক। এক এক করে সেগুলো বুঝে নেওয়া যাক।

প্রথম কথা, উপন্যাস হচ্ছে মানুষের গল্প এবং মানবিক অনুভূতির গল্প। এইজন্যই আধুনিক কাল ছাড়া উপন্যাসের উদ্ভব সম্ভব ছিল না। মধ্যযুগে, অর্থাৎ চার-পাঁচশো বছর আগেকার সাহিত্যে দেবদেবীদেরই প্রাধান্য ছিল। মঙ্গলকাব্যে আমরা দেবদেবীর জীবনকথা পড়েছি, তাঁদের আশীর্বাদের মানুষের জীবন কিভাবে ধন্য হয় তাও জেনেছি। কিন্তু সেখানে দেবতারাই সব, মানুষ নিমিত্ত মাত্র। মানুষের গল্পও যে মানুষকে শোনানো যায়, তার জীবনের সুখদুঃখের গল্প অর্থাৎ মানবিক অনুভূতির গল্পও যে মানুষকে আনন্দ দিতে পারে, এ কথা আমরা বুঝতে শিখেছি আধুনিক কালেই। মানুষের এই প্রাধান্য স্বীকৃত না হলে মানুষের গল্প মানুষকে শোনানো যায় না। আধুনিক কালে মানুষ স্বীকৃতি পেয়েছে বলেই উপন্যাসের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা, উপন্যাস সাধারণ মানুষের গল্প। দেব-দেবী বা অসাধারণ মানুষের গল্পই আগে আমাদের মুগ্ধ করত। আধুনিক কালে গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে, সাধারণ মানুষের মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে, তাই সেই সাধারণ মানুষের গল্পই উপন্যাসে শুনতে আমরা আগ্রহী হয়েছি। কাজেই গণতন্ত্রের বিকাশ উপন্যাসের উদ্ভবের আর একটি কারণ।

> **প্রান্তরেখা**
>
> এ বিষয়ে আলোচনা একেবারে প্রাথমিক গ্রন্থের নাম 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', লেখক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই কী লিখেছেন, জেনে রাখুন—'বর্তমান যুগের পূর্বে, গণতন্ত্রের বিকাশের পূর্বে, ইহার আবির্ভাব সম্ভব ছিল না।'

তৃতীয় কথা, উপন্যাসের প্রধান গুণ বাস্তবতাবোধ। আগেকার দিনে যেসব কাহিনি রচনা করা হত সেখানে বাস্তবতার কোনো ব্যাপারই ছিল না। তা বিশ্বাস্যযোগ্য কী বিশ্বাসযোগ্য নয় এ বিষয়ে কারো কোনো চিন্তা ছিল না। বরং যতো অলৌকিক এবং অবিশ্বাস্য, তার প্রতিই লোভ ছিল মানুষের, কারণ সে তো সাধারণ মানুষের গল্প নয়। দেবদেবী যতো অলৌকিক ক্ষমতা দেখাবেন—সমুদ্র থেকে সপ্তডিঙা মধুকর উদ্ধার করবেন, মানুষকে সাত ঘড়া মোহর পাইয়ে দেবেন, মরা মানুষ বাঁচিয়ে দেবেন, ততোই তাঁদের প্রতি ভক্তি আমাদের বাড়বে। রূপকথার গল্পে রাজকুমার পক্ষীরাজ ঘোড়া চড়ে যতেই অজানা দেশে পাড়ি জমাবে ডাইনির দেশে এসে লোহার মটরভাজা চিবিয়ে খাবে, যতোই সব অলৌকিক কাণ্ড ঘটতে থাকবে ততোই ভালো লাগবে—আমাদের মধ্যযুগীয় মানসিকতা ছিল ঠিক এইরকম। বুঝতেই পারেন, আজকের মানুষ ঠিক সেভাবে চিন্তা করে না। কাহিনি বাস্তবসম্মত না হলে তার ভালো লাগে না। তাছাড়া, সাধারণ মানুষের সাধারণ সুখদুঃখের গল্পে এতো অলৌকিক ঘটনা তো ঘটেও না।

কাজেই উপন্যাস বেঁচে থাকে তার বাস্তবতার গুণে। অনেকে এটাকেই উপন্যাসের সব চেয়ে বড়ো গুণ বলে মনে করেন।

চতুর্থ কথাটাকে বলা যেতে পারে, উপন্যাসের একটা শর্ত, সেটা হল মুদ্রণযন্ত্র বা ছাপাখানার উদ্ভাবন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, ছাপাখানা প্রথম তৈরি হয় আধুনিক কালেই। তার আগে পর্যন্ত কাব্যকবিতা মানুষ পড়তো না— শুনতো। যে-কাহিনি মানুষকে ডেকে শোনাতে হয় সেখানে লেখকের স্বাধীনতা থাকে অল্প, কারণ কারো ধর্মভাব বা অন্ধবিশ্বাসকে মানুষ আঘাত করতে পারে না। কিন্তু যখন সাহিত্য পাঠ্য হয়ে গেল, অর্থাৎ মানুষকে আর গিয়ে শোনাতে হয় না, সে নিজেই পড়ে নিতে পারে—এরকম একটা অবস্থা এসে গেল, তখনই উপন্যাস লেখার উপযোগী অবস্থা মানুষ পেল।

পঞ্চম কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। মানুষ তার অভিজ্ঞতা এবং মানসিকতা নিয়ে এই পৃথিবীটাকে দেখছে, দেখতে দেখতে তার নিজের একটা দৃষ্টিভঙ্গিও তৈরি হচ্ছে। উপন্যাসের পক্ষে এই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিটাও খুব দরকার। আগে গল্প ছিল, সেই গল্প লেখক বর্ণনা করতেন, কিন্তু জগৎ আর জীবন সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণাটা কীরকম সেটা আপনি মোটেই বুঝতে পারতেন না। কিন্তু মনে করুন আপনি একটা উপন্যাস পড়ছেন—আপনার একটা চেনা উপন্যাসের কথাই মনে করা যাক—ধরুন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’, এখানে পল্লীগ্রামের দুঃখ-দারিদ্রের কথা আপনি সবই পাবেন, কিন্তু সেই কষ্টটা আপনি একেবারেই অনুভব করবেন না। এর কারণ হচ্ছে ওই দৃষ্টিভঙ্গি—সমস্ত গল্পটাই অপুর মুগ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা বলে হরিহরের পরিবারের দারিদ্র্যকে ছাপিয়ে একটি বালকের অতি সামান্য উপকরণ নিয়েও আনন্দের সঙ্গে বড় হয়ে ওঠাটাই আপনাকে অভিভূত করে।

৫৪.৪ উপন্যাসের ভাগ ঃ নভেল ও রোমান্স

উপন্যাস মানুষেরই গল্প এবং বাস্তবতাই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবু মানুষগুলি কী ধরনের, বাস্তবতার প্রকৃতিই বা কীরকম, এই দুটি ব্যাপারের ওপর ভিত্তি করে উপন্যাসের দুটি স্পষ্ট ভাগ আছে, সেটা আপনাদের জেনে রাখতে হবে। উপন্যাসে যে সব মানুষের গল্প শোনানো হয়েছে সে মানুষগুলি যদি আমাদের চেনা হয়, যে সমস্যার কথা উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা যদি আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই পড়ে, তবে তাকে আমরা বলি ন’ভেল। কিন্তু মানুষগুলিকে লেখক যদি সংগ্রহ করেন ইতিহাস থেকে, কিংবা একেবারেই তাঁর কল্পনা থেকে, তাহলে মানবিক অনুভূতির গল্প হলে তাকে আমরা বলবো রোমান্স; তবে ইতিহাস থেকেই নেওয়া হোক, আর কল্পনা থেকেই রচনা করা হোক, বাস্তবতাবোধ সেখানে বজায় রাখতেই হবে, কারণ বিশ্বাসযোগ্য না হলে তাকে তো আপনি উপন্যাসই বলতে পারবেন না।

> **প্রান্তলিপি**
>
> এ বিষয়ে আগে উল্লেখ করা গ্রন্থ ‘বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’-র ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে আমাদের কথাগুলি মিলিয়ে দেখে নিতে পারেন—
>
> ‘উহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা বাস্তব-গুণের আপেক্ষিক প্রাধান্য লইয়া। Novel অবিমিশ্র ভাবেই বাস্তব .... ইহার প্রধান কাজ সমসাময়িক সমাজ ও পারিবারিক জীবন চিত্রণ; .... Romance-এর বাস্তবতা অপেক্ষাকৃত মিশ্র ধরনের; .... রোমান্সের জগতেও আর অতিপ্রাকৃত বা অবিশ্বাস্যের কোন স্থান নাই।’

এবার নভেল এবং রোমান্সের পার্থক্যটা আপনাদের দুটো-একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা যাক, তাহলে এটা আরো স্পষ্ট হবে, মনে করুন আপনি আপনার প্রতিবেশী একজন সৎ মানুষকে খুব ভাল করে জানেন।

তিনি নীতি মেনে চলেন, অফিসে ঘুষ নেবার সুযোগ থাকলেও কখনও সেই প্রলোভনে পা দেন না, সব রকম ভাবেই সৎ জীবনযাপন করেন। সেই মানুষটির ছেলেমেয়ের ভালভাবে সততার আদর্শ নিয়ে বড় হওয়া উচিত, অথচ আপনি দেখলেন ছেলেটি স্মাগলারের দলে ভিড়ে গেল, মেয়েটিও বিপথে চালিত হল। এর ফলে আপনি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে আদর্শনিষ্ঠ জীবনযাপন অর্থহীন, এইভাবে ছেলেমেয়েদের মানুষ করা যায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনি একটা নভেল লিখতে পারেন।

এবার মনে করুন আপনি ইতিহাস পড়তে পড়তে মুঘল সম্রাট বাবরের জীবনের ওই ঘটনাটার কথা জানলেন যেখানে তিনি সন্তান হুমায়ুনের আরোগ্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে নিজেকে রোগগ্রস্ত করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। এখানে ইতিহাসের সাল তারিখ ভেদ করে প্রকাশিত হচ্ছেন একজন পিতা, যিনি নিজের সন্তানের রোগমুক্তির জন্য ব্যাকুল। এই মানবিক অনুভূতির গল্প নিয়ে যদি আপনি কোন উপন্যাস রচনা করেন, সেটাকে বলা হবে রোমান্স। আশা করি, ব্যাপারটা স্পষ্ট হল, আরো স্পষ্ট হবে আমাদের পরের আলোচনা থেকে।

৫৪.৪.১ রোমান্সের দু'টি ভাগ

রোমান্সেরও আবার দুটি বিভাগ করা হয়—ঐতিহাসিক রোমান্স এবং কাব্যিক রোমান্স। রোমান্সের বিষয় যখন ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করা হয় তখন তাকে বলা হয় ঐতিহাসিক রোমন্স এবং রোমান্সের বিষয় যখন কল্পনার সাহায্যেই উদ্ভাবন করা হয় তখন তাকে বলে কাব্যিক রোমান্স। ব্যাপারটা আর একটু ভাল করে বোঝা যাক।

ঐতিহাসিক রোমান্স কাকে বলে সেটা বোধ হয় আমরা বুঝতে পেরেছি, কারণ রোমান্সের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এই ঐতিহাসিক রোমান্সের কথাই বলা হয়েছে। এবারে কাব্যিক রোমান্সের একটা উদাহরণ দেবো এবং একে 'কাব্যিক' কেন বলা হচ্ছে, সেটাও বলবো।

ধরুন আপনার মাথায় হঠাৎ একটা চিন্তা এল যে, কোন একটা ছেলে যদি প্রায় জন্ম থেকেই বনে জঙ্গলে পশুদের সঙ্গে বেড়ে ওঠে—বিখ্যাত সেই টার্জানের গল্পের মতো, তারপর যৌবনকালে তাকে বন্দী করে নিয়ে আসা হল শহরে, সভ্য করার চেষ্টা করা হল, সভ্য ভাষা শেখানো হল, লেখাপড়াও কিছু শিখলো সে। এবার তার মধ্যে সেই আজন্মলালিত বন্য সংস্কার থাকবে, অথবা থাকবে না। এই বিষয়টা নিয়ে যদি আপনি একটা সার্থক উপন্যাস লিখে ফেলতে পারেন—মানে বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রেখে, তাহলে সেটা হবে একটা কাব্যিক উপন্যাস। কেন? তার প্রধান কারণ হল, এইরকম চরিত্র আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাইনা, কল্পনার সাহায্যেই আপনি মানবিক অনুভূতির এই গল্প লিখেছেন। এবার বলি, এই 'কাব্যিক' নামটার আর একটা তাৎপর্যের কথা।

ঔপন্যাসিকের উপন্যাস লেখার কৌশল আর কবির কবিতা লিখবার প্রক্রিয়াটা আলাদা, একেবারে বিপরীত বললেই কথাটা ঠিক বলা হয়। ঔপন্যাসিক কী করেন? তিনি আগে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, সেই অভিজ্ঞতা থেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছন এবং তারপর উপন্যাসটা লিখতে আরম্ভ করেন। কবির পদ্ধতিটা ঠিক উলটো, তিনি প্রথমেই একটা সিদ্ধান্ত নেন—বা বলা যায় একটা ধারণা তাঁর মাথায় এসে যায়; সেটাকেই তিনি প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। কাব্যিক রোমান্সের জন্মও এই কবিতার মতই—আগেই একটা ধারণা ঔপন্যাসিকের মাথায় এসে গেল। তারপর কবির প্রক্রিয়াতেই তিনি সেটাকে মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ করে, বাস্তবতা বজায় রেখে একটা উপন্যাসে পরিণত করেন। কাজেই, পদ্ধতির দিক থেকেও এটাকে কাব্যিক রোমান্স নামে অভিহিত করাটাই সংগত বলে আপনার মনে হয় না কি?

৫৪.৪.২ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির কথা তো আমরা জানিই, এমন উপন্যাসের তিনটি প্রধান বিভাগের কথাও আমরা জানলাম—নভেল, ঐতিহাসিক রোমান্স এবং কাব্যিক রোমান্স। তাহলে এক নজরে তাঁর এগারোটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস আর তিনটি খণ্ড-উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগটা করে ফেলা যাক। অবশ্য আপনাদের মধ্যে যাঁরা সব কটি উপন্যাসই পড়েছেন, তাঁরা নিজেরাই কাজটা করতে পারেন, যাঁরা সব পড়েননি আমি তাঁদের কাজেই একটু সাহায্য করছি মাত্র। শ্রেণিবিভাগটা হবে এইরকম—

ক) নভেল ঃ 'বিষবৃক্ষ', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। খণ্ড-উপন্যাসের মধ্যে 'ইন্দিরা' ও 'রাধারাণী' এই জাতীয়।

খ) ঐতিহাসিক রোমান্স ঃ 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম'। খণ্ড-উপন্যাসের মধ্যে 'যুগলাঙ্গুরীয়' এই জাতীয়।

গ) কাব্যিক রোমান্স ঃ 'কপালকুণ্ডলা' ও 'দেবীচৌধুরানী'।

৫৪.৪.৩ সারসংক্ষেপ

আমাদের এই এককের আলোচ্য অংশ একটু দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার এর মূল বক্তব্যগুলি অতি সংক্ষেপে আপনাদের একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি।

উপন্যাস আধুনিক কালের সৃষ্টি। এর বৈশিষ্ট্য ও শর্তগুলি হল—কাহিনি হবে মানুষের ও মানবিক অনুভূতির, গণতন্ত্রের উদ্ভব না হলে উপন্যাসের উদ্ভব হয় না, বাস্তবতাবোধ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য, ছাপাখানার উদ্ভাবনও গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এবং উপন্যাসে থাকবে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি

উপন্যাসের দুটি ভাগ—নভেল ও রোমান্স। রোমান্সেরও দুটি ভাগ—ঐতিহাসিক ও কাব্যিক। নভেলে আমরা পাই পরিচিত মানুষের কথা, পরিচিত সমস্যার কথা। ঐতিহাসিক রোমান্সের পাত্রপাত্রীরা ইতিহাস থেকে সংগৃহীত, কাব্যিক রোমান্সের পাত্রপাত্রীরা কল্পনা থেকে—বাস্তব জগতে যেসব চরিত্রের দেখা পাওয়া শক্ত। তবে বিশ্বাসযোগ্যতা থাকতেই হবে কাহিনীর।

এরপর আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির শ্রেণিবিভাগ করেছি।

৫৪.৫ বঙ্কিমচন্দ্র ঃ উপন্যাসের পথিকৃৎ বলা হয় কেন?

বাংলা উপন্যাসের সার্থক প্রতিষ্ঠাতার সম্মান বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন দেওয়া হবে, এ কথাটা আপনাদের মনে হবেই যদি আপনি বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকবছর আগে ও পরে রচিত এই ধরনের কয়েকটি আখ্যানের কথা মনে রাখেন। কারণ সেগুলি সমসাময়িক মানুষের গল্পই শোনাতে চেয়েছে। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনটি উপন্যাসে আমরা আমাদের চোখে দেখা মানুষের কোনো গল্পই পাইনি। বিচার-বিবেচনা করবার আগে সেই সব আখ্যানগুলির কথা সংক্ষেপে একটু আমাদের জেনে রাখতে হবে।

৫৪.৫.১ বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক রচনা

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু তার অনেক আগেই, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'নববাবু-বিলাস'। লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রমথনাথ শর্মা' ছদ্মনামে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। সেই সময়ে বিলাস ও ব্যভিচারের স্রোতে প্রবাহিত বাবু সম্প্রদায় নামে যে একটি শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল, তারই প্রথম পরিচয় পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। সেই সময়কার মানুষদের কথা আখ্যানে প্রথম দেখা গেল বলেই এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হল, নতুবা এটি সম্পূর্ণ গদ্যে লেখাও নয়, গদ্যে পদ্যে ছড়ায় কৌতুকে একে এক ধরনের টুকরো লেখার সংকলন বলাই ভালো। বাবু সম্প্রদায়কে নিয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য আখ্যানটি রচিত হয় ১৮৫৮ সালে। এটির নাম আপনারা শুনে থাকতে পারেন। গ্রন্থটির নাম 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র এটি রচনা করেন 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে। এটিকে আগাগোড়া একটি কাহিনি বলা যায়, লেখাও হয়েছিল একটু ভিন্ন ভাষায়—সাধু বাংলার পরিবর্তে একেবারে মুখের ভাষায়। প্যারীচাঁদের প্রায় সব গ্রন্থেই এইরকম মৌখিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন—'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়', 'অভেদী' এবং 'আধ্যাত্মিকা'।

প্যারীচাঁদের অন্যান্য রচনাকে না হলেও 'আলালের ঘরের দুলাল'কে উপন্যাস রচনার চেষ্টা হিসাবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বলে অনেকেরই মনে হয়েছে। এর নায়ক মতিলাল শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে কিছুদিন পড়াশুনা করেই নিজেকে দিগ্‌গজ পণ্ডিত মনে করেছে এবং বিলাসের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। সেই সময়কার সমাজচিত্র যেমন এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে, তেমনি চরিত্রগুলিও অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের ঠক চাচা চরিত্রটি সবচেয়ে শক্তিশালী কলমে আঁকা এক ভণ্ড, প্রতারক মানুষ। উপন্যাসের প্রধান যে গুণ বাস্তবতা, সেটিও প্যারীচাঁদের রচনার সবচেয়ে বড় গুণ। তা সত্ত্বেও উপন্যাসে লেখকের যে নিজস্ব জীবনদৃষ্টি ফুটে ওঠে, এখানে তার বিশেষ কোন পরিচয় নেই। সেই কারণেই বাবুদের স্খলন পতন কেবল বাইরের ঘটনা হয়েই থাকে, ভেতরের কোন্ অতৃপ্তি বা অপূর্ণতা থেকে এদের জন্ম তা বোঝা শক্ত। আমরা বড়ো জোর এটিকে একটি দুর্বল উপন্যাস হিসাবে আখ্যা দিতে পারি।

বাবু সম্প্রদায়কে নিয়ে এই সময়ে আরো একটি গ্রন্থ লেখা হয়েছিল, কয়েক বছর পরে অবশ্য, ১৮৬২ সালে। এটির নাম 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'। এটিও ছদ্মনামে লেখা, আসল লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ। বাস্তবতাবোধ এবং সমাজচিত্রের নিখুঁত পরিচয় এই গ্রন্থেও আছে বটে, তবে এখানে কোন নিটোল কাহিনী আমরা পাই না, পাই কিছু কিছু টুকরো সমাজচিত্র। কাজেই একে উপন্যাসের উপাদান আপনারা বলতে পারেন, উপন্যাস কোনো মতেই বলতে রাজি হবেন বলে মনে হয় না।

আর একটি বই সম্বন্ধে অবশ্য প্রথম উপন্যাসের দাবি খুব জোর গলাতেই কেউ কেউ জানিয়েছেন। এই বইয়ের নাম 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ', এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। এর লেখিকা একজন বিদেশিনী, শ্রীমতী হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স। বিদেশিনী হিসাবে বাংলা ভাষায় তাঁর দখল অবশ্য খুবই প্রশংসা করবার মতো এবং সাধারণ মানুষের জীবন নিয়েই তিনি এই গ্রন্থের কাহিনি রচনা করেছেন—তাতে তাদের সংসারজীবনের খুঁটিনাটি যেসব পরিচয় ফুটে উঠেছে তাও আমাদের পড়তে খারাপ লাগে না। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন, গ্রন্থটি একেবারেই উদ্দেশ্যমূলক—একটু অন্যভাবে গল্প বলে খ্রীষ্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করাই এর উদ্দেশ্য। ফুলমণি খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী বলে তার সংসারে কোনো কষ্ট নেই, প্রত্যেকটি মানুষই অত্যন্ত আনন্দে আছে। অন্যদিকে করুণাও অবশ্য খ্রীষ্টধর্মেই দীক্ষিত, কিন্তু এই ধর্মের প্রতি তার কোনো আস্থা নেই। কাজেই তার জীবনে কষ্টেরও কোনো শেষ নেই। ধর্মে আস্থা আসার পরেই তার জীবন আবার সুখের হয়েছে।

এইরকম বানানো এবং কৃত্রিম কাহিনি নিয়ে উপন্যাস লেখা যায় না, কারণ মানুষের জীবন এইরকম ছকে বাঁধা হয় না। যে-জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখা হবে তা বিশ্বাসযোগ্য না হলে তাকে তো আপনি উপন্যাসও বলতে পারবেন না।

এতোক্ষণ তো আমরা নভেল জাতীয় উপন্যাসের কথাই আলোচনা করলাম, এবার বঙ্কিমচন্দ্রের আগে রচিত একটি ঐতিহাসিক রোমান্সের কথা বলা যাক। এই গ্রন্থের নাম 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৭ সালে, লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিজের নামেই এই উপন্যাস লিখেছিলেন। এই গ্রন্থটি আসলে দুটি ছোট কাহিনি এক সঙ্গে নিয়ে রচিত, যাকে বড় জোর খণ্ডোপন্যাস বলা যেতে পারে। এই দুটি কাহিনির নাম হল 'সফল স্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। দ্বিতীয় খণ্ড-উপন্যাসের মধ্যে ঔপন্যাসের লক্ষণ কিছু কিছু আছে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে, 'যুগলাঙ্গুরীয়' নামে একটি খণ্ড-উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রও লিখেছিলেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নয় বলেই আমরা ভূদেব মুখোপাধ্যায়কেও প্রথম ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দিতে পারবো না।

৫৪.৫.২ বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব

উপন্যাসের বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে কিছু কিছু—যেমন সেই সময়ের মানুষের ছবি আঁকা, সাধারণ মানুষের চরিত্র ফুটিয়ে তোলা, বাস্তবতার বোধ ইত্যাদি গুণ যে সেই সময়ের বেশ কিছু লেখার মধ্যেই ছিল সে কথা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এগুলির মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলাল' যে শ্রেষ্ঠ, এ সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কাহিনী গেঁথে একটা অখণ্ড জিনিস তৈরি করবার যে ক্ষমতা উপন্যাস লিখতে গেলে থাকা দরকার, লেখকের নিজস্ব জীবন দৃষ্টি থাকার জন্য সমস্ত ঘটনাই উপন্যাসে যেভাবে জীবনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হয়ে ওঠে, উপন্যাসের সেই মহত্ত্ব এবং গাম্ভীর্য বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর কেউই সেই মূহুর্তে সৃষ্টি করতে সমর্থ হননি। সেই কারণেই, জীবনের প্রথম তিনটি উপন্যাসে পরিচিত মানুষ ও আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ চিত্রিত না করা সত্ত্বেও তাঁকেই আমরা প্রথম সার্থক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের স্রষ্টার মর্যাদা দিয়ে থাকি।

প্রান্তলিপি

এ বিষয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য আপনারা জেনে নিতে পারেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাঁচ নম্বর পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন—"আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাস-সাহিত্যের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া প্রথম অনিশ্চয়াত্মক যুগের অবসান ও আসন্ন পূর্ণ পরিণতির ঘোষণা করে। ইহার মাত্র ৮ বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে উপন্যাসের মহিমান্বিত, প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল যৌবনের আরম্ভ।"

৫৪.৬ সারাংশ

উপন্যাস মানুষের গল্প এবং মানবিক অনুভূতির গল্প। গণতন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই দেবদেবীর কাল্পনিক মাহাত্ম্যকীর্তন ছেড়ে মানুষের সুখদুঃখ, আশা-স্বপ্ন, বিঘ্ন-বিপর্যয়ের কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাস রচনা শুরু হয়। লেখক আর পাঠক, মুদ্রণযন্ত্রের কৃপায় প্রত্যক্ষ সংযোগে আসার ফলে কথকতা নির্ভর কাব্যিক মাধ্যম ছেড়ে, মানুষের কাহিনী গদ্যের শক্তমাটিতে হেঁটে পৌঁছে গেল মানুষের দরজায় দরজায়। বাস্তব পৃথিবী তার রুক্ষ কোমল মূর্তি নিয়ে, স্বরূপে হাজির হল বাঙালী পাঠকের সামনে।

সব উপন্যাসই সাধারণভাবে মানুষের গল্প। কিন্তু যদি সেই মানুষগুলি আমাদের সমকাল বা পরিচিত অভিজ্ঞতার জগতের বাইরের হয়, লেখক যদি তাদের নির্বাচন করেন সুদূর ঐতিহাসিক পট থেকে বা নির্মাণ করেন

একেবারেই তাঁর নিজস্ব কল্পনার জগৎ থেকে, তাহলে তাদের জীবনকাহিনির নাম হবে রোমান্স। আর যদি সেই মানুষগুলি আমাদের চেনা হয়, যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে তা যদি আমাদের চেনা জগৎ ও অভিজ্ঞতার মধ্যেই পড়ে, তবে তাকে আমরা বলি নভেল।

বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নে প্রায় একসঙ্গেই এই দুই ধারার রচনা জনপ্রিয়তা লাভ করে। গঠনগত দিক থেকে সর্বাঙ্গীন পরিণতি সবগুলির না থাকলেও কাহিনি পরিবেশনের বৈচিত্র্য এগুলিকে পাঠকের কাছে আকর্ষক করে তুলেছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছবি তুলে এনে, উপন্যাস উদ্ভবের বীজ প্রথম বপন করলেন। পাশাপাশি ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বনে মানব অনুভূতির কথাকে উপন্যাসের ভাববস্তু হিসাবে হাজির করালেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এর অব্যবহিত পরেই, ইতিহাস ও সমকালীন বাস্তব জগৎ—উভয় ক্ষেত্র থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে, নিজস্ব কল্পনাশক্তি ও সৃজনক্ষমতায় সেগুলিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে বাংলা উপন্যাসের ভাণ্ডারটিকে নভেল ও রোমান্সের সম্পদে পরিপুষ্ট করে তুললেন।

একক ৫৫ ❑ কপালকুণ্ডলা ঃ উপন্যাস পাঠ

গঠন

৫৫.১ উদ্দেশ্য

৫৫.২ প্রস্তাবনা

৫৫.৩ 'কপালকুণ্ডলা'-র কাহিনির উৎস সন্ধানে

৫৫.৩.১ কাহিনি সংক্ষেপ

৫৫.৩.২ 'কপালকুণ্ডলা' উপসংহার

৫৫.৩.৩ কাহিনি-বিশ্লেষণ

৫৫.৪ উপকাহিনির প্রয়োজনীয়তা

৫৫.৪.১ উপকাহিনির অন্যান্য উপযোগিতা

৫৫.৪.২ 'কপালকুণ্ডলা'র উপকাহিনি

৫৫.৪.৩ সার-সংক্ষেপ

৫৫.৫ 'কপালকুণ্ডলা'র বৃত্তগঠন

৫৫.৬ 'কপালকুণ্ডলা'র অতিপ্রাকৃত উপাদান

৫৫.৭ কাহিনীতে বাস্তবতা সৃষ্টির চেষ্টা

৫৫.৭.১ বাস্তবতা ঃ সময়ের উল্লেখ

৫৫.৭.২ বাস্তবতা ঃ ঐতিহাসিক কাহিনি

৫৫.৭.৩ বাস্তবতা ঃ শীর্ষ উদ্ধৃতি

৫৫.৮ সার-সংক্ষেপ

৫৫.৯ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টি

৫৫.৯.১ চরিত্র সৃষ্টি ঃ নবকুমার

৫৫.৯.২ চরিত্র সৃষ্টি ঃ কপালকুণ্ডলা

৫৫.৯.৩ চরিত্র সৃষ্টি ঃ মতিবিবি

৫৫.৯.৪ চরিত্র সৃষ্টি ঃ অপ্রধান চরিত্রসমূহ

৫৫.১০ সার-সংক্ষেপ

৫৫.১১ 'কপালকুণ্ডলা'র শ্রেণিবিচার

৫৫.১১.১ কপালকুণ্ডলা ঃ একটি কাব্য

৫৫.১১.২ কপালকুণ্ডলা ঃ একটি উপন্যাস

৫৫.১১.৩ কপালকুণ্ডলা ঃ একটি রোমান্স

৫৫.১১.৪ কপালকুণ্ডলা ঃ একটি কাব্যিক রোমান্স

৫৫.১২ সারাংশ

৫৫.১৩ অনুশীলনী
৫৫.১৩.১ সামগ্রিক আলোচনানির্ভর অনুশীলনী
৫৫.১৪ গ্রন্থপঞ্জি
৫৫.১৫ উত্তরমালা
৫৫.১৫.১ সামগ্রিক আলোচনানির্ভর উত্তরমালা

৫৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- 'কপালকুণ্ডলা' আখ্যানভাগ কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল, এই কাহিনীর কতখানি বাস্তব ঘটনা, কতটা লেখকের নিজস্ব কল্পনা সে বিষয়ে জানতে পারবেন।
- কাহিনীর উপস্থাপনায় বিভিন্ন ঘটনা এবং চরিত্রাবলীর প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা জানতে পারবেন।
- কাহিনীর সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত নির্মাণ রীতি এবং অতিপ্রাকৃত ও বাস্তব উপাদানের অনুপাতিক বিন্যাসে কিভাবে একে আকর্ষক করে তোলা হয়েছে তা অনুধাবন করতে পারবেন।
- কাহিনীতে প্রধান পাত্রপাত্রী এবং অপ্রধান চরিত্রাবলী কী ভূমিকা পালন করেছে, তা বুঝতে পারবেন।
- উপন্যাসের শ্রেণীভেদ অনুযায়ী 'কপালকুণ্ডলা'র বৈশিষ্ট্য বিচার করতে পারবেন।

৫৫.২ প্রস্তাবনা

একটি উপন্যাসকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে গেলে আলোচনার আওতায় আনা প্রয়োজন মূলত তিনটি বিষয়—এর কাহিনি অংশ, এর চরিত্রনির্মাণ এবং লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশরীতি। উপন্যাসের গল্পটি পরিবেশিত হয় নানা ঘটনার কার্যকারণে শৃঙ্খলে বাঁধা থেকে, বিভিন্ন চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ ও সংলাপকে অবলম্বন করে, লেখকের বিশিষ্ট চিন্তাভাবনার আলোকে আলোকিত হয়ে। উপন্যাস পাঠের সময় তাই আপনাদের এই তিনটি প্রধান বিষয়ে সচেতনতা আবশ্যক।

'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনি কিছুটা বাস্তব, কিছুটা লেখকের কল্পনা এবং নিজস্ব জিজ্ঞাসাপ্রসূত ঘটনা। এর চরিত্রাবলীও কখনও বাস্তব মানুষের আদলে নির্মিত, (নবকুমার) কখনও অন্য সাহিত্যিক-প্রেরণাসঞ্জাত (কপালকুণ্ডলা), কখনও আবার ইতিহাসসম্ভাব্য (মতিবিবি)। এরা অধিকাংশ সময়েই আমাদের পরিচিত মানবজগতের সঙ্গে সদৃশ, যদি-বা এরা কখনও ভিন্ন পথে বিচরণ করে, তবে সেটি লেখকের নিজের দর্শন, মতামত, উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই। আসুন, উপন্যাসটির সামগ্রিক বিশ্লেষণে আমরা এর কাহিনি, চরিত্রায়ণ এবং লেখকের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের ব্যাপারটিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করি।

৫৫.৩ 'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনির উৎস সন্ধানে

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটি এমনই একটি সৃষ্টি যে বহু সমালোচকই এর উচ্ছ্বসিত প্রসংসা করেছেন। সেই সময়ের এবং পরবর্তী কালের অনেক আলোচকই মনে করেন, এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাস যে অত্যন্ত

জনপ্রিয় হয়েছিল তা বোঝা যায় বহুভাষায় এর অনুবাদ দেখে। ইংরেজিতে অনুবাদ তো বেশ কয়েকবার হয়েছে তা ছাড়া ১৮৮৬ সালে অধ্যাপক ক্লেম জার্মান ভাষায় এটি অনুবাদ করেন। ভারতীয় ভাষার মধ্যে সংস্কৃত, হিন্দি, গুজরাটি, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি ভাষাতেও এর অনুবাদ হয়েছে। এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে এটি মঞ্চস্থ করেন প্রথম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পরে অন্য নাট্যকারও এর নাট্যরূপ দিয়েছেন। এর কাহিনিটি তখন এতই আকর্ষক মনে হয়েছিল যে অপর একজন সাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাস যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখান থেকেই এদের নিয়ে আবার নতুন করে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন, নাম 'মৃন্ময়ী'। এ থেকেই বুঝতে পারবেন তখনকার সাহিত্যিকরাও এই উপন্যাস পড়ে কতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন।

এই যে সকলে মুগ্ধ হচ্ছেন উপন্যাস পড়ে, সে তো লেখার গুণে বটেই, কিন্তু এর বিষয়টাও এমন অভিনব যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়— এমন একটা চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্র পেলেন কোথা থেকে। এ বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্রের লেখা 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনীপুরের নেগুঁয়াতে (এখন যা কাঁথি নামে পরিচিত) বদলি হন তখন তাঁর সমুদ্র তীরের বাংলোতে প্রতিদিন গভীর রাতে এক কাপালিকের উদয় হত। সে থাকত সমুদ্রতীরের গভীর জঙ্গলে। এই কাপালিককে নিয়ে তিনি যে বেশ চিন্তা ভাবনা করতেন সে কথা বোঝা যায় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে করা একটি প্রশ্ন থেকে—'যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছু জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?'

প্রান্তলিপি

এই উপন্যাসের বিষয় এতোই নতুন রকমের মনে হয়েছে যে লণ্ডন থেকে ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে আর. ডব্লিউ ফ্রেজার কী দারুণ প্রশংসা করেছেন এর, সেটাও আপনাদের জেনে রাখা দরকার। তিনি লিখেছেন—"Outside in 'Mariage de Loti' there is nothing comparable to the 'Kopala Kundala' in the history to western fiction."

এ প্রশ্নের উত্তর দীনবন্ধু মিত্র কিছু দেননি, দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, তিনি বলেছিলেন— 'কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে। পরে সন্তানাদি হইলে স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে; সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।' এই মন্তব্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ পছন্দ হয়নি, পূর্ণচন্দ্র তাঁর গ্রন্থেই সে কথা বলেছেন। উপন্যাসটি পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন, পূর্ণচন্দ্র ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু সমাধান যেরকমই হোক, সমস্যাটা যে বেশ অভিনব তা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে হচ্ছে। খানিকটা এই ধরনের সমস্যা দেখা যায় কালিদাসের সংস্কৃত নাটক 'অভিজ্ঞানম্‌শকুন্তলম্'-য়। সেখানে আশ্রমে প্রতিপালিতা শকুন্তলা কণ্বমুনি আর আশ্রমবালক ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ চোখে দেখেনি, প্রথম দেখল রাজা দুষ্মন্তকে। শেক্সপীয়রের 'দ্য টেম্পেস্ট' নাটকে মিরান্ডারও প্রায় এইভাবেই নির্জন দ্বীপে শৈশব কেটেছে। সমালোচক ফ্রেজার যে উপন্যাসটির নাম করেছেন, সেই উপন্যাসের লেখক পিয়ের লোতিও দেখিয়েছেন এইরকম একটি মেয়েদের দ্বীপে প্রথম পুরুষের আগমন। যাইহোক, সংক্ষেপে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাহিনীটা আপনাদের জানিয়ে রাখি, যাতে বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্যার কী সমাধান করলেন।

৫৫.৩.১ কাহিনি-সংক্ষেপ

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটির কলেবর খুব বেশি নয়, গল্পে নাটকীয় উত্থান পতন থাকলেও কাহিনি খুব জটিল নয়। নবকুমার এই কাহিনির নায়ক। সপ্তগ্রামে তার বাড়ি। মূল ঘটনা আড়াইশো বছর আগেকার কথা, তাই সপ্তগ্রাম তখন জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি। গঙ্গাসাগরের মেলা থেকে ফেরবার সময় দিগ্‌ভ্রান্ত একদল যাত্রীর মধ্যে নবকুমারও ছিল। কোনরকমে একটা চরে নৌকা ভিড়লে রান্নার উদ্যোগ শুরু হল। কাঠ নেই বলে নবকুমার একা গেল কাঠ কাটতে, কিন্তু তার আগেই জোয়ারে নৌকা ভেসে গেল। নবকুমার সেই চড়ে পরিত্যক্ত হল।

সেই চরে থাকত এক কাপালিক আর একটি যুবতী মেয়ে কপালকুণ্ডলা। আসলে সে ব্রাহ্মণকন্যা, দৈবদুর্ঘটনার অতি শৈশবে সেই চরে নির্বাসিত। কাপালিক নিজের স্বার্থেই তাকে লালন করেছে। কাপালিক বধের জন্য একটি মানুষ পেয়ে খুব খুশি, নবকুমারকে বন্দী করে রাখল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার মায়া হল, সে তাকে মুক্ত করে নিয়ে এল ভৈরবী মন্দিরে পুরোহিত অধিকারীর কাছে। কাপালিকের রোষ থেকে কপালকুণ্ডলাকে বাঁচাবার জন্য অধিকারী নবকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে তাকে সপ্তগ্রাম পাঠাবার জন্য মেদিনীপুর পর্যন্ত দিয়ে এলেন।

সপ্তগ্রাম যাবার পথেই দেখা হয় নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মবতীর সঙ্গে, কিন্তু নবকুমার তাকে চিনতে পারে না। পাঠানের হাতে পড়ে পদ্মাবতীর পরিবারের সকলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে বলে নবকুমারের সঙ্গে তাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। পদ্মাবতী লুৎফা-উন্নিসা নাম নিয়ে মোগল রাজদরবারে সেলিমের খুব প্রিয়পাত্রী হয়েছে। বাইরে, তার নাম মতিবিবি। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়, গা ভর্তি গহনা সে দেয় কপালকুণ্ডলাকে, কপালকুণ্ডলা তা আবার দান করে ভিখারীকে।

অচেনা মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এলে যে ধরনের সমস্যা হবার কথা, তা হয়না, নবকুমার জীবন্ত ফিরে আসার আনন্দে সব চাপা পড়ে যায়। কিন্তু কিছু দিন পার নবকুমারের বিবাহিতা ভগ্নী শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথনে বুঝি, কপালকুণ্ডলার কোন পরিবর্তন হয়নি, আগের জীবনই তার কাম্য ছিল।

এরপর কাহিনি কপালকুণ্ডলাকে ত্যাগ করে মতিবিবির আখ্যান বর্ণনা করতে বসে। সেলিম বা জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী রাজা মানসিংহের ভগিনী এবং সেই ভগিনীর প্রধানা সহচরী হিসাবে লুৎফা-উন্নিসা সেলিমকেও তৃপ্তি দান করত। আকবর মৃত্যুশয্যায় বলে সেলিমই সিংহাসনের দাবিদার ছিলেন। কিন্তু সেলিম যে গোপনে শের আফগানের স্ত্রী মেহের-উন্নিসার প্রতি প্রণয়াসক্তা, সে কথা জানত মতিবিবি। ফলে খসরুকে সিংহাসনে বসাবার একটা ষড়যন্ত্র করে সে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। এরপর মেহের-উন্নিসার কাছে গিয়ে সেলিম সম্বন্ধে তার মন জানতে চেষ্টা করে মতিবিবি। শেষে মেহের ঘোর প্রণয়াসক্ত। সে কথা সেলিমকে সে জানালে সেলিম অবশ্য উপপত্নী হিসাবে তাকে কাছে রাখতে চায়, কিন্তু সে নিজের স্বামীর ওপর অধিকার কায়েম করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কপালকুণ্ডলাকে বিতাড়িত করতে সপ্তগ্রামে আসে। এর কাপালিককেও সেখানে পেয়ে গেল। দুজনের উদ্দেশ্য একই।

এক বছরের বিবাহিত জীবন কাটার পর কপালকুণ্ডলার সামান্য পরিবর্তন হলেও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে তার প্রতি অনুরক্ত করার জন্য বন থেকে গভীর রাতে ওষুধ খোঁজার জন্য পাঠায় মৃন্ময়ী বা কপালকুণ্ডলাকে। মতিবিবি ও কাপালিকের পরামর্শ শুনে ফেলে সে, কাপালিককে দেখেও ফেলে এক ঝলক। স্বপ্নে কপালকুণ্ডলা নিজের নিয়তি দেখতে পায়। ব্রাহ্মণকুমারবেশী মতিবিবি চিঠি দেয় তাকে আবার দেখা করার জন্য। সেই অনুযায়ী সে যায়, কিন্তু সেই চিঠি নবকুমারের হাতে পড়লে সে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। গভীর রাতে কপালকুণ্ডলাকে

অনুসরণ করতে যাওয়ার কাপালিকের সঙ্গে দেখা হয়। ভগ্নবাহু কাপালিক মৃণ্ময়ীকে ভৈরবীর কাছে বলিদানে নবকুমারের সাহায্য চায় এবং মদ্যপানে তাকে উন্মত্ত করে ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে মৃণ্ময়ীর মিথ্যা দ্বিচারিতার দৃশ্য দেখায়। নবকুমারই মৃণ্ময়ীকে বধ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় পাড় ভেঙে মৃণ্ময়ী জলে পড়ে। নবকুমার তাকে উদ্ধার করার জন্য ঝাঁপ দেয়। দুজনেই তলিয়ে যায়।

৫৫.৩.২ 'কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের একেবারে শেষ বাক্যটি এইরকম ছিল—'সেই অনন্তগঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে, 'বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?'

এটা কিন্তু উপন্যাসের বর্তমান সংস্করণে আছে। আপনারা সন্ধান করলে দেখতে পাবেন, প্রথম সংস্করণে অর্থাৎ উপন্যাসটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এর পরেও খানিকটা অংশ ছিল। সেই অংশটুকু এইরকম ঃ "(কাপালিক) লম্ফ দিয়া অনায়াসে দৃষ্ট পদার্থ কুলে তুলিলেন। দেখিলেন, এ নবকুমারের প্রায় অচৈতন্য দেহ। অনুভবে বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলাও জলমগ্ন আছেন। পুনরপি অবতরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না।

তীরে পুণরারোহণ করিয়া কাপালিক নবকুমারের চৈতন্য বিধানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের সংজ্ঞালাভ হইবামাত্র, নিঃশ্বাস সহকারে বাক্যস্ফূর্তি হইল। সে বাক্য কেবল 'মৃণ্ময়ী! মৃণ্ময়ী!'

কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মৃণ্ময়ী কোথায়?' নবকুমার উত্তর করিলেন, 'মৃণ্ময়ি-মৃণ্ময়ি-মৃণ্ময়ি!'

এই দুটি উপসংহারের মধ্যে কোন্‌টি আপনাদের মতে সুন্দর এবং যুক্তিসংগত, ভেবে দেখতে পারেন। আমার বিবেচনায়, শাস্তি যদি পেতেই হয়, দুজনেরই পাওয়া উচিত, একা কপালকুণ্ডলার নয়। তাছাড়া অন্যায় তো বেশি করেছে নবকুমারই। কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর উপকার করবার জন্যই বেরিয়েছিল, আগের দিন কাপালিককে দেখা সত্ত্বেও; কথা বলেছিল ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতীর সঙ্গে। অথচ সেই অপরাধে নিজে তাকে বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে নবকুমার কাপালিকের নির্দেশ অনুসারে তাকে বলি দিতে গিয়েছিল। বিনা অপরাধে মৃণ্ময়ীর মৃত্যু যদি ঔপন্যাসিক দেখাতে পারেন, তবে অপরাধ করে নবকুমারের বেঁচে যাওয়া পাঠক হিসাবে আমাদের কিছুতেই যুক্তিসংগত হত না বলে মনে হয়। তাই, মনে হয় আপনারাও একমত হবেন যে, বর্তমান সমাপ্তিটিই উপন্যাসের পক্ষে ঠিক হয়েছে—যা হবার দুজনের একসঙ্গেই হয়েছে, এবং সেটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৫৫.৩.৩ কাহিনি-বিশ্লেষণ

আপনারা উপসংহার নিয়ে যেরকম ভাবনাচিন্তা করলেন, সেই ভাবেই একবার ভাবতে পারেন গোটা কাহিনিটা নিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের মাথায় যে চিন্তাটা এসেছিল, আমরা তা জানি। সেই চিন্তাটাকে রূপ দেবার জন্যই তিনি 'রসুলপুরের নদীর' বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি এবং অরণ্যসংকুল অঞ্চলে মৃণ্ময়ীর আশৈশব প্রতিপালনের কথা ভেবেছিলেন। কোনোসময় নৌকাডুবি হয়ে একটি শিশু সেখানে উপস্থিত হতেই পারে এবং কাপালিক তাকে আশ্রয় দিয়েছে এমন ঘটনাও স্বাভাবিক। মৃণ্ময়ী বা কপালকুণ্ডলা কখনোই কোনো যুবা-পুরুষের মুখ দেখেনি, এটা অবশ্য ঠিক নয়—অধিকারীর শিষ্যেরা কখনও কখনও এসেছে। তবে সভ্য সমাজের নিয়মকানুন-জানা বা স্বামী ও বিবাহ সম্বন্ধে কোনো ধারণা তার অবশ্য থাকার কথা নয়।

নবকুমার সেইরকম একটি জায়গায় নিতান্ত পরিস্থিতি বিপর্যয়েই গিয়ে পড়েছিল এবং যেরকম ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিল তাতে নবকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে তাকে সভ্য সমাজে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া অধিকারীর আর কিছু করবারও ছিল না বোধহয়। অর্থাৎ এইরকম একটি লোকালয় ও সভ্য সমাজের সংস্রব বর্জিত মেয়ের বিয়ে দেওয়া হল।

এরপরে যা হতে পারে বলে সঞ্জীবচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন তা যে বঙ্কিমচন্দ্রের পছন্দ হয়নি, সেটা আমরা পরবর্তী কাহিনী থেকেই বুঝতে পারি। মৃণ্ময়ীকে পেয়ে নবকুমার যে পৃথিবীকে অন্য চোখে দেখতে লাগল, সব কিছুই তার কাছে সুন্দর হয়ে গেল, এ কথা লেখক বলেছেন, কারণ—'প্রণয় এইরূপ! প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।'

অথচ কপালকুণ্ডলার তিলমাত্র পরিবর্তন এই প্রণয় ঘটাতে পারেনি। নবকুমারের বোন শ্যামাসুন্দরী তাকে সুন্দর করে চুল বেঁধে দিতে চেয়েছে, অলংকারে ভূষিত করতে চেয়ছে, এমন কী সোনার পুত্তলি ছেলে কোলে তোর দিব ফেলে', একথাও বলেছে, তার পরেও কপালকুণ্ডলা বলেছে, 'বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।'

আমরা বিবাহের এক বছর পরেও কপালকুণ্ডলাকে দেখেছি। তখনও সংসারের দিকে তার কোন মন নেই, নবকুমারের প্রতি বিশেষ প্রণয় নেই, দাম্পত্য জীবনেও কোনো লোভ নেই। কাজেই মনে হয় জীবনের প্রথম ষোল বছর এইভাবে কাপালিকের কাছে লালিত হলে সংসার আর তাকে আকর্ষণ করতে পারবে না, এইরকম একটা চিন্তাই মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ছিল। অন্তত কাহিনী থেকে সেরকমই মনে হয়। চরিত্রের পক্ষে এই ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে কিনা আমরা কিছুটা পরে বিচার করবো। এখন একটা অন্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্র যে চিন্তার কথা উপন্যাস লেখার আগে কারো কারো কাছে খুলে বলেছেন সেখানে কিন্তু শুধু মেয়েটির কথাই ছিল, তাকে বিবাহ করে যে সভ্যসমাজে নিয়ে যাবে তার আর একপক্ষ আগে ছিল, কিম্বা তার বিবাহিত বোনকে স্বামী বিশেষ সম্মান বা ভালবাসা দেয় না, এসব কথা ছিল না। এসব যে উপন্যাসে এসেছে, তাই নয়, কপালকুণ্ডলার জীবন এবং পরিণতির সঙ্গে এরা একেবারে গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। এটা কেন হল, আপনাদের একটু চিন্তা করে দেখতে হবে।

৫৫.৪ উপকাহিনির প্রয়োজনীয়তা

যে কোনো উপন্যাস লেখার সময় মূল কাহিনি তো একটা থাকেই, কিন্তু সেই সঙ্গে অপ্রধান আরো দুটো-একটা গল্প লেখক সুন্দর ভাবে জুড়ে দেন এমনভাবে, যাতে মূল গল্পের সঙ্গে বেশ মসৃণভাবে মিশে যেতে পারে। কেন তিনি এমন করেন? উপন্যাসটা একটু মোটাসোটা করবার জন্য? পাঠকের কৌতূহল আরো বাড়িয়ে তোলবার জন্য?

এমনিতে প্রশ্ন দুটো শুনতে যতোই মোটা দাগের হোক না কেন, এ কথাগুলোও কিন্তু মিথ্যে নয়। উপন্যাসটাকে বেশ খানিকটা কলেবর তো দিতেই হবে, নইলে তাকে উপন্যাস বলে মনে হবে কেন! এখন আমাদের আলোচ্য এই 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কথাই ধরা যাক, বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যে প্রশ্নটা জেগেছিল, সেই প্রশ্নের রূপায়ণ কিন্তু তিনি প্রথম দুটি খণ্ডেই, অর্থাৎ পনেরোটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই করে ফেলেছেন—অর্থাৎ লোকালয়বর্জিত

স্থানে একটি মেয়ের বেড়ে ওঠা দেখালেন, অবস্থা বিপাকে তাকে বিবাহ করে সভ্যসমাজে নিয়ে আসা দেখালেন, দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করে সে মেয়ের কোন পরিবর্তন হল কিনা তাও তিনি দেখিয়ে ফেললেন। সব কিন্তু ওই পনেরোটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই, যে উপন্যাসের বর্তমান কলেবর হচ্ছে একত্রিশটি পরিচ্ছেদ। তাও প্রথম পনেরোটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে মতিবিবি। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার মধ্যে তো মতিবিবির কোন প্রসঙ্গই ছিল না কাজেই মতিবিবিকে বাদ দিলে, 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস খণ্ডোপন্যাসের আয়তনও পেত কি না সন্দেহ।

দ্বিতীয় কথাটা ছিল পাঠকের কৌতূহল বাড়িয়ে তোলা। তার জন্যেও তো নিশ্চয়ই গৌণ কিছু গল্প মূল কাহিনির সঙ্গে জুড়ে দেবার দরকার হতে পারে। 'কপালকুণ্ডলা'র গল্পটা যখন সদ্য আমরা জেনেছি তখন তার কথাটাই আর একবার ভাবা যাক। একেবারে প্রথম দিকটা পাঠকের খুবই কৌতূহল ছিল, একটা রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনাও ছিল—কাপালিকের হাতে ধরা পড়ার পর নবকুমার উদ্ধার পায় কি না। যখন কপালকুণ্ডলাই তাকে বাঁচিয়ে দিল, অধিকারী তার সঙ্গে নবকুমারের বিয়ে দিয়ে তাকে মেদিনীপুর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন, তখন আমাদের কৌতূহলের বিষয়, এইবার কপালকুণ্ডলা বা মৃণ্ময়ী একটি সাধারণ নারীর অনুভূতিগুলি লাভ করবে, নাকি আগেকার মত বন্যস্বভাবেরই থাকবে। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে দেখা গেল নবকুমার কপালকুণ্ডলার জন্য পাগল হলেও কপালকুণ্ডলার মনে নবকুমার বা এই সংসারের জন্য কোনরকম আকর্ষণ তৈরি হয়নি—এমনকী সাধারণ নাগরিক মেয়ের মত চুলবাঁধা বা সাজসজ্জার ব্যাপারেও তাকে রাজি করানো যাচ্ছে না। পাঠকের কৌতূহলকে এবার কী দিয়ে জাগ্রত করবেন বঙ্কিমচন্দ্র। অপ্রধান গল্প তো তাকে খুঁজতেই হবে। এই ধরনের অপ্রধান গল্পগুলিকে উপন্যাস সমালোচনার ভাষায় বলা হয় উপকাহিনী বা sub plot. একটা উপন্যাসে এর দরকার হয় আরো নানা রকম কারণে। সেগুলি এবার জেনে নিন।

৫৫.৪.১ উপকাহিনির অন্যান্য উপযোগিতা

যেকোনো উপন্যাসেই ঔপন্যাসিকের যে একটা নিজস্ব জীবনদৃষ্টি থাকে, সে-বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং নিজের বিশিষ্ট মানসিকতার জন্যই এই জীবনদৃষ্টি তৈরি হয়। উপন্যাস যদি এই জীবনদৃষ্টি বা লেখকের নিজস্ব কোনো বক্তব্য আমরা খুঁজে না পাই তাহলে উপন্যাসটিকে সার্থক উপন্যাস হিসাবে মেনে নিতে পারব না। এই যে জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা বা বক্তব্য, সেটা তো ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের মূল কাহিনি দিয়েই প্রকাশ করবেন। কিন্তু এখন মনে হতে পারে যে সেই বক্তব্যকে আরো জোরদার করার জন্য তাঁর মনে হল, আরো দুটো একটা উপকাহিনি হলে বেশ সুবিধে হয়। তখন তিনি এই রকম গৌণ কাহিনির কথা ভাবেন। ব্যাপারটা আপনারা আরো ভালো বুঝতে পারবেন আর একটু বুঝিয়ে বললে।

প্রথম যে দুটি কারণের কথা বলেছি, উপকাহিনি সে জন্য তো দরকার হয় নিশ্চয়ই—উপন্যাসের আয়তন বাড়াবার জন্য উপকাহিনির খোঁজ করেন লেখক, পাঠকের কৌতূহল বজায় রাখার জন্যও একসঙ্গে দু'তিনটি ছোটবড় কাহিনি পেয়ে গেলে একবার এটা, একবার ওটা করে পাঠককে অনেকক্ষণ ধরে রাখা যায়, কিন্তু ওই জীবনদৃষ্টির ব্যাপারটা আরো গুরুত্বপূর্ণ। সেটার ব্যাপারে উপকাহিনিকে দুভাবে কাজে লাগান হয়। প্রথমত ধরুন যে বিশেষ বক্তব্য ঔপন্যাসিক সেই উপন্যাসে প্রকাশ করতে চান ঠিক সেইরকম বক্তব্য নিয়েই যদি একটি ছোট কাহিনি পাশাপাশি বুনে যান, তাহলে তাঁর বক্তব্য আরো জোরদার হতে পারে। দ্বিতীয় ব্যাপারটাও বেশ আকর্ষক। মূল কাহিনিতে যেরকম জীবনচিত্র আছে ঠিক তার বিপরীত ধরনের একটা জীবনচিত্র যদি তিনি উপকাহিনিতে

আঁকেন তাহলে প্রেক্ষিতের একটা বৈপরীত্য থাকে বলেই ঔপন্যাসিকের বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কালো কাপড়ের ওপরে যেমন ফুটে ওঠে সাদা সুতোর কাজ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটা আপনাদের অনেকেরই চেনা, সেই জন্য ওই উপন্যাসকেই দৃষ্টান্ত হিসাবে বেছে নিচ্ছি। উপন্যাসের নায়ক নগেন্দ্রনাথ পরম সাধ্বী স্ত্রী সূর্যমুখী থাকা সত্ত্বেও প্রবৃত্তিকে সংযত করতে না পেরে কুন্দনন্দিনীর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন এবং তাঁকে বিবাহ করলেন। এর ফল অবশ্য হল বিষময়, কুন্দনন্দিনী বিষপান করে আত্মহত্যা করল, এই হচ্ছে উপন্যাসের মূল কাহিনি। এর সঙ্গে উপকাহিনি আছে দুটি—দেবেন্দ্রনাথ-হীরার আখ্যান এবং শ্রীশচন্দ্র-কমলমণির আখ্যান। প্রবৃত্তিকে সংযত করতে না পারলে তার বিষময় ফলে সংসারে বিপর্যয় দেখা যায়, এই মূল বক্তব্যের সমান্তরাল উপকাহিনি দেবেন্দ্র-হীরার আখ্যান—সেখানেও অসংযমী দেবেন্দ্র দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিল এবং হীরা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা উপকাহিনিতে হয়ে থাকে, আমরা বলেছি, তার দৃষ্টান্ত শ্রীশচন্দ্র-কমলমণি বৃত্তান্ত। নগেন্দ্রের অশান্তির সংসার আরো স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য তাঁর বোন কলমমণির দাম্পত্যচিত্র এত মধুর করে এঁকেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এমনকী, সংসারে প্রকৃত টান যে তৈরি হয় সন্তানকে দিয়ে এবং সেইখানেই যে নগেন্দ্রের জীবনে একটা মস্ত ফাঁক রয়ে গিয়েছে তা বোঝানো হয়েছে কলমমণির সন্তান সতীশচন্দ্রের অত্যধিক পাকামি দিয়ে।

৫৫.৪.২ 'কপালকুণ্ডলার'র উপকাহিনি

উপকাহিনী লেখবার প্রথম যে কারণদুটি থকে, 'কপালকুণ্ডলা'র ক্ষেত্রে সে কারণদুটি যে ছিলই, সে কথা আপনারা আগেই শুনেছেন, কারণ 'উপকাহিনির দরকার হয় কেন' শিরোনামে সে আলোচনা আমরা করেছি। 'উপন্যাসের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে এখানে প্রাথমিকভাবে কিছুটা কলেবর বৃদ্ধির কারণে উপকাহিনি লেখবার কথা ভাবতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত নবকুমারের প্রথমা পত্নী মতিবিবিকে নিয়ে আসায় পাঠকের কৌতূহলও যে বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক, সে কথা অস্বীকার করবারও কোনো উপায় নেই। এবার আমাদের দেখতে হবে উপকাহিনি সৃষ্টির অন্য দুটি তাৎপর্য এখানে ফুটিয়ে তোলবার কোনো চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল কিনা।

প্রথমেই অবশ্য আপনাদের জেনে রাখা ভাল যে, কপালকুণ্ডলায় মতিবিবির গল্পটা প্রধান উপকাহিনি হলেও এখানে ছোটো আর একটি উপকাহিনি কিন্তু ছিল, সেটা শ্যামাসুন্দরীর গল্প। এই গল্পটা যে তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই শোনাবেন, সে কথা নবকুমার পরিবারের পরিচয় দেবার সময়ই বঙ্কিম বলেছেন।

'নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিল। জ্যেষ্টা বিধবা; তাহার সহিত পাঠকমহাশয়ের পরিচয় হইবে না। দ্বিতীয় শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা; কেননা, তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেন।'

এবার ভাবুন উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব যে জীবনদৃষ্টি ফুটে উঠেছে সেটার কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের ধারণা, সমাজ-সংসারের বাইরে কোনো মেয়ে যদি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বড় হয়ে ওঠে, তাহলে যৌবনকালে বিবাহ দিয়ে তাকে সংসারী করতে চাইলেও দাম্পত্যজীবনে সে সুখী হতে পারবেনা। এই ধারণা তাঁর ছিল বলেই নবকুমারের প্রগাঢ় প্রেম ব্যর্থ হয়ে গেল—নবকুমারের প্রেম বা দাম্পত্যবন্ধন, কোনোটাই তাকে আকর্ষণ করতে পারল না।

উপকাহিনির কাজ হতে পারে এর অসম্ভব ধারার কোনো কাহিনি সৃষ্টি করা। সেটা যে সম্ভব ছিল না, সে কথা আমরা বুঝতে পারি, কারণ এই কাহিনি এতই বিচিত্র ধরনের যে একই গ্রন্থে এরকম আর একটি উপকাহিনি আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হত না নিশ্চয়ই। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র উপকাহিনির অন্য তাৎপর্যটির কথা মনে রেখেছেন, অর্থাৎ বিপরীত ধরনের কাহিনি শুনিয়ে একটা বৈপরীত্য তৈরি করা, যাতে সেই পরিপ্রেক্ষিতে মূল কাহিনি বেশ ফুটে ওঠে। ছোটো এবং বড়ো দুটি উপকাহিনির কথাই মনে করুন, ব্যাপারটা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথমে শ্যামাসুন্দরীর গল্পে দেখুন, কুলীন ব্রাহ্মণের বহু স্ত্রীর মধ্যে সে এক জন বলে তার প্রতি স্বামীর ভালবাসা বিশেষ নেই। স্বামীর মন যাতে পাওয়া যায় সেজন্য প্রসাধনকলা, গুণপনার পরিচয় দেওয়া—ইত্যাদি ব্যাপারে সে যথেষ্ট করেছে নিশ্চয়ই, তারপরও যখন স্বামীর মন পাওয়া যায়নি তখন টোটকার সাহায্য নিয়েচে। কপালকুণ্ডলাকে বন থেকে ওষধি লতা খুঁজে আনতে বলেছে। শ্যামাসুন্দরীর স্বামীর মন পাবার এই তীব্র চেষ্টা, দাম্পত্যজীবনের প্রতি এই ভালবাসা, কপালকুণ্ডলার উদাসীনতা এবং সংসারের প্রতি বিরাগকেই আরো স্পষ্ট করে নাকি।

দ্বিতীয় গল্পে দেখুন এই বৈপরীত্য আরো তীব্র। কপালকুণ্ডলা স্বামীর প্রেম পেয়েও তার মূল্য বুঝতে পারছে না, অথচ মতিবিবি জীবনে প্রচুর বৈভব, প্রচুর আভিজাত্য এবং বিলাস পেয়েও স্বামীপ্রেমের জন্য লালায়িত। সেলিমের মোহ ত্যাগ করে সপ্তগ্রামে ফিরে এসেছে সে, কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, কাপালিকের কাজে সাহায্য করেছে। কেন? উত্তর কিন্তু একটাই—নবকুমার তার স্বামী, সেই অধিকার সে আবার প্রতিষ্ঠিত করবে, আবার দাম্পত্যজীবনে সে ফিরে আসবে। মতিবিবির এই তীব্র জীবনপিপাসার পরিপ্রেক্ষিত কপালকুণ্ডলার সংসারজীবনে বিতৃষ্ণাকেই আরো স্পষ্ট করেছে। উপকাহিনি দুটি এই জন্যই সার্থক।

৫৫.৪.৩ সার-সংক্ষেপ

'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনি সংক্রান্ত যেটুকু আলোচনা এতক্ষণ করা হল সেটা সংক্ষেপে একটু মনে করার চেষ্টা করুন।

প্রথমে কাহিনির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আপনারা দেখেছেন, মেদিনীপুরে গিয়ে একটি কাপালিককে দেখেই হোক বা যে কারণেই হোক, একটা প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রের মনে জেগেছিল, কোনো মেয়ে যদি জ্ঞান থেকেই সমাজ সংসারের বাইরে থাকে, তারপর যৌবনকালে তাকে কেউ সংসারী করার চেষ্টা করে, সংসারের প্রতি কি তার আগ্রহ জন্মাবে! সকলের সঙ্গে আলোচনায় সন্তুষ্ট না হয়েই বোধ হয় উপন্যাসটি তিনি লেখেন। এর কাহিনিতে আমরা দেখি মৃণ্ময়ী প্রায় আজন্ম কাপালিকের কাছে নির্জন বালিয়াড়িতে বড়ো হয়েছে। পরে নবকুমারকে বিবাহ কর সংসারী হবার চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়েছে।

এই মূল কাহিনির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আরো দুটি খণ্ডকাহিনি জুড়েছেন, উপন্যাসের আলোচনায় যাদের বলে উপকাহিনি। উপন্যাসে উপকাহিনি দরকার হয় মূলত চারটি কারণে—উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করবার জন্য, পাঠকের কৌতূহলকে ধরে রাখবার জন্য, লেখকের বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টির অনুরূপ একটি খণ্ডকাহিনী দিয়ে তার তীব্রতা বাড়াবার জন্য অথবা বিপরীত ধরনের উপকাহিনি তৈরি করে মূল কাহিনির ঔজ্জ্বল্য বাড়াবার জন্য। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে দুটি উপকাহিনি আছে, নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী মতিবিবির গল্প এবং নবকুমারের বোন শ্যামসুন্দরীর গল্প। এই উপকাহিনি দুটি উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করেছে। পাঠকের ঔৎসুক্য বজায় রেখেছে এবং তীব্র সংসারাসক্তি ও দাম্পত্য জীবনের তৃষ্ণায় কপালকুণ্ডলার সংসারে অনাসক্তিকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

৫৫.৫ ‘কপালকুণ্ডলা’র বৃত্তগঠন

বৃত্তগঠন কথাটা ইংরেজি Plot-construction কথাটির বাংলা রূপান্তর। উপন্যাসের story বা কাহিনী আর plot বা বৃত্ত ব্যাপার দুটোর মধ্যে একটু তফাত আছে। এই তফাতটা ই. এম. ফরস্টার নামে এক ইংরেজ ঔপন্যাসিক সমালোচক ভারি সুন্দর করে বুঝিয়েছেন Aspects of the Novel নামে একটি ছোটো বইয়ে। এইরকম একটা ছোটো দৃষ্টান্ত দিয়েই পার্থক্যটা বুঝিয়েছেন, বলেছেন—‘রাজা মারা গেলেন, তারপর রাণি মারা গেলেন, এই হল কাহিনী, এবং ‘রাজা মারা গেলেন, তারপর দুঃখে রাণিও মারা গেলেন’, এই হল বৃত্ত। মানেটা কী হল? গল্পে আছে কেবল এই প্রশ্ন, তারপর কী হল! বৃত্তে আছে একটা কার্যকারণ শৃঙ্খল। ব্যাপারটা আপনাদের আর একটু স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করি।

যেকোনো একটা ছোট গল্প বা উপন্যাস লিখতে গেলে তার গল্পটা তো লেখককে মোটামুটি ভাবে আগেই ভেবে নিতে হবে, কিন্তু সেটা ঠিক কীভাবে সাজিয়ে লিখলে পাঠকের কৌতূহল বজায় থাকবে, কার্যকারণ শৃঙ্খলা রক্ষিত হবে, গোটা কাহিনীটার মধ্যে একটা বাঁধুনি থাকবে—এক কথায় তার বিন্যাসটাকেই বলে বৃত্ত। আপনারা যে আগে উপকাহিনীর কথা জেনেছেন, সেও কিন্তু এই বিন্যাসেরই ব্যাপার। কীভাবে আমি আমার গল্পটাকে বিন্যস্ত করবো, এটা ভাবতে গিয়েই ঠিক করতে হয় এতে একটাই কাহিনি থাকবে; নাকি একের বেশি। একটিই কাহিনি থাকলে সে বৃত্তকে আমরা বলি সরল বৃত্ত। যদি একাধিক উপকাহিনি থাকে, মানে আমাদের ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসের মতো, তবে সেই গঠনকে বলি জটিল বৃত্ত। আর যদি বেশ কয়েকটি কাহিনির মধ্যে কোনোটিকেই ঠিক প্রধান মনে না হয়, সবগুলোই প্রথমটা দেখতে আলাদা বলে মনে হয়, তবে সেই গঠনটাকে বলি যৌগিক বৃত্ত, যেমন শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’। কপালকুণ্ডলার গঠনটা যে জটিল বৃত্তের, সেটা আমরা এর মধ্যেই জেনে ফেলেছি, কারণ এখানে কপালকুণ্ডলা-নবকুমারের গল্পটাই প্রধান, মতিবিবি আর শ্যামাসুন্দরীর গল্প এই প্রধান কাহিনিটাকে নিটোল হতে সাহায্য করেছে মাত্র। এবার দেখি, গোটা কাহিনীটার বিন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক কেমনভাবে করেছেন।

আকারে ‘কপালকুণ্ডলা’ খুব বড় না হলেও বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটিকে বিন্যস্ত করেছেন চার খণ্ডে। প্রত্যেক খণ্ডে অবশ্য বেশ কিছু করে পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম খণ্ডের নয়টি পরিচ্ছেদে আছে—কাপালিকের আস্তানায় নবকুমারের গিয়ে পড়া, বন্দী হওয়া, কপালকুণ্ডলার সাহায্যে সাময়িক মুক্তি, অধিকারীর পৌরোহিত্যে তাদের বিবাহ এবং মেদিনীপুর পর্যন্ত তাদের নির্বিঘ্নে এগিয়ে দিয়ে আসা। দ্বিতীয় খণ্ডের ছ-টি পরিচ্ছেদে পাই—সপ্তগ্রামে প্রত্যাবর্তন, পথে নবকুমারের প্রথমা পত্নীর সঙ্গে দেখা এবং বিনা বাধায় কপালকুণ্ডলা নবকুমারের স্ত্রী হিসাবে গৃহীত। তৃতীয় খণ্ডের সাতটি পরিচ্ছেদেই পাই—মতিবিবির সংবাদ—আগ্রায় তার প্রতিপত্তির ইতিহাস এবং সপ্তগ্রামে প্রত্যাবর্তন। চতুর্থ খণ্ডের ন’টি পরিচ্ছেদে নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ, কপালকুণ্ডলার বিরুদ্ধে চূড়ান্তষড়যন্ত্র এবং পরিণতিতে দুজনের মৃত্যুর আশঙ্কা। ঠিক মতো কার্যকারণে শৃঙ্খলে সমস্ত ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে কিনা বুঝতে গেলে অবশ্য আর একটু বিস্তারিত ভাবে গোটা ব্যাপারটা আমাদের জানতে হবে। প্রথম খণ্ডের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে নবকুমারের নির্বাসনের কাজটা সম্পন্ন হয়েছে। দিগভ্রান্ত যাত্রীনৌকা কোনোক্রমে চড়ায় বেঁধে রান্নার উদ্যোগ করলে তা নষ্ট হতে বসেছিল চেলাকাঠের অভাবে। অন্য কেউ রাজি না হওয়ার নবকুমার একাই গিয়েছিল কাঠ কাটতে, ফলে জোয়ার আসবার সময় নবকুমারের প্রতীক্ষা আর কেউ করতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য আমাদের একটা উপদেশ দিয়েছিলেন সেটিও আপনাদের মনে রাখতে হবে ঃ

'ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। . . . তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তর না হইব কেন?

একেবারে পরের পরিচ্ছেদেই কাপালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে গল্পের কোনো চমক থাকে না, তাই তৃতীয় পরিচ্ছেদে নিঃসঙ্গ ও অসহায় নবকুমারের এমন কষ্ট দেখানো হয়েছে যাতে যে কোনো কারও সন্ধান পেলে সে বেঁচে যায়। চতুর্থ পরিচ্ছেদেই কাপালিকের সন্ধান পেয়েছে এবং তাতে সে আশঙ্কিত না হয়ে খুশিই হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে—পথভোলা পথিককে সে কাপালিকের আশ্রয়ে যেমন পৌঁছে দিয়েছে, তেমনি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নবকুমারকে বলিদানের জন্য কাপালিক বন্ধন করলে বাঁধনও কেটে দিয়েছে সে। সপ্তম পরিচ্ছেদে খুব যুক্তিসংগত ভাবেই কাপালিককে উঁচু বালিয়াড়ি থেকে পড়ে যেতে দেখিয়েছেন লেখক, যাতে কিছুদিনের জন্য সে কর্মক্ষয় না থাকে, কারণ অষ্টম পরিচ্ছেদে অধিকারী নবকুমারকে বিবাহের প্রস্তাব দেবেন এবং নবম পরিচ্ছেদে বিবাহের পর তাকে মেদিনীপুর পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন—গোটা ব্যাপারটাই সময় সাপেক্ষ। যেহেতু দ্বিতীয় খণ্ডে মতিবিবিকে দেখানো হবে, প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদেই তার উল্লেখ করা হয়েছে।

নবকুমারের সঙ্গে মতিবিবির সাক্ষাৎ করানো হবে বলেই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার পালকির সঙ্গে না গিয়ে নবকুমারকে পদব্রজে যাত্রা করানো হয়েছে, মতিবিবি দস্যুর হাতে নিগৃহীতা হয়েছে এবং নবকুমারের সাহায্যে সরাইখানায় পৌঁছেছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মতিবিবি তার স্বামীকে চিনেছে, নবকুমার তাকে চেনেনি। সপত্নীকে দেখার প্রলোভন অবশ্যই এবার জাগবে, তাই তৃতীয় পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলাকে দেখেছে মতিবিবি, তাকে গহনা দান করে নিজের বৈভব বোঝাতে চেয়েছে। পরের পরিচ্ছেদেই সেগুলি ভিখারীকে দান করে কপালকুণ্ডলা তার নিজের চরিত্রও বুঝিয়ে দিয়েছে। যুক্তি অনুসারে এরপর থাকা উচিত একটি অজ্ঞাতকুলশীল মেয়েকে নবকুমারের পরিবার কীভাবে গ্রহণ করে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে সেটাই বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখিয়েছেন কপালকুণ্ডলার প্রেমে নবকুমার বিহ্বল হলেও কপালকুণ্ডলার কোনরকম পরিবর্তন নেই।

যে কোনো অল্প শক্তিমান লেখক হলে কাহিনি হয় এখানেই শেষ হতো, অথবা কপালকুণ্ডলা যে কিছুতেই সংসারে মন বসাতে পারছেনা, বার বার তার বর্ণনা দিয়ে আমাদের বিরক্ত করা হতো। এই একঘেয়েমি এড়াবার জন্য, অর্থাৎ কপালকুণ্ডলাকে সংসারে মন বসাবার জন্য বেশ কিছুটা সময় দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র গোটা দ্বিতীয়খণ্ডই প্রায় অতিবাহিত করেছেন নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী ও আগ্রার সম্রাট পরিবার নিয়ে। প্রথম পরিচ্ছেদে দেখিয়েছেন সম্রাট সেলিমের অত্যন্ত কাছের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কেন তাকে উড়িষ্যা পালাতে হয়েছিল, যাতে মেদিনীপুরে নবকুমারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়ে যায়। সেই পূর্বসূত্র অর্থাৎ ক্ষমতা দখলের লড়াই দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। আগ্রার সিংহাসনে মতিবিবির টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে তৃতীয় পরিচ্ছেদে সে গিয়েছে শের আফগানের বেগম মেহেরউন্নিসার কাছে। নিজের অস্তিত্বরক্ষা প্রায় অসম্ভব, সে বুঝে গিয়েছে চতুর্থ পরিচ্ছেদে সম্রাট সেলিমের সঙ্গে কথা বলে। সুতরাং পঞ্চম পরিচ্ছেদে অনিবার্য ভাবেই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে আগ্রা ত্যাগের। এইবার আশাহত, ক্ষমতাচ্যুত, ভাগ্যের লড়াইয়ে পরাজিত মতিবিবির মনে ঝলসে উঠবে প্রতিহিংসার আগুন, এটাই স্বাভাবিক—তার অধিকারে যে হস্তক্ষেপ করেছে, তার স্বামীকে যে পরিত্বে বরণ করেছে, তাকে সরতে হবে সেখান থেকে, অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে মতিবিবির। সুতরাং পরবর্তী দুটি পরিচ্ছেদে মতিবিবি ফিরে এসেছে পদ্মবতী হয়ে, গাঁটছড়া বেঁধেছে কাপালিকের সঙ্গে, কপালকুণ্ডলার সঙ্গে।

নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত, চতুর্থখণ্ডে সেই কাজটিই তিনি করেছেন। কপালকুণ্ডলার চরিত্র অপরিবর্তিত, প্রথম পরিচ্ছেদে শ্যামাসুন্দরীর জন্য গভীর বনে সে ওষধি খুঁজতে গিয়েছে। এ কাজ তাকে দ্বিতীয়বার করতে হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, তখনই কাপালিককে জঙ্গলে সে দেখতে পেয়েছে, ব্রাহ্মণকুমারবেশী পদ্মাবতী এবং কাপালিকের পরামর্শও সে শুনতে পেয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার নিয়তি যেন সে দেখতে পেয়েছে স্বপ্নে, সুতরাং আর একবার সাক্ষাৎ করার জন্য পদ্মবতীর পত্র পেয়ে সে জঙ্গলে যাবারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নাটকীয়তার চূড়ান্ত পর্যায় পত্র হারানো ও নবকুমারের তা হস্তগত হওয়া। এবার ক্ষিপ্ত নবকুমার পঞ্চম পরিচ্ছেদে কাপালিককে তার বাড়িতে ডেকে আনতেও দ্বিধা বোধ করে না। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এবং মদ্যপান করিয়ে কাপালিক নবকুমারকে এমন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তোলে যে সপ্তম পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মণকুমারবেশী পদ্মাবতীর সঙ্গে কপালকুণ্ডলার অঙ্গুরীয় বিনিময় দেখতে পেয়ে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দ্বিচারিণী ভাবে। অষ্টম পরিচ্ছেদে নবকুমারই কপালকুণ্ডলাকে ধরে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়, অদৃষ্টের পরিহাস বোধ হয় একেই বলে। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণকুমারের পরিচয় কপালকুণ্ডলার মুখে শুনে তার ঘোর কাটে। কিন্তু নদীর পাড় ভেঙে কপালকুণ্ডলা জলে পড়ে যায়, উদ্ধার করার জন্য নবকুমারও ঝাঁপ দেয়। কেউই আর উঠতে পারে না।

কাহিনির এই বিনাস থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন, কী নিপুণভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনাগুলি সজ্জিত করেছেন, সর্বত্র একটা যুক্তিশৃঙ্খলা মেনে চলেছেন এবং নিতান্ত প্রয়োজনেই মতিবিবির উপকাহিনি সৃষ্টি করেছেন।

৫৫.৬ ‘কপালকুণ্ডলা’র অতিপ্রাকৃত উপাদান

বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ বলা হয়েছে, এবং উপন্যাসের প্রধান লক্ষণই যখন বাস্তবতা, তখন বাস্তব উপাদান বা প্রকৃত উপাদানই তাঁর রচনায় খুঁজে পাওয়া যাবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনারা যদি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাস পড়ে থাকেন, তবে একথা নিশ্চয়ই জানেন যে কিছু অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণ ছিল যেমন স্বপ্নদর্শন, অলৌকিক ঘটনা, ভাগ্যগণনা প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে অবশ্য মনে করতেন পাঠকের চিত্তবিনোদনের জন্য বা বাইরের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করবার জন্যই এসব ঘটনা উপন্যাসে এসে পড়েছে, কিন্তু এটাও ঠিক যে ভবিষ্যৎ এবং পরিণতি নির্দেশের কাজেও এইসব ঘটনা অনেক সময়ই কাজে লেগেছে।

প্রান্তলিপি

‘প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন, তার সার কথাটি আপনারা জেনে রাখতে পারেন। তিনি বলেছেন ‘যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।’

‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে এইরকম দৈব বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটেছে মূলত দুবার—একবার প্রথম অঙ্কের নবম পরিচ্ছেদে, অন্যবার চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় পরিচ্ছেদে। এর কাহিনি আপনারা জানেন, কাজেই ঘটনাদুটির উল্লেখ করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন।

নবকুমারকে উদ্ধার করে প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে যখন কপালকুণ্ডলা অধিকারীর কাছে এসেছিল তখন অধিকারী তার সঙ্গে নবকুমারের বিবাহ দেবার সংকল্প করে ‘একটি অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র লইয়া মন্ত্রপূত করিলেন, এবং

তাহা প্রতিমার পাদোপরি সংস্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।' বিল্বপত্রটি পড়েনি বলেই তিনি মনে করেছিলেন—এই সংকল্পে দেবী কালিকার সম্মতি আছে। কিন্তু বিবাহের পর যাত্রাকালে যখন দেবীর কাছে আবার এসেছেন—'ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, পুষ্পপত্র হইতে একটি অভিন্ন বিল্পপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি পড়িয়া গেল।'

এই ঘটনা কপালকুণ্ডলার মনে গভীর রেখাপাত করেছে, এমন হতে পারে, কারণ, সংস্কার এবং তামসিক ভক্তি তার মনে অত্যন্ত বেশি থাকারই কথা।

চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলা একটি স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নের মধ্যে অতিপ্রাকৃত বলে কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু এখানেও যেন তার ভবিষ্যতের একটি নির্দেশ আমরা পাই। কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখেছে—একটি তরীতে বসন্তলীলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হঠাৎ দুর্যোগের কালো মেঘে সব পরিপূর্ণ হয়ে গেল। প্রচণ্ড তরঙ্গ উঠল সমুদ্রে। 'একজন জটাজুটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ' এসে তরী বাঁ হাতে তুলে ধরল। 'ভীমকান্তশ্রীময়ী ব্রাহ্মণবেশধারী' অন্য একজন তরী ধরে জানতে চাইলেন—তরী ভাসাবেন না নিমগ্ন করবেন। ''কপালকুণ্ডলার মুখ হইতে বাহির হইল, 'নিমগ্ন কর।'' তরী পাতালে নিমজ্জিত হল।

এই স্বপ্নের অবশ্য একটা সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমরা পাই। কপালকুণ্ডলার দাম্পত্যজীবন নষ্ট করার জন্যই যে কাপালিক এসেছে, তা কপালকুণ্ডলা দেখেছে। ব্রাহ্মণবেশধারী যে পুরুষ নয়, তা সে শুনেছে, কিন্তু কাপালিকের সঙ্গে তাকে মন্ত্রণা করতে যখন সে দেখেছে তখন তার সর্বনাশের জন্যই জল্পনা-কল্পনা চলেছে, এ কথা চিন্তা করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। স্বপ্নটি হয়তো তার সেই চিন্তারই ফলমাত্র।

৫৫.৭ কাহিনিতে বাস্তবতা সৃষ্টির চেষ্টা

আমাদের এতক্ষণের আলোচনায় এ কথা নিশ্চয়ই বোঝা গিয়েছে যে, কপালকুণ্ডলায় লেখক এমন একটা পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, ঠিক যেরকম পরিবেশ আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতায় আমরা পাই না। এটা ঠিক আমাদের চেনা মানুষের গল্পও নয়—কাপালিক আর কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ আমরা কেউই প্রায় পাব না। যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে তাও আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে না, কারণ ওইভাবে একটি নির্জন বালিয়াড়িতে নির্বাসিত হবো এবং একটি সুন্দরী যুবতী কাছে এসে বলবে 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' এমন অভিজ্ঞতা আমাদের কারোরই হয়তো হবে না।

ব্যাপারটা যতই কাল্পনিক হোক, এই কাহিনি নিয়ে উপন্যাস লিখতে গেলে তাকে বাস্তব করে তুলতে হবে, অর্থাৎ পাঠকের কাছে তাকে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে হবে। সেই ব্যাপারটা করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কী কী চেষ্টা করেছেন, সেগুলোই আমরা এবার লক্ষ করার চেষ্টা করবো।

৫৫.৭.১ বাস্তবতা ঃ সময়ের উল্লেখ

যে-গল্প শোনানো হচ্ছে, সেটা আরম্ভ করবার সময়টা একেবারে নির্দিস্ট করে বললে কি হয়, মনে হয় যেন এটা গল্প নয়—সত্য ঘটনা। তাই বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস শুরু করেছেন এইভাবে ঃ

'প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল।' অর্থাৎ তখন সালটা যে প্রায় ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ—কারণ এই উপন্যাস লেখা হয় ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে, এটা স্পষ্ট করে বলা হল। তাতে মনে হল, যেন এটা কোন কাল্পনিক কাহিনি নয়। অবশ্য এটা বঙ্কিমচন্দ্রের অতি প্রিয় কৌশল, অন্যান্য উপন্যাসেও এরকম কৌশল আপনি পাবেন।

প্রান্তলিপি

এখানে একবার মনে করে নিতে পারেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'-র আরম্ভটা ঃ '৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন।'

কিন্তু এই কৌশলের কথা মুখে বলা যত সহজ, সর্বদা স্মরণ রেখে ঠিক সেইমতো উপন্যাস লিখে যাওয়া কিন্তু অতো সহজ নয়। যেমন দেখুন, সপ্তদশ শতকের ঘটনাক্রম বললেই মনে রাখতে হবে, ইংরেজ তখনও এদেশে আসেনি। সেটা মাথায় রেখেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'পর্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল।'

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র যখন মতিবিবির প্রসঙ্গে আগ্রার মোগল রাজবংশের কথা উল্লেখ করেছেন, তখনও স্মরণ রেখেছেন, সেটা সম্রাট আকবরের মৃত্যু ও যুবরাজ সেলিমের সিংহাসন লাভের সময়।

তৃতীয় আর একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা যায়। সপ্তগ্রামে নবকুমারের বাসভবনের কাছাকাছি এমন অরণ্য থাকতে হবে যেখানে কাপালিক লুগিয়ে থাকতে পারে, যেখানে ওষধির সন্ধানে কপালকুণ্ডলা পরিভ্রমণ করতে পারে। এই কারণেই সমৃদ্ধিশালী নগর হিসাবে পরিচিত সপ্তগ্রামের সে সময় কীরকম অবস্থা ছিল তা বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা করেছেন একটু বিশেষভাবে ঃ

'সপ্তগ্রামের এক নির্জন ওপনিবেশিক ভাগে নবকুমারের বাস। . . . নবকুমারের বাটীর পশ্চাদ্ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্ধ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত; সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

বাস্তবতা রক্ষার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ সতর্কতা এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই বোধহয় সৃষ্ট হতে পারবে।

৫৫.৭.২ বাস্তবতা ঃ ঐতিহাসিক কাহিনি

একটি কাল্পনিক কাহিনি পরিবেশন করতে গিয়ে উপকাহিনিতে অর্থাৎ নবকুমারের প্রথমা পত্নীর গল্প-প্রসঙ্গে ইতিহাসকে বঙ্কিমচন্দ্র কেন আশ্রয় করলেন, এ বিষয়ে নানা কারণ অনুমান করা যায়। কেউ কেউ এরকম বলেন যে—'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক পরিবেশে এবং ঐতিহাসিক চরিত্র সমন্বয়ে রচনা করে তিনি বিশেষ সাফল্য ও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, সেই জন্যই দ্বিতীয় উপন্যাসে ইতিহাসকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন নি, ইতিহাসের কাহিনি যেটুকু সুযোগ পেয়েছেন, সেটুকুই বর্ণনা করেছেন।

আমার কিন্তু সে কথা মনে হয় না। এ বিষয়ে আমার মত হল এই যে, বাস্তবতা রক্ষার জন্যই এ কাজ বঙ্কিমচন্দ্রকে করতে হয়েছে। এ মত অবশ্য সম্পূর্ণ ভাবেই আমার। আপনারা উপন্যাসটি ভালভাবে পড়ে দেখে যদি এর সঙ্গে একমত না হন, তবে অবশ্যই অন্যভাবে আপনার শিক্ষাসহায়কের সঙ্গে আলোচনা করবেন। আমি

মনে করি, যে-কাহিনি এই উপন্যাসে তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা শুধু কাল্পনিক নয়, এত বিচিত্র ধরনের যে, কোন মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাকে ধরার সম্ভাবনা খুবই কম। এই রকম একটা পুরোপুরি কাল্পনিক কাহিনিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হলে বিশ্বাসের একটা ভূমি দরকার, 'ইতিহাস সেই বিশ্বাসের ভূমি বলে আমি মনে করি। রসুলপুরের নদীর চরে কাপালিকের বসবাস বা প্রায় আজন্ম কপালকুণ্ডলাকে মানুষ করবার ব্যাপারটা একেবারে অলীক হতে পারে, কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনলাভ তো অলীক নয়, মানসিংহের ভগিনী যে তাঁর প্রধানা মহিষী ছিলেন, এ খবর তো অসত্য নয়, এবং জাহাঙ্গীর যে শের আফগানের পত্নী মেহেরউন্নিসার প্রতি গাঢ় প্রণয়াসক্ত ছিলেন, ইতিহাসই তার নির্ভুল সাক্ষ্য দেয়—অন্যায়ভাবে শের আফগানকে হত্যা পর্যন্ত করাতে হয়েছিল তাঁকে নিজের অভিলাস পূর্ণ করার জন্য। কাজেই এমন একটি শক্ত জমির ওপর নিজের উপন্যাসকে দাঁড় করাবার যে সুযোগ বঙ্কিমচন্দ্র হাতে পেয়েছেন, সেটাই কাজে লাগিয়েছেন নবকুমারের প্রথমা পত্নীকে লুৎফ-উন্নিসা হিসাবে সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহভাজন করিয়ে। ইতিহাসের এই কাহিনি বিশ্বাসযোগ্য বলেই লুৎফ-উন্নিসার কাহিনীও বিশ্বাসযোগ্য এবং লুৎফ-উন্নিসার সূত্রেই নবকুমারের কাহিনিটি পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে।

৫৫.৭.৩ বাস্তবতা ঃ শীর্ষ উদ্ধৃতি

চারখণ্ডে সম্পূর্ণ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে পরিচ্ছেদের সংখ্যা একত্রিশ। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের শীর্ষেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছেন। পরিচ্ছেদের ঘটনার সঙ্গে কিছুটা ভাবসাদৃশ্য আছে, বিভিন্ন সাহিত্য থেকে এরকম অংশ খুঁজে খুঁজে এক বা একাধিক পঙ্‌ক্তি পরিচ্ছেদ শুরুর আগে তুলে দিয়েছেন। এতে শুধু যে তাঁর পাণ্ডিত্য ও রসবোধ প্রকাশ পেয়েছে, উপন্যাসটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তাই নয়—যে সমস্ত নাটক ও কাব্যকে আমরা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছি তাদের সঙ্গে ভাবসাদৃশ্যে উপন্যাসটিও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, তার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদ্ধৃতিগুলি আপনাদের কারো কারো কাছে অপরিচিত মনে হতেও পারে। কিন্তু এগুলি না জানা থাকলে উপন্যাসটির রস পুরোপুরি গ্রহণ করা যাবে না, তাই আমি অতি সংক্ষেপে এদের পরিচয় দেবো।

প্রথম খণ্ড ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ — 'Floating straight obedient to the stream.' বিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপীয়রের Comedy of Errors নাটকের একটি পঙ্‌ক্তি। এই নাটক অবলম্বনেই বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন 'ভ্রান্তিবিলাস'। নবকুমারের যাত্রীবাহী নৌকা যেমন এখানে ঘন কুয়াশার মধ্যে পড়ে দিগভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, শেক্সপীয়রের নাটকেও তেমনি বণিক Aegion (ইজিয়ন) দিগন্তজোড়া কুয়াশার মধ্যে পড়ে অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ — 'Ingratitude! Thou marble-hearted fiend!'- শেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটক King Lear-এর প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য থেকে এটি নেওয়া হয়েছে। বড়ো এবং মেজো মেয়েকে সম্রাট লিয়র অত্যন্ত স্নেহ করতেন, কিন্তু প্রতিদানে অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই পাননি বলে এটি তাঁর খেদোক্তি—অকৃতজ্ঞতাই সবচেয়ে কঠিন হৃদয় শত্রু। 'কপালকুণ্ডলা'র এই পরিচ্ছেদে নবকুমারও এইরকম অকৃতজ্ঞতাই পেয়েছিল সহযাত্রীদের কাছে। তাদের আহার হবে না বলে গিয়েছিল কাঠের জোগাড় করতে, তারাই তাকে চরে নির্বাসন দিয়ে চলে গিয়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— '— Like a veil,
Which if withdrawn, would but disclose the frown
Of one who hates us, so the night was shown
And girmly darkled o'er their faces pale
And hopeless eyes.'

বিখ্যাত ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের 'ডন জুয়ান' (Don Juan) কাব্যগ্রন্থ থেকে পঙ্ক্তিগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই কাব্যের নায়ক জাহাজে করে সমুদ্রপথে যখন চলেছিল, তখন রাত্রির গভীর অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে এরকম অনুভূতিই তার হয়েছিল, যেন যবনিকা উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে এসেছে নিকষ কালো রাত—সমস্ত বিদ্বেষ নিয়ে তাদের মুখ বিবর্ণ ও দৃষ্টি হতাশ করে দিতে। ডন জুয়ানের সঙ্গে অবশ্য একজন সঙ্গিনী ছিল, 'কপালকুণ্ডলা'র এই পরিচ্ছেদে অজানা নির্জন দ্বীপের কালো অন্ধকারে নবকুমার একা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— '—সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি।'

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রন্থের পঞ্চম সর্গে এই পঙ্ক্তি দুটি আছে। লঙ্কার উত্তর দরজায় গভীর বনের মধ্যে অবস্থিত চণ্ডীদেবীর মন্দিরে লক্ষ্মণ এসেছিলেন দেবীকে পুজো করতে, উদ্দেশ্য মেঘনাদকে বধ করা। সেই সময়ই দরজায় ভীষণদর্শন মহাদেবকে দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। নবকুমার এই পরিচ্ছেদে কাপালিককে ওইভাবে হঠাৎ দেখতে পেয়েছে বলেই বঙ্কিমচন্দ্র এই উদ্ধৃতির সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন বোধ হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— '—যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্ব্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্।।'

মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য 'রঘুবংশম্'-এর ষোড়শ সর্গে এই শ্লোকটি আছে। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর শারাবতীতে যখন কুশ রাজত্ব করছেন, গভীর রাতে একদিন অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী সাধারণ নারী হিসাবে তাঁর বন্ধ ঘরে তাঁকে দর্শন দিলেন। সেই রাজলক্ষ্মীকেই কথাগুলি কুশ বলেছিলেন—আপনার বিশেষ যোগশক্তি আছে বলে মনে হচ্ছে না, কারণ আপনার আকৃতি দুখিনী নারীর মত, আপনাকে হিমক্লান্ত মৃণালিনী বা পদ্মফুলের মতো মনে হচ্ছে। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখে হতবাক হয়ে যাবে বলেই এই পরিচ্ছেদে 'রঘুবংশের' কুশের বিমূঢ় অবস্থার কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে পড়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— 'কথং নিগড়সংযতাসি। দ্রুতম্
নয়ামি ভবতীমিতঃ—

শ্রীহর্ষ রচিত 'রত্নাবলী' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক থেকে রাজার এই সংলাপের অংশ সংগ্রহ করা হয়েছে। শৃঙ্খলিতা সাগরিকাকে দেখে রাজা এই কথা বলেছেন—এ কী! তুমি শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আমি দ্রুত এখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাব। কপালকুণ্ডলাও এই পরিচ্ছেদে নবকুমারের বন্ধনমুক্ত ঘটাবে, সেই জন্যই এই প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ধৃত করেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ— 'And the great lord of Luna
Fell at that deadly stroke;
As falls on mount Alvernus
A thunder-smitten oak.'

এই অংশ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের বিস্তৃতি বোঝা যায়। এটি নেওয়া হয়েছে মেকলের Lays of Ancient Rome গ্রন্থ থেকে। শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে লুনার অধিপতি ভূপতিত হওয়ার সঙ্গে মেকলে তুলনা করেছিলেন অ্যালভার্নাস পাহাড়ের একটি বজ্রাহত ওক গাছের লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে। এখানে বালিয়াড়ির শিখর থেকে কাপালিকের পতন প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই তুলনার কথা মনে পড়ে গিয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ— 'And that very night—
Shall Romeo bear thee to Mantua.'

এটি শেক্সপীয়রের 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট' (Romes and Juliet) নাটকের অংশবিশেষ (4th Act, Scene1)। এখানে নায়িকা জুলিয়েটকে লরেন্স সান্ত্বনা দিয়ে বলছে,—ওযুধের প্রভাবে মৃতপ্রায় জুলিয়েটকে কবরস্থ করার জন্য নিয়ে এলে সেই রাত্রেই রোমিও তাকে মান্টুয়ায় নিয়ে যাবে। মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে অধিকারীর আশ্রমে নিয়ে গিয়েছে বলেই এই অংশ লেখকের মনে পড়েছে।

নবম পরিচ্ছেদ— 'কণ্ব। অলং বুদিতেন; স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়।'

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে মহর্ষি কণ্ব এই উক্তি করেছিলেন। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় তাকে অঝোরে কাঁদতে দেখে তিনি বলেছিলেন, আর কেঁদো না, স্থির হও। তোমার পথের দিকে চেয়ে দেখো। নবম পরিচ্ছেদে অধিকারীও প্রায় সেই ভূমিকা গ্রহণ করে কপালকুণ্ডলাকে উপদেশ দিয়েছেন বলে সদৃশ অংশ লেখক উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ— '—There—now lean on me:
Place your foot here—

ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের 'ম্যানফ্রেড' (Manfred) নাট্যকাব্যে এই সংলাপটি পাওয়া যায়। পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় ম্যানফ্রেডের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হলে একজন শিকারী তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে এ কথা বলেছিল—আমার দেহের ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে আসুন। এই পরিচ্ছেদে নবকুমারও মতিবিবিকে সেইরকম কথা বলবে বলে লেখক ম্যানফ্রেডের ওই অংশের সঙ্গে নিজের লেখার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— 'কৈষা যোষিৎ প্রকৃতিচপলা'

কবীন্দ্র ভট্টাচার্যের সংস্কৃত 'উদ্ধবদূত' কাব্যে কবি শ্রীরাধাকে দেখে এই মন্তব্য করেন—স্বভাব চঞ্চলা এই নারীটি কে? 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নবকুমার মতিবিবিকে চিনতে না পেরে কেবল প্রগলভা নারীটির আচরণ দেখে এইরকম কথাই হয়তো মনে করে থাকবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— ‘ধর দেরি মোহন মূরতি
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপু আনি
নানা আভরণ।’

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ গ্রন্থের দ্বিতীয় সর্গ থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। রতিদেবী এ কথা বলেছেন দেবী পার্বতীকে। রাবণবধের জন্য মহাদেবের অনুগ্রহ দরকার, মহাদেব ধ্যানমগ্ন—সেই ধ্যান ভঙ্গ করতে পারেন একমাত্র পার্বতী, তাই রামচন্দ্রের অনুরোধে রতিদেবী পার্বতীকে মোহিনী সাজে সাজাবার জন্য এ কথা বলেছেন। এই পরিচ্ছেদে মতিবিবিও কপালকুণ্ডলাকে সাজাবে, কিন্তু তার সঙ্গে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের সাদৃশ্য বোধহয় খুব বেশি নেই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— ‘—খুলিনু সত্বরে,
কঙ্কণ, বলয়, হার, সীঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চি।’

এটিও মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং এখানেও আমাদের মনে হয় কপালকুণ্ডলার সব গহনা ভিক্ষুককে দেওয়ার সঙ্গে মধুসূদনের কাব্যের সাদৃশ্য খুব বেশি নেই। ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’র চতুর্থ সর্গে সীতা রাবণ কর্তৃক হরণের সময় রামচন্দ্রকে পথের সন্ধান দেবার জন্য অলংকারগুলি ওইভাবে ছড়াতে ছড়াতে গিয়েছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— ‘শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ।
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।।’

কবি কালিদাসের ‘মেঘদূতম্’ পত্রকাব্যের উত্তরমেঘ অংশের ৪২-সংখ্যক শ্লোকের এটি আরম্ভ। এই শ্লোকে নির্বাসিত যক্ষের প্রগাঢ় প্রেম স্পষ্ট হয়েছে। এর বাংলা ভাষান্তর প্রায় এইরকম—তোমার সখীদের কাছেও সে কথা অনায়াসে প্রকাশ্যেই বলা যায়, সেরকম অগোপন কথাও একদিন সে তোমার আনন স্পর্শ করার লোভে ঝুঁকে পড়ে কানে কানে বলতো। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই নবকুমারের প্রেমের গাঢ়তা বোঝাতেই এই সদৃশ বর্ণনা খুঁজেছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— ‘কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা
বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে।।’

কবি কালিদাসের ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যের পঞ্চম সর্গে এই শ্লোকটি আছে। উমার তপস্বিনী মূর্তি দেখে স্বয়ং মহাদেব ব্রহ্মচারী বেশে তাঁকে ছলনা করতে এসে এই কথা বলেছিলেন—যৌবনেই সমস্ত আভরণ ত্যাগ করে তুমি বৃদ্ধ বয়সের উপযোগী বল্কল ধারণ করেছো কেন! প্রদোষকালে প্রস্ফুট চন্দ্র ও তারকাশোভিত বিভাবরী কি কখনও অরুণের কাছে যেতে পারে, তুমিই বলো! অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনে যোগিনী কপালকুণ্ডলা সঙ্গে সাধিকা উমার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

তৃতীয় খণ্ড ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ— 'কষ্টোহয়ং খলু ভৃত্যভাবং।'

শ্রীহর্ষরচিত 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকে একটি শ্লোকের সামান্য অংশ এখানে উদ্ধার করা হয়েছে। কথাটা বলেছেন রাজমন্ত্রী যৌগন্ধাবায়ণ। রাজার মঙ্গলের জন্যই অনেক রকমের কাজ তাঁকে করতে হয়েছে যা রাজার পছন্দ নয়। সেই জন্যই তিনি ভৃত্যের কাজকে বড়ই কষ্টকর বলেছেন। এই পরিচ্ছেদে লুৎফ-উন্নিসাও অনেক রকমের অনভিপ্রেত কাজ করেছে, তবে তা নিজের মঙ্গলের জন্য নয় রাজার মঙ্গলের জন্য, বলা শক্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— 'যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধরে।
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে।।
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল।
আজিকে বিফলা হলো, হতে পারে কাল।।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী' নাটক থেকে এই অংশটি সংগ্রহ করা হয়েছে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত এই উক্তিটি করেছেন মন্ত্রী জলধর। স্ত্রীর কাছে একবার অপদস্থ হয়ে আবার তারই সাহায্য প্রার্থনা করবেন সংকল্প করে তাঁর এই উক্তি। এই পরিচ্ছেদে মতিবিবির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পরও হতোদ্যম না হয়ে সে নতুন করে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করছে বলেই অংশটি প্রাসঙ্গিক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— 'শ্যামাদন্যো নহি নহি প্রাণনাথ মমাস্তি।'

কবীন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা 'উদ্ধবদূত' কাব্যগ্রন্থ থেকে এই পংক্তি উদ্ধৃত। এই উক্তি শ্রীরাধার—শ্যাম ছাড়া আমার প্রাণনাথ আর কেউ নেই। এই পরিচ্ছেদে সম্ভবত মতিবিবিও বুঝতে পেরেছে, নবকুমারের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোন গতি তার নেই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— 'পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।'

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' থেকে সংগৃহীত। এটি 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী' পত্রের অন্তর্ভুক্ত। রাজা শান্তনুকে জাহ্নবী বিবাহ করেছিলেন কেবল এই শর্তে যে, সন্তানকে তিনি গঙ্গাগর্ভে-বিসর্জন দেবেন, রাজা বাধা দিলেই তিনি স্বর্গে ফিরে যাবেন। যেবার অসহিষ্ণু হয়ে শান্তনু বাধা দেন সেবারই জাহ্নবী সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং রাজাকে এ কথা বলেন। এই পরিচ্ছেদে সেলিমের প্রতি মতিবিবির সম্ভাষণ পড়লেই বোঝা যায়, তার বক্তব্যও এই একই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রুতিপথে পরশ ন গলে।।
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল।।
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক।।'

এটি কবি বিদ্যাপতির অতি বিখ্যাত এক বৈষ্ণব পদ। পদটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাবার

পর রাধার বাবসম্মিলনের পদ এবং এখানে আর অংশ নয়, গোটা পদটাই বঙ্কিমচন্দ্র তুলে দিয়েছেন। কৃষ্ণের প্রেমে মুগ্ধ রাধা এখানে প্রেমের অসীম রহস্যময়তার অনুভূতিই প্রকাশ করেছেন। এতদিন লীলায় অংশগ্রহণ করেও এ লীলা কত মুর রাধা বুঝতে পারেননি, লক্ষ লক্ষ যুগ কৃষ্ণের হৃদয়ে হৃদয় যোগ করেও হৃদয় জুড়োয় নি। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের মতিবিবি এই প্রথম বুঝতে পারছেন প্রকৃত প্রেমের রহস্য, তাই প্রেমের অসীম রহস্যময় অনুভূতির পদ এখানে সংযোজিত হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— ‘কায় মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে।।’

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘বীরাঙ্গনা কাব্যে’র লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পনখা’ পত্রিকার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত। মধুসূদনের অমর লেখনীতে রাক্ষসীও এখানে প্রেমমুগ্ধা নারীতে পরিণত হয়েছে, বলেছে দেহ মনপ্রাণ সবই সে সমর্পণ করবে লক্ষ্মণকে। শিরোনাম হিসাবে এটা অত্যন্ত উপযোগী বলেই আমাদের মনে হয়, কারণ রাক্ষসীর মতই ইন্দ্রিয় লালসাযুক্ত জীবনযাপন করে মতিবিবি এখন মধুর দাম্পত্যপ্রেমে আত্মসমর্পণ করার সংকল্প গ্রহণ করেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ— ‘I am settled, and bend up
Each corporal agent to this terrible feat.’—

বিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপীয়রের অমর সৃষ্টি ‘ম্যাকবেথ’ R —নাটক থেকে অংশটি গৃহীত। এটি প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত। রাজা ডানকানকে মারার ব্যাপারে প্রথমে ছিল তাঁর তীব্র অনিচ্ছা, এ ব্যাপারে সংকল্প যখন স্থির করেন, তখনই এই উক্তি তিনি করেন। নবকুমারের কাছে আত্মসমর্পণ যখন ব্যর্থ হয়ে গেল তখন মতিবিবি নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেবার জন্য কপালকুণ্ডলার সর্বনাশে উদ্যত হয়েছে—এই ব্যাপারটাই এখানে দেখতে পাবো বলে শীর্ষ উদ্ধৃতি সংগত বলেই আমাদের মনে হয়।

চতুর্থ খণ্ড ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ— ‘রাধিকার বেড়ী ভাঙ্গ, এ মম মিনতি।’

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্যে’র অন্তর্গত ‘সারিকা’ নামক একটি কবিতা থেকে এই পংক্তিটি উদ্ধার করা হয়েছে। শ্রীরাধা পিঞ্জরে আবদ্ধ সারিকাকে দেখে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছেন। তিনি যে সমাজ-সংসারের বাধা অতিক্রম করে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে পারছেন না, তার সঙ্গে সারিকার শুকের সঙ্গে মিলিত না হতে পারার যন্ত্রণাকে এক করে দেখতে পেয়েছেন বলেই তাঁর মিনতি সারিকাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এবং তার পরেই তাঁর নিজের বেড়ি ভাঙার জন্য। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র সংসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ কপালকুণ্ডলাকে সারিকার সমগোত্রীয় মনে করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— ‘—Tender is the night,
And haply the Queen moon is on her throne,
Clustered around by all her starry fays;
But here there is no Light.’

ইংরেজ কবি Keats-এর বিখ্যাত কবিতা ‘Ode to A Nightingale’ থেকে এই অংশটুকু এখানে তুলে আনা হয়েছে। কোমল রাত্রি, আকাশের সম্রাজ্ঞী চন্দ্রকলা প্রসন্না, তারাপরীর দল ঝাঁক বেঁধে ভিড় করেছে চারপাশে, অথচ

কবির কাছেই কোন আলো নেই। এই অংশের সঙ্গে প্রবল সাদৃশ্য আছে কপালকুণ্ডলার নিশাভিসারের। বাসন্তীরাত্রি জ্যোৎস্নায় প্লাবিত, কিন্তু তার জীবনে তো নেমে আসবেই অসুন্দর অন্ধকার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— 'I had a dream, which was not all a dream'.

লর্ড বায়রনের 'ডন জুয়ার' R — কাব্যের চতুর্থ সর্গ থেকে পংক্তিটি সংগ্রহ করা হয়েছে। এই কাব্যের নায়িকা হেইডি একটা স্বপ্ন দেখেছিল, যা শুধু স্বপ্ন নয়, তার জীবনের পূর্বাভাসও বটে। তাই বলা হয়েছে স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়। কপালকুণ্ডলার স্বপ্নের সঙ্গে এর একটা নিবিড় সাদৃশ্য আছে বলেই পংক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণে এসেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— '— I will have grounds
More relative than this.'

উইলিয়াম শেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটক 'হ্যামেলেটের (Hamlet) প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে এটি সংগৃহীত। একটি নাটকের অভিনয় করিয়ে হ্যামলেট পিতার হত্যাকারী সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল, সেই প্রসঙ্গেই হ্যামলেটের এই উক্তি। কপালকুণ্ডলাও সমস্ত সংশয়ের অবসানের জন্যই ব্রাহ্মণ কুমারের কাছে গোপনে যাওয়া মনস্থ করেছে। এখানেই দুটি ঘটনার সাদৃশ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— 'Stand you awhile apart,
Confine yourself but in a patient list.'

এটিও শেক্সপীয়রের আর একটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডি থেকে সংগৃহীত, নাম —'ওথেলো' (Othello) এখানে আপাত-ভালমানুষ কিন্তু প্রকৃত শয়তান ইয়াগো ডেসডিমোনার প্রতি ওথেলোর সন্দেহকে তীব্রতর করে তোলবার জন্য এরকম করে কথা বলছে। কাপালিক-ও নবকুমারের মন কপালকুণ্ডলার প্রতি বিষিয়ে দেবার জন্যই এই পরিচ্ছেদে এই ধরনের আচরণ করবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— 'তদ্‌গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যম্।'

মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব কাব্য'-এর তৃতীয় সর্গ থেকে গৃহীত। এটি দেবরাজ ইন্দ্রের উক্তি। মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করার জন্য মদন যখন নিজের মনস্থির করতে পেরেছে, তখনই ইন্দ্র মদনকে একথা বলেছিলেন—তবে সিদ্ধিলাভের জন্য যাও, দেবকার্য সুসম্পন্ন কর। এখানে কাপালিকও কপালকুণ্ডলাবধকে দেবকার্য হিসাবেই দেখাতে চেয়েছে এবং নিজ অক্ষম বলে এ কাজ করাতে চেয়েছে নবকুমারকে দিয়েই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ— 'Be at peace; it is your sister that addresses you. Requite Lucretia's love.'

এই উক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্র সংগ্রহ করেছেন লর্ড লীটনের 'লুক্রেশিয়া' (Lucretia) উপন্যাস থেকে। লুক্রেশিয়া যাকে ভালবাসতো, সে ভালবাসতো লুক্রেশিয়ার বোন সুসানকে। সুসান এখানে ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে তার প্রেমিককে অনুরোধ করছে, সে যেন লুক্রেশিয়াকেই ভালবাসে। এই পরিচ্ছেদে মতিবিবি এবং কপালকুণ্ডলার কথাবার্তার মধ্যেও অনুরূপ একটি ব্যাপার ঘটেছে বলে 'লুক্রেশিয়া' উপন্যাসের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হতে পারে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ— 'No spectre greets me – no vain shadow this.'

এই পংক্তিটি ইংরেজ-কবি William Wordsworth-এর 'Laodamia' কবিতা থেকে সংগৃহীত। ঈশ্বরের অনুগ্রহে লাওডেমিয়াও তার মৃত স্বামীর ছায়া দেখতে পেয়েছে, কিন্তু মনে হয়েছে তা যেন ছায়া নয়, সজীব। এখানেও ভবানীমূর্তি কপালকুণ্ডলার কাছে ছায়ার মত এলেও তা শুধু ছায়া নয়।

নবম পরিচ্ছেদ— 'বপুষা করণোজ্‌ঝিতেন সা নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈলনিষেকবিন্দুনা সহ দীপ্তার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীম্।।'

মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশম্' কাব্যের অষ্টম সর্গের ৩৮ সংখ্যক শ্লোকটি এখানে শীর্ষ নির্দেশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রসঙ্গটি ছিল এইরকম—নারদের বীণা থেকে মালা খসে অজপত্নী ইন্দুমতীর ওপর পড়লে রানী মারা যান। তা দেখে রাজা অজও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। এটাই যে স্বাভাবিক, সেটা বোঝাতে গিয়ে শ্লোকে বলা হয়েছে—হৃদয়েশ্বরীর হতচেতন দেহের সঙ্গে তাঁর পতি অজও ভূতলে পতিত হলেন, কারণ জ্বলন্ত দীপশিখা থেকে এক বিন্দু তেল ক্ষরিত হলে জ্বলন্ত শিখারও কিছু অংশ ভূতলে পতিত হয়। বোঝাই যাচ্ছে, কপালকুণ্ডলার জলে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবকুমারের জলে ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে এর স্পষ্ট সাদৃশ্যই এরকম উল্লেখের কারণ।

৫৫.৮ সার-সংক্ষেপ

এই এককে আমরা আলোচনা করতে চেয়েছি, একটি কাল্পনিক কাহিনিকে বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন। প্রথমত, তিনি সময়ের উল্লেখ করবার সময় খুব নির্দিষ্ট করে তা নির্দেশ করেছেন যাতে ঘটনাটা ওই বিশেষ সময়েই ঘটেছে বলে আমাদের মনে হয়। অবশ্য সেই সঙ্গে সেই বিশেষ সময়ে কোন্ কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে যা সেই সময়ের বৈশিষ্ট্য কী, এটাও মনে রেখেছেন।

দ্বিতীয়ত, মুঘল রাজদরবারের কাহিনী শোনানোর উদ্দেশ্যও ছিল প্রধানত এই বাস্তবতা সৃষ্টি করা। কারণ ইতিহাসের ঘটনার সত্যতা আমরা সকলেই জানি, কল্পিত কাহিনির সঙ্গে তাকে নিখুঁত ভাবে জুড়ে দেওয়া মানেই বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার একটা গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া।

তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের যেমন একটা করে নাম দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র তার ঘটনা নির্দেশ করতে, যথা 'সাগরসঙ্গমে', 'উপকূলে', 'বিজনে', 'স্তূপশিখরে' প্রভৃতি, তেমনি কাহিনী শুরু করার আগে বিখ্যাত কোনও নাটক, কাব্য, কবিতা বা উপন্যাস থেকে একটি বিশেষ অংশ উদ্ধারও করেছেন। আমরা প্রত্যেকটি অংশের উৎস নির্দেশ করেছি। আসলে এই সব সাহিত্যিক সৃষ্টি এত বাস্তব হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে যে এগুলির উল্লেখ করলেই বর্তমান কাহিনির বাস্তবতা যেন তাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কাহিনির বাস্তবতা প্রতিষ্ঠার জন্য চরিত্রগুলিকেও বাস্তব করে তুলতে হয়। তা বঙ্কিমচন্দ্র করতে পেরেছেন কিনা সেটা আমরা পরের এককে দেখবো।

৫৫.৯ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টি

উপন্যাসে লেখক গল্প বলেন, সেই গল্পকে বৃত্তে ভালভাবে বিন্যস্ত করেন, তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন—সবই তো আমরা দেখলাম। তাহলে চরিত্রসৃষ্টির ব্যাপারে ঔপন্যাসিককে আবার আলাদা

করে নজর দিতে হবে কেন, এ প্রশ্ন আপনাদের মাথায় জাগতেই পারে। সেই কথাটাই একটু বুঝে নেওয়া দরকার।

উপন্যাসে লেখক নিজে অবশ্য মন্তব্য করতে পারেন, ঘটনাবর্ণনাও করতে পারেন কিন্তু এটা তো আরো সত্যি কথা যে, চরিত্রগুলোকে ভালবেসে ফেলেন বলেই পাঠক গল্পটা পড়বার আগ্রহ বোধ করেন। যে মানুষগুলি উপন্যাসে আছে, তারা যখন রক্তমাংসের মানুষ হয়ে ওঠে তখনই তো গল্পটাকে আমাদের আর বানানো বলে মনেই হয় না, তারা আমাদের খুব আপনজন হয়ে ওঠে, আমরাও আগ্রহভরে তাদের গল্প শুনি। সুতরাং গল্পের মানুষগুলিকে অত্যন্ত যত্নসহকারে রক্তমাংসের মানুষ করে তুলতে হবে এটাও উপন্যাসের একটা শর্ত। সেই ব্যাপারটা বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা'য় কীভাবে করতে পেরেছেন সেটা আমাদের দেখতে হবে।

তবে সেটা শুধুই প্রধান চরিত্রদের দিকে তাকিয়ে করলেই হবে না, খুব অল্প সময়ের জন্য হয়তো একটা চরিত্র দেখা গিয়েছে, সেটির প্রতিও ঔপন্যাসিক দৃষ্টি কেমন, এ থেকে লেখকের সামর্থ্য বোঝা যায়। তাই দুরকম চরিত্রের প্রতিই আমরা নজর রাখব, অর্থাৎ চরিত্রগুলিকে লেখক কীভাবে প্রাণ দিতে পেরেছেন। প্রথমে প্রধান চরিত্রগুলির কথাই ভেবে দেখা যাক।

৫৫.৯.১ চরিত্র সৃষ্টি ঃ নবকুমার

উপন্যাসের নাম থেকেও বোঝা যায়, কাহিনি থেকেও বোঝা যায়, নারীরাই এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ, পুরুষরা নয়। বস্তুত, নবকুমার ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য পুরুষ এই উপন্যাসে আমরা খুঁজেও পাই না। কাপালিক অবশ্য গল্পের পরিণতি ঠিক করার ব্যাপারে অনেকটাই সাহায্য করেছে, যেমন নবকুমারের দাম্পত্য জীবন গঠনের ব্যাপারে অধিকারীর ভূমিকাও রয়েছে অনেকখানি। কিন্তু গল্পের নায়ক যাদের মনে করা হয়, ঠিক তেমন চরিত্র বলতে আমরা নবকুমারকেই বুঝে থাকি।

নায়কের সাধারণত যেসব গুণ থাকা দরকার, নবকুমারের তার প্রায় সবই আছে। বয়সে যুবক হলেও বিবেচনায় সে যে কারো চেয়ে কম নয়, প্রথম পরিচয়েই সে কতা আমরা বুঝতে পারি। যেমন, ঘোর কুয়াশায় দিগভ্রান্ত হয়ে মাঝি যখন বুঝতেই পারছে না সে কেমন করে এ থেকে উদ্ধার পারে, তখন বৃদ্ধ তাকে তিরস্কার করলে নবকুমার বলেছিল, 'যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে?' এ সংবাদও পরে আমরা জানতে পারি যে সেই বৃদ্ধের বাড়িতে অন্য অভিভাবক কেউ নেই বলে তাঁকে সে এই গঙ্গাসাগর যাত্রায় আসতে নিষেধ করেছিল। পুণ্যের জন্য তীর্থে আসতেই হবে, এ কথাও সে মেনে নেয়নি, বলেছে, 'যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।'

নবকুমার যে কেবল শাস্ত্রজ্ঞ নয়, সেই সঙ্গে কাব্যরসিকও, সে কতা আমরা বুঝতে পারি বিস্তীর্ণ সমুদ্রসঙ্গম থেকে দূরের আবছা তটভূমি দেখে নবকুমারের 'রঘুবংশম্' কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গের অন্তর্গত পঞ্চদশ শ্লোক অর্থাৎ 'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী ......' ইত্যাদি মনে পড়ে যাওয়ায়। যেরকম দুর্বিপাকে পড়ে যাত্রীরা সকলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, সেই অবস্থাতেও নবকুমার কাব্যরস আস্বাদন এবং সৌন্দর্য উপভোগের মত অবস্থায় আছে, এটা বড় কম কথা নয়।

নবকুমারের সাহসিকতারও প্রশংসা করতে হবে, কারণ যে অবস্থায় সে বিসর্জিত হয়েছিল—'গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য নাই, পেয় নাই; নদীর জল অসহ্য লবণাক্ত; ....প্রাণনাশই নিশ্চিত'—তা সত্ত্বেও

সে বালিয়াড়িতে হেলান দিয়ে ঘুমোতে পেরেছে। নিদ্রাভঙ্গ হবার পর কাপালিকের মুখোমুখি হবার মতো সাহসও তার ছিল।

নবকুমারের পরোপকার ব্রতের কথা আমরা প্রথমেই জানতে পেরেছি। অচেনা চর এবং বালিয়াড়ি বলে রান্নার উপযোগী কাঠ কাটতে যেতে কেউই রাজি হয়নি, নবকুমার রাজি হওয়ার পর শুধু একজনকে সঙ্গী হতে বলেছিল, তাতেও কেউ রাজি হয়নি। অগত্যা সে একাই অগ্রসর হয়েছিল।

কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করার মধ্যে একই সঙ্গে নবকুমারের মধ্যে বিবেচনাশক্তি এবং কৃতজ্ঞতাবোধের প্রকাশ দেখা যায়। অধিকারী নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিবাহের প্রস্তাব করার পর সারা রাত যে নবকুমারের ঘুম হয়নি, উপন্যাসে তার প্রমাণ আমরা পাই। সকালে নিজের সিদ্ধান্ত সে জানিয়েছে—'আজি হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্মপত্নী। ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব।'

অর্থাৎ আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, নবকুমারের যে একটি বিবাহ আগে ছিল, সে জন্য সে চিন্তিত নয়, তাঁর চিন্তা অন্য। একটি অজ্ঞাতকুলশীল কন্যাকে এভাবে বিবাহ করে নিয়ে গেলে হয়তো তাকে সমাজচ্যুত হতে হবে, এই ভাবনাই সারা রাত তাকে ঘুমোতে দেয়নি। কিন্তু একই সঙ্গে সে চিন্তা করে দেখেছে, যে-নারী নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে উদ্ধার করেছে, তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া তার উচিত হবে না, কারণ ফিরে গেলে কপালকুণ্ডলার যে মৃত্যু সুনিশ্চিত, এ কথা অধিকারী তাকে বলেছিলেন।

সৌন্দর্যপিপাসু নবকুমার যে বিবাহের পর কপালকুণ্ডলাকে সুখী করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, তা আমরা দেখেছি। নিজের পরিবার যখন মৃণ্ময়ীকে সাদরে গ্রহণ করল তখন তার প্রেম আর কোন বাধা মানল না। কিন্তু সমস্ত হৃদয় সমর্পণ করার পরও যদি কপালকুণ্ডলার মনে তিলমাত্র প্রভাব ফেলতে না পারে তবে ধীরে ধীরে অবসাদ তাকে গ্রাস করবে, এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই হয়েছিল। তা না হলে কাপালিকের কথা অত সহজে সে বিশ্বাস করত না, অথবা যে কপালকুণ্ডলাকে এত করেও সংসার এবং দাম্পত্য জীবনের কোনো বোধ ও অনুভূতিই দিতে পারল না, সে কেমন করে দ্বিচারিণী হতে পারে, এ কথাও তার মনে হল না। ফলে সে কপালকুণ্ডলাকেও সুখী করতে পারল না, নিজেও সুখী হল না।

৫৫.৯.২ চরিত্র সৃষ্টি ঃ কপালকুণ্ডলা

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-কন্যা, মনের সৃষ্টি—সুতরাং চরিত্রটি একদিকে রহস্যময়তা, অন্যদিকে সজীবতা ফোটাবার গুরু দায়িত্ব তাঁর ওপর ছিল। রহস্যময়তা ফুটিয়ে তুলবার জন্যই দুটি প্রধান উপাদান বঙ্কিমচন্দ্র সুকৌশলে ব্যবহার করেছেন—প্রথমত সর্বদাই তাকে অন্ধকার রাত্রি বা আলোছায়ার পরিবেশে দেখানো, দ্বিতীয়ত রাশি রাশি কালো চুলের মধ্যে তাকে লুকিয়ে রাখা। কপালকুণ্ডলাকে প্রথম দেখার দৃশ্যটিই একবার মনে করে দেখুন—'সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি। কেশভার—অবেণী সম্বন্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার।'

দ্বিতীয়বার যখন নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার দেখা হয় 'তখন সন্ধ্যালোক অন্তর্হিত হয় নাই' এবং পিঠে কোমলস্পর্শ পেয়ে পেছন ফিরে নবকুমার দেখেছে 'সেই আগুল্‌ফলম্বিত-নিবিড়কেশরাশি-ধারিণী বন্য দেবীমূর্তি।'

তৃতীয়বার মতিবিবির সঙ্গে আলাপের জন্য যখন কপালকুণ্ডলার কাছে আসে তখন 'একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছে মাত্র—অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল।

সপ্তগ্রামের বাড়িতে কপালকুণ্ডলাকে যখন আমরা প্রথম দেখি শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে, তখনও ‘সন্ধ্যাকাল উপস্থিত’ এবং কপালকুণ্ডলা ‘অবিন্যস্ত কেশভার মধ্যে প্রায় অর্ধলুক্কায়িতা।’ বস্তুত এই পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার চুল বেঁধে দেবার জন্যই শ্যামাসুন্দরী সাধাসাধি করেছে কপালকুণ্ডলা রাজি হয়নি।

পরবর্তীকালে চতুর্থ খণ্ডে অন্ধকার রাত্রে কপালকুণ্ডলার ওষধি খুঁজতে যাওয়া, অন্ধকারে ব্রাহ্মণকুমারবেশী মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং বিষাদময় পরিণতির কথা আমাদের সকলেরই জানা, কিন্তু লক্ষ্য করবেন পটভূমি সবসময়েই অন্ধকার রাত্রি।

তার অর্থ এই নয় যে চরিত্রটিকে শুধু রহস্যময়ই করে রাখবার চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেননি। চরিত্রটি যাতে রক্তমাংসের সজীবতা লাভ করে সেজন্য তিনি যে কত সচেতন ছিলেন, একটু ব্যাখ্যা করলেই তা বোঝা যাবে।

কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে পথ দেখিয়েছিল, সেটা তার অন্তরের স্বাভাবিক কোমলতা হতে পারে, কিন্তু কাপালিকের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে অধিকারীর বাড়িতে নিয়ে আসায় করুণাবৃত্তির একেবারে চরম প্রকাশ দেখা যায়। এভাবে নবকুমারের প্রাণ বাঁচালে কাপালিক যে তাকে হত্যা করবে, এ কথা সে জানত—অধিকারীর কাছে তা প্রকাশও করেছে। তবু যে এ কাজ সে করেছে তাতে বোঝা যায় মানবিক অনুভূতি তার মধ্যে পুরোপুরি বজায় আছে।

সংসার ও সামাজিক বন্ধন সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ কপালকুণ্ডলা ‘বিবাহ’ শব্দের অর্থই বুঝতে পারেনি প্রথমে, অধিকারী কালিকা ও শিবের সম্বন্ধ এনে এটি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। সংসার সম্বন্ধে কপালকুণ্ডলার অনভিজ্ঞতা যে কত বেশি তা বোঝাবার জন্য তার একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত আপনাদের মনে করার। মতিবিবি প্রচুর স্বর্ণালংকার পরিয়ে দিয়েছিল কপালকুণ্ডলাকে, রাস্তায় ভিখারি সাহায্য চাওয়াতে সমস্ত অলংকারগুলি সে তার হাতে খুলে দিয়েছে। বিহ্বল ভিক্ষুক এদিক-ওদিক চেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করেছে, তখন—‘‘কপালকুণ্ডলা ভাবিলেন, ভিক্ষুক দৌড়িল কেন?’’

সপ্তগ্রামের সংসারে এসে শ্যামাসুন্দরীর অবস্থা দেখেও কপালকুণ্ডলার দাম্পত্য প্রণয় সম্বন্ধে কিছুই ধারণা জন্মায়নি, নবকুমার প্রবল প্রণয় কত দুর্লভ বস্তু একথা কখনোই সে জানতে পারেনি, বরং সে বলেছে ‘বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।

এরপর যখন কপালকুণ্ডলার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় তখন সে ‘এক বৎসরের অধিককাল নবকুমারের গৃহিনী।’ সাজসজ্জায় তার কিছু পারিপাট্য এসেছে, অলংকারও তার অঙ্গের ভূষণ হয়েছে, কিন্তু মানসিকতার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলেম মনে হয় না, না হলে শ্যামাসুন্দরীকে বলতো না, ‘যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে বিবাহ করিতাম না।’

অর্থাৎ কপালকুণ্ডলার স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি। সংসার তার ভাল লাগে না, রাত্রে অরণ্যে ভ্রমণ করতে সে আনন্দ পায়, ‘গৃহস্থের বউ-ঝি’র এই আচরণ ভাল কিনা সে প্রশ্নই তার মনে আসে না। যে পরোপকার বৃত্তি আমরা প্রথম থেকেই তার মধ্যে দেখেছি, সেই পরোপকার সাধনের জন্যই শ্যামাসুন্দরীর জন্য সে গভীর রাতে বনে ঢুকেছিল ওষধির সন্ধানে। কাপালিককে একবার দেখা সত্ত্বেও ভয়ে সে এ কাজে বিরত হয়নি। কাজেই চরিত্রের কোনো

পরিবর্তন হয়নি, এটা আমাদের বলতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের দাদার পরামর্শ যে পছন্দ হয়নি, উপন্যাসের পরিণতি সে কথা প্রমাণ করে। আসুন চরিত্রটি এবার আমরা একেবারে আমাদের নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারে দেখার চেষ্টা করি এবং এর কোন ত্রুটি দেখতে পাই কিনা তা দেখি।

প্রথম কথা, 'কুচরিত্রা', 'অবিশ্বাসিনী' ইত্যাদি শব্দগুলি কপালকুণ্ডলা বেশ কয়েকবার ব্যবহার করেছে, যেমন—'আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?' কিম্বা 'আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।' প্রশ্ন হচ্ছে, দাম্পত্য সম্পর্কই যে বোঝে না, সংসারের রীতিনীতি এখনও যার কাছে অস্পষ্ট, সে এসব কথা জানল কী করে এবং এর অর্থই বা তার কাছে পরিষ্কার হয় কেমন করে।

দ্বিতীয় কথা, যেখানে এক বছরেরও বেশি সময় বাস করছে, যাদের সঙ্গে, তাদের প্রতি একটা গভীর ভালবাসার সম্পর্ক এমনিতেই গড়ে ওঠার কথা। মানুষের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, বাড়িতে একটি গৃহপালিত পশু থাকলেও তার বাড়ি সম্বন্ধে মায়া জন্মে যায়—আর কপালকুণ্ডলার মতো কোমলহৃদয়া নারী এই সংসারকে ভালবাসতে পারল না। সংসারের প্রতি কোনো আকর্ষণই তার জন্মাল না। এটা কি বিশ্বাস করা সহজ।

তৃতীয় কতা, কপালকুণ্ডলা লোকালয়বর্জিত স্থানে প্রতিপালিত হলেও সে মেয়ে। যখন মানবিক বৃত্তিগুলি তার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে তখন জৈববৃত্তি জাগ্রত হবে না, এটা মনে করা অসম্ভব। কাজেই নবকুমারের উন্মত্ত ভালবাসার অর্থ সে বুঝতে পারবে না। একটি দম্পতি যেভাবে জীবনযাপন করে সেভাবে তারা জীবন কাটাবে না! জৈব প্রবৃত্তিকে কী করে একটি নারী ঠেকিয়ে রাখতে পারে। তাহলে তার সন্তন সম্ভাবনা কি অনিবার্য ছিল না! আর সন্তান একবার জন্মগ্রহণ করলে একটি নারী কি আগের মতো থাকতে পারে!

এই অসংগতির ব্যাখ্যা দেবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র শুধু রেখেছেন নবকুমারের সঙ্গে বালিয়াড়ি ত্যাগের প্রাক্কালে দেবীর পা থেকে বিল্বপত্র স্খলিত হওয়া। অশিক্ষিতা ও কাপালিকলালিতা মেয়ের মনে সংস্কার প্রবল হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তা সক্রিয় থাকবে এবং একটি নারীর সহজাত প্রবৃত্তির দ্বার রুদ্ধ করে দেবে, এটা আমাদের স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। বরং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর অগ্রজ যা বলেছিলেন, সেই পরিণতিই যেন স্বাভাবিক হতো বলে আমাদের মনে হয়—'সন্তানাদি হইলে স্বামী-পুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাঁহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।'

৫৫.৯.৩ চরিত্র সৃষ্টি ঃ মতিবিবি

কপালকুণ্ডলার মতো একটি বিচিত্র নারীকে উপন্যাস লেখবার বাসনা যখন বঙ্কিমচন্দ্রের মনে জন্মায় তখন মতিবিবি চরিত্রের কথা তাঁর মাথাতেই ছিল না। আমাদের মনে হয়, তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, কপালকুণ্ডলা সংসারজীবনে ফিরে এসেও সুখী হবে না। এটাকে নিশ্চিত করার জন্যই নবকুমারের প্রথম স্ত্রী এবং স্বামীকে অধিকার করার ও সপত্নীর প্রতি প্রতিহিংসার জন্য এই চরিত্রের পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, যাতে কপালকুণ্ডলার বিষণ্ণ পরিণতি একেবারে সুনিশ্চিত হয়।

বোধহয় এই কারণেই মতিবিবি চরিত্রের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না, তাকে স্বৈরিনী নারী হিসাবে আঁকবার চেষ্টাই তিনি করেছেন, কিন্তু শিল্পী যখন একটি চরিত্রের মধ্যে সৃষ্টির প্রচুর উপাদান পেয়ে যান তখন তিনি আর নিজেকে সংবরণ করতে পারেন না। ফলে চরিত্রটি সম্ভবত এই উপন্যাসের সবচেয়ে আকর্ষক

চরিত্রে পরিণত হয়েছে। কপালকুণ্ডলা কল্পনার সৃষ্টি, তাকে বাস্তব করার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তার অসংগতি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ দূর করতে পারেন নি। মতিবিবি প্রয়োজনের সৃষ্টি, তাকে স্বৈরিনী ও প্রতিহিংসাপরায়ণা করবার সচেতন অভিপ্রায় সত্ত্বেও শিল্পীর প্রচ্ছন্ন সহানুভূমি তাকে সজীব ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।

চরিত্রটিকে দেখার আগে তার কথা আমরা শুনি কেবল লেখকের বর্ণনায়। নবকুমারের প্রথম স্ত্রী পদ্মাবতী বিয়ের পর পিত্রালয়েই থাকত, মাঝে মাঝে আসতো। তেরো বছর বয়সে উড়িষ্যায় সপরিবার পাঠানের হাতে পরে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফলে নিজের কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও পদ্মবতী স্বামী-পরিত্যক্তা হয়। পরবর্তী কালে এই নারী যে লুৎফ-উন্নিসা নাম গ্রহণ করেছে, প্রয়োজনে ছদ্মবেশে মতিবিবি নাম গ্রহণ করে থাকে, তার পিতা আগ্রায় এসে আকবরের রাজদরবারে ওমরাহ্ হয়ে বসেছে, লুৎফ-উন্নিসা আগ্রায় এসে 'পারসিক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত, রসবাদ্য ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হয়েছে, এসব সংবাদ আমরা পরে পেয়েছি। জেনেছি, 'ইন্দ্রিয়দমনে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। ......বড় বিবাহের অনুরাগিণী হইলেন না। মনে মনে ভাবলেন, কুসুমে কুসুমে বিহারিণী পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব? অর্থাৎ পদ্মাবতী এখন স্বৈরিণী নারী, এমনকি যুবরাজ সেলিমও তার অনুরক্ত।

> **প্রান্তলিপি**
>
> মতিবিবি চরিত্রটি এমনই প্রাণবন্ত হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় যেন এই মেয়েটিকেই আমরা দেখতে পাই। আপনারাও মিলিয়ে দেখতে পারেন, একটু অংশ তুলে দিচ্ছি। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে 'নাম্নী' নামে এক গুচ্ছ কবিতা আছে, তার 'নাগরী' কবিতা থেকে—
>
> 'ব্যঙ্গসুনিপুণা,
> শ্লেষবাণসন্ধানদারুণা।
> অনুগ্রহবর্ষণের মাঝে
> বিদ্রুপ বিদ্যুৎঘাত অকস্মাৎ মর্মে এসে বাজে।
>
> ....
>
> আপন তপস্যা লয়ে যে-পুরুষ নিশ্চল সদাই,
> যে উহারে ফিরে, চাহে নাই,
> জানি সেই উদাসীন
> একদিন
> জিনিয়াছে ওরে,
> জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভরে।'

মতিবিবিকে প্রথম আমরা দেখি ভাঙা পালকিতে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। রাতে নবকুমার কপালকুণ্ডলার সন্ধানে যাবার সময় এর সাক্ষাৎ পেয়েছিল। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, কপালকুণ্ডলা কী না জানতে চাওয়ায় বলেছিল, 'আপাততঃ দস্যুহস্তে নিষ্কুণ্ডলা হইয়াছি।'

তারপরই আমরা দেখেছি শুধু বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে নয়, আচরণেও মতিবিবি আকর্ষক। বিপদে পড়ে সে শঙ্কা বিসর্জন দিয়ে নবকুমারের কাঁধে ভর দিয়ে সরাইখানায় এসেছে। সেখানে নবকুমারের সঙ্গে কথোপকথনে তার বুদ্ধিমত্তা, শ্লেষবাণ সন্ধানের ক্ষমতা এবং পরিশীলিত রুচি প্রমাণিত হয়।

কপালকুণ্ডলাকে দেখতে গিয়ে নিজের সমস্ত অলংকার মতিবিবি কেন তাকে দান করেছিল স্পষ্ট করে বলা শক্ত, কিন্তু অনুমান করা শক্ত নয়। তার আগের পরিচ্ছেদেই নবকুমারের নাম সে শুনেছে এবং একটি অব্যর্থ ইঙ্গিত দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচ্ছেদ শেষ করেছেন—'প্রদীপ নিবিয়া গেল।' কপালকুণ্ডলাকে দেখতে যাবার সময় অবশ্যই তার মনে হয়েছে, যে-জীবনে ফিরে যাবার সমস্ত পথ রুদ্ধ, সেই জীবনেই এখন সে দর্শক মাত্র। নবকুমারের স্ত্রী হিসেবে নিজেকে সাজাতে পারেনি, এখন নবকুমারের পরিত্যক্তা স্ত্রী হিসাবে তার নবপরিণীতা বধূকে সাজিয়ে আংশিক তৃপ্তি পেতে চেয়েছে।

তিনটি ব্যাপার এ থেকে প্রমাণিত হয়—মতিবিবির হৃদয়ের ঔদার্য এবং ফেলে আসা জীবনের জন্য স্তিমিত বাসনা ও নবকুমারের প্রতি এখনও সুপ্ত প্রেম। এগুলিরই প্রকাশ দেখা যাবে পরবর্তী পর্যায়ে। যে-দাম্পত্য জীবনের

স্বাদ মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠেছিল তার জীবনে, তাকে ভুলে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টায় সে পরিবর্তিত জীবনের ভোগবিলাসকেই উত্তুঙ্গ শিখরে টেনে তুলতে চেয়েছিল। সে আশা যখন মিলিয়ে গেল, তখন এই জীবনের অপ্রাপ্তি তার মনে প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হল। বিনাদোষে যে একদিন স্ত্রীর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, আজ সেই অধিকার ফিরে পাবার জন্য সে ফিরে এল সপ্তগ্রামে। কপালকুণ্ডলার সর্বনাশ না করলে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, তাই কাপালিকের সঙ্গে সন্ধি করতে তার আপত্তি হয়নি। কিন্তু লক্ষ করে দেখবেন, তার সহানুভূতি কপালকুণ্ডলার প্রতিও ছিল, কাপালিকের মতো তার জীবনহানি সে চায়নি।

আসলে মানুষের চরিত্র দোষগুণে ভরা। কেবল দোষ বা কেবল গুণ থাকলে তাকে বাস্তব মানুষ বলে মনে করা শক্ত। কপালকুণ্ডলাকে তাই আমরা ততটা আমাদের কাছের মানুষ মনে করতে পারি না, যতটা পারি মতিবিবিকে। মতিবিবির যন্ত্রণা আমরা অনুভব করতে পারি। সে গিয়েছিল পুরীতে জগন্নাথদেব দর্শনে। ধর্মচ্যুত হয়ে তাকে যে মুসলমান হতে হয়েছিল সে দোষ তার নয়, কিন্তু তার ফলভোগ করল সে—নবকুমার তাকে ত্যাগ করল। স্বাভাবিক জীবন থেকে যে বঞ্চিত হয়েছে, সে মৃগয়া বৃত্তি গ্রহণ করবে, এটা কাম্য না হতে পারে কিন্তু এটাই তো ঘটে থাকে। কিন্তু এই স্বৈরিণীবৃত্তি গ্রহণ করেও যে তার ভেতরের মানুষটা মরে যায়নি, বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গিতে সে কথা অনেকবার বলেছেন, যেমন—'পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।'

বস্তুত, নবকুমার যদি পদ্মাবতীকে গ্রহণ করত, তবে কপালকুণ্ডলার বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধনও বোধহয় সে করতে চাইত না। নবকুমার যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখনই 'দলিতফণা ফণিনীর' মতো সে ঘোষণা করেছে 'তুমি আমারই হইবে।' এরপরই তার কাপালিকের সঙ্গে মন্ত্রণা, ছদ্মবেশ ধারণ এবং যাবতীয় অভিনয়।

বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো চাননি, কিন্তু মতিবিবি যে কপালকুণ্ডলার চেয়েও স্পষ্টতর ও উজ্জ্বলতর চরিত্র হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নেই।

৫৫.৯.৪ চরিত্র সৃষ্টি ঃ অপ্রধান চরিত্রসমূহ

অপ্রধান শুধু নয়, একেবারে নগণ্য চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র যে কতটা সতর্কতা এবং শৈল্পিব মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা আপনাদের মনে পড়বে যদি একেবারে প্রথম পরিচ্ছেদের একটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করি। নৌকা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছে, বাঁচার আশা নেই শুনে পুরুষরা দুর্গানাম জপ করতে লাগল, মেয়েরা সুর তুলে কাঁদতে লাগল—'একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,—সেই কেবল কাঁদিল না।'

এই উপন্যাসে কাপালিককে অপ্রধান চরিত্র বলে আপনাদের মনে নাও হতে পারে, কারণ তার জন্যই নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছে, আবার তার জন্যই নবকুমারের জীবনে করুণ পরিণতি ঘনিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও আমাদের মনে হয় কাপালিক অপ্রধান চরিত্র এই কারণে যে, বিশেষ উদ্দেশ্য পেরিয়ে কোনো সজীবতা সে লাভ করেনি। যে কপালকুণ্ডলাকে প্রায় আজন্ম সে লালনপালন করেছে, তাকে বধ করবার জন্য নিয়ে যাবার সময়ও সে একবারও ইতস্তত করেনি। এইরকম একমুখী তীব্রতা নিয়ে কোনো চরিত্র সজীবতা লাভ করতে পারে না। সপ্তগ্রামে তার আসাটাও অবিশ্বাস্য, অধিকারী তাদের সন্ধান বলে দেবেন, এমন মনে হয় না।

অধিকারী চরিত্রটি আবার অন্য রকমের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। তবু এই চরিত্রে কিছু বৈচিত্র্য আছে এবং সেই কারণেই চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য মনে হয়। প্রথমত তাঁর অন্তরে করুণাবৃত্তি আছে বলেই কপালকুণ্ডলাকে ঘোর বিপদ থেকে

রক্ষা করার কথা তিনি বিবেচনা করেছেন। কপালকুণ্ডলার প্রতি যে তাঁর যথার্থ স্নেহ ছিল, তার বোঝা যায় মেদিনীপুর পর্যন্ত তাদের পৌঁছে দিয়ে আসা এবং কপালকুণ্ডলার সমব্যথী হয়ে অশ্রুবিসর্জনে। অধিকারী যেভাবে নবকুমারকে বিবাহ করার জন্য রাজি করিয়েছেন তাতে তাঁর বাস্তব বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। নিজেকে নিজেই তারিফ করে মনে মনে বলেছেন, 'রাঢ়দেশের ঘটকালী কি ভুলিয়া গিয়াছি না কি?'

তবু, চরিত্রসৃষ্টিতে কিছু অসংগতি আছে, সেটা আপনাদেরও চোখে পড়তে পারে, যেমন ঘোর জঙ্গল এবং বালিয়াড়ির মধ্যে লোকালয়বর্জিত স্থানে অধিকারী যেখানে থাকেন সেখানে 'এক অত্যুচ্চ দেবালয় চূড়া' এবং 'তন্নিকটে ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরবেষ্টিত একটি গৃহ' থাকাটা কিছুটা বিস্ময়কর। দ্বিতীয়ত, সেখানে অধিকারীর শিষ্যও দু-একজন এসে থাকে (কপালকুণ্ডলার কথা—'যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে' ইত্যাদি) । তৃতীয়ত সেখানে নাকি হিজলীর বহুলোক পুজো দেয়, অধিকারী বলেছেন—'পরমেশ্বরীর প্রসাদে তোর সন্তানের অর্থের অভাব নাই। হিজলীর ছোট বড় সকলেই তাঁহার পূজা দেয়।' এত লোক যেখানে পূজা দেয় সেটি নির্জন স্থান হবে কেমন করে।

নারী চরিত্রের মধ্যে প্রাধান্য পেতে পারে শ্যামাসুন্দরী। বোঝাই যায়, কপালকুণ্ডলার উদাসীনতাকে স্পষ্টতর করবার জন্যই এই স্বামীপ্রেমবুভুক্ষু চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে। সে সময়ের কৌলীন্য প্রথার অসুন্দর দিকটিও এতে ফুটে উঠেছে। নবকুমারের এই ভগ্নীর বিবাহ এক কুলীনের সঙ্গে হয়েছিল বলেই তার সপত্নীও ছিল অনেক। শ্যামাসুন্দরী ছোটবেলায় শেখা ছড়া জানে, বৌদির কেশসজ্জার উৎসাহ তার আছে, মেয়েদের জীবনের 'পরশ-পাথর' যে পুরুষের প্রেম, সেকথা শ্যামাসুন্দরী জানে, এবং এও জানে যে 'সোনার পুত্তলি ছেলে কোলে তোর দিব ফেলে'—এর চেয়ে বড় চাওয়া মেয়েদের আর কিছু হতে পারে না। কেন মেয়েদের এত সাজসজ্জা, এ কথা বোঝাতে গিয়ে শ্যামাসুন্দরী সুন্দর একটি উপমা দেয়, 'বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ', কিন্তু কপালকুণ্ডলা তাতেও যখন উদাসীন তখন তার গভীর হৃদয়বেদনা এই উক্তিতে ধরা পড়ে—'ফুলের কি? তাহা ত বলিতে পারি না। কখনও ফুল হইয়া ফুটি নাই। কিন্তু যদি তোমার মত কলি হইতাম তবে ফুটিয়া সুখ হইত।'

আসলে, শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে কাছে রাখবার জন্য, তাঁকে বশ করার জন্য ওষধি খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, আর কপালকুণ্ডলা নবকুমারের আকুল প্রেম উপেক্ষা করে যোগিনী হয়ে বসে থাকে—এই বৈপরীত্যটি শ্যামাসুন্দরীর চরিত্রের সাহায্যে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে।

মেহেরউন্নিসা একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে তার উল্লেখই শুধু আছে, চরিত্র হিসাবে তাকে ফুটিয়ে তোলবার অবকাশ পাওয়া যায় নি। তবু এরই মধ্যে কিন্তু চরিত্রের পাঠানোচিত দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন, আবার সেই সঙ্গে সেলিমের প্রতি তার আন্তরিক দুর্বলতাও ঢাকা থাকে নি। মতিবিবি যখন জানায় মেহেরউন্নিসার প্রেমে মুগ্ধ সেলিম তাকে পাবার জন্য সব কিছুই করতে পারেন, তখন মেহেরউন্নিসা বলে, 'বৈধব্যের আশঙ্কা। শের আফগান আত্মরক্ষায় অক্ষম নহে।' মতিবিবি যখন চিত্রাঙ্কনে তার দক্ষতার প্রশংসা করে বলে অন্যের এ ক্ষমতা থাকলে মেহেরউন্নিসার অপূর্বরূপ চিত্রপটে অঙ্কিত থাকতো, মেহের বলে, 'কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে।' ফের এই মতিবিবিই যখন সংবাদ দেয় আকবরের মৃত্যু হয়েছে, সেলিম এবং সিংহাসনে, মেহের-উন্নিসা চোখের জল সামলাতে পারে না, নিশ্বাস ত্যাগ করে বলে, 'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?'

এত স্বপ্ন অবসরে চরিত্র অঙ্কনের এমন দক্ষতা অল্পই দেখা যায়।

৫৫.১০ সার-সংক্ষেপ

এখানে আমরা চরিত্রসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সাধারণভাবে মূল ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছি এবং 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র কীরকম দক্ষতা দেখিয়েছেন সেটা বুঝবার চেষ্টা করেছি। প্রথমেই প্রধান চরিত্র এবং অপ্রধান চরিত্রের পার্থক্যটা আমরা বুঝে নিয়েছি এবং অপ্রধান চরিত্র ফুটিয়ে তুলবার ব্যাপারেও লেখকের দৃষ্টি কেন থাকা দরকার, সে কথা বলেছি।

এবার প্রধান চরিত্রের মধ্যে আলোচনা করেছি নবকুমার, কপালকুণ্ডলা এবং মতিবিবির। উপন্যাসটি নারীপ্রধান বলেই আমরা দেখতে পেয়েছি নবকুমার চরিত্রটি বিভিন্ন নায়কোচিত গুণে ভূষিত হলেও, এখানে ঘটনা বলতে যা আছে তাতে নবকুমারের ভূমিকা অল্প। কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি কত যত্নে বঙ্কিমচন্দ্র আঁকবার চেষ্টা করেছেন সে কথা আলোচনা করা হয়েছে। রহস্যময়তা ও বাস্তগুণের সংমিশ্রণে চরিত্রটি অভিনব হয়ে উঠেছে। কিন্তু আরো বেশি সজীব চরিত্র হয়েছে মতিবিবি, এ ব্যাপারে আমরা অনেকেই বোধহয় একমত হবো।

অপ্রধান চত্রি নির্মাণেও বঙ্কিমচন্দ্র কত দক্ষ ছিলেন তা আমরা দেখিয়েছি এবং এই দক্ষতা কাপালিক, অধিকারী, শ্যামাসুন্দরী এবং মেহের-উন্নিসার চরিত্রসৃষ্টিতে কীভাবে পরিস্ফুট হয়েছে সেটা দেখিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে।

৫৫.১১ কপালকুণ্ডলার শ্রেণিবিচার

একটি উপন্যাসের পরিচয় সম্পূর্ণ জানা না হলে তার শ্রেণিবিচার করা শক্ত। এখন আমরা তার পরিচয় মোটামুটিভাবে সব দিক থেকেই জানি, বলতে পারি। যিনি প্রথম এই উপন্যাস পড়তে যাবেন, একটা ব্যাপারে তাঁর একটু খটকা লাগতে পারে, কারণ 'কপালকুণ্ডলা' নাম হিসাবে কিছুটা বিস্ময়কর, যখন দেখা যাবে এর অন্যতম প্রধান নারীচরিত্রের নামই এই, তখন বিস্ময় আরো বাড়বে, কারণ এরকম নাম সাধারণত কোন স্ত্রীলোকের হয় না।

এ বিষয়ে যাঁরা কিছু চিন্তাভাবনা করেছেন তাঁরা বলেছেন, নামটি সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেছেন ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটক থেকে। সেখানেও অঘোরঘন্ট নামে এক কাপালিক আছে এবং তাঁর এক শিষ্যাও আছে কপালকুণ্ডলা নামে। তবে আপনারা যদি সেই নাটক পড়েন, তাহলে দেখবেন, যেখানে কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি উপন্যাসের চরিত্রের ঠিক বিপরীত আমাদের কপালকুণ্ডলা কাপালিকের গ্রাস থেকে মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, ভবভূতির কপালকুণ্ডলা কাপালিকের জন্য নরবলির জোগাড় করে।

আসলে, এই উপন্যাসের উৎস সম্বন্ধে আমরা জানি, এটি বঙ্কিমচন্দ্রে একটি পরীক্ষামূলক গ্রন্থ। মনের একটি গভীর চিন্তাকে তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে রূপ দিতে চেয়েছেন। যে মেয়ে প্রায় আজন্ম লোকালয় থেকে দূরে আছে, যৌবনে তার বিবাহ দিলে সে সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করতে পারবে কিনা, এই ছিল প্রশ্ন। এটা দেখাবার জন্য একটি মেয়েকে নিতান্ত শৈশবে কোন নির্জন জায়গায় নির্বাসিত দেখাতে হয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, নির্জন বালিয়াড়িতে কাপালিক এই মেয়েকে লালিত করেছে। কাপালিকের দেওয়া নাম এই ধরনের হওয়াই স্বাভাবিক কারণ এটি কালীর নামান্তর। অধিকারী নিজেও স্নেহভরে কখনও কখনও তাকে কাপালিনী বলে ডেকেছেন। যাইহোক, একে আমরা কোন জাতীয় সৃষ্টি বলবো সে ব্যাপারে এবার চিন্তা করা যাক।

৫৫.১১.১ 'কপালকুণ্ডলা' ঃ একটি কাব্য

কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, কপালকুণ্ডলা আসলে একটি গদ্য কাব্য। একথা অবশ্য ঠিক যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম কবিতা রচনার মাধ্যমেই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এ কথাও মিথ্যা নয় যে কপালকুণ্ডলার মধ্যে এমন এক গভীর অনুভূতিমূলক চিন্তা আছে, মহৎকাব্যেই সেরকম চিন্তা দেখা যায়। তাছাড়া এমন এক রহস্যময় পরিমণ্ডল বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন—নির্জন সমুদ্রতীর, বালিয়াড়ি, দৈবদুর্বিপাকে নবকুমারের সেখানে নির্বাসন, রহস্যময় কাপালিক, তার চেয়েও রহস্যময়ী নারী কপালকুণ্ডলা এবং তার ব্যাকুল আহ্বান—সমস্ত মিলে একটা কাব্যিক ব্যঞ্জনাই যে ফুটে ওঠে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

এই গ্রন্থের কাব্যিক লক্ষণ আরো আছে। সমগ্র গ্রন্থে এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র যার কাব্যিক সুষমা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। দু-এক পংক্তি উদ্ধার করলে আপনারাও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন—'মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদিবণ, ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে, না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভুত হয় না।'

গ্রন্থের মধ্যে মধ্যেই এমন কিছু ব্যঞ্জনধর্মী পংক্তি আছে যার সাক্ষাৎ কাব্যেই পাওয়া স্বাভাবিক, যেমন—

ক) ''মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পারি না?'
নবকুমার বলিলেন, 'নবকুমার শর্মা।'
প্রদীপ নিবিয়া গেল।''

খ) 'ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণ মধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।'

গ) 'লুৎফ-উন্নিসা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। পাষাণমধ্যে অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।'

এত কাব্যিক লক্ষণ সত্ত্বেও বলতে হবে এটি বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য কাব্য নয়, কারণ কাব্যের আখ্যান এবং চরিত্রসৃষ্টির কোনো দায় থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে এর আখ্যান রচনা করেছেন তাই নয়, সেই আখ্যানকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার জন্য কার্যকারণ শৃঙ্খল সমন্বিত সুবিন্যস্ত বৃত্তে পরিণত করেছেন। চরিত্র শুধু আখ্যানের অবলম্বন হিসাবে আসেনি, তাদের জীবন্ত করার আপ্রাণ চেষ্টাও তিনি করেছেন। সুতরাং কাব্যিক সুষমা এর উপভোগ্যতা অনেক বাড়াতে পারে, কিন্তু শ্রেণী হিসাবে একে গদ্য কাব্য বললে এর প্রতি সুবিচার করা হবে না বলেই আমরা মনে করি।

৫৫.১১.২ 'কপালকুণ্ডলা' ঃ একটি উপন্যাস

উপন্যাসের যেসব লক্ষণের কথা আমরা জানি, সেগুলি মনে রেখে বিচার করতে গেলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে 'কপালকুণ্ডলা' একটি উপন্যাস। কারণ উপন্যাসের যে লক্ষণগুলি ২ নং এককে আপনারা স্বীকার করে নিয়েছেন সেগুলিই একবার মনে করুন। এর মধ্যে উপন্যাসের দুটি শর্ত, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং ছাপাখানার আবিষ্কার আমরা বাদ দিয়ে শুধু লক্ষণগুলি বিচার করছি।

ক) উপন্যাসে আমরা প্রথম পাই মানুষের গল্প, তার সুখদুঃখ আর মানবিক দুর্বলতার গল্প। 'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থে দৈবী সংস্কার ও বিশ্বাসের একা পরিমণ্ডল আছে বটে, কিন্তু এ গল্প মানুষের গল্প এবং সুনিশ্চিত ভাবে মানুষেরই

গল্প। নবকুমার সৌন্দর্যপ্রেমিক এবং প্রকৃতিপ্রেমিক একটি যুবক, নানারকম ভাগ্যবিপর্যয়ে প্রথমা স্ত্রীকে হারিয়েছিল, আবার জীবনে কৃতজ্ঞতাসূত্রে একটি নারী এসেও ছিল। তাকে নবকুমার হৃদয়ের সংরক্ত প্রেম নিবেদন করেছিল, ভালবাসার একটি সংসার গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই নারী যেহেতু ভিন্ন পরিবেশে মানুষ, লোকালয় ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে তার ধারণা অল্প, সুতরাং সংসারজীবন সম্বন্ধে তার উদাসীনতা কাটেনি। নবকুমার সুখী হয়নি, কারণ তার হৃদয়ে সে প্রেম জাগ্রত করতে পারে নি। পাশাপাশি পেয়েছি জীবনতৃষ্ণার প্রতীক স্বরূপ নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতীকে, প্রেম না পেলে নিজের দাম্পতয অধিকারে যা সে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে ছলে-বলে কৌশলে। কাজেই এই আদ্যন্ত মানবিক বিষয়টি যে অবশ্যই উপন্যাসের উপযোগী, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

খ) বাস্তবতাই উপন্যাসের প্রাণ। উপন্যাস সৃষ্টির আগে রূপকথার গল্প, দেবদেবীর গল্প অনেক প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেসব ছিল অলৌকিক। উপন্যাস মানুষের গল্প বলেই সেখানে বিশ্বাসযোগ্যতার একটা ব্যাপার আছে। সেই কারণেই উপন্যাসে বৃত্ত নির্মাণ করতে হয় যাতে সমগ্র গল্পটা বাঁধা থাকে একটা কার্যকারণ সূত্রে। আমরা দেখেছি, ঠিক সেই নিয়ম মেনেই কপালকুণ্ডলার গোটা গল্পটাই বঙ্কিমচন্দ্র একটা সুচিন্তিত বৃত্তে বা plot-এ রূপায়িত করেছেন। কাজেই সেদিক থেকেই একে উপন্যাস বলে স্বীকার করতে হবে।

গ) উপন্যাসে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে লেখকের একটি নিজস্ব জীবনদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। সেটি যে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে ছিল,—এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। সেই জন্যই অন্যান্যদের মতকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি, নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী জীবনের যে রূপ প্রতিভাত হওয়া উচিত, চরিত্র যেরকম আচরণ করা উচিত বলে মনে হয়েছে, তাই তিনি দেখিয়েছেন। মানুষ পশু নয় বলেই প্রাথমিক জীবনাচরণের প্রভাব তার জীবনে অলঙঘ্য, দাম্পত্য জীবনের মূল প্রেমে, জৈব তাড়নায় নয় এবং সেই প্রেম জীবনের যোল বছর পর্যন্ত যার মনে জাগবার কোনো অবকাশই ছিল না, পরেও পরিণত হবার পর তা জাগতে পারে না—এই ধরনের একটা জীবনবোধই মনে হয় এখানে প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই এই গ্রন্থকে উপন্যাস আখ্যা না দেবার কোন কারণ নেই।

৫৫.১১.৩ 'কপালকুণ্ডলা' ঃ একটি রোমান্স

কপালকুণ্ডলাকে উপন্যাস হিসাবে স্বীকার করে নিলেও আমরা দেখবো, এটি একটি বিশেষ ধরনের উপন্যাস, কারণ এখানে যেসব পাত্রপাত্রীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তারা কেউই আমাদের খুব পরিচিত নয়।

উপন্যাসের পাত্রপাত্রী আমাদের পরিচিত কিনা, উপন্যাসের ঘটনা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে কিনা, এইসব বিচার থেকে উপন্যাসকে যে দুটিভাগে ভাগ করা হয়, সে কথা আমরা জানি। যেখানে আমাদের পরিচিত অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে উপন্যাসের পাত্রপাত্রী ও ঘটনা আহরণ করা হয়, তাকে আমরা বলি 'নভেল' এবং যেখানে পাত্রপাত্রী আমাদের অপরিচিত, ঘটনাধারাও ঠিক অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে না, অথচ মানবিক সুখদুঃখের কাহিনি এমন ভাবে উপস্থাপিত করা হয়, যাতে আধুনিক পাঠকের তাতে উৎসাহিত হবার কারণ থাকে, সে ধরনের উপন্যাসকে আমরা বলি 'রোমান্স'। 'কপালকুণ্ডলা'য় যেহেতু এই দ্বিতীয় ব্যাপারটির ঘটেছে অথচ তীব্র মানবিক আখ্যান আমাদের কাছে গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে, একে আমরা 'রোমান্সজাতীয় উপন্যাস' হিসাবেই স্বীকৃতি দিতে পারি।

৫৫.১১.৪ 'কপালকুণ্ডলা' ঃ একটি কাব্যিক রোমান্স

রোমান্সজাতীয় উপন্যাসেরও দুটি ভাগ আছে, সে কথা আমরা জানি। যে রোমান্সের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয় ইতিহাস থেকে, তাকে আমরা বলি 'ঐতিহাসিক রোমান্স' এবং যে রোমান্সের বিষয়বস্তু লেখকের কল্পনাতেই প্রথম দেখা দেয়, তারপর বাস্তব পরিবেশ, বিশ্বাসযোগ্য পাত্র-পাত্রী এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য কাহিনীর দ্বারা সাহিত্যে তার রূপ দেবার চেষ্টা করেন, তাকে বলা হয় 'কাবিযক রোমান্স'।

একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারবো, 'কপালকুণ্ডলা'কে আমরা 'কাব্যিক রোমান্সে'র পর্যায়েই ফেলতে পারি। এখানে অবশ্য ইতিহাসের কিছু অনুষঙ্গ আছে, সম্রাট আকবরের মৃত্যু এবং যুবরাজ সেলিমের রাজত্বভার গ্রহণের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক পর্বকেও গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু তা সবই এসেছে একটি উপকাহিনির চরিত্র মতিবিবির মাধ্যমে। কাজেই এর দ্বারা ঐতিহাসিক গাম্ভীর্য কিচুটা সৃষ্টি হয়েছে বটে, সমগ্র কাহিনিটির বাস্তবতাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু মূল পরিকল্পনা যে 'কাব্যিক রোমান্সে'র সে বিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ।

'কাব্যিক রোমান্সে'র জন্ম যেভাবে হয়, 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের উৎস সন্ধানে গেলে দেখা যাবে,—এর সৃষ্টিও সেইভাবেই হয়েছে। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নয়, জীবন বিষয়ে একটি জটিল জিজ্ঞাসা আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে উদিত হয়েছিল। সেই জিজ্ঞাসার কতা আমরা বার বার বলেছি, সুতরাং এখানে আর তার পুনরাবৃত্তির কোনো প্রয়োজন নেই বোধ হয়। মনের এই প্রশ্নটির সাহিত্যিক মীমাংসা খুঁজবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাল্যকালে খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত' এবং 'সমুদ্রতীরে ত্যক্ত' একটি নারীর কথা কল্পনা করতে হয়েছিল, তন্ত্রসাধক কাপালিকের দ্বারা লালন এবং কপালকুণ্ডলা নামকরণ করাতে হয়েছিল, নবকুমারকে দৈব দুর্বিপাকে সেখানে নিয়ে যেতে হয়েছিল, ঘটনাক্রমে নবকুমারের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাকে সংসাযী করতে হয়েছিল এবং লোকালয়ে বসবাসের ব্যবস্থাও করতে হয়েছিল। তারপর দেখাতে হয়েছিল মূলত তার সংসার ও দাম্পত্যজীবনে অনীহা এবং সপত্নী পদ্মাবতীর প্রতিহিংসা সাধনের প্রচেষ্টার কীভাবে তার জীবনে করুণ পরিণতি নেমে এল। কাজেই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার দিক থেকে একে অবশ্যই বলতে হবে কাব্যিক রোমান্স।

তবে সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে যে প্রক্রিয়ার মিল থাকলেই তাকে যথার্থ 'রোমান্স' আমরা আখ্যা দিতে পারি না, কাহিনী বাস্তব করে তুলবার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা ও নিষ্টা লেখকের থাকা প্রয়োজন। তাও যে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল, সে বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সুতরাং কপালকুণ্ডলার শ্রেণী সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সংশয় থাকতে পারে না।

৫৫.১১.৫ সার-সংক্ষেপ

উপন্যাসের আলোচনা সব দিক থেকে করা হলে, বলা সম্ভব এটি কী জাতীয় উপন্যাস বা আদৌ উপন্যাস কিনা। 'কপালকুণ্ডলা' গ্রন্থটির আলোচনা মোটামুটি ভাবে শেষ হয়েছে, সুতরাং এইবার আমরা এই আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি।

'কপালকুণ্ডলা'কে কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন 'গদ্যকাব্য' কারণ এর মধ্যে লেখকের এক গাঢ় অনুভূতির প্রকাশ আমরা দেখি, সর্বব্যপ্ত একটা রহস্যময় পরিমণ্ডলী দেখি এবং পাত্র-পাত্রীদের আচরণও কেমন রহস্যময় মনে হয়। এ ছাড়া এই গ্রন্থ রচনায় এমন কাব্যিক ভাষার ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, মাঝে মাঝে এমন ব্যঞ্জনাময়

উক্তি করেছেন যে একে কাব্য বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও বলতে হবে, এটি কাব্য নয়, এতে একটি আখ্যান আছে, সুবিন্যস্ত বৃত্ত আছে এবং সমর্থ চরিত্রসৃষ্টি আছে। কোনো কাব্যেরই এগুলি থাকে না। সুতরাং একে 'কাব্য' বলা বোধহয় ঠিক হবে না।

'কপালকুণ্ডলা'কে উপন্যাসই বলতে হবে, তবে 'নভেলজাতীয় উপন্যাস' নয়, 'রোমান্স ধরনের উপন্যাস'। 'রোমান্স'ও দুরকমের হতে পারে—'ঐতিহাসিক রোমান্স' এবং 'কাব্যিক রোমান্স'। এদের যেসব লক্ষণ আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি, তা মনে রাখলে একে 'কাব্যিক রোমান্স' বলাই সংগত হবে।

৫৫.১২ সারাংশ

'কপালকুণ্ডলা'-প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ। তাঁর সমকালের অন্যান্য লেখকদের তুলনায় তিনিই প্রথম উপন্যাসে প্রাণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন—একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। দায়িত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজে ব্যপৃত থেকেও সাহিত্যের সৃজনশীলতায় তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গেই বিচরণ করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র পর ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয় 'কপালকুণ্ডলা'।

উপন্যাস আধুনিক কালের ফসল, যখন মানুষ দেবকেন্দ্রিক মানসিকতা ঝেড়ে ফেলে মানবজগৎ সম্পর্কে সচেতন ও উৎসাহী হয়ে উঠছে। তাই সব উপন্যাসই মানুষের গল্প, মানবিক অনুভূতির গল্প। কখনও সে সুদূর ইতিহাসচারী বা কল্পনাপ্রসূত মানুষের রোমান্সধর্মী চরিতকথা, কখনও বা সে বাস্তব, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত মানবজীবনের প্রতিলিপি, নভেল। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন লেখকের দ্বারা বাংলা উপন্যাসের ভাণ্ডার—এই দুই শ্রেণীর রচনাতেই পূর্ণ হয়ে উঠছিল, যার মধ্যে অন্যতম সফল অবদান—বঙ্কিমচন্দ্রের।

'কপালকুণ্ডলা'র মূলকাহিনি নবকুমার-কপালকুণ্ডলা কেন্দ্রিক হলেও তাতে দুটি উপকাহিনি সংযোজিত হয়েছে—মতিবিবির গল্প ও শ্যামাসুন্দরীর গল্প। এই দুটি কাহিনি উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করেছে, গল্পের পরিণতি সম্পর্কে পাঠকের ঔৎসুক্য বজায় রেখেছে এবং এই দুই চরিত্রের তীব্র সংসারাসক্তি ও দাম্পত্যজীবনের তৃষ্ণার বিপরীতে কপালকুণ্ডলার সংসারে অনাসক্তিকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

এই উপন্যাসের কাহিনিকে পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সময় নির্ধারণের দিকে লেখক সচেতন দৃষ্টি দিয়েছেন। স্পষ্ট সময় নির্দেশ বা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য মূলকাহিনিকে সম্ভাব্যতার জায়গায় নিয়ে যেতে সাহায্য করে। কল্পিত কাহিনির সঙ্গে ইতিহাসের ঘটনার সত্যতা নিখুঁতভাবে জুড়ে দেবারফলে সমগ্র কাহিনি পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে অতি সহজেই।

সমগ্র উপন্যাসটি নারীপ্রধান। নবকুমার বিভিন্ন নায়কোচিত গুণে ভূষিত হলেও ঘটনাবলীতে তার ভূমিকা গৌণ। রহস্যময়তা ও বাস্তবগুণের সংমিশ্রণে কপালকুণ্ডলা লেখকের এক অভিনব সৃষ্টি। তবে পাশাপাশি মতিবিবির চরিত্রটি বরং অধিকতর সজীব, মনোগ্রাহী। বিভিন্ন অপ্রধান চরিত্রের নির্মাণেও লেখকের যত্ন ও দক্ষতা আমাদের চোখে বিশেষভাবে ধরা পড়ে।

'কপালকুণ্ডলা'-র রহস্যময় পরিমণ্ডল, কাব্যিক ভাষারীতি, ব্যঞ্জনাময় উক্ত এবং প্রগাঢ় অনুভূতির প্রকাশময়তা অনেকের কাছেই একে 'গদ্যকাব্য'-এর পরিচয়ে উপনীত করেছে। কিন্তু যেহেতু এতে একটি আখ্যান আছে, সুবিন্যস্ত বৃত্ত এবং সমর্থ চরিত্রসৃষ্টি আছে যা কোনো কাব্যে থাকে না, সেইহেতু একে 'কাব্য' বলা ঠিক নয়। এটি উপন্যাসই, তবে এর বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ অনুযায়ী একে 'কাব্যিক রোমান্স' বলাই সংগত।

৫৫.১৩ অনুশীলনী

অনুশীলনী ৫৩

১) এ কথা কি ঠিক যে বঙ্কিমচন্দ্র একাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ.—পরীক্ষায় পাশ করেন?

২) বঙ্কিমচন্দ্র মোট কটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন?

৩) যে মন্তব্যটি সঠিক সেটি চিহ্নিত করুন—

ক) বঙ্কিমচন্দ্র কেবল উপন্যাসই রচনা করেছেন।

খ) বঙ্কিমচন্দ্র শুধু প্রবন্ধই রচনা করেছেন

গ) বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে কিছু রচনা করেন নি।

ঘ) উপন্যাস এবং প্রবন্ধ ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কিছু ইংরেজি রচনাও আছে।

৪) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের —— উপন্যাস নয়, —— উপন্যাস।

অনুশীলনী ৫৪

১) মধ্যযুগের আখ্যানের সঙ্গে উপন্যাসের আখ্যানের কোনও পার্থক্য আছে কি? থাকলে সেটা কী?

২) উপন্যাস সৃষ্টির জন্য এমন দুটি শর্তের কথা বলুন যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

৩) উপন্যাসের প্রধান লক্ষণগুলি কী বলুন।

৪) মন্তব্যগুলির সত্যাসত্য বিচার করুন এবং অসত্য হলে তার কারণ বুঝিয়ে দিন।

ক) নভেলে থাকে আমাদের চেনা মানুষের গল্প।

খ) ইতিহাস থেকে কাহিনি সংগ্রহ করলেই তা ঐতিহাসিক রোমান্স হয়ে যায়।

গ) কাল্পনিক ধারণা নিয়ে যুক্তিসংগত ভাবে আখ্যান রচনা করলেই তা কাব্যিক রোমান্স হতে পারে।

ঘ) রোমান্স মানেই কল্পনার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেওয়া।

৫) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে কোন্‌গুলি নভেল এবং কোন্‌গুলি ঐতিহাসিক রোমান্স তার শ্রেণীবিভাগ করুন।

৬) বঙ্কিমচন্দ্রের আগে বাংলা নভেল রচনার চেষ্টা হয়েছিল কি? হলে সেরকম গ্রন্থগুলির নাম করুন।

৭) বঙ্কিমচন্দ্রের আগে ঐতিহাসিক রোমান্স রচিত হয়েছিল কি? হলে কার লেখা, কী গ্রন্থ? তাকে উপন্যাস বলা যায় কি?

৮) প্রকৃত নাম, ছদ্মনাম এবং গ্রন্থনাম ভুলভাবে সাজানো আছে, আপনি সঠিকভাবে সাজিয়ে দিন—

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম	গ্রন্থনাম
ক) কালীপ্রসন্ন সিংহ	টেকচাঁদ ঠাকুর	নববাবুবিলাস
খ) প্যারীচাঁদ মিত্র	প্রমথনাথ শর্মা	আলালের ঘরের দুলাল
গ) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	হুতোম প্যঁচা	হুতোম প্যাঁচার নকসা

অনুশীলনী ৫৫.৩

১) কপালকুণ্ডলা উপন্যাস রচনার উৎসাহ বঙ্কিমচন্দ্র কীভাবে পান?

২) উপকাহিনি কাকে বলে? উপন্যাসে উপকাহিনির দরকার হয় কেন?

৩) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে উপকাহিনি আছে কি? কী জন্য লেখক সেগুলি সৃষ্টি করেছেন?

৪) সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক) কপালকুণ্ডলার আর একটি নাম— বনবালা / কপালিকা / মৃণ্ময়ী।

খ) নবকুমারের প্রথম স্ত্রী নাম— পদ্মাবতী / মতিবিবি / লুৎফ-উন্নিসা / সবগুলিই / কোনটিই নয়।

গ) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের শেষে মৃত্যু হল— কাপালিকের / মতিবিবির / কপালকুণ্ডলার / নবকুমারের / কপালকুণ্ডলার ও নবকুমারের / ঠিক জানা যায় না।

ঘ) কাপালিকের হাত থেকে নবকুমারকে রক্ষা করেছিল— কপালকুণ্ডলা / অধিকারী / দুজনেই।

অনুশীলনী ৫৫.৫

১) কাহিনী এবং বৃত্তের মধ্যে পার্থক্য কী?

২) সাধারণভাবে বৃত্ত কত রকমের ও কী কী?

৩) বাক্যগুলির একটি 'হ্যাঁ' বা 'না' বসান—

ক) কপালকুণ্ডলার শুধু কাহিনি আছে, বৃত্ত নেই—

খ) কপালকুণ্ডলায় কোনো স্বপ্নদৃশ্য নেই—

গ) উপকাহিনীর আলোচনা বৃত্তগঠনের মধ্যেই পড়ে—

অনুশীলনী ৫৫.৭

১) কপালকুণ্ডলা-র কাহিনিতে বাস্তবতা সৃষ্টির কী দরকার ছিল, তার দুটি কারণ উল্লেখ করুন।

২) ক) যুবরাজ সেলিমের পিতা কে? খ) সেলিমের প্রধান মহিষী কে ছিলেন? গ) শেষ আফগানের স্ত্রীর নাম কি? ঘ) তাঁকে সেলিম গ্রহণ করেছিলেন কি না উপন্যাসে তার উল্লেখ না থাকার কারণ কি?

৩) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করুন—

ক) মোট কতগুলি শীর্ষ উদ্ধৃতি ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে আছে?

খ) নাট্যকার শেকস্পীয়রের কোন্ কোন্ নাটক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ধৃতি দিয়েছেন?

গ) সংস্কৃত কোন্ কোন্ কবির কী কী নাটক ও কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন?

ঘ) বাংলা কোনও কাব্য ও নাটক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র কোনও উদ্ধৃতি দিয়েছেন কি?

ঙ) ইংরেজ কবিদের মধ্যে কাদের কবিতার উল্লেখ এই উপন্যাসে আছে?

৪) বাঁদিকে কিছু গ্রন্থের নাম আছে, ডানদিকে সাহিত্যিকদের নাম। গ্রন্থের পাশে সঠিক গ্রন্থকারের যে ক্রম উল্লেখ আছে, সেটি বসান।

প্রকৃত নাম	**গ্রন্থনাম**
কমেডি অব এররস ( )	ক) লর্ড বায়রন
মেঘনাদবধ কাব্য ( )	ক) কালিদাস
নবীন তপস্বিনী ( )	গ) কবীন্দ্র ভট্টাচার্য
লুক্রেশিয়া ( )	ঘ) শেকস্পীয়র
উদ্ধব দূত ( )	ঙ) মধুসূদন দত্ত
লাওডামিয়া ( )	চ) জন কীটস
লেইজ অব এনশেন্ট রোম ( )	ছ) লর্ড লীটন
ওড টু এ নাইটিংগেল ( )	জ) ওয়র্ডসওয়র্থ
ডন জুয়ান ( )	ঝ) মেকলে
মেঘদূতম্ ( )	ঞ) দীনবন্ধু মিত্র

অনুশীলনী ৫৫.৯

১) চরিত্রসৃষ্টি বলতে আপনি কী বোঝেন?

২) কপালকুণ্ডলার পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে কাকে প্রধান মনে করেন, বুঝিয়ে দিন।

৩) কপালকুণ্ডলার নারীচরিত্রদের মধ্যে আপনি কাকে প্রধান্য দেবেন বুঝিয়ে বলুন।

৪) উক্তিগুলি সত্য হলে পাশ টিক চিহ্ন (✓) দিন, ভুল হলে ক্রশ চিহ্ন (×) দিন—

ক) কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করে আনার সময় নবকুমারের মাতা জীবিত ছিলেন—

খ) শ্যামাসুন্দরী নবকুমারের একমাত্র ভগিনী—

গ) কপালকুণ্ডলাকে গ্রহণ করতে নবকুমারের মা প্রথমে রাজি হয়নি—

ঘ) মতিবিবি আগ্রায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন—

ঙ) বালিয়াড়ি থেকে পড়ে গিয়ে কাপালিকের দুটি হাতই ভেঙে গিয়েছিল—

চ) অধিকারীর ভবানীমন্দিরে কেউ কখনও পূজা দেয় নি—

অনুশীলনী ৫৫.১১

১) ‘কপালকুণ্ডলা’ নামটি কি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেরই কল্পনা? উপন্যাসের প্রধান নারীচরিত্রের নাম এমন অদ্ভুত কেন?

২) গ্রন্থের শ্রেণীবিচার বলতে কী বোঝায়? ‘কপালকুণ্ডলা’র শ্রেণীবিচার করার জন্য আমরা কীভাবে অগ্রসর হবো?

৫৫.১৩.১ সামগ্রিক আলোচনা নির্ভর অনুশীলনী

১) ‘কপালকুণ্ডলা’কে উপন্যাস না বলে অনেকে কাব্য বলতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানান।

২) এক সমালোচকের মতে ‘কপালকুণ্ডলা ঠিক উপন্যাস নয়; ইহার কতকটা কাব্য, কতকটা নাট্য।’ আপনি এই মত সমর্থন করেন কি?

৩) ‘কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে’র শ্রেণিবিচার করুন।

৪) উপন্যাসে উপকাহিনীর প্রয়োজন হয় কেন? কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের উপকাহিনি কী? এর কোন প্রয়োজন ছিল বলে আপনার মনে হয় কি?

৫) ’কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত বা সংস্কারের কোনো পরিচয় আছে বলে মনে করেন কি? উপন্যাসের মতো আধুনিক সাহিত্যে এর কি কোনো দরকার ছিল?

৬) কপালকুণ্ডলাকে প্রায় সর্বদাই অন্ধকারে দেখানো হয়েছে, দিনের উজ্জ্বল আলোয় তাকে আমরা বিশেষ দেখতে পাইনা। এর কোনও বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে আপনার মনে হয় কি?

৭) ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাস রচনার উৎস কী? এ বিষয়ে যা জানা যায় তার পরিচয় দিন।

৮) কপালকুণ্ডলার চরিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যা ভেবেছেন এবং পরিণতি যেরকম দেখিয়েছেন, তা কি আপনার স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে এর স্বাভাবিক পরিণতি কী হতে পারত বলে আপনি মনে করেন?

৯) গ্রন্থের নাম যখন ‘কপালকুণ্ডলা’ তখন কপালকুণ্ডলাকেই সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র নায়িকা করতে চেয়েছেন, কিন্তু অনেকেই মনে করেন মতিবিবিই অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

১০) ‘কপালকুণ্ডলার’ কয়েকটি অপ্রধান চরিত্রের পরিচয় দিন। এই চরিত্রগুলি সৃষ্টি করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে সতর্ক ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কি?

১১) ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে ইতিহাস থাকলেও একে ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ বলা সংগত নয় কেন, বুঝিয়ে দিন।

৫৫.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

২) শ্রী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা উপন্যাসের কালান্তর

৩) প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত ঃ উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম

৪) মোহিতলাল মজুমদার ঃ বঙ্কিম-বরণ

৫৫.১৫ উত্তরমালা

উত্তর — ৫৩

১) না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্নাতক পরীক্ষা বা বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আরো একজন পাশ করেন—যদুনাথ বসু।

২) এগারোটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস আর তিনটি ছোট উপন্যাস বা খণ্ডোপন্যাস। অবশ্য ইংরেজি উপন্যাস 'Rajmohan's Wife'-এর কথা ধরলে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হবে বারোটি।

৩) (ঘ)

৪) [কপালকুণ্ডলা উপন্যাস সম্বন্ধে আপনি এখনও পর্যন্ত তেমন কিছুই জানেন না, কেবল কোন্‌টি প্রথম বা দ্বিতীয় সেটুকুই জানেন। তাই শূন্যস্থান পূরণও সেইভাবেই করবেন—]

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস নয়, দ্বিতীয় উপন্যাস।

[এক্ষেত্রে আপনাকে Rajmohan's Wife-এর কথা মনে রাখতে হবে না, কারণ বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় তাকে ধরা হয় না।]

উত্তর — ৫৪

১) মধ্যযুগেও আখ্যান বা গল্প ছিল, কিন্তু তা ছিল প্রধানত দেবদেবীর কাহিনি, উপন্যাসে আমরা পাই মানুষের গল্প, তার সুখদুঃখ আর মানবিক দুর্বলতার গল্প। মানুষের গল্প বলেই উপন্যাসে অলৌকিক বা অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা বিশেস থাকে না, মধ্যযুগে দেবদেবীর গল্প শোনার হতো বলে অবিশ্বাস্য মাহাত্ম্য কথাও থাকতো অনেক বেশি, নইলে তাঁদের অসাধারণ ক্ষমতার বিশ্বাস জন্মায় না সাধারণ মানুষের।

২) উপন্যাস সৃষ্টির দুটি মৌলিক শর্ত হল, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার।

৩) উপন্যাসের প্রধান লক্ষণগুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, সারাংশেও তার উল্লেখ আছে। আপনারা বিশদভাবেই আলোচনা করতে পারেন এই প্রশ্নে কত মানাঙ্ক দেওয়া আছে তার ওপর নির্ভর করে। সাংরাশের মূল সূত্রগুলি আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি—

ক) উপন্যাসের কাহিনি হবে মানুষের ও মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন।

খ) গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ওপর উপন্যাস সৃষ্টি নির্ভরশীল।

গ) বাস্তবতাই উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ।

ঘ) ছাপাখানার আবিষ্কার উপন্যাস সৃষ্টির এক প্রধান শর্ত।

ঙ) উপন্যাসে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার।

৪) ক) সত্য

খ) অসত্য। ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করা সেই কাহিনিতে যথেষ্ট মানবিক আবেদন বা মানুষের ভালো লাগার মত উপাদান না থাকলে তা ঐতিহাসিক রোমান্স হয় না।

গ) সত্য।

ঘ) অসত্য। কারণ, রোমান্স তো উপন্যাসেরই একটি প্রকারভেদ এবং উপন্যাসের প্রধান গুণ—বাস্তবতা; কাজেই কল্পনার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিলে তাকে কখনই আমরা 'উপন্যাস' বলতে পারবো না, আর যাকে 'উপন্যাস' বলা চলে না তাকে 'রোমান্স' বলার কোন কারণ নেই।

৫) এই শ্রেণিবিভাগ আমরা করেই দিয়েছি, আপনি ৫৪.৪.২ অংশটি দেখে নিয়ে অনায়াসে উত্তর করার চেষ্টা করতে পারেন। আপনার নিজের যদি অন্যরকম কোনো সিদ্ধান্ত হয়, আপনি তাও জানাতে পারেন।

৬) হ্যাঁ, হয়েছিল। প্রথম গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ১৮২৩ সালে, নাম 'নববাবু-বিলাস'। দ্বিতীয় নভেল লেখার চেষ্টা হয়েছিল ১৮৫৮ সালে, গ্রন্থের নাম 'আলালের ঘরের দুলাল'। তৃতীয় গ্রন্থটি রচিত হয় ১৮৫২ সালে, নাম 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ'। হুতোম প্যাঁচার নক্সা' নামে আরো একটি গ্রন্থ রচিত হয়, সেটির প্রকাশকাল ১৮৬২ সাল।

৭) হ্যাঁ, 'ঐতিহাসিক রোমান্স' লেখার চেষ্টা করা হয়েছিল। লিখেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থের নাম 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। পূর্ণাঙ্গ রোমান্স হলে তাকে হয়তো 'উপন্যাস' বলা চলতো, কিন্তু গ্রন্থটি আসলে দুটি ক্ষুদ্র কাহিনীর সংকলন। তাই একে 'উপন্যাস' না বলাই বাঞ্ছনীয়।

৮) সঠিক সাজানো এইরকম হবে ঃ

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম	গ্রন্থনাম
ক) কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতোম প্যাঁচা	হুতোম প্যাঁচার নক্সা
খ) প্যারীচাঁদ মিত্র	টেকচাঁদ ঠাকুর	আলালের ঘরের দুলাল
গ) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রমথনাথ শর্মা	নববাবু বিলাস

উত্তর — ৫৫.৩

১) কর্মজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনীপুরের নেগুঁয়ায় বদলি হয়েছিলেন, এক কাপালিকের দেখা পেতেন মাঝরাতে। এঁকে দেখেই সম্ভবত মাথায় একটা প্রশ্ন এসেছিল, কোন নারী যদি লোকালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত অবস্থায় বড় হয়, তবে যৌবনে বিবাহ দিয়ে তাকে সংসারী করতে চাইলে তার স্বভাবের পরিবর্তন হবে কিনা।

এর উত্তর সন্ধানের জন্যই যে উপন্যাসটি লেখা, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে সেই কথাই বলা হয়েছে।

২) এই প্রশ্নের উত্তর আপনারাই দিতে পারবেন। এই এককের ৫৫.৪ এবং ৫৫.৪.১ অংশদুটিকে সংক্ষেপে লিখলেই এর উত্তর হয়ে যাবে।

৩) এর উত্তরও নিজে লেখার চেষ্টা করুন। ৫৫.৪.২ অংশে এর উত্তর সাজানোই আছে।

৪) ক) মৃণ্ময়ী।

খ) সবগুলিই।

গ) ঠিক জানা যায় না।

[ভেসে যাওয়ার কথা আছে, মৃত্যুর কথা নেই]

ঘ) দুজনেই

[এটা একটা শক্ত প্রশ্ন, কারণ যে-কোন উত্তরই ঠিক, তবে শেষেরটা যে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তর, আপনারা একটু চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারবেন]

উত্তর — ৫৫.৫

১) কাহিনি বলতে বোঝায় উপন্যাসের আখ্যান বা গল্পটা, ইংরেজিতে যাকে বলে 'story' এবং বৃত্ত বলতে বোঝায় সেই গল্পের বিন্যাস, যাকে ইংরেজিতে বলি আমরা 'প্লট'। কাহিনির মধ্যে কেবল পাঠকের কৌতূহলবৃত্তিকে তৃপ্ত করা হয়, অর্থাৎ তারপর কী হল, তারপর? এইভাবে কাহিনি এগিয়ে যায়। বৃত্তে থাকতে হবে সেই সঙ্গে কার্যকারণের শৃঙ্খলা—এইজন্যে এটা হল, এই জন্যে ওটা হল, এইরকম। এক কথায় বলা যেতে পারে, বৃত্ত একটা সুশৃঙ্খল কাহিনি।

২) সাধারণভাবে বৃত্ত হয় তিন রকমের। এদের নাম হল 'সরল বৃত্ত', যাতে একটাই গল্প থাকে; 'জটিল বৃত্ত', যাতে একটি মূল কাহিনি আর এক বা একাধিক উপকাহিনি; 'যৌগিক বৃত্ত',—যেখানে বেশ কয়েকটা আপাত স্বাধীন কাহিনি যারা তাৎপর্যে কিন্তু একটা অভিন্ন সংবেদন তৈরি করে।

৩) ক) না

খ) না

গ) হ্যাঁ।

উত্তর — ৫৫.৭

১) প্রথমত এটি যখন বঙ্কিমচন্দ্র রচিত একটি উপন্যাস তখন বাস্তবতা সৃষ্টি তো করতেই হবে, নইলে তাকে উপন্যাস হিসাবে আমরা মেনে নেব কেন।

দ্বিতীয়ত, কাহিনিটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলেই পাঠকের কাছে তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার দরকার ছিল।

২) ক) সম্রাট আকবর।

খ) মানসিংহের ভগিনী। নাম উল্লেখ করা হয় নি।

গ) মেহের-উন্নিসা।

ঘ) ইতিহাস থেকে জানা যায়, সেলিম তাকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু উপন্যাসে তার উল্লেখ নেই এই জন্য যে, উপন্যাসের সময়কালের মধ্যে তা পড়ে না

৩) ক) মোট একত্রিশটি।

খ) Comedy of Errors; King Lear; Romeo and Juliet; Macbeth; Hamlet; Othello

গ) কালিদাস — রঘুবংশম্; অভিজ্ঞান শকুন্তলম্; মেঘদূতম্; কুমারসম্ভব;

শ্রীহর্ষ — রত্নাবলী।

কবীন্দ্র ভট্টাচার্য — উদ্ধবদূত।

ঘ) মধুসূদন দত্ত — মেঘনাদবধ কাব্য; বীরাঙ্গনা কাব্য; ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

দীনবন্ধু মিত্র — নবীন তপস্বিনী

বিদ্যাপতি — বৈষ্ণব পদ।

ঙ) Lord Byron — Don Juan; Manfred।

John keats — Ode to a Nightingale।

William Wordsworth — Laodamia।

উত্তর — ৫৫.৯

১) উপন্যাসের কাহিনি কিছু পাত্র-পাত্রীর সাহায্যেই বর্ণনা করা হয়। এই সব পাত্র-পাত্রীকেই সাধারণভাবে বলা হয় চরিত্র। তবে সৃষ্টির গুণে এই কাল্পনিক পাত্র-পাত্রী যদি রক্তমাংসের মানুষের মত সজীব না হয়ে ওঠে, তবে তাদের চরিত্র বলা যাবে না। প্রত্যেকটি মানুষের যেমন এক-একটি বৈশিষ্ট্য থাকে, চরিত্রেরও তাই থাকা উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের হাতে হবে দোষেগুণে ভরা মানুষ। এই ভাবেই চরিত্র আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। চরিত্র বিশ্বাসযোগ্য না হলে কাহিনিটিও অবাস্তব মনে হবে, আর কাহিনী অবাস্তব হলে তাকে আমরা উপন্যাসই বলতে পারবো না। কাজেই উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টির একটা বিরাট গুরুত্ব যেমন আছে, তেমনি কাল্পনিক পাত্র-পাত্রী যাতে 'চরিত্র' হয়ে ওঠে, সেটা দেখাও সাহিত্যিকের প্রধান দায়িত্ব।

২) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র বলতে একটিই আছে, নবকুমার। উল্লেখ করা যায় এমন চরিত্র আছে আর দুটি—কাপালিক ও অধিকারী। এই দুটি চরিত্রই সম্পূর্ণ একমুখী, কাপালিকের সব কিছুই খারাপ এবং অধিকারীর সব কিছুই ভালো। সেইজন্য তাদের খুব বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র বলে মনেই হয় না। নবকুমারের চরিত্রে গুণ অনেক বেশি থাকলেও দোষও আছে কিছু। তা না হলে কপালকুণ্ডলাকে সে অবিশ্বাসিনী ভাবতে পারতো না, কাপালিকের আজ্ঞা পালন করে কপালকুণ্ডলাকে বধের জন্য নিয়ে যেতে পারতো না — অন্তত

এ কথা তার মনে পড়ত, এই কপালকুণ্ডলাই কাপালিকের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে নতুন জীবন দান করেছিলেন। দোষেগুণে ভরা এই চরিত্রটিই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হতে পেরেছে।

৩) এটা বলা একটু শক্ত, কোনো সন্দেহ নেই। কারণ উপন্যাসের নাম 'কপালকুণ্ডলা'। এই চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের মানসকন্যা, একে সাহিত্যে রূপ দেবার জন্যই তিনি উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছেন। পক্ষান্তরে মতিবিবিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে, কপালকুণ্ডলা যাতে কোনো মতেই সুখী হতে না পারে, সে ব্যাপারে নিশ্চত হবার জন্য নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী হিসাবে তার পরিকল্পনা করেছেন। কপালকুণ্ডলাকে বঙ্কিমচন্দ্র রহস্যময়ী করে তুলেছেন, যেন একটা অলৌকিক পরিমণ্ডল তাকে ঘিরে আছে, তার উদাসী মূর্তির যেন সবটা ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না। অন্যদিকে মতিবিবি স্বৈরিণী নারী—ক্ষমতা করায়ত্ত করা এবং লুব্ধ পুরুষের বিলাসসঙ্গিনী হবার জন্যই তাকে যেন বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। অথচ এই নারীই আমাদের কাছে বেশি আকর্ষক হয়ে ওঠে। আসলে মতিবিবির মধ্যে দোষের ভাগ বেশি, কিন্তু সে এক চিরন্তন নারী, এইজন্য তাকে বেশি ভালো লাগে। কপালকুণ্ডলার মধ্যে যেন এক অনির্বচনীয় মহত্ত্ব আছে, কিন্তু সে আমাদের হৃদয়ের অতো কাছে আসতে পারে না।

৪) ক) ✓
খ) ✗
গ) ✗
ঘ) ✗
ঙ) ✓
চ) ✗

উত্তর — ৫৫.১১

১) নামকরণ যখন বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন তখন কপালকুণ্ডলা নামটিও তিনি নিজেই ভেবে থাকতে পারেন। কিন্তু নামকরণ একটি অদ্ভুত ধরনের বলেই এ প্রশ্ন উঠেছে যে এরকম নাম তিনি আগে কখনও শুনেছেন কিনা। এ বিষয়ে বলা যায়, ভবভূতির লেখা সংস্কৃত নাটক 'মালতীমাধবে' একটি কাপালিক ছিল, তার প্রধান শিষ্যার নাম ছিল কপালকুণ্ডলা। কিন্তু সে চরিত্রটি ছিল নির্দয় এবং হিংস্র। কাজেই, নামটি যদিওবা বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করে থাকেন ভবভূতির নাটক থেকে, চরিত্রটি তিনি নির্মাণ করেছেন নিজের মত করেই।

২) সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ আছে — কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতি। একটি গ্রন্থকে ঠিক কী ধরনের বা প্রকারের সাহিত্য বলা যায়, সেটা নির্ণয় করাকেই বলে তার শ্রেণীবিচার। কারণ অনেক সময় আকৃতির দিক থেকে একরকম মনে হলেও তার প্রকৃতি হয়তো দেখা যায় অন্যরকম। সেক্ষেত্রে প্রকৃতিগত বিচারটাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত।

কপালকুণ্ডলা দৃশ্যত একটি উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্র সেভাবেই এটি রচনা করেছেন কিন্তু অনেকেই এর প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক রকম কথা বলেছেন। কেউ একে বিশুদ্ধ 'কাব্য' বলতে চেয়েছেন, কেউ বলেছেন 'নাটক', কেউ আবার এমন কথাও বলেছেন যে এটা বঙ্কিমচন্দ্রের এক বিচিত্র সৃষ্টি। আর ডব্লিউ ফ্রেজার সাহেব মন্তব্য

করেছিলেন 'লতির বিয়ে', ছাড়া এমন একখানা বই নাকি পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যেও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা এই সমস্যার সমাধানে কীভাবে অগ্রসর হব সেটা এই ৫৫.১১ এককে বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করা আছে, আপনারা সেই আলোচনা পড়ে নিজের বুদ্ধিবিচার প্রয়োগ করে এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন। মনে রাখবেন, সাহিত্যের প্রশ্নে একেবারে আমিই চূড়ান্ত সত্য কথা বলছি, এভাবে কেউ বলতে পারে না। সুতরাং আপনার নিজের চিন্তাভাবনার সুযোগ নিশ্চয়ই আছে, তবে তা করতে হবে আপনি যেসব আলোচনা পড়েছেন, তাকেই অবলম্বন করে। কারণ আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার জন্যই আলোচনাগুলি বিভিন্ন দিক থেকে করা হয়েছে।

৫৫.১৫.১ সামগ্রিক আলোচনা নির্ভর উত্তরমালা

এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার আগে একটা কথা আপনাদের জানানো দরকার। সেটি হল, যে-প্রশ্ন এখানে দেওয়া আছে তার প্রত্যেকটিই যাতে আপনি নিজে আলোচনা করতে পারেন, সেই ভাবেই আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এটা বলে দেওয়াই যথেষ্ট হতো যে, এই প্রশ্নের জন্য এই এককটি দেখে নিন এবং তারপর আপনার বুদ্ধি বিবেচনামতে ঠিক মত গ্রহণ করুণ, কিন্তু বর্জন করুন, কিছু আপনি নিজে ভেবে-চিন্তে নিন। কারণ আমাদের আলোচনা একক বিভাগ করে পৃথক বিষয় নিয়েই হয়েছে। বিষয় অনুযায়ী এককের বিভাগ এইরকম ঃ

৫৩	লেখক, তাঁর সৃষ্টি এবং প্রতিভার বৈশিষ্ট্য
৫৪	উপন্যাসের বিভিন্ন লক্ষণ এবং তার শ্রেণিবিভাগ।
৫৪	উপন্যাসের পথিকৃৎ কে এবং তাঁর সমসাময়িক রচনা।
৫৫.৩ ও ৫৫.৪	'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য।
৫৫.৫ ও ৫৫.৬	'কপালকুণ্ডলা'র বিষয়বিন্যাস বা বৃত্তগঠনের আলোচনা।
৫৫.৭	'কপালকুণ্ডলায়' বাস্তবতা সৃষ্টির বিভিন্ন উপায়।
৫৫.৯	'কপালকুণ্ডলায়' চরিত্রসমূহ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য।
৫৫.১১	'কপালকুণ্ডলায়' শ্রেণিনির্ণয়।

তবুও আপনাদের সম্পূর্ণ একার প্রচেষ্টায় উত্তর লেখার অসুবিধাও কিছু আছে। প্রধান অসুবিধা হল এই যে, উত্তরগুলি অত্যন্ত সংক্ষেপে লিখতে হবে—৫০ থেকে ২০০ শব্দের মধ্যে। কিন্তু আমাদের আলোচনা তুলনায় কিছুটা বিস্তৃত। সেই আলোচনা দেখে কী করে সংক্ষেপ করবেন তা বোঝাবার জন্য কিছু উত্তর এখানে লিখে দেওয়া হবে। তবে তা সত্ত্বেও সেই উত্তর হুবহু না লিখে আপনি নিজে কিছু ভাবুন, আলোচনা-অংশ দেখুন, তার কিছু পরিবর্তন করুন—এটাই বাঞ্ছনীয়। আপনাদের সুবিধার জন্য যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হল, সেগুলি অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন।

এবার উত্তরমালা।

১) এই প্রশ্নের উত্তর আপনি অনায়াসে ৫৫.১১ অংশ থেকে করতে পারবেন। শুধু মনে রাখবেন, এই মূল কথাগুলি আপনাকে লিখতে হবে—

ক) কাব্যের গভীর অনুভূতি বর্তমান।

খ) উপন্যাসের মত স্পষ্ট নয়, রহস্যময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি।

গ) ভাষা একেবারেই কাব্যময়।

ঘ) কিছু উক্তিতে কাব্যিক ব্যঞ্জনা আছে।

ঙ) কিন্তু আখ্যান চরিত্রবিত্রণ ও বিশেষ করে বৃত্তনির্মাণের বৈশিষ্ট্যে বোঝা যায় এটি কাব্য নয়।

২) এই প্রশ্নের উত্তর ১ নং প্রশ্নের উত্তরের মতই হবে, শুধু নাট্য লক্ষণ বলতে কী বোঝায়, এবং সেটা 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে আছে কিনা আপনাদের বলতে হবে। তাই সেই লক্ষণ দু-এক কথায় জেনে নিতে পারেন ঃ

প্রকৃতির দিক থেকে দ্বন্দ্বময়তা এবং বাহ্যিক দিক থেকে চমকিত ঘটনা সংস্থাপন নাটকের বৈশিষ্ট্য। কপালকুণ্ডলায় দ্বন্দ্বময়তা আমরা খুব বেশি দেখতে পাইনা, কারণ কপালকুণ্ডলার চরিত্রে বিশেষ দ্বন্দ্ব নেই। মতিবিবির যদি আগ্রার রাজসিংহাসন দখলের ক্ষমতা থাকত তাহলে তার ফিরে আসা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারত, কিন্তু সে সম্ভাবনাও কিছু ছিল না। নবকুমার বিক্ষুব্ধ চরিত্র—একেবারে শেষের দিকে কিছুটা দ্বন্দ্বময় বলা যায়। আসলে চমকপূর্ণ ঘটনা এখানে অনেক ঘটেছে যাদের 'নাটকীয়' ঘটনা বলতে পারি, যেমন — সমুদ্রতীরে কপালকুণ্ডলার প্রথম সাক্ষাৎ, দস্যুহস্তে নিগৃহীতা মতিবিবির সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ, কপালকুণ্ডলার পত্র হারানো এবং তা নবকুমারের হাতে পড়া, ব্রাহ্মণ-বেশী মতিবিবির অঙ্গুরীয় দান দেখে নবকুমারের কপালকুণ্ডলাকে ভুল বোঝা ইত্যাদি।

৩) [লক্ষ করে দেখুন, এখানে কপালকুণ্ডলা যে উপন্যাস, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়নি, কী জাতীয়উপন্যাস, সে কথাই জানতে চাওয়া হয়েছে।] উত্তর এই ভাবে লিখতে পারেন ?

উপন্যাসের প্রধানত দুটি বিভাগ—'নভেল' এবং 'রোমান্স'। 'নভেল' আমরা পাই আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ এবং পরিচিত পাত্রপাত্রী, 'রোমান্সে' বাস্তবতা বজায় রেখে, আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে যে জগৎ সেখানকার মানবিক কাহিনি শোনানো হয়। 'রোমান্সের' কাহিনি ইতিহাস থেকে সংগৃহীত হলে তাকে বলে 'ঐতিহাসিক রোমান্স' এবং লেখকের কল্পনার যদি সেটি আগেই এসে থাকে তবে তাকে বলে 'কাব্যিক রোমান্স'।

'কপালকুণ্ডলা'র সমগ্র কাহিনি আমাদের স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয় আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে এদের আমরা পেতে পারি না, সুতরাং এটি যে 'রোমান্স' এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইতিহাসের আশ্রয় এ উপন্যাসে নেওয়া হলেও মূল কাহিনির সঙ্গে ইতিহাসের যোগ নেই বলে একে 'ঐতিহাসিক রোমান্স' বলা যায় না। বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্র থেকে জানা যায়, এই উপন্যাসের সমস্যা বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাতে আগেই দেখা দিয়েছিল —যৌবনকাল পর্যন্ত লোকালয়বর্জিত স্থানে বাস করে, পরে দাম্পতয জীবনে বাস করলে কোন নারীর স্বাভাবিক সংসারাসক্তি, প্রেম ইত্যাদি অনুভূতি জাগবে কিনা। এই চিন্তারই বাস্তব গ্রাহ্য ও বিশ্বাসযোগ্য ঔপন্যাসিক রূপান্তর বলা যায় এই উপন্যাসকে। কাজেই এটি যে একটি 'কাব্যিক রোমান্স' এ কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়।

৪) বুঝতেই পারছেন এর উত্তর পাওয়া যাবে ৫৫.৪ নং এককে কারণ এটি কাহিনী সংক্রান্ত প্রশ্ন। এই এককের ৫৫.৪.১ ও ৫৫.৪.২ অংশ দেখে উত্তরটি সংক্ষেপে লিখতে পারেন অথবা ৫৫.৪.২ অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি সরাসরি লিখে দিতে পারেন।

৫) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত বা সংস্কারের পরিচয় কিছু কিছু আমরা পাই। সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়, কারণ কাপালিক ও তার পালিতা কন্যা 'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনীতে এরকম রহস্যময় আবেষ্টনী একটা থাকতেই পারে। সেগুলির পরিচয় দিই আগে।

অলৌকিক যে অংশটি আছে সেটি রয়েছে চতুর্থ খন্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে। মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে বাড়ি ফেরার পথে কপালকুণ্ডলা ভৈরবী-কালীর দর্শন পেয়েছে এবং তাঁর নির্দেশ শুনতে পেয়েছে। এটি যে প্রত্যক্ষ, সেটা দেখাবার জন্য Wordsworth-এর একটি কাব্যপংক্তি দিয়ে পরিচ্ছেদের শুরু — 'No spectre greets me — no vain shadow this,' কপালকুণ্ডলা দেখেছে 'আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত মূর্তি। গলবিলম্বিত নরকপালমালা হইতে শোণিতশ্রুতি হইতেছে, কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকররাজি দুলিতেছে — বাম করে নরকপাল — অঙ্গে রুধিরধারা ললাটে বিষমোজ্জ্বলাজ্বালা বিভাসিত লোচনপ্রান্তে বালশশী সুশোভিত।' কপালকুণ্ডলা চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে একটি স্বপ্ন দেখেছে, তাকেও অতিপ্রাকৃত বলা যেতে পারে, কারণ সেখানে কপালকুণ্ডলার পরিণতিই যেন নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। যে-তরীতে কপালকুণ্ডলা ইতোপূর্বে বসন্তলীলা করেছে, সেই তরী সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবার জনয এসেছে কাপালিক, ব্রাহ্মণ বেশধারী একজন তাকে আটকেছে, তরী রাখবে না ডুবিয়ে দেবে প্রশ্ন করায় তরী নিজেই তা ডুবিয়ে দিতে বলেছে এবং তরী পাতালে প্রবেশ করেছে।

সংস্কারের যে ব্যাপারটি আছে সেটি, বিবাহের পর যাত্রাকালে ভবানীর চরণ থেকে বিল্বপত্র খসে পড়া। এটি কপালকুণ্ডলাকে পরবর্তী জীবনে সর্বদা আশঙ্কিত রেখেছে।

উপন্যাস আধুনিক সাহিত্য হলেও 'কপালকুণ্ডলা' একটু অন্য ধরনের উপন্যাস। এখানে কিছু রহস্যময়তাকে আমরা ছাড়পত্র দিতে পারি। দ্বিতীয়ত এই ধরনের অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত যে মনের ভুল হতে পারে, তারও ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। ভৈরবী-মূর্তি দর্শনের আগে এ কথা বলেছেন মানুষের মন চঞ্চল হলে 'অনৈসর্গিক পদার্থও প্রতীক্ষীভূত' বলে বোধ হতে পারে। স্বপ্নদর্শন-যে কপালকুণ্ডলার অবচেতন মনেরই প্রতিফলন, এ আমরা বুঝি। আর সংশয় উপস্থিত হলে সংস্কার তো মানুষকে আচ্ছন্ন করেই। কাজেই 'কপালকুণ্ডলা'য় অতিপ্রাকৃত উপাদান বলে যেগুলিকে মনে হয় তাদের প্রত্যেককেই জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া বলে অনায়াসেই মেনে নেওয়া যায়।

৬) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা চরিত্রটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদা যুক্ত করে রেখেছেন অন্ধকার এবং কপালকুণ্ডলার কেশভার — অবেণীসম্বন্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত। যখন প্রথম তাকে নবকুমার দেখে, তখনও তাই এবং একেবারে শেষ পরিচ্ছেদ, যেখানে কপালকুণ্ডলাকে বধ করতে নিয়ে যাওয়া হবে সেখানেও তাই 'চন্দ্রমা অস্তমিত হইল। বিল্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল।' এছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অন্ধকারই কপালকুণ্ডলার সঠিক পরিপ্রেক্ষিত হয়েছে, শ্যামাসুন্দরী ওষধিচয়নের ক্ষেত্রেও বলেছে, 'ঠিক দুই প্রহর রাত্রে এলো চুলে তুলিতে হয়।'

চরিত্রটিতে এভাবে অন্ধকারে রাখার গূঢ় তাৎপর্য আছে বলেই আমরা মনে করি। কপালকুণ্ডলা কেবল যে বঙ্কিমচন্দ্রে কাল্পনিক সৃষ্টি তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় 'অর্ধেক কল্পনা তুমি, অর্ধেক মাধবী।' কপালকুণ্ডলা লেখকের একটি অর্ধস্ফুট তত্ত্বপত্র — সম্ভবত লেখকের কাছেও সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। সেইজন্য একটি রহসের মায়াজালে চরিত্রটিকে বরাবর তিনি রেখে দিতে চেয়েছিলেন। দিনের উজ্জ্বল আলোয় এনে ফেললে সে রহস্যজাল উন্মুক্ত হয়ে যায় বলেই প্রকাশ্য দিবালোকে চরিত্রটিকে তিনি কখনও আনেননি।

৭) প্রশ্ন দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটি কপালকুণ্ডলার কাহিনি সংক্রান্ত প্রশ্ন। আপনারা জানেন এটা আমরা আলোচনা করেছি ৫৫ নং এককে। সুতরাং সেখানেই এর উত্তর আছে। আপনরা ৫৫.৩ শীর্ষাঙ্কের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদটি একটু সংক্ষেপে ১০০ শব্দের মধ্যে লেখার চেষ্টা করলেই এর উত্তর হয়ে যাবে।

৮) [এই প্রশ্নের উত্তর আপনি সমস্ত আলোচনা পড়ে ঠিক যেরকম আপনার মনে হয়, সেইভাবেই দিতে চেষ্টা করবেন। আমার মতামত আমি উত্তরের মত লিখছি, এটি যুক্তিসংগত বিবেচনা করলে আপনি এটাও ব্যবহার করতে পারেন।]

যে নারীর লোকালয়ের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক না রেখে বড় হয়েছে, যৌবনে বিবাহ হলে সংসার ও দাম্পত্য জীবনকে সে ভালবাসতে ও গ্রহণ করতে পারবে কিনা এই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসা। এ বিষয়ে অনেক মতামত পেলেও বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যা সংগত মনে করেছেন সেই মত অনুযায়ীই উপন্যাসে চরিত্রটির পরিণতি দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রকৃতির মধ্যে বড় হওয়া মেয়ে চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সুখী হয়নি, দাম্পত্য জীবন কাকে বলে সে বোধও তার হয়নি। এমনিতে সংসার সম্পর্কে উদাসীন সে ছিলই, তার ওপর মতিবিবির কথা জানতে পেরে সংসারে থাকার ইচ্ছা তার একেবারেই লোপ পেয়ে যায় এবং পরে নাটকীয় পরিস্থিতিতে নবকুমার তাকে বধ করতে নিয়ে যাবার সময় দুর্ঘটনায় দুজনেই সমুদ্রে তলিয়ে যায়।

এই পরিরতি স্বাভাবিক মনে করা শক্ত, কারণ মতিবিবি এসে আবির্ভূত হলে পরিস্থিতি কী রকম দাঁড়াত সেটা পরের কথা, কিন্তু এক বছরের বেশি সময় নবকুমারের বিবাহিতা স্ত্রী হিসাবে সপ্তগ্রামে কাটাবার পরও সংসারে কোনরকম আসক্তি না জন্মানো খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। দাম্পত্য জীবন এবং যৌন জীবন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন, তবে তাদের কোন সন্তান সম্ভাবনা ঘটেনি, এটাও আমরা দেখেছি। কপালকুণ্ডলা লোকালয়ে না থেকেও নারীসুলভ করণাবৃত্তি যখন অর্জন করেছে তখন জৈব আকর্ষণ তার কেন গড়ে উঠবে না বোঝা শক্ত। তাই সংসার তার উৎসাহ জন্মানোটাই স্বাভাবিক ছিল, এরপর মতিবিবির প্রসঙ্গে কোনো নাটকীয় সিদ্ধান্তে লেখক নিলে সম্ভবত তা আমাদের আপত্তির কারণ হতো না।

৯) গ্রন্থের নাম 'কপালকুণ্ডলা' বলেই তাকে নায়িকা হিসাবে মেনে নিতে পারলে খুব ভাল হতো। বিশেষ করে মতিবিবি যখন কোনমতেই আদর্শনারী নয়, এমন একটি স্বৈরিণী নারীকে নায়িকার সম্মান দিলে অনেকেরই তা ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই যে, এই উপন্যাসের সবচেয়ে আকর্ষক নারী চরিত্র মতিবিবিই।

কপালকুণ্ডলার নাটকীয় আবির্ভাব, তার বন্য সৌন্দর্য, তার রহস্যময় চরিত্র আমাদের বিহ্বল করে সত্য, কিন্তু তাকে যেন আমরা ঠিক আমাদের ঘরের মেয়ে করে নিতে পারিনা — ঠিক যেমন পারেনি নবকুমার, পারেনি শ্যামাসুন্দরী। মতিবিবিকে ঘরের মেয়ে বা আপনজন ভাবা সম্ভব নয় ঠিকই, কিন্তু তাকে বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। আগ্রায় যে-জীবনযাত্রায় সে জড়িয়ে পড়েছিল সেটা অনভিপ্রেত হতে পারে, কিন্তু অস্বাভাবিক

নয়। পাঠানের হাতে লুণ্ঠিতা হয়ে যে-মেয়ে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয় তাকে নবকুমার গ্রহণ করে নি সামাজিক বিধিনিষেধের জন্যই, কিন্তু আধুনিক পাঠক হিসাবে একথা আমরা নিশ্চয়ই অনুভব করি যে তাতে মতিবিবির নিজের দোষ কিছু ছিল না। এরপর ক্ষমতালোভী, বিবেকবর্জিত পিতার হাতে পড়ে যা হতে হয়েছে তাকে, তাতেও নিজের কোন হাত ছিল না তার। আগ্রার ক্ষমতার লড়াইয়ে টিকতে না পেরে এবং অবশ্যই সুপ্ত দাম্পত্যপ্রেম মনে জাগ্রত হওয়ায় যে-স্ত্রীলোক সপ্তগ্রামে ফিরে এসেছে, তার আচরণকে আমরা নিন্দা করতে পারি, কিন্তু তার অধিকারবোধকে অস্বীকার করতে পারিনা।

তাই জীবনে অভাবিত সুযোগ পেয়ে গিয়েও যে তার অধিকারকে কোনদিন বুঝতেই শিখল না, তার বদলে ভাগ্যবিড়ম্বিত এক নারীর অধিকার ফিরে পাবার সংগ্রামকে — হোক না তা অসুন্দর উপায়ে, আমাদের মনে মনে সমর্থন না করে কোন উপায়ই থাকে না। মতিবিবি অবশ্যই উজ্জ্বলতর চরিত্র।

১০) চরিত্র আমরা আলোচনা করেছি ৫৫.৯ নং এককে। তাই সেখানে ৫৫.৯.৪ শীর্ষক আলোচনা সংক্ষেপে লিখতে পারেন। আমরা বৃদ্ধের চরিত্র আলোচনা করিনি, পেষমনও না; আপনি সে বিষয়েও আপনার মতামত সংযোজিত করতে পারেন।

১১) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ইতিহাস তো আছেই, মুঘল ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ই সেখানে ধরা পড়েছে। তা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি কারণে একে 'ঐতিহাসকি উপন্যাস' আমরা বলতে পারবো না। কারণগুলি উল্লেখ করলেই আমরা এরকম সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছি তা বোঝা যাবে।

ক) সমগ্র উপন্যাসটি পড়লে এবং এই উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কেন উৎসাহিত হয়েছিলেন তা জানা থাকলে, আমরা বুঝতে পারি, মতিবিবির আগ্রার জীবনবৃত্তান্ত নয়, নির্জন সমুদ্রতীরে কাপালিকের লালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলাই এই উপন্যাস রচনার প্রাথমিক কারণ এবং প্রধান আকর্ষণের বস্তু। সেই হিসাবে একে কাব্যিক রোমান্সের পর্যায়ভুক্ত করাই অধিকতর সংগত।

খ) ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস থেকেই চরিত্র সংগৃহীত হয়, কিছু কাল্পনিক চরিত্রও থাকতে পারে। এই উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের যোগাযোগ যেটুকু সেখানে মতিবিবি বা নবকুমার কেউই ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। ঐতিহাসিক যেসব চরিত্র অতি স্বল্পকালের জন্য উপন্যাসে এসেছে তাদের চরিত্র নির্মাণে কোনো উৎসাহ লেখকের ছিল না।

গ) ঐতিহাসিক উপন্যাসে একটা ঐতিহাসিক পটভূমি নির্মাণ করতে হয়, এখানে যে-পটভূমির প্রতি লেখকের উৎসাহ বেশি তাকে ভৌগোলিক বলা যায়, ঐতিহাসিক নয়।

ঘ) সমগ্র উপন্যাসের এক-চতুর্থাংশ মাত্র, অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ড ইতিহাসের পটভূমিতে রচিত, মতিবিবিকে আশ্রয় করেই ইতিহাস এই উপন্যাসে কিছুটা স্থান পেয়েছে — সেই চরিত্রটিও উপকাহিনীর অন্তর্গত। সুতরাং ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত এই উপন্যাসে থাকলেও একে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা কখনোই সংগত নয়।

একক ৫৬ ❑ লেখক-পরিচিতি - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গঠন

৫৬.১ উদ্দেশ্য
৫৬.২ প্রস্তাবনা
৫৬.৩ লেখকের ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক ঐতিহ্য
৫৬.৪ লেখকের শিল্পমানস
৫৬.৫ লেখকের সামগ্রিক উপন্যাস তালিকা
৫৬.৬ সারাংশ
৫৬.৭ অনুশীলনী
৫৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৫৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর আবির্ভাব পর্ব ও তাঁর পারিবারিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- লেখকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও নানা শখ-নেশা-আগ্রহ সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- লেখকের জীবনের নানা সংকট এবং বিপন্ন মানসিকতার কারণটি বুঝতে পারবেন।
- লেখকের সামগ্রিক সাহিত্যসৃজন এবং তাঁর ব্যক্তিজীবনের গতিপরিবর্তন কিভাবে তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাবেন।

৫৬.২ প্রস্তাবনা

মাত্র আটচল্লিশ বছরের জীবন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর জন্ম ১৯শে মে, ১৯০৮ আর জীবনসমাপ্তি ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৫৬। সৃজনক্ষম, প্রতিভাধর, মানুষের পক্ষে এই ব্যাপ্তিকাল মোটেই পর্যাপ্ত নয়। তবু এই সময়ের মধ্যেই উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ ইত্যাদি নানা ধারায় স্বকীয়তায় উজ্জ্বল রচনার এক বিশাল সম্ভার তিনি রেখে গেছেন। সাহিত্যে ভাবালুতা বর্জনের ব্রত নিয়ে এক ব্যতিক্রমী, বিরল সাহিত্যব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এই অল্প সময়েই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জীবন ও প্রতিভা আমাদের মনে পড়ায় আরও একজন বিরল প্রতিভাধারী বাঙালী সাহিত্যিক মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা। দুজনেরই বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে বাংলাসাহিত্যে ধূমকেতুর মতো এসে পড়া, সমকালীন সাহিত্যিকদের অতিক্রম করে জীবনদৃষ্টিকে অনাগত ভবিষ্যতে প্রসারিত করা, দারিদ্র ও অসুস্থতার সঙ্গে আমৃত্যু সংগ্রাম, তীব্র মদ্যাসক্তি এবং অপ্রত্যাশিত সংক্ষিপ্ত জীবৎকাল — এক অদ্ভুত ঘটনাচক্রের যোগাযোগ বলে আমাদের মনে হয়। বাংলাসাহিত্যকে প্রথানুগত্যের পথ থেকে ভিন্ন পথে চালিত করার কৃতিত্বও তাঁদের উভয়েরই প্রাপ্য।

তবে মধুসূদন সমাজবদলের কোনো স্বপ্ন চোখে নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি, যা তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে মানিকের চোখে ছিল। দারিদ্র্য থেকে কঠোর পারিশ্রমের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত উন্নীত হওয়া পিতার সন্তান মানিক আপসহীন মনোভাবে বরণ করে নিয়েছিলেন সেই দারিদ্র্যকেই অর্থ-হীন গণমানুষের কথা বলতে গিয়ে তিনি নিজেও নিজেকে সেই অগণিত সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদেরই একজন করে তুলেছিলেন। গণসাহিত্য রচনার উদ্দেশয এ ছিল তাঁর এক সচেতন আত্মবিলোপ-প্রচেষ্টা। বিত্ত-কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠার প্রতি কোনো মোহ তাঁর ছিল না, বরং তাঁর সৃজন, বিশ্বাস এবত জীবনাদর্শ গড়ে উঠেছিল একান্তভাবে মানবীয় সমাজপ্রবাহের গতিবদলের আশা নিয়ে।

৫৬.৩ লেখকের ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক ঐতিহ্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম সাঁওতাল পরগণার দুমকায় হলেও তাঁর পরিবারের আদি নিবাস ঢাকার বিক্রমপুরে। তাঁর পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক জীবিকা ছিল পৌরোহিত্য। অনিয়মিত আয় এবং অত্যন্ত অর্থকষ্টের মধ্যেও বি. এ. পাশ করে, প্রথমে শিক্ষকতা এবং পরে সেটেল্‌মেন্ট বিভাগের কানুনগো হিসাবে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা এবং অন্যান্য বহু জায়গায় বদলির চাকরিতে বহাল হয়েছিলেন। তাঁর আট পুত্র এবং ছয়টি কন্যাসন্তানের মধ্যে মানিক ছিলেন পঞ্চম পুত্র।

মানিগের ভালো নাম ছিল প্রবোধকুমার। জীবনের প্রথম গল্পটি প্রকাশের সময় তিনি আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে ভালো নাম না দিয়ে ডাকনাম 'মানিক' ব্যবহার করেছিলেন। আকস্মিকতা এবং ভাগ্য শেষপর্যন্ত তাঁকে এই নামেই প্রতিষ্ঠা এনে দিল, প্রবোধকুমার নামটিই গেল হারিয়ে।

শৈশবে মানিক ছিলেন হাসিখুশি, চঞ্চল-নির্ভীক, প্রাণবন্ত। দুরন্তপনার সাথে সাথে ক্রমশঃ তাঁর চরিত্রে স্পষ্ট হতে লাগল জেদ এবং অদ্ভুত এক সহনশীলতা। পিতার বদলির চাকরির কারণে কোথাও দীর্ঘদিন থাকা হয়নি, লেখাপড়াও হয়নি খুব বাঁধাবাঁধি নিয়মে। ফলে তাঁর স্কুলজীবনটা বেশ ছন্নছাড়া বলা যায়। পড়াশুনার চেয়ে খেলার ঝোঁকই ছিল তাঁর বেশী। এই পর্বের কথা বলতে গিয়ে মানিক পরে লিখেছেন —''আমার স্বভাব ছিল ভারি মন্দ। একদিকে যেমন ভালবাসতাম লাল ধুলোভরা সহরের নোংরা পুরানো ঘিঞ্জি লোকালয়, মোটেই হিসাব থাকতনা যে যাদের সঙ্গে মিলছি-মিশছি খেলাধুলো হৈ চৈ করছি তারা বয়সে বড় অথবা ছোট, সংসারের মাপকাঠিতে ভদ্র অথবা ছোটলোক, - তেমনি ভালবাসতাম সহরের আশেপাহে শুধু কয়েকটা কুঁড়েঘর নিয়ে গড়া ছোট-ছোট গ্রাম, বর্ষার ভরা আর শীতের শুকনো নদী, ফাঁকা মাঠ আর বুনো গাছের জাম এবং ছড়ানো সবুজ শালের ঐ বন।''

মানিকের প্রথম শিক্ষারম্ভ কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে, তাঁর বড়দা, পরবর্তীকালের বিখ্যাত আবহতত্ত্ববিদ সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু চাকরির কারণে তিনি কলকাতার বাইরে চলে যাওয়ায় শেষপর্যন্ত পিতার কাছেই মানিককে ফিরে যেতে হয় এবং কখনও টাঙ্গাইল, কখনও মহিষাদল বা ব্রাহ্মণবেড়িয়া বা মেদিনীপুরের নানা স্কুলে ঘুরে শেষ পর্যন্ত তাঁর ১৯২৬ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করায় এই ছন্নছাড়া স্কুলজীবন শেষ হয়। এরপর বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ন কলেজ থেকে ১৯২৮ সালে আই. এস. সি পরীক্ষা পাশ করেন। এই মিশনারী কলেজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মানিক পরে লিখেছেন —জ্যাকসন নামে এক অধ্যাপকেরকাছে বাইবেল পড়ে তিনি সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হন। ধর্ম বিষয়ে সকলরকম গোঁড়ামি দূর হয়ে যাওয়ার কারণ হিসাবেও তিনি অধ্যাপক জ্যাকসন এবং বাইবেলের প্রভাবের কথা স্বীকার করেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে তাঁর পিতা হরিহর

বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও স্মর্তব্য। তিনিও কৈশোরে যজমানবৃত্তির আরোপিত দায় কাঁধে তুলে, হিন্দুধমের আনুষ্ঠানিক প্রথা-প্রকরণের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, সেগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেই সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁর আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কিত তিক্ত মন্তব্যই তাঁর যুক্তিবাদী মনকে আমাদের কাছে প্রকট করে তোলে।

১৯২৮ সালে মানিক প্রেসিডেন্সী কলেজে অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি. এস. সিতে ভর্তি হলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের মন্তব্য — ''অঙ্কের মত এমন আর কি আছে? এত জটিলতার এমন চুলচেরা নিয়ম। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা ত অভিনব কাব্য — ছ্যাবলামি, নেকামি, হাল্কা ভাবপ্রবণতার চিহ্নও নেই।'' সত্যিই তিনি প্রাণমন দিয়েই এই বিজ্ঞানশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণপ্রিয়তা তাঁর পরবর্তীকালের সাহিত্য কর্মেও প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই স্নাতকপর্ব শেষ করার আগেই 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তাঁর 'অতসীমামী' গল্প প্রকাশিত হয়। যে গল্পের সৃষ্টি এবং মুদ্রিত প্রকাশ নিতান্তই খেলার ছলে বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি ধারা ফলশ্রুতি হিসাবে, সেই গল্পই ঘুরিয়ে দিল মানিকের জীবনের মোড়। একাধিকবার চেষ্টা করেও মানিক বি. এস. সি. পাশ করলেন না। কারণ তাঁর মন তখন সাহিত্য-সৃষ্টির নেশায় বুঁদ হয়ে উঠেছে। অভিভাবকদের কাছ থেকে তাঁর উপরে বহুবার চাপ এসেছিল — মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ ছেলের মত গ্র্যাজুয়েট হয়ে, কোনো চাকরি নিয়ে, সুস্থিত আর্থিক অবস্থায় নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করার জন্য। কিন্তু তাঁর সুপ্তোত্থিত শিল্পীমন আর কোনোদিনই সেই বাঁধাজীবনের ঘেরাটোপে আত্মসমর্পন করেনি।

স্বভাবের দিক থেকে মানিক ছেলেবেলায় যেমনই ছিলেন দুরন্ত, খেয়ালী, পরিণত বয়সে এসে তিনি তেমনই হয়ে উঠলেন নির্জন প্রকৃতির মানুষ। তাঁর সম্পর্কে তাঁর সুহৃদ-স্বজনদের লেখায় ফুটে ওঠে কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আত্মশক্তি সচেতন, বেপরোয়া একজন মানুষের রেখাচিত্র। এই খেয়ালি ঔদ্ধত্যের পাশাপাশি তাঁর রহস্যময় ঔদাসীন্যের মিশেল দেওয়া স্বভাব তাঁকে তাঁর চারপাশের মানুষদের থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিল। এই অনন্যতা তাঁর সৃষ্টিসম্ভারকেও সমকালীন লেখকদের রচনার থেকে করে রেখেছিল আলাদা। মাত্র ষোল বছর বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। ফলে তাঁর দুরন্ত কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল বল্‌গাহীন বেপরোয়া উদ্দাম জীবনচর্চায়। সাহিত্যজীবনেও মানিক তাঁর জননী প্রসঙ্গে আশ্চর্যরকম নীরব; যদিও তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নামই 'জননী'। শৈশবসংক্রান্ত যাবতীয় স্মৃতিচারণায় তাঁর মাতৃপ্রসঙ্গ গৌণ হলেও পিতৃপ্রসঙ্গ কিন্তু যথোচিত প্রাধান্য নিয়েই উপস্থিত হয়েছে। তাঁর পিতার প্রতি অপরিসীম ভক্তি ত শ্রদ্ধার প্রকাশ তাঁরই লেখা একটি চিঠিতে এইভাবে হয়েছে—''পিতা হিসাবে আপনি শুধু আমার নমস্য নয়, লাখ লাখ লোকের নমস্য হয়ে রইলেন। বিক্রমপুরের গাঁয়ের একটি ছেলে কোনমতে বি. এ. পাস করে যে সুধাংশু আর মানিককে সৃষ্টি করতে পারে — একই বংশে বৈজ্ঞানিক আর সাহিত্যিক সৃষ্টি করতে পারে, এ গৌরব বাংলার একমাত্র আপনি পেয়েছেন।'' কিন্তু এই শ্রদ্ধা বা ভক্তি তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতাকে লাগাম পরিয়ে বশ করতে পারেনি। কুড়ি বছর বয়স থেকে নিরন্তর সাহিত্যসৃজন, ত্রিশ বছর বয়সে বিবাহ, চারটি পুত্রকন্যার পিতৃত্ব, ১৯৪৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান তাঁর জীবনের ইতিবাচক ঘটনা। তাঁর রচনার সাফল্যের উপযুক্ত আর্থিক প্রতিদান না পেলেও সুহৃদজনের গুণমুগ্ধতা, সমাদর এবং অগণিত মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা তিনি যথেষ্টই পেয়েছিলেন। কিন্তু আশৈশব বেহিসাবী মানিক জীবনকে নিয়ে অনেকসময়ই এমন হেলা খেলা করেছেন, যার ফলে শরীরে প্রবেশ করেছিল দুরারোগ্য ব্যধি, যার থেকে তিনি মুক্তি পাবার জন্য ডুব দিলেন সুরাসক্তিতে। সারা জীবন, আটভাই ছয়বোনের অন্তর্গত একজন মানুষের ক্ষেত্রে, উপযুক্ত স্নেহ ও পরিচর্যার অভাবই তাঁর জীবনের বিপর্যয়ের ভিত্তি নির্মাণ করেছিল। তবুও জীবনের কোনো রোগ, দারিদ্র্য, বিপর্যয়ই তাঁকে তাঁর স্বেচ্ছানির্মিত ঔদাসীন্যের দুর্গ থেকে বার করে আনতে পারেনি। ব্যক্তিগত

ডায়েরির পাতায় তাঁর বিপর্যস্ত দেহমনের নানাপ্রকার অভিজ্ঞতার কথাকে তিনি শাব্দিক রূপ দিয়ে গিয়েছিলেন, যার থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠজন যুগান্তর চক্রবর্তীর সিদ্ধান্ত — তিনি ''অতিজীবী ও মরণশীল, অকালমৃত ও ইহকালীন। মৃত্যুর পর এতগুলি বছর একাদিক্রমে যিনি আমাদের সমসাময়িক, অথচ এখানো পর্যন্ত অপ্রকাশিত।''

['অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' - সম্পাদনা ঃ যুগান্তর চক্রবর্তী]

৫৬.৪ লেখকের শিল্পীমানস

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পারিবারিক ইতিহাসকে সমাজতত্ত্বের দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে গেলে এইভাবে আমরা বলতে পারি — গ্রামনির্ভর, সামন্ত সভ্যতাপুষ্ট, প্রাচীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাজাত, ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক মধ্যবিত্তশ্রেণীতে রূপান্তর। আমাদের এই জাতীয় রূপান্তরে একদিকে যেমন প্রাচীনধারার অংশবিশেষ অন্ততঃ কিছুটা হলেও আমাদের মধ্যে মিশে থাকে, অন্যদিকে নূতনতর জীবনের আধুনিক ও উদার মনস্বতা আপাতভাবে হলেও আমাদের প্রভাবিত করে। মানিকের জীবনেও এইভাবে যেমন প্রাচীন মূল্যবোধ তাঁকে তাঁর পারিবারিক সীমায় আবদ্ধ করে রেখেছিল, তেমনি ফ্রয়েড এবং মার্ক্স তাঁকে নব্য মানবতায় দীক্ষিত করে সমগ্র মানবজীবন সম্পর্কে এক নিরপেক্ষ, বৈজ্ঞাকি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তার ফলে তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয় যে চিন্তা, দৃষ্টিকোণ, বিশ্লেষণ পদ্ধতি — তার স্বরূপ একান্তভাবে অভিনব। বাংলা সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতার যে রূপায়ণ তাঁর হাতে হয়েছে, তার তীক্ষ্ণতা এবং গভীরতা তাঁর সমকালে তো বটেও, অদ্যাবধি বিরল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হবার অব্যবহিত আগের যুগ — 'কল্লোল' পর্ব নামে চিহ্নিত। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লেখকবর্গের বৈশিষ্ট্যকে এককথায় সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা বাতুলতা। তবুও সংক্ষেপে একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে তাদের পরিধিকে চিহ্নিত করা যায় এইভাবে —রবীন্দ্রবলয়মুক্ত হয়ে, এদেশীয় প্রথাগত সাহিত্যধারার প্রভাব এড়িয়ে বাংলা সাহিত্যে নতুন কোনো স্রোত বইয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন এই গোষ্ঠী। পশ্চিমী সাহিত্য এঁদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব, রুশবিপ্লব, বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী ধ্বংসলীলার সঙ্গে। কিছু পরবর্তীকালের দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ দেশভাগের অভিজ্ঞতাও এঁদের হয়েছিল। কিন্তু এতগুলি দেশী-বিদেশী ঘটনার যে মানবিক আবেদন, যা একজন সচেতন শিল্পীকে সমাজ পরিবর্তনের নির্মোহ স্বপ্নগঠনে উদ্বুদ্ধ করে, তা এঁদের উপর তেমনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। একমাত্র ফ্রয়েড তাঁদের কাছে কিছুটা গ্রহণযোগ্য হয়েছিলেন।

এই ধারার থেকে কিছুটা বিমুক্ত হয় অন্যপথ অণ্বেষণ করেছিলেন জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকবর্গ। তাঁদের রচনায় মানবতার আবেগ যথেষ্টই ছিল। গল্পে ও উপন্যাসে যে বাস্তবতাকে তাঁরা রূপায়িত করেছিলেন, তাও বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু লক্ষণীয় — যথেষ্ট শক্তিমান লেখক হওয়া সত্ত্বেও এঁরা কেউই মানবতাকে সমাজ পরিবর্তনের প্রকরণ হিসাবে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

এঁদের সঙ্গে এইখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্থক্য। তাঁর প্রথম দিককার কিছু রচনা বাদ দিলে, অন্ততঃ চল্লিশের দশক শেষ হবার আগে থেকেই আমৃত্যু তিনি যা কিছু লিখেছেন, তার নেপথ্যে একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য

তাঁর ছিল। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে সচেতনভাবে সমাজ পরিবর্তনের একটি হাতিয়াররূপে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা যত ব্যাপক ও গভীর হয়েছে, ততই তিনি মানুষের বেদনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। স্মৃতিচারণ করতে বসে এ প্রসঙ্গে তিনি 'লেখকের কথা' রচনায় বলেছেন—''ছেলেবেলা থেকেই গিয়েছিলাম পেকে। অল্পবয়সে 'কেন' রোগের আক্রমণ খুব জোরালো হলে এটা ঘটবেই। ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মাচ্ছিল নীচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সঙ্গে। ....মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের শত শত আশা আকাঙ্খা অতৃপ্ত থাকার শত শত প্রয়োজন না মেটার চরম রূপ দেখতে পেতাম নিচের তলার মানুষের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনে।'' এইখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর স্পষ্ট কোনো সামঞ্জস্য সাধন বা সমাধান খোঁজার চেষ্টা। বিভেদ জর্জরিত এই সমাজকে বদলে এমন এক সমাজের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, যেখানে শ্রেণিবৈষম্য সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে এক অখণ্ড, সামগ্রিক মানবতার উন্মেষ ঘটবে। তাঁর পূর্বসুরী বা সমকালীন লেখকদের সঙ্গে এইখানেই তিনি পৃথক। মানিকের ক্ষেত্রে এই মানবতা মার্ক্স-প্রদর্শিত পথে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছিল।

শুধু তাই নয়, এঁদের সঙ্গে মানিকের আরও তফাৎ এই যে, মানিক শুধুমাত্র সাহিত্যের অঙ্গনেই সমাজ পরিবর্তনের জন্য কাজ করেননি, জীবনের এলাকাতেও সমাজ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যকে জয়যুক্ত করার জন্য ব্রতী হয়েছিলেন। ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হয়ে, একজন নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক দলীয় কর্মীর মতই দলের সমস্ত শৃঙ্খলাবিধি, কর্তব্য কর্মের নির্দেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন। এই অনুশীলনেরই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যকর্মেও। তাঁর প্রথম দিককার রচনায় ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের প্রতি অনুরক্তিবশতঃ যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, পরবর্তীকালের লেখায় তা বহুল পরিমাণে মন্দীভূত হয়েছিল এবং তাঁর লেখার ধারা অনেকবেশী সহজ, সরল ও বহির্মুখী হয়ে উঠেছিল। তিনি নিজেই তাঁর অন্তর্জগতের এই বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথায় ('লেখকের কথা') বলেছেন —''মার্ক্সবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে যে, আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানী করেছি, জীবন ও সাহিত্যকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভালবেসেও, জীবন ও সাহিত্যকে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও।'' এই আত্মসমীক্ষা তাঁকে এক কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল — ''আমার অর্ধেক জীবনের সাধনা কি বাতিল গণ্য করতে হবে?'' কিন্তু মার্ক্সবাদের শিক্ষাই তাঁকে আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করেছিল। আত্মসমীক্ষায় বসে তিনি অনুভব করেছিলেন — নেহাত শখের খাতিরে, নাম করা লেখক হবার লোভে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করতে বসেননি। জীবন সম্পর্কে তাঁর যে সহমর্মী দৃষ্টিভঙ্গী, তা-ই তাকে এগিয়ে দিয়েছিল মানুষের কথা বলতে। তাই তিনি উৎসাহী হয়েছিলেন চাষা, মাঝি, কুলি, মজুরদের কাহিনী রচনায়। তথাকথিত 'ছোটলোক'-রা তাই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে। তিনি কামনা করেছিলেন — ভদ্রতার মেকি খোলস খুলে সবাই যেন শ্রমজীবী, সঙ্ঘবদ্ধ, 'ছোটলোক' হয়, এমনই এক পরিণামের। সেই উদ্দেশ্যেই শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শোষণের মূল ব্যাধিগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণে তিনি নিজেকে গভীরভাবে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁর সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টিই সমাজ বদলের স্বপ্নের পাদমূলে উৎসর্গিত হয়েছিল।

৫৬.৫ লেখকের সামগ্রিক উপন্যাস তালিকা

মানিক-সাহিত্য বাংলাভাষায় ফ্রয়েডবাদ থেকে মার্ক্সবাদে উত্তরণের এক মহোজ্জ্বল, 'শৈল্পিক প্রতিরূপক'। তাঁর উপন্যাসগুলিকে প্রাক্-মার্ক্সীয় এবং মার্ক্সবাদ-প্রভাবিত এই দুটি ধারায় শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। উপন্যাস লেখা

তিনি শুরু করেন ১৯৩৫ সালে আর মৃত্যুর বছরও (১৯৫৬) তিনটি উপন্যাস লেখেন। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর লেখা কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। কালানুক্রমিকভাবে উপন্যাসগুলি হল ঃ

'জননী' (মার্চ ১৯৩৫), 'দিবারাত্রির কাব্য' (ডিসেম্বর ১৯৩৫), 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'পদ্মানদীর মাঝি' (মে ১৯৩৬), 'জীবনের জটিলতা' (নভেম্বর ১৯৩৬), 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' (জুলাই ১৯৩৮), 'সহরতলী', ১ম পর্ব (জুলাই ১৯৪০), 'সহরতলী' ২য় পর্ব (১৯৪১), 'অহিংসা' (১৯৪১), 'ধরাবাঁধা জীবন' (১৯৪১), 'প্রতিবিম্ব' (১৯৪৩)।

১৯৪২ সাল থেকে মার্ক্সবাদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৪৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হন। এর পরবর্তীকালে তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসগুলি—

'দর্পণ' (জুন ১৯৪৫), 'সহরবাসের ইতিকথা' (ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬), 'চিন্তামণি' (জুলাই ১৯৪৬), 'চিহ্ন' (জানুয়ারী ১৯৪৭), 'আদায়ের ইতিহাস' (১৯৪৭), 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮), 'জীয়ন্ত' (জুলাই ১৯৫০), 'পেশা' (১৯৫১), 'স্বাধীনতার স্বাদ' (জুন ১৯৫১), 'সোনার চেয়ে দামী', ১ম খণ্ড (জুন, ১৯৫১), 'ছন্দপতন' (১৯৫১), 'সোনার চেয়ে দামী', ২য় খণ্ড (১৯৫২), 'ইতিকথার পরের কথা' (আগস্ট, ১৯৫২), 'পাশাপাশি' (সেপ্টেম্বর, ১৯৫২), 'সার্বজনীন' (সেপ্টেম্বর, ১৯৫২), 'আরোগ্য' (মে, ১৯৫৩), 'নাগপাশ' (১৯৫৩), 'তেইশ বছর আগে পরে' (অক্টোবর, ১৯৫৩), 'চালচলন' (১৯৫৩), 'শুভাশুভ' (অক্টোবর, ১৯৫৪), 'হরফ' (মে, ১৯৫৫), 'হলুদ নদী সবুজ বন' (ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬), 'মাশুল' (অক্টোবর ১৯৫৬), 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান' (ডিসেম্বর, ১৯৫৬), 'মাটিঘেঁষা মানুষ' (অসমাপ্ত ১৯৫৭), 'শান্তিলতা' (আগস্ট, ১৯৬০), 'মাঝির ছেলে' (১৯৬০)।

সর্বমোট ছত্রিশটি উপন্যাস মানিকের সাহিত্যিক জীবনের ফসল। এগুলির বিষয়বস্তু যেমন বিচিত্র এবং ব্যাপক, দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকেও তেমনি বৈচিত্রপূর্ণ, যা তাঁর সৃজনক্ষমতার গভীরতারই পরিচায়ক।

৫৬.৬ সারাংশ

স্বল্পায়ু হয়েও শক্তিমান সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা উপন্যাস ধারায় একটি স্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছেন। পিতার স্বল্প উপার্জন, বদলির চাকরি, তাঁর বহু সন্তানের মধ্যে একজন হওয়া এবং কৈশোরে মাতৃবিয়োগ মানিকের জীবনে অনাদর, অনিশ্চয়তা ও অনিয়মিত শিক্ষার সংকট ঘনিয়ে নিয়ে আসে। উপরন্তু মৃগীরোগ এবং মদ্যাসক্তি পরিণত বয়স থেকেই র্তার নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল। এহেন অস্থির জীবনপ্রক্রিয়ার মধ্য থেকেই নিষ্কাশিত হয়ে আসে তাঁর সমগ্র জীবন-অভিজ্ঞতার সারাৎসার — তাঁর আটত্রিশটি উপন্যাস।

বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে মানিক চিরকালই জীবনকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন বৈজ্ঞানিক যুক্তি, নিরাবেগ এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে। কঠোর ব্যক্তিত্ব, আত্মশক্তি সচেতনতা, বেপরোয়া মনোভাব তাঁকে পরিণত বয়সে করে তুলল এক নির্জন প্রকৃতির মানুষ। তাঁর এই স্বভাবের অনন্যতাই তাঁর সৃষ্টিসম্ভারকেও সমকালীন অন্যান্য লেখকদের রচনার থেকে করে রেখেছিল আলাদা। কুড়ি বছর বয়স থেকে নিরন্তর সাহিত্যসৃষ্টি, ত্রিশ বছর বয়সে বিবাহ, চার পুত্রকন্যার পিতৃত্ব, ১৯৪৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান তাঁর জীবনের কয়েকটি ইতিবাচক ঘটনা। তবে সৃজনক্ষেত্রে তাঁর জনপ্রিয়তা যতখানি, ততখানি আর্থিক প্রতিদান না পাওয়ায় দারিদ্র্য তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী হয়েছিল।

তবে এই দারিদ্রের কারণে তিনি কখনও স্বধর্মচ্যুত হননি। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে সচেতনভাবে সমাজ পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা যত ব্যাপক ও গভীর হয়েছে, ততই তিনি মানুষের বেদনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। জীবন যন্ত্রণার দহনে অস্থির, দারিদ্র্যবঞ্চনা সহানুভূতিহীনতায় পীড়িত, ক্লিষ্ট মানুষের মুখগুলি তাঁর লেখকসত্তাকে নাড়া দিয়েছিল। এই অবস্থার জড় অন্বেষণ করতে গিয়ে তিনি তাঁর বিজ্ঞানচর্চা ও নির্মোহ দৃষ্টিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর সাহিত্যে স্পষ্ট কোনো সামঞ্জস্যসাধন বা সমাধান খোঁজার চেষ্টা। এ বিষয়ে তাঁর একহাতে ছিল মার্ক্সবাদ, অন্যহাতে ফ্রয়েডীয় মতবাদ। তিনি বিশ্বাস করতেন — 'সাহিত্যে মানুষের জন্য।' আত্মসমীক্ষায় বসে তাই তিনি বলতে পারেন — নেহাত শখের খাতিরে, নামকরা লেখক হবার লোভে তিনি সাহিত্যসৃষ্টি করতে বসেননি। সেই কারণেই মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র-শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রতি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শোষণের মূল ব্যধিগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণে তিনি নিজেকে গভীরভাবে নিয়োজিত রেখেছিলেন তাঁর সাহিত্যকর্মে। তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টিকর্মে এই মহৎ উদ্দেশ্যই বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে।

৫৬.৭ অনুশীলনী

১) লেখকের ব্যক্তিগত প্রবণতা তাঁর রচনায় কোন বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে কি না — এই প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর উপন্যাসগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

২) বাংলা সাহিত্যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সমকালীন যুগের প্রবণতা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। (৫০০ শব্দের মধ্যে)।

৩) সমকালীন লেখকবর্গের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার অভিনবত্ব কোথায় তা চিহ্নিত করুন। (১০০০ শব্দের মধ্যে)।

৪) সমাজ পরিবর্তনের যে স্বপ্ন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছিলেন, তার উৎস ছিল তাঁর নিজের পারিবারিক জীবন —এই মন্তব্যের সত্যতা বিচার করুন। (১০০০ শব্দের মধ্যে)।

৫৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি

ডঃ নিতাই বসু ঃ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* ফাল্গুন ১৩৬৮, ফসল প্রকাশনী, সালকিয়া, হাওড়া।

ডঃ সরোজমোহন মিত্র ঃ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও সাহিত্য,* গ্রন্থালয়, ক'লকাতা।

ডঃ লিলি দত্ত ঃ *জীবনশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* উত্তরণ, কলকাতা।

নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত ঃ *মানিক সাহিত্য সমীক্ষা,* পুস্তকবিপনি, ক'লকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* দে'জ পাবলিশিং, ক'লকাতা।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* মর্ডান বুক এজেন্সী, ক'লকাতা।

সরোজ দত্ত ঃ *ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬*

Nirmal Kanti Bhattacharya : *Manik Bandopadhyay : A Centenary Tribute in the Indian Literature, Nov/Dec. 2008.*

একক ৫৭ ❑ কাহিনি-পরিচিতি

গঠন

৫৭.১ উদ্দেশ্য

৫৭.২ প্রস্তাবনা

৫৭.৩ কাহিনির বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ

৫৭.৪ আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে পরিচিতির প্রাসঙ্গিকতা

৫৭.৫ রোমান্টিকতার প্রভাব ও অস্তিত্ব

৫৭.৬ সারাংশ

৫৭.৭ অনুশীলনী

৫৭.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৫৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের রচনাপর্বে লেখকের বিশেষ মানসিকতার পর্বটিকে বুঝতে পারবেন।
- সমকালীন বাংলা উপন্যাসধারায় এই রচনাটির বিশিষ্টতা কিভাবে নির্ধারিত হতে পারে তা সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন।
- এই উপন্যাসের কাহিনিসূত্রটিকে সংক্ষেপে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- আঞ্চলিকতা এই উপন্যাসে বিশিষ্ট ধর্ম কি না তা বুঝতে পারবেন।
- রোমান্টিকতার কোনো চিহ্ন এই উপন্যাসে আছে কি না তা বিচার করতে পারবেন।

৫৭.২ প্রস্তাবনা

'পদ্মানদীর মাঝি'তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা ভয়াল, দুরন্ত নদীর প্রেক্ষাপটে দরিদ্র জেলেদের জীবন ও জীবিকার কথা শুনিয়েছেন। নদী পদ্মা ও তার তীরবর্তী অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষগুলি এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। জেলেদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম ও অপ্রেম — সবই যেন খেয়ালি পদ্মার মেজাজ-মর্জির উপর নির্ভরশীল। বর্ষার মরশুমে ইলিশ মাছের কৃপায় তাদের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আসে, সাময়িক স্বচ্ছলতা দেখা দেয়। তারপর সারাবছর নিশ্ছিদ্র দারিদ্র্য, হোসেন মিয়ার কৃপালাভ এবং তার কাছেই অচ্ছেদ্য ঋণজালে জড়িয়ে পড়া এই ধীবরশ্রেণীর অনিবার্য নিয়তি। লেখক সামাজিক দিক থেকে পূর্ববঙ্গের এই বিশিষ্ট মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে দেখতে চেয়েছেন। তাই এই উপন্যাসে তাদের অর্থনৈতিক নিস্পেষণে অসহায়তা, অশিক্ষাজনিত নানা কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, বেঁচে থাকবার তাগিদেই অবধারিত নীচতা এবং স্বীয়ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞতাজাত এক অদ্ভুত হীনমন্যতা বিশেষ প্রাধান্য নিয়ে রূপায়িত হয়েছে।

৫৭.৩ কাহিনির বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ

কুবের এই উপন্যাসের নায়ক। সে জানে, ‘গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশী ছোটলোক।’ তার মতো মানুষদের বঞ্চিত করার অধিকার তাই সকলের। সামাজিক বা ধর্মীয় আর পাঁচটা নিয়মের মতো এই অধিকারটাও সে এক অমোঘ প্রথা হিসাবে নিজের জীবনে স্বীকার করে নিয়েছে। প্রতিবাদ করার কোনো চেষ্টা তার নেই। সবাই যাকে অন্যায় শোষণ বলে জানে মুখ ফুটে তা প্রকাশ করার কোনো ইচ্ছাই তাই তার মধ্যে দেখা যায় না। অর্থনৈতিক পীড়ন কুবেরের মতই গণেশঃ ধনঞ্জয়, রাসু, যুগল, পীতম ইত্যাদি সকলকেই সমাজের এক পঙ্কিল আবর্তে ঠেলে দিয়েছে। এরা সকলেই জেলাপাড়ার সংকীর্ণ পরিসরে আদিম অন্ধকারময় জীবনে অভ্যস্ত। এদের যা কিছু বীরত্ব ও আস্ফালন, ক্রোধ ও উত্তেজনা — তার সবটাই ঘটে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাতে। কিন্তু কেতুপুরের জেলেপাড়ার অমার্জিত, ক্লিন্ন পরিবেশের স্রষ্টা ও রক্ষকদের বিরুদ্ধে তাদের সম্মিলিত বিদ্রোহ বা প্রতিরোধ নেই।

কবিত্ববর্জিত তীক্ষ্ণ, বাস্তব দৃষ্টিতে লেখক জেলেপাড়ার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশকে বর্ণনা করেন এইভাবে— ‘‘পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গায় অন্ত নাই, কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়ীগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ....স্থানের অভাব এ জগতে নাই, তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই ওদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতলভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায়না। একটি কুঁড়ের আনাচে কানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে।’’

[পৃ ১১৫, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা, নিতাই বসু]

জেলেপাড়ার জীবনচর্যার বর্ণনায় লেখক তির্যক কটাক্ষে যে দৃশ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরেন, তা এইরকম— ‘‘জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না। এদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণে ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্র মানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে। ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কনকন। আসে রোগে, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষরেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া সে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।’’

[পৃ ১১৬, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা, নিতাই বসু]

‘‘দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অন্তহীন সরলতার সঙ্গে নীচুস্তরের চালাকি, অবিশ্বাস ও সন্দেহের সঙ্গে একান্ত নির্ভয়, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অধর্মকে অনায়াসে সহিয়া চলা — এসব যাদের জীবনে একাকার হইয়া আছে, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া যারা ভাবুক করি, ডাঙায় যারা গরিব ছোটলোক’’ — কুবের তাদেরই একজন। ঘরে তার পঙ্গু স্ত্রী মালা, লখা ও চণ্ডীকে নিয়ে অসহায় তিনটি শিশু, গ্রাম সমাজের পক্ষে বয়স্থা মেয়ে গোপী। কুবের ও গণেশ ধনঞ্জয়ের নৌকায় চড়ে পদ্মার বুকে মাছ ধরে বেড়ায় ধৃত মৎস্যের এক চতুর্থাংশের চুক্তিতে। রোগ, শোক, অভাব-

অনটন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং সর্বোপরি মালার শারীরিক অক্ষমতা কুবেরের জীবনে এক স্থায়ী বিষণ্ণতা ও উদ্দ্যমহীনতা তৈরী করেছে। এমন সময়ে তার জীবনে এল উদ্ধত যৌবলা লীলাচপলা কপিলা, আকুর-টাকুর গ্রামের শ্যামাদাসের পরিত্যক্তা স্ত্রী, মালার সহোদরা। কুবেরের সঙ্গে তার রহস্য-চপলতা কুবেরের উপবাসী জীবনে নিয়ে আসা সঞ্জীবনী সুধার স্বাদ।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গোপী পায়ে আঘাত পেলে, কুবের তাকে নিয়ে যায় আমিনবাড়ীর হাসপাতালে, সঙ্গিনী হয় কপিলা। সেখানকার হোটেলে একরাত্রি কুবেরের সঙ্গে কপিলার সহবাস এবং পরবর্তীকালে কপিলার শ্বশুরবাড়ীতে কুবেরের প্রতি তাদের পরিবারের দুর্ব্যবহারের জন্য কপিলার অশ্রুসজল আকুতি, কুবেরের হৃদয়ে কপিলাকে অনেকটা প্রতিষ্ঠিত করে। সমান্তরালে অবস্থার দাস হিসাবে দুর্জ্ঞেয় এবং রহস্যময় মানুষ হোসেন মিয়ার হাতছানিতে সে ক্রমশঃ বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে। কুবের ক্রমশ হোসেন মিয়ার কুটিল ব্যবসায়ের জটিল জালে জড়িয়ে পড়ে। সে জানে ''এই কাজ ছাড়িয়া দিলে যে অবস্থা তাহার হইবে'', সে বুঝতে পারে ''জানিয়া-শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিবার ক্ষমতা আর তাহার নাই।'' হোসেন মিয়ার 'অকৃপণ কৃপার' বিরুদ্ধে মনে মনে সে বিদ্রোহ করে ''এই সব ভয়ংকর কাজের সহায়তা যদি তাকে করিতে হয়, বিপদের ভাগ যদি তাহার থাকে, লাভের অংশ তো তার পাওয়া উচিত। জেলে যাওয়া ঝুঁকি যার সে কি শুধু বৈঠা বাহিবার মজুরিই পাইবে।''

কিন্তু তার পক্ষে হোসেনের প্রবল ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নিজের প্রাপ্য বুঝে নেওয়ার স্পর্ধা হয়নি। রামুর জীবনে ভয়ংকর বিপর্যয়ের ইতিহাস জেলেপাড়ার অধিবাসীদের কাছে অজানা নয়, তবু আমিনুদ্দী বা কুবের, কেউই হোসেনের সংস্রব এড়াতে চেয়েও পারেনা, আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় হোসেনের সুকৌশলে পাতা জালে। পীতমের টাকার ঘটি চুরি করে রামু গোপীকে বিয়ে করার কন্যাপণ, জোটায়, কুবেরও দায়মুক্তিতে কিছুটা নির্ভার হয়। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে চৌর্যবৃত্তির মিথ্যা অভিযোগে কুবেরকে বাধ্য করা হয় হোসেনের কাছে নিঃশর্ত আত্মনিবেদনে। কেতুপুর ছেড়ে ময়নাদ্বীপের অগস্ত্যযাত্রায় কুবেরের ভাবী জীবনের সঙ্গিনী হয় কপিলা, হোসেনের পরিকল্পিত ধর্মহীন, জাতহীন নতুন সমাজে পুরুষ ও নারীর মিলিত জীবনযাত্রার অবশ্যম্ভাবী ফসল ফলানোর তাগিদে।

৫৭.৪ আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে পরিচিতির প্রাসঙ্গিকতা

এই উপন্যাসটি পূর্ববঙ্গের একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনকথা এবং ভাষাপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত হিসাবে গড়ে ওঠায় সঙ্গতভাবেই আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। একথা বলা বাহুল্য যে সব উপন্যাসেরই একটি বাস্তব পটভূমি থাকে, থাকতে বাধ্য। বিশেষত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক কালে আঞ্চলিক উপন্যাস রচনার একটি ঝোঁক বাংলা সাহিত্যে প্রকট হয়েছিল। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মন, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রমুখের রচনা আঞ্চলিক সাহিত্য হিসাবে এইসময় বিশেষ এক পরিমণ্ডল তৈরী করেছিল। কতগুলি সাধারণ লক্ষণ থেকে আঞ্চলিক উপন্যাস উৎসারিত হয়। অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, ধর্মীয় বা আঞ্চলিক সংস্কার, বিশেষ বিশেষ জীবন-পরিচালন রীতি, মানসিকতা, লৌকিক বা অলৌকিক বিশ্বাস — এই সবকিছু সেখানে পরিবেশের অনিবার্য প্রভাবের সঙ্গে সাযুজ্য ও সম্পর্ক রচনা করে নিয়ে আসে এক নিবিড় অখণ্ডতা। সাহিত্য সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত —কোনো কোনো রচনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিবেশ শুধুমাত্র ফ্রেমের কাজ করে, ঘটনা ও চরিত্রকে চতুঃসীমায় বেঁধে রাখার জন্য।

একে অলংকরণের অতিরিক্ত আর কিছু বলা যায় না। আবার কখনও কোনো বিশিষ্ট পটভূমি কোনো রচনার বিশেষ ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে সহায়ক হয়। এটিও আঞ্চলিক রচনার যথার্থ স্বরূপ নয়। যখন বিশেষভাবে কোনো পরিবেশে লেখকের সৃষ্ট চরিত্রগুলির শক্তি ও সত্তার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, হয়ে ওঠে ওই চরিত্রগুলির প্রতীক, তখনই তা আঞ্চলিক রচনা হিসাবে আখ্যাত হবার যোগ্যতা অর্জন করে।

আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠার এই তাত্ত্বিক আলোচনা মনে রেখে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আঞ্চলিকতার প্রশ্নটি আমরা বিচার করতে পারি। এই প্রশ্নের সূত্রপাত হয় মূলত উপন্যাসটির নামকরণ থেকে। লেখক পদ্মার বুকে নৌকা চালনারত মৎস্যজীবীদের জীবনকথা এখানে বলেছেন। এই জেলেপাড়া, কেতুপুর গ্রাম, পদ্মার রূপ ও প্রভাব কাহিনীর শুরু থেকেই একটি বিশেষ অঞ্চলের চিহ্নকে প্রকট করে তুলেছে। কেতুপুর পূর্ববঙ্গীয় জীবনের একটি খণ্ডিত রূপ। তবু তার মধ্যেই চিত্রিত হয়ে উঠেছে জলনির্ভর পূর্ববঙ্গীয় জীবনের মানস-বিকাশ। উপরে সীমাহীন আকাশের বিস্তার, নীচে পদ্মার অনন্ত জলরাশি, তারই মধ্যে দারিদ্র্যবেষ্টিত, চালানবাবু বা শীতলবাবুর চাতুর্যে রঞ্চিত, নিজেদের অভ্যন্তরীণ কহহে বিচ্ছিন্ন জেলের দল — এই ছবিই লেখকের অভিপ্রেত জীবনরূপ।

অঞ্চল হিসাবে এখানে দুটি স্থানে প্রসঙ্গ প্রধানত বারবার এসেছে। প্রথমত কেতুপুর, যেখানে কুবের ও তার সগোত্রের মানুষের বাস। এরই অনুষঙ্গে আকুরটাকুর বা চরডাঙা গ্রামের কথাও পাওয়া যায়, যা ছবি কেতুপুরেরই সদৃশ। আমিনাবাড়ী গঞ্জ হিসাবে আধা-গ্রাম আধা-শহরের মিশ্রিত রূপের পরিচায়ক। উপন্যাসের সবকটি চরিত্রই প্রায় এইসব গ্রাম-গঞ্জের পটভূমিতে বিচরণ করেছে। তাদের জীবনচক্র, নানা ঘটনায় জীবনের পরিবর্তিত গতি, ভাষাগত বিশিষ্টতা — সবকিছুই এই বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমনকি লেখক এই অঞ্চলের এক শব্দহীন বিশিষ্ট ভাষারূপের সঙ্গেও পাঠকের পচিরয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন এইভাবে — ''বহুদূর নদীবক্ষ হইতে হাঁক আসিতেছিল, মানবকণ্ঠের একটানা একটা ক্ষীণ আওয়াজ। ....এ এক ধরনের ভাষা, পূর্ববঙ্গের মাঝির লোক ছাড়া এভাষা কেহ জানে না। এ ভাষার কথা নাই, আছে শুধু তরঙ্গায়িত শব্দ। উন্মুক্ত প্রান্তরের বিস্তৃত নদীবক্ষে এ শব্দ দূর হইতে দূরে চলিয়া যায়, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে, কিন্তু তরঙ্গের তারতম্য অবিকল থাকিয়া যায়। অস্ফুট গুঞ্জনের মত মৃদু হইয়াও যদি কানে আসিয়া লাগে, পদ্মানদীর মাঝি কান পাতিয়া শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারে।'' দ্বিতীয় আরেকটি অঞ্চল হিসাবে এসেছে ময়নাদ্বীপের কথা। এইখানে কেতুপুর বা সদৃশ অঞ্চলগুলির যে সীমায়িত রূপ লেখক সযত্নে উপস্থাপিত করেছিলেন তার ব্যতিক্রম ও বিনষ্টি।

ময়নাদ্বীপ হোসেনের উপনিবেশ, তার উচ্চাকাঙ্খা এবং উদ্দেশয সাধনের প্রতীক। একটি দুর্গম, খাদ্য-বস্ত্র-পানীয়হীন, হিংস্রপশু অধ্যুষিত এক আদিম ভূখণ্ড। এই ময়নাদ্বীপ কেতুপুরের থেকে স্থানিকভাবেই যে শুধুমাত্র দূরে তা নয়, কেতুপুর বা অন্যান্য গ্রামের সামাজিক জীবনের থেকেও সে দূরে। ধর্মীয় আচার, নৈতিক সংস্কার সেখানে প্রবেশের পথ পায়না হোসেনের নির্দেশে। তাই প্রচলিত সমাজ-সংস্কারকে অস্বীকার করে কপিলাকে এই ময়নাদ্বীপের পটভূমিতেই লাভ করার স্বপ্ন দেখে কুবের। তার সেই স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে সফলও হয়। মোটের উপর, পরিচিত জনজীবনের কোনো উপস্থিতিই খুঁজে পাওয়া যায় না এখানে। তাই কেতুপুর বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলের সীমা এখানে লঙ্ঘিত — অঞ্চলের গন্ডীবদ্ধতার অভাবে, এখানকার জীবনধারণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে। ময়নাদ্বীপই এই উপন্যাসে ক্রমশঃ আঞ্চলিকতার যে প্রস্তুতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে চলেছিল, তার সংহতি বিনষ্টিকরণে সহায়ক।

প্রকৃতপক্ষে একথা অনস্বীকার্য যে আঞ্চলিকতার কিছু কিছু উপাদানে সমৃদ্ধ বলেই ‘পদ্মানদীর মাঝি’ সম্পর্কে আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ উঠেছে। পদ্মা ও তার তীরবর্তী মানুষের এমন পরিপূর্ণ জীবনকথা এর আগে বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়নি। উপরন্তু এই অঞ্চলের অনুপুঙ্খ বর্ণনাসমৃদ্ধ যে চিত্র এখানে প্রকাশিত হয়েছে তাও আঞ্চলিকতার প্রতিভাস গড়ে তুলতে অনেকখানি সহায়ক হয়েছে। কিন্তু কেতুপুরের কুবের আকুরটাকুরের কপিলাকে সঙ্গিনী করে যখনই ময়নাদ্বীপ অভিমুখে রওনা হয়েছে তখনই একটি বিশেষ অঞ্চলের সীমা চূর্ণ করে, গোষ্ঠীজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ব্যক্তিচরিত্র বিস্তৃততর জীবনের প্রেক্ষাপটে আভাসিত হয়ে উঠেছে। আঞ্চলিকতার পরিসমাপ্তি এখানেই।

৫৭.৫ রোমান্টিকতার প্রভাব ও অস্তিত্ব

‘পদ্মানদীর মাঝি’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালের মে মাসে। এই পর্বের বাংলাসাহিত্য ও তার প্রবণতা প্রসঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ অবধারিতভাবে এসে পড়ে। বিংশ শতক তার প্রথম অর্ধেই দু’-দু’টি বিশ্বযুদ্ধের সাক্ষী হতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথমবারেই মহাযুদ্ধের ভয়ালমূর্তিতে সমগ্র বিশ্ব এক অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হল। অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে সেকালের জনজীবন আমূল পরিবর্তিত হল। যুদ্ধের মাশুল হিসাবে সমগ্র ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে প্রচলিত মূল্যবোধে প্রচণ্ড নাড়া লাগল এই প্রেক্ষাপটে সমগ্র বিশ্বের শিল্প ও সাহিত্য জগতেও এল এক পরিবর্তনের ঢেউ। বাংলা সাহিত্যে এই পরিবর্তিত মূল্যবোধের প্রতিনিধি হিসাবে জন্ম নিলেন ‘কল্লোল’ গোষ্ঠীভুক্ত লেখক সম্প্রদায়।

এই সম্প্রদায়ের সাধারণ প্রবণতা হিসাবে পাশ্চাত্য প্রভাবজাত এক বোহেমিয়ান দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিল। যদিও তাঁদের সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাবের আগেই রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র নারীর মানবিক মূল্যায়নে, বৈপ্লবিক আন্দোলন বিষয়ে বা দুঃসাহসিক প্রেমের সামাজিক মূল্যনির্ণয়ে উপন্যাসকে মাধ্যমে করেছিলেন। কিন্তু ‘কল্লোল’ গোষ্ঠীর উচ্চকিত, নিঃসংকোচ প্রকাশভঙ্গীকে তাঁর আপন করতে পারেননি। এই নতুন যুক্তিবাদী লেখকগোষ্ঠী প্রকৃতির হিমশীতল রহস্যময় নির্লিপ্ত রূপের মাঝে, ফ্রয়েড ব্যাখ্যাত যৌনমনস্তত্ত্বের পাতা উল্টে, নরনারীর জটিল থেকে জটিলতর সম্পর্কের অসংকোচ বিশ্লেষণে এগিয়ে এলেন।

‘কল্লোল’ সম্প্রদায়ের এই যুক্তিবাদ, অবক্ষয়ের কারণে হতাশা, নতুন পথের অন্বেষণে অস্থিরতা ও উদ্দামতা, প্রেম ও যৌনতার প্রেক্ষাপটে নরনারীর সমস্যা প্রকাশের পাশাপাশি রোমান্টিক যৌবন-স্বপ্ন এবং সূক্ষ্ম জীবনরহস্যের প্রতি অদম্য আকর্ষণও তাঁদের রচনায় প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাঁদের উপজীব্য জগত ছিল ‘অপজাত ও অবজ্ঞাত’ মানুষের জনতা, নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসার। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাথে যেখানে প্রেতায়িত পরিত্যক্তের বাস, সেখানকার মানুষের বেদনাকে বাস্তব রূপ তাঁর দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রোমান্টিকতা অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের এই প্রচেষ্টার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘কল্লোল’ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হয়েও বুদ্ধদের বসু বা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতো প্রতিষ্ঠিত কল্লোলীয়দের চোখে কিন্তু ‘আদর্শ কল্লোলীয়’ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন (বুদ্ধদেব বসু বলেন — ‘belated Kallolean’, অচিন্ত্যকুমার বলেন — ‘কল্লোলেরই কুলবর্ধন)। এই দুই অভিধা থেকে একথা অন্তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ‘কল্লোল’ পর্বের যথার্থ বৈশিষ্ট্যগুলি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় পরিস্ফুট হয়েছিল ঠিক মাত্রায়। এই সূত্রে তাঁর রচনাবলী এবং বিশেষত ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাস সম্পর্কে আমরা বলতে পারি — যে-

ভদ্রেতর মানুষের কথা তিনি লিখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তাদের জীবনবর্ণনায় তিনি বৈজ্ঞনিক চেতনাসম্পন্ন নির্মম রূপকার। কল্লোলীয় রোমান্টিক আবেশ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি এই বিত্তহীন মেহনতী মানুষদের প্রেম ও হিংসা, পাপ-পুণ্য, লোভ ও নীতিবোধে মিলেমেশে থাকা জান্তর পরিবেশকে স্বরূপে হাজির করিয়েছেন পাঠকের দরবারে।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রাক্-মার্ক্সবাদ প্রভাবিত পর্বের রচনা। তাই মাঝিদের বৈচিত্র্যহীন কঠোর বাস্তব জীবনসংগ্রামের ইতিকথা লিখতে বসে কখনও কখনও তাঁর শিল্পীমন রোমান্টিক সৌন্দর্যলোকে যে পা বাড়ায়নি তা নয়। একবার কুবেরের পিছু পিছু জেলেবস্তিতে ঢুকে তিনি যেমন দেখতে পান তাদের ক্লেদাক্ত পঙ্কিল জীবনযাত্রা, তাকে বর্ণনা করেন তির্যক কটাক্ষে, তেমনি কুবেরের সঙ্গেই অলস কোনো এক মুহূর্ত যাপনের পর্বে তাঁর চোখে ধরা পড়ে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের সৌন্দর্যময়তা — ''কাউয়াচিলা পাখিগুলি ক্রমাগত জল ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। বকেরা এখন একক শিকারী সন্ধ্যায় ঝাঁক বাঁধিবে। স্টীমার, নৌকা, ভাসমান কচুরিপানা, আকাশের পাখি ও মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে - তীরের দিকে চাহিয়া মনে হয় জলের সীমায় মাটির তীরভূমিও বুঝি লঘুগতিতে চলিয়াছে।'' এই মুগ্ধতার মধ্যে দৈন্য ও হতাশাগ্রস্ত, ভীরু, গম্ভীর কুবের নয়; পাই এক স্বপ্নাতুর রোমান্টিক কুবেরকে। ১৯৫৫ সালে এই 'পদ্মানদীর মাঝি'র রূপকারকেই আমরা বলতে শুনি — ''আমি মার্ক্সবাদী, আমি বৈজ্ঞানিক, আমি সব জানি। সংস্কার বা ভাবপ্রবণতার ধার আমি ধারিনা, আমি লড়ায়ে শ্রমিক শ্রেণীর যোদ্ধা কম্যুনিস্ট — আমার হৃদয় পাথর।'' কিন্তু ১৯৩৬ সালে এই উপন্যাস রচনার সময়, হৃদয়কে প্রস্তরীভূত করার সচেতন সাধনা তিনি তখনও শুরু করেনি। তাই নির্মম নির্মোহ বিশ্লেষণের মধ্যেও অন্যতর ভাব, এক, রোমান্টিক বাতাবরণের সৃষ্টি হয় কখনও কখনও, হয়ত বা লেখকের অজান্তেই। যেখানে ভদ্র পাড়া, জমিদার, চালানবাবু, হোসেনমিয়া, পুলিশ এবং সর্বোপরি প্রকৃতি — সকলে সম্মিলিতভাবে এই হতদরিদ্র জেলেদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম স্বাধীনতাকেও অস্বীকার করে, সেখানেও তারা 'পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া' ভাবুক, স্বভাবকবি। এই ভাবুকতা, কবিত্বশক্তি তাদের অন্তর্নিহিত স্বপ্নজাত, রোমান্টিক মন ছাড়া যে-স্বপ্ন উৎসারিত হয় না।

মার্ক্সবাদ প্রভাবিত পর্বে নিজেকে বিজ্ঞানাগারের আবদ্ধ রাখার প্রস্তুতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর রচনাকে বস্তুধর্মী করে তুলেছে একথা ঠিক। কিন্তু তার পূর্ববর্তী পর্বে তিনি নিজেকে রোমান্টিকতা থেকে একেবারে মুক্ত করতে পারেননি। তবে সংযম ও সংহত রূপের প্রতি আসক্তি তাঁকে পুরোপুরি আত্মহারাও হতে দেয়নি। পদ্মার প্রতি, ধীবরজীবনের প্রতি দৃষ্টিপাতে তাঁকে এই সতর্ক ভারসাম্য রক্ষা করতে দেখা যায়। হোসেনের পল্লীগীতি, কপিলাকে ঘিরে কুবেরের আসক্তি জড়িত স্বপ্নলোক রচনা, গণেশের আমিনবাড়ীর প্রতি লোভাতুর ঈপ্সা, অলস অবসরের মুহূর্তে কখনও মালার কখনও বা পদ্মার অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য কুবেরের চোখে উদ্ভাসিত হওয়া — এইসকল ঘটনায় এই উপন্যাসের রোমান্টিক মুহূর্তগুলি বিধৃত হয়ে থাকে। এখানে কাঠিন্য ও পৌরুষের প্রতীক যে- হোসেন মিয়া, সেও 'খুশ' হলে রোমান্টিক গীতিকার 'নামানো আকাশের তলে দীনা পৃথিবী'কে দেখে তার মায়া জাগে, ভোরের শিশিরের নিত্যদৃষ্ট বিচ্ছুরণ নতুন ছটা হয়ে দেখা দেয় তার চোখে। সারারাত্রি শীতার্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত অবস্থায় জাল ফেলেও গণেশ যখন কুবেরকে গান গাইতে অনুরোধ করে, তখন সচেতন পাঠকের বুঝতে বাকি থাকে না যে — এ শুধুই গ্রাম্যপ্রমোদ নয়, রূঢ় বাস্তবকে প্রতিহত করতে অন্তরের মোহিনী স্বপ্নের শাব্দিক, সুরেলা প্রতিরোধ। এই একই গোত্রের তাড়না বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন, অবশেলিত মালাকেও রূপকথার কথকতায় পঞ্চমুখ করে তোলে। যে-রূপরসময় জীবন থেকে সে নির্বাসিত, তাকেই সে ছুঁতে চায় লখা চণ্ডীকে উদ্দেশ্য করে বলা গল্পের স্বপ্নময়তায়।

রোমান্টিক কল্পনার, স্বপ্নের এইসব জগত বাস্তব থেকে দূরে। কিন্তু হোসেন মিয়ার কাছে এই কল্পলোক বাস্তব — তার ময়নাদ্বীপ। কেতুপুরের ধীবর সমাজের কাছে ক্রমশ অলক্ষ্য নিয়তি হিসাবে দেখা দিয়েছে যে-ময়নাদ্বীপ, তা শুধুই হোসেননির্মিত উপনিবেশ নয়। তা হোসেনের স্বপ্নের দেশও বটে। কুবেরের কাছে নিভৃত অবকাশে সে মনশ্চক্ষে দেখা ময়নাদ্বীপের ভাবীরূপ বর্ণনা যখন করে, তখন সেই ভয়ংকর দ্বীপটিও শিশুর কোলাহলমুখর, ফসল পরিপূর্ণ মনুষ্যবসতিপূর্ণ দীপিত একটি ভূমিখণ্ড হয়ে ওঠে, যা সমানাধিকার এবং অপ্রাপণীয়ের আকাঙ্খাপূর্তির স্বর্গক্ষেত্রও বটে। এই ময়নাদ্বীপ যেমন পরবর্তীকালের মার্ক্সবাদী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্য নির্দিষ্ট মানসিকতার পূর্বরূপ, তেমনি দারিদ্র্য, অসাম্য ও অত্যাচারে নিষ্পেষিত মানুষের লোভাতুর চোখের সামনে একটি রোমান্টিক স্বপ্নের হাতছানিও। এই কল্পলোকে রাসুর কাছে বা কুবেরের কাছে বাস্তব হয়ে ধরা পড়ায় তার ওপরকার স্বপ্নময়তার আবরণ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু তাকে ঘিরে হোসেনের স্বপ্ন ফুরিয়ে যায়নি। তাই কুবেরকে কপিলাসহ ময়নাদ্বীপে চালান করার পরও গোপী, বঙ্কু, মালা ও তার ছেলেদের ময়নাদ্বীপে পাঠাবার পরিকল্পনা সে তৈরী করে রাখে।

মানুষের জীবনের যে- আর্থিক ও মানসিক সংকটের ছবি ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের মূলকথা, তাতে প্রচলিত রোমান্টিক বাতাবরণ সৃষ্টির সুযোগ তেমনভাবে নেই। কুবের ও কপিলার সম্পর্কের মধ্যেও রোমান্টিক প্রেম অপেক্ষা জৈবিক আকর্ষণের প্রকাশই বেশী। প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্তের শিক্ষিত, চর্চিত রোমান্টিকতা থেকে পালিয়ে, চাষা-ভুষোর মধ্যে যাবার প্রবণতাই ছিল লেখকের বেশী, কুবের-গণেশদের মধ্যেই তিনি বেশী স্বচ্ছন্দ। তাই সচেতন বস্তুধর্মিতায় তাদের জীবনের গতি ও পরিণতিকে তিনি বিবৃত করেন। তবে যেহেতু রোমান্টিকতার বিলাসের প্রতি তেমন সোচ্চার বীতরাগ তাঁর এই উপন্যাস রচনাপর্বে তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি, তাই সূক্ষ্ম অন্বেষণে কোথাও কোথাও রোমান্টিকতার স্পর্শ বা নৈকট্যও ধরা পড়ে।

৫৭.৬ সারাংশ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তাদের অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে অসহায়তা, অশিক্ষাজনিত নানা কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকা, বেঁচে থাকার একান্ত তাগিদে নানারকম নীচতা, স্বার্থপরতা এবং সর্বোপরি স্বীয় ক্ষমতা বিষয়ে অজ্ঞতাজনিত এক অদ্ভুত হীনমন্যতা — এই দিকগুলি আসলে তাদের ভদ্রেতর জীবনযাপনের মূল কারণ, এই চিত্রই লেখক পাঠকের সামনে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ধীবরপল্লীর সেই জীবনযাত্রায় লেখকের শিক্ষিত আভিজাত্য, মার্জিত রুচি বা উচ্চ আদর্শবাদের কোনো ছায়াপাত ঘটেনি। কাহিনির শুরু থেকে শেষপর্যন্ত তাই জেলেদের জীবনের বঞ্চনা, দারিদ্র্য ও অনিশ্চিত নিয়তির হাতে আত্মসমর্পনের এক বাস্তব তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ উপস্থাপিত।

পূর্ববঙ্গের পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলের জীবন-চর্যার বেশ কিছু লক্ষণ ও উপাদান এই উপন্যাস আছে বলে এর সম্পর্কে আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ ওঠে। তবে ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’ সংজ্ঞার্থের কিছু শর্ত এখানে আছে বলেই একে ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। পদ্মা ও তার তীরবর্তী মানুষদের এমন নদীনির্ভর, পূর্ণাঙ্গ জীবনালখ্য ইতোপূর্বে বাংলাসাহিত্যে পাওয়া যায়নি, একথা যেমন ঠিক, তেমনি এই অঞ্চলের যে বিপুল চিত্রময়

জীবন এখানে প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকেও আঞ্চলিকতার প্রতিভাস গড়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা তৈরী হয় — একথাও সত্য। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটির সূচনা হয়েছে গোষ্ঠীজীবন ও ব্যক্তিচরিত্রকে আশ্রয় করে একটি বিশেষ আঞ্চলিক বলয়ে, কিন্তু শেষপর্যন্ত আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ, সুনির্দিষ্ট সীমা চূর্ণ হয়ে, একক ব্যক্তিত্বের আধারে জীবনের বিস্তৃততর প্রেক্ষাপট আভাসিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এই উপন্যাসের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ এর বিষয়গত অভিনবত্ব, পদ্মার মাঝি ও জেলেদের দুঃসাহসিক ও কিছুটা পরিমাণে অসাধারণ জীবনযাত্রার আকর্ষণী শক্তিও। তাদের জীবন ও মৃত্যু — দুই-ই নির্ভর করে আছে খেয়ালী পদ্মার কৃপা ও রুষ্টতার উপর। উপরন্তু এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমুদ্রবক্ষের ময়নাদ্বীপও, যা সমগ্র কেতুপুরের ধীবর জীবনে একই সঙ্গে প্রত্যাশা ভীতির স্বর্গ-নরকের পরিণতি নির্ধারিত করে তোলে। সেই অজানা, রহস্যময় দ্বীপ, তার অভ্যস্ত সমাজ-বহির্ভূত জীবনযাত্রা এবং এর অধিকারী তথা স্রষ্টা হোসেন মিয়া, কেতুপুরবাসীদের কাছে নিয়তির প্রতিমূর্তি, স্বপ্ন পূরণ আর জাহান্নমের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

৫৭.৭ অনুশীলনী

ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১) ''পদ্মা ও পদ্মার খালগুলি ইহাদের অধিকাংশের উপজীবিকা।''—একতা কাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে? উপজীবিকার কি পরিচয় এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে তা বক্ত করুন।

২) ''এই ঢেঁকির কাঠটির ইতিহাস স্বতন্ত্র।''—এই ইতিহাসটির পরিচয় দিন।

৩) ''সে যাহাকে ভয় করে, এতলোকের সামনে তাহার মাথা হেঁট হইয়া যাওয়ায় মনে মনে সে শুধু ব্যথা পাইতেছিল।''—কার প্রসঙ্গে এই কথা বলা হয়েছে? সে কাকে ভয় করে? মাথা হেঁট হবার ঘটনাসূত্রটিই বা কী তার পরিচয় দিন।

৪) ''আর শোন বাই; কী দেখলা কী শুনলা আঁধার রাতে মনে মনে থুইও, কইয়া কাম নাই।''—এই কথা কে, কাকে, কোন্ প্রসঙ্গে বলেছে?

খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিশদ আলোচনাপূর্বক উত্তর দিন। (অনধিক ১০০০ শব্দে)

১) 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে বাংলার নিম্নবিত্ত মানুষের দারিদ্র্যের যে মর্মান্তিক ছবি ফুটে উঠেছে তা কতখানি বাস্তবানুগ তা বিচার করুন।

২) 'পদ্মানদীর মাঝি' আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে উল্লিখিত হতে পারে কি না তা বিচার করুন।

৩) 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আলোচনায় কোনো কোনো সমালোচক লক্ষ করেছেন যে রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ ঘোষণা করেও লেখক মাঝে মাঝেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন। সমালোচকগণের এই উপলব্ধির সঙ্গে আপনি সহমত কি না তা বিচার করে দেখান।

৫৭.৮ গ্রন্থপঞ্জি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *পদ্মানদীর মাঝি*, ফাল্গুন ১৩৯৯, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ক'লকাতা।

ডঃ নিতাই বসু ঃ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সমাজ জিজ্ঞাসা*, সঞ্জয় প্রকাশন, ক'লকাতা।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ঃ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জীবনদৃষ্টি ও শিল্পীরীতি*, জি. ই. এ পাবলিশার্স, ক'লকাতা।

নারায়ণ চৌধুরী ঃ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সাহিত্য মূল্যায়ন*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ক'লকাতা।

নারায়ণ চৌধুরী ঃ *মানিক সাহিত্য সমীক্ষা*, পুস্তক বিপণি, ক'লকাতা।

একক ৫৮ ❑ চরিত্রায়ণ

গঠন

৫৮.১ উদ্দেশ্য

৫৮.২ প্রস্তাবনা

৫৮.৩ কুবের চরিত্র

৫৮.৪ মালার চরিত্র ঃ কুবেরের জীবনে তার ভূমিকা

৫৮.৫ কপিলার চরিত্র ঃ কুবেরের জীবনের নিয়ন্তা

৫৮.৬ হোসেন মিয়া ঃ কেতুপুরের নিয়ন্তা

৫৮.৭ উপন্যাসে বিধৃত নিয়তিবাদ

৫৮.৮ সারাংশ

৫৮.৯ অনুশীলনী

৫৮.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৫৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- চরিত্র রূপায়নে এই উপন্যাসে লেখকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।
- কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে কুবের কতখানি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, তার সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারবেন।
- মালার চরিত্রটি অপেক্ষাকৃত স্বল্প স্থানাধিকারিণী হলেও যে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে তা বুঝতে পারবেন।
- কপিলার চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যের নারী চরিত্রসমূহের মধ্যে এক অভিনব সংযোজন হিসাবে আপনার কাছে পরিচিত হয়ে উঠবে।
- হোসেন মিয়া তার মহত্ত্ব ও শয়তানির সহাবস্থানে এই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা জটিল চরিত্র হিসাবে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করবে।
- নিয়তি নামক এক সংস্কারজাত, অদৃশ্য, অনিবার্য শক্তিকে প্রাকৃতিক ও মানবিক অস্তিত্বে প্রতিবিম্বিত হতে দেখবেন।

৫৮.২ প্রস্তাবনা

সমগ্র উপন্যাসটি আকারে নাতিবৃহৎ হলেও পূর্ববঙ্গের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর জীবনালেখ্য উপস্থিত করতে গিয়ে লেখক যতজন পাত্রপাত্রীকে উপস্থিত করেছেন, তাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। জালে মাছ ধরা পড়লে জীবনে যাদের উৎসব আসে, পদ্মার কৃপণতায় যাদের নানা উঞ্ছবৃত্তির মাধ্যমে বেঁচে থাকার আপ্রাণ লড়াই চালাতে হয়, হোসেন মিয়ার কূটকৌশল যাদের কুয়াশার মতো ঘিরে রাখে তাদের প্রতিমূর্তি হয়ে দেখা দেয় কুবের, গণেশ, ধনঞ্জয়, পীতম, রাসু, নকুল, সিধু, জহর, রসুল, আমিনুদ্দি। এদের ভাগ্যহত অবস্থার সমভাগী হিসাবে আসে মালা-লখা-চণ্ডী-গোপী, ধনঞ্জয়ের বউ (যে কি না বুতির মা), গণেশের বউ উলুপী, আমিনুদ্দির মেয়ে, জহরের ছেলে আরও কত কে। কাহিনিবৃত্তের নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকে ধীবরশ্রেণীর অনিশ্চিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের দায়ভাগী দায়ভাগী মানুষজন — জমিদার অনন্ত তালুকদার, চালানবাবু, শীতল, পুলিশ তথা শাসনতন্ত্রের প্রতিনিধি। সর্বোপরি তার অনিবার্য উপস্থিতি নিয়ে হোসেন মিয়া। তার কার্যকলাপ, স্বপ্নের ময়নাদ্বীপ, তার ভয়ংকর বাণিজ্য প্রক্রিয়ার সূত্রেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাহিনিতে এসেছে শম্ভু ও বগা, নহিবন ও তার সহযাত্রীরা, রাসুর বিগত পরিবার, গোপীর স্বামী বঙ্কু। হোসেনের আগ্রাসী থাকার বাইরে যারা নিজেদের সচ্ছলতা ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে এই উপন্যাসে ঠাঁই পেয়েছে, তাদের মধ্যে আছে গণেশের শ্যালক যুগল, কপিলা ও চরডাঙ্গায় মালার পিত্রালয়ের আত্মীয়স্বজন, আকুরটাকুরের শ্যামা দাস, কেতুপুরের যুগী। পদ্মার মাঝিদের জীবনের চালচিত্রটি এই এতগুলি চরিত্রের সমাবেশে অনেকখানি বিস্তার নিয়ে উপন্যাসে ধরা দিয়েছে। পদ্মার স্রোত বেয়ে মানুষের যে জীবনধারা বয়ে চলেছে, সেখানে সরলতা ও স্বার্থসিদ্ধি, দারিদ্র্য ও দুর্নীতি, ক্ষুধা ও কামনার নানা ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয় কি প্রকারে, এই চরিত্রগুলি পাঠকের কাছে তারই গোপন রহস্যকে ক্ষন্মোচিত করে। এই মানুষগুলির ব্যক্তিগত কিছু প্রবণতা, কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন এদের পরস্পরের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত হবার মাত্রা তৈরি করে, তেমনি আবার গোষ্ঠীবদ্ধ পিণ্ডাকার জীবনচিত্রের সাধারণ ধর্মে এরা সবাই পদ্মার উপর নির্ভরশীল, পদ্মারই তীরবর্তী মানুষ হিসাবে দেখা দেয়। কখনও পদ্মার প্লাবন, কখনও কালবৈশাখী ঝড়, কখনও আবার হোসেনের লোভী (নাকি স্বপ্নময়?) চক্রান্ত এলোমেলো করে দেয় এদের নিস্তরঙ্গ, একঘেমে জীবন। ধীরে ধীরে আবার সেই ঘুলিয়ে ওঠা জীবনতরঙ্গ প্রশমিত হয়ে যায় এদেরই অসহায় সহিষ্ণুতায়, প্রতিবাদহীন অভ্যস্ততায়। এই উপন্যাসে তার বারবার উল্লিখিত হয় নিয়তিবাদ, অদৃষ্ট প্রসঙ্গ। এখানে উপস্থাপিত নরনারী সকলেই সেই প্রকৃতি ও পদ্মারূপী নিয়তি, দারিদ্রের অদৃষ্টরূপী মূর্তির কাছে নতজানু। তাদের সেই পিঠ নোয়ানো অবস্থা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক বাস্তবতারই নির্মোহ রূপায়ণ।

৫৮.৩ কুবের চরিত্র

‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসটি আদ্যোপান্ত এই একটি চরিত্রের চারপাশে আবর্তিত হয়েছে। তাকে নায়ক বলা হলে সে নায়ক, প্রধান চরিত্র বললে সে তাই-ই। কোনো তাত্ত্বিকতায় না গিয়েও, উপন্যাসের উদ্দিষ্ট জনজীবন বা তার ক্ষুদ্র পারিবারিক আবেষ্টনের কাহিনীতে সে-ই কেন্দ্রীয় চরিত্র — একথা আমরা একবাক্যে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হই। উপন্যাসের শুরুতে গণেশ, ধনঞ্জয়ের সঙ্গে শূন্য উদরে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে, অন্ধকার পদ্মার গভীরতর অন্ধকার জলতলে মাছ ধরতে ধরতে যে কুবের আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়, সে কেতুপুরের সমগ্র ধীবর গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। আমিনুদ্দি, রাসু, পীতম, সাধু — কারও সঙ্গে তার কোনো তফাৎ নেই। সেখানে তাকে তার গোষ্ঠীস্বভাবের দ্বারাই আমরা চিনে নিই। কিন্তু এই কুবের অপেক্ষাকৃত ভিন্নতর চেহারায় উপস্থিত হয় কপিলার

সঙ্গে তার সংরাগময় সম্পর্কের প্রেক্ষিতে। স্ব-গোষ্ঠী এবং স্ব-জন নির্মিত বলয়ে তখন আর বেশীদিন কুবেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না। উপন্যাসের সমাপ্তিতে কপিলাকে সঙ্গিনী করে যে কুবের হোসেন মিয়ার নৌকায় ময়নাদ্বীপ অভিমুখে এক অগস্ত্যযাত্রায় পাড়ি দেয়, সেই কুবের তখন কোনো গোষ্ঠীপ্রবণতার প্রতীক নয়, ব্যক্তিমানুষের তীব্র আশা-আকাঙক্ষার দোলায় আন্দোলিত এক সত্তা, যে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখে, যে স্বপ্ন শুধুই তার আকাঙক্ষাপুরণের, হোক না সে আকাঙক্ষা যত তুচ্ছ, যত ক্ষুদ্র, শুধুমাত্র কপিলাকেন্দ্রিক।

কুবেরকে লেখক যেভাবে উপন্যাসের প্রথমাংশে উপস্থিত করেছেন তাতে দেখি — সে শান্ত, কর্মোদ্যোগিতা তার নিতান্তই কম, নিজের প্রাপ্য বুঝে নিতেও সে একান্ত নিরুৎসাহী। এককথায় বলতে গেলে সেখানে সে নিরীহ, ভীরু এবং স্বভাবতই সমাজের শোষিত মানুষদের একজন। সেইসময় তার সামনে বা বলা ভাল তার চারপাশ ঘিরে রয়েছে এক অত্যুঙ্গ ব্যক্তিত্ব — হোসেন মিয়া। সে সামনে এসে দাঁড়ালেই কুবের নিজের তুচ্ছতা এবং ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে আরও বেশী সচেতন হয়ে ওঠে। সে জানে — যেহেতু সে ''গরিবের মধ্যে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশী ছোটলোক,'' তাই তাকে বঞ্চিত করার অধিকার সমাজের সকলের। দারিদ্র্য তাকে ছোটলোকের সীমায় আবদ্ধ করে রেখেছে, যে সীমাকে অতিক্রম করার কোনো চেষ্টা আমরা তার মধ্যে দেখতে পাইনা। বড়জোর মালার নিষেধ উপেক্ষা করে অসুস্থ শরীরেও সে গণেশের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের নৌকায় মাছ ধরতে যায় যাতে দিন গুজরানের অর্থটুকু হাতে আসে। তার নিজের নৌকা নেই, জালও নেই, ফলে মাছ বিক্রিয় টাকার ভাগও তার কম। এর উপর যখন ধনঞ্জয়, চালানবাবু বা শীতল নানা ফিকিরে তাকে ঠকায়, তখন সব বুঝেও সে চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়। কারণ বঞ্চিত হওয়াকে সে তখন এক অমোঘ নিয়ম ও অভ্যাসে পরিণত করেছে। তার এই দারিদ্র-কণ্টকিত, অভাব-অভ্যস্ত জীবনে পুত্রলাভের মত ঘটনাও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিকতা ও লৌকিকতার দায় অবাঞ্ছিত হয়ে ওঠে — যখন বন্যার সময় মালার ভাই-বোনেরা তারই বাড়িতে আশ্রয় নেবার জন্য আসে।

এই অবস্থায় কুবেরের দিন কাটে পদ্মার দয়ায় কিংবা হোসেন মিয়ার কৃপায়। পদ্মার দয়া অনিশ্চিত, কখনও মাছ ধরা পড়ে, কখনও পড়ে না। কিন্তু কুবেরের প্রতি হোসেনের কৃপা তেমন অনিশ্চিত নয়। না চাইতেই তার কাছ থেকে পাওয়া যায় ঘরের ফুটো চাল মেরামতির জন্য শন, ঝড়ে মুখ থুবড়ে পড়া ঘন নতুন করে গড়ে দেবার সর্বপ্রকার সাহায্য, উপবাসের সময় বিনা সুদে কিছু কর্জ। তবুও পদ্মার কৃপণতায় বুকের ভীত নয়, তার অবসরের সময়টাও সে পদ্মার বুকে নৌকায় বসে কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু হোসেনের উপস্থিতি কুবেরকে এক অজ্ঞাত ভয়ে অস্বস্তি বোধ করায়। তার পর্বতসদৃশ ব্যক্তিত্ব কবেরের কাছে এক দুর্জ্ঞেয় আশঙ্কা বহন করে আনে। সর্বোপরি নিজের অক্ষমতা এবং অসহায়তা তাকে যেন একেবারে গ্রাস করে নেয়। তার এই হীনমন্যতাই তাকে ক্রমশ হোসেনের কাছে আত্মসমর্পনের পথে টেনে নিয়ে যায়। পদ্মানির্ভর এবং হোসেন-নির্ভর কেতুপুরের ধীবর গোষ্ঠীর একজন হয়েই যে কুবেরের দিন কাটছিল গতানুগতিকভাবে, একসময় সে ময়নাদ্বীপের প্রজাবৃদ্ধির উপকরণে পরিণত হয় হোসেনের কারসাজিতে।

কুবেরের নিস্তরঙ্গ জীবনে প্রথম তরঙ্গবিক্ষোভ দেখা দেয় — কপিলার উপস্থিতিতে। বন্যার সময় মালার অনুরোধে কুবের চরডাঙায় মালার পিত্রালয়ে যার এবং নিতান্ত লৌকিকতার খাতিরে স্বামীর ঘর ছেড়ে আসা কপিলাসহ মালার অন্যান্য ভাইবোনদের নিয়ে কেতুপুরে ফিরে আসে। অভাবের সংসারে অতিরিক্ত এতগুলি মানুষের ভরণপোষণের দায় পালনে কুবের তখন বিরক্ত, ক্রুদ্ধ। কিন্তু কপিলার রঙ্গ-রসিকতা, রহস্যালাপ,

শরীরীবিভঙ্গ ক্রমশ তার বিরূপতাকে প্রশমিত করতে থাকে। মালার স্বামী হিসাবে, শাশুড়ীর কথায় যে- প্রশংসা একদিন সে গর্বের সঙ্গে উপভোগ করেছিল, সেই কথা ক্রমশ তার মন থেকে মুছে যেতে থাকে। এতদিন সে বিশ্বাস করত, মালার একটি পা বিকৃত না হলে সে কুবেরের ঘরে পায়ের ধূলো ঝাড়তেও আসত না। কিন্তু এবার দুরন্ত কপিলার দুর্বোধ্য সব ইঙ্গিত তার চোখে নতুন ঘোর লাগায়। ক্লান্ত কুবেরের ঘুমজড়ানো চোখে মালার রাজরানী-বিভ্রম সৃষ্টি আর হয় না। সেখানে তখন কপিলা স্বপ্ন এনে দেয়। ''পরের পে ভরাইতে ফতুর হইতে বসিয়াও গৃহে তাই কুবেরের আকর্ষণ বাড়ে।''

মনের গহন কোণে অবদমিত বাসনায় অনেক অপূর্ণতা বাসা বেঁধে থাকে, কুবেরেরও ছিল। মালার পঙ্গুতা, নিস্পৃহতা, হাসিবিহীন মুখের পাশে কপিলার চটুল ভঙ্গিমা, রঙ্গরসিকতা এবং উচ্চকিত হাসি ক্রমশ কুবেরের মনে অসামাজিক ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলতে থাকে। সে ক্রমশ তার মনের সুপ্ত বাসনার দাসে পরিণত হতে থাকে। কপিলাকে নিয়ে গোপীর পায়ের চিকিৎসা উপলক্ষ্যে আমিনবাড়িতে রাত্রিবাস এবং দুর্গাপূজোর দিনে সন্ধ্যার নির্জন অন্ধকার পথে কপিলার সান্নিধ্য কুবেরের সংগুপ্ত বাসনাকে প্রকট করে তোলে। এরই মধ্যে হোসেনের কারসাজিতে সে হোসেনের বেতনভুক্ কর্মচারীতে পরিণত হয়। নৌকায় আফিমের চোরাচালান এবং ময়নাদ্বীপে মানুষ চালানের কাজে হোসেন কুবেরকে নিয়োগ করে। ভীরু, বশংবদ কুবেরকে একটু একটু করে গ্রাস করার যে প্রচ্ছন্ন জাল তার চারপাশে হোসেন বুনে তুলছিল, এ-ও ছিল তারই একটি ধাপ। ময়নাদ্বীপে গিয়ে কুবের দেখতে পায় হোসেনের মধ্যস্থতায় কীভাবে বৃদ্ধ বসিরের অল্পবয়সী স্ত্রীকে এনায়েত লাভ করে। এই অভিজ্ঞতা তার কপিলাকেন্দ্রিক সুপ্ত বাসনাকে আও উদ্দীপিত করে তোলে। বিনা আমন্ত্রণে সে গিয়ে হাজির হয় কখনও কপিলার শ্বশুরবাড়ী, আকুরটাকুর গ্রাম। কখনও বা দোল উপলক্ষ্যে বিনা আমন্ত্রণে নিজের শ্বশুরবাড়ীতেও। কখনও সে ফেরে শূন্য হৃদয়ে, অপমানিত, প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ী হিসাবে, কখনও দুর্বার কপিলার লীলাবিভঙ্গে হতচকিত হয়ে। একদিকে সামাজিক নিয়মে মালা-কেন্দ্রিক উচ্ছ্বাসহীন আবাসস্থল, অন্যদিকে কপিলা-কেন্দ্রিক অসামাজিক জীবনের লোভ — এই দুয়ের মাঝখানে কুবের কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

শেষপর্যন্ত কুবেরের জীবনে হোসেন এবং কপিলা যৌথভাবে কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টির মতো দেখা দিয়েছে, যাদের প্রতিহত করার ক্ষমতা কুবেরের মতো দুর্বল মানুষের ছিল না। দুজনেই তার কাছে অপ্রতিরোধ্য। তার হোসেনকে ঠেকাবার মতো আর্থিক বা মানসিক জোর নেই, উপন্যাসের শুরু থেকেই তাকে আমরা হোসেনের প্রতি দাস্যভাবে নত অবস্থায় দেখি। কপিলাকে ঠেকাবার মতো সংযমশক্তিরও একান্ত অভাব আমরা ক্রমশ তার মধ্যে লক্ষ করি। ফলত তাকে তার জীবনক্ষেত্র থেকে উৎপাটিত করে আনতে হোসেন বা কপিলা কাউকেই বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কপিলার প্রতি কুবেরের আকর্ষণ যত গোপনই থাক, হোসেনের সন্ধানী, সতর্ক দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে যায়। এইবার সে কুবেরের চারপাশে ছড়ানো জাল গুটিয়ে আনতে থাকে। ঘটনাচক্রে বা সাজানো চুরির ঘটনার পাকে জড়িয়ে সে তার একান্ত বশংবদ, বিশ্বাসী মাঝি কুবেরকে চিরতরে ময়নাদ্বীপের দিকে ঠেলে দেয়। গোপীর জন্য পাত্র নির্বাচন করার, পুলিশের কাছে কুবেরের চুরি সামাল দেওয়ায়, এমনকি কুবেরের অসহায় পরিবারের দায়দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নেয় হোসেন, কুবেরের কাছে সে তখন সর্ব চিন্তাহরণ। এরপর আর কুবের পিছু ফিরে তাকায়নি। অর্থনৈতিক দায়, অসামাজিক প্রণয়ের দায়, পাপ-পুণ্য ইচ্ছে-অনিচ্ছের সব দায়, যা কিছু কুবেরের স্বল্পবুদ্ধির অগম্য তার সবটাই সে সমর্পণ করেছে হোসেনের কাছে, কিছুটা বা কপিলার কাছেও। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত পদ্মার মাঝিগিরি, কেতুপুরের সংকীর্ণ আবেষ্টনী, স্ত্রী-পুত্র-পিসি পরিবেষ্টিত জগতের থেকে নির্বাসিত হয়ে সে নতুন জগতের দিকে পাড়ি দিয়েছে। অবশ্য চলে যাবার আগে কিছুটা দুঃখবোধও তার মধ্যে জেগেছে। কুবের যত

নিষ্ক্রিয়ই হোক, সে অন্তত অমানুষ নয়। পুরনো জগৎ ও পরিজন ছেড়ে যাবার আগে, এতদিনের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করতে যে যন্ত্রণাবোধ, তাই তার চোখের জল হয়ে নেমে আসে।

কুবেরের চরিত্রের এই পূর্বাপর বিশ্লেষণে তার বিবর্তনের ধারাটিকে আমরা একটু বিশেষভাবে লক্ষ করতে পারি। সে খুব ছোটমাপের মানুষ, যা তার নিজের উপলব্ধিতেও 'ছোটলোক' হিসাবে স্বীকৃত। অর্থনৈতিক সামর্থ্যে এবং আচরণগত প্রবণতায় সে সত্যিই ছোট, অন্তত তাকে বেষ্টন করে আবর্তিত হোসেন ও কপিলার তুলনায়। দুজনের হাতেই সে ক্রীড়নক হয়ে থেকেছে, অর্থনৈতিক এবং মানসিক কারণে। তাকে নিয়ে অনিশ্চিত খেলায় মেতেছে তার জীবনদাত্রী পদ্মাও, কৃপণ দানে কুবেরকে চিরদারিদ্র্যের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখে। পদ্মানদীর মাঝির জীবন এই ত্রয়ী শক্তির টানাপোড়েনে ক্রমশ অনিকেত হয়ে ওঠে। নিরুচ্চারে সব কিছু মেনে নিতে যে অভ্যস্ত, সে নিজের ঠিকানাও শেষপর্যন্ত নিজে খুঁজে নিতে পারে না। জীবনধারণের সরলরৈখিক গতি ঘটনাক্রমে এবং ব্যক্তি-প্রভাবে যখনই বক্র হয়ে উঠেছে, সে হারিয়ে ফেলেছে পরিচিত জীবনছন্দ। তার ভীরুতা, সংশয়চিত্ততা, আত্মবিলোপ প্রবণতা আগাগোড়াই তাকে নিশ্চেষ্ট, অপরের লাঞ্ছনার শিকার অন্যের করুণার উপর নির্ভরশীল করে রেখেছে। পদ্মানদীর সব মাঝিই এমন — এরকম ভাবার অবকাশ আমাদের নেই। কারণ স্বয়ং হোসেন মিয়া বা যুগল-এর ক্রম-উত্তরণ, মাঝি-জীবনে থেকেও অর্থে-সামর্থ্যে প্রতিপত্তি লাভ-এর ঘটনা এই উপন্যাসেই চিত্রিত হয়েছে। এমনকি ধনঞ্জয়ও কুবেরের তুলনায় সচ্ছল, সক্ষম। এদের পাশে কুবেরকে রাখলে তার চারিত্রিক দীনতা এবং ন্যুব্জতা আমাদের আরও বেশী চোখে পড়ে। আসলে কুবের ব্যতিক্রম নয়, সে-ই ধীবরগোষ্ঠীর প্রকৃত প্রতিনিধি। রাসু, পীতম, সিধু বা আমিনুদ্দি, গণেশ তারই ছায়াসঙ্গী। উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে চির-অপরিচিত, সচ্ছলতার সঙ্গে পরিচয়হীন, উঞ্ছবৃত্তি ও স্বার্থপরতায় অভ্যস্ত মাঝি ও জেলেরাই প্রকৃত অর্থে 'পদ্মানদীর মাঝি'। তাদের জীবনকথাই লেখক বলতে চেয়েছেন। তাদের মধ্যে থেকেই তাই উঠে এসেছে কুবের। তার পরিবার, জীবনচর্যা এবং পরিণতি তাই রাসুর সঙ্গে সাদৃশ, আমিনুদ্দির প্রায় প্রতিরূপ। পদ্মার মাঝির দুঃসহ জীবনপাত প্রদর্শনই ছিল লেখকের উদ্দিষ্ট। আর তাই কুবেরের চেয়ে যোগ্য মানুষ অন্বেষণের প্রয়োজন তাঁর হয়নি। রাসু, আমিনুদ্দি, আরও অনেক মাঝির মতোই মূল জীবনস্রোত থেকে কুবেরও একসময় বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে যায় ময়নাদ্বীপের অনির্দিষ্ট জীবনে, যা পদ্মানদীর মাঝিদের প্রায় সবার জীবনেরই অনিবার্য পরিণতি। ময়নাদ্বীপ বাস্তব ভূমিখণ্ড হলেও যেখানে যাবার পরিণতি কী হতে পারে তার স্পষ্ট বিবরণ লেখক আমাদের দিয়েছেন। সে-পরিণতি ধর্মীয় শাসন বা প্রচলিত সমাজনীতির বন্ধনমুক্তি হলেও, আর্থিক সাচ্ছল্য, নিশ্চিন্ত দিনযাপন বা সুস্থিত আশ্রয় যে নয়, তা রাসুর বিবরণে বা কুবেরের ময়নাদ্বীপে প্রথম পদার্পণ প্রসঙ্গে আমরা জানতে পেরে যাই। তাই কেতুপুরের থেকে উন্নত কোনো জীবনপরিণতি যে সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করে নেই, সেকথা সহজেই অনুমেয়। ব্যক্তিমানুষ হিসাবে কুবেরের কপিলাকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে পাবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হওয়া ছাড়া, জেলে বা মাঝি হিসাবে যে কষ্টকর জীবন সে এতদিন কাটিয়েছে, ময়নাদ্বীপে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবার সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায়। তাই তার এই কেতুপুর থেকে সকলের অজ্ঞাতে, রাতের অন্ধকারে ময়নাদ্বীপ উদ্দেশ্যে নিষ্ক্রমণ, তা শুধুমাত্র তার গোষ্ঠী জীবন থেকে স্থানিক বিচ্যুতিমাত্র। ধীবর গোষ্ঠীর অন্যান্যদের ললাটলিপিতে যে- পরিণতি নির্ধারিত হয়ে আছে, কুবের সেই একই অদৃষ্ট লিপি সঙ্গে নিয়েই ময়নাদ্বীপে যাত্রা করেছে, অদৃষ্টের কাছেই আত্মসমর্পণ করার জন্য।

৫৮.৪ মালার চরিত্র ঃ কুবেরের জীবনে তার ভূমিকা

কুবেরের বউ মালা, কপিলার দিদি মালা, গোপী-লখা-চণ্ডীর মা মালা। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মালা শুধুমাত্র শারীরিক পঙ্গুতার কারণেই জীবনের আংশিক রূপের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু সংসারে তার অস্তিত্ব আর কোনো অর্থে খণ্ডিত নয়। কেতুপুরের দশমাইল উত্তরে চরডাঙা গ্রামের বৈকুণ্ঠের কন্যা মালা। তার গৌরবর্ণ এবং জেলেপাড়ার পক্ষে বিরল সৌন্দর্য্যের কারণে তার কুবেরের চেয়ে ভাল পাত্র জুটলেও জুটতে পারত। কিন্তু একটা পা হাঁটুর কাছ থেকে দুমড়ে বেঁকে থাকায় মালা উত্থানশক্তিরহিত, চলৎক্ষমতাহীন। তাই মালার জীবনে বরাদ্দ হয় কুবেরের মত হতদরিদ্র স্বামী, ভাঙ্গা ঘর, ক্ষুধার্ত, উপবাসী রাত্রি আর অসহায় জড়ত্ব। ঘরের কোনায় স্বতন্ত্র পড়ে থাকাই তার একমাত্র কাজ। কিন্তু বাইরের জগতে তার গতিবিধি বন্ধ হলেও বেড়ার ফাঁকে চোখ পেতে সে সেই জগতকে অনুভব করে তার সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে।

মালার গতিবিধি সংকুচিত হলেও গ্রামজীবনের প্রথাসিদ্ধ কুৎসা রটনা কিন্তু তার পিছু ছাড়ে না। তার শেষ পুত্রের জন্মের সঙ্গে মেজকর্তা অনন্ত তালুকদারের নাম জুড়ে সারা গ্রামে যে- ঠাট্টা, টিটকিরি চালু হয়েছিল, সেই একই দুর্নাম তার মায়ের ক্ষেত্রেও এক বামুনঠাকুরকে ঘিরে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু মালার মধ্যে এমন কোনো দুঃসাহসিক কাজের কোনো বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই কুবেরও মনে মনে প্রার্থনা করে, তার নবজাতকের যে উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ এই অপবাদের হেতু তা যেন বিবর্ণ হয়ে কালক্রমে মাঝিদের পরিচিত গায়ের রঙের কাছাকাছি আসে। ছেলের জন্মের খবরে আরও একজন ভাতের ভাবী ভাগীদার সংসারে বেড়ে ওঠায় কুবের অখুশি হয়, কিন্তু সংসারের নিভৃত অবকাশে নিদ্রাকাতর চোখে ছেলেকোলে মালা তার কাছে রাজরাণীর মহিমায় দেখা দেয়। এমনকি কুবেরের মধ্যে একধরনের কৃতার্থতাও আমরা লক্ষ করি, যখন সেও মনে করে মালার পঙ্গুত্বই তাকে কুবেরের হাঘরে সংসারে এনে ফেলেছে, অন্যথায় ''কুবেরের ঘরে ও পায়ের ধূলা ঝাড়িতেও আসিত না''।

পঙ্গুত্বের কারণেই মালা অন্তর্মুখী। তার মধ্যে জেলেপাড়ার কঠোর জীবনসংগ্রামে অভ্যস্ত নারীদের যে রুক্ষতা তা অনুপস্থিত। প্রেম-প্রীতির বাহুল্যই তাকে গতানুগতিক জেলে-মাঝির ঘরের মেয়ে বউদের থেকে পৃথক বলয়ে স্থাপিত হতে সাহায্য করেছে। ধীবরপল্লীতে মায়েদের নবজাত শিশু ছাড়া অন্যদের প্রতি কোনো মমতা দেখা যায় না। আর জেলেপাড়ার পুরুষদের নিষ্ঠুরতা ও ঔদাসীন্যের কথা তো কারও অবিদিতই নয়। লেখক নারীপুরুষের এই যে মানসিক অসাড়তা তার থেকে পঙ্গু, অলস মালাকে রেহাই দিয়েছেন। ''ছেলেমেয়েদের ভালবাসিবার মনও তাহার আছে, সময়ও সে পায়।'' সারাদিন অবাধ্য দৌরাত্মের পর লখা-চণ্ডীও বাধ্য, ভদ্র সুবোধ ছেলের মতো ফিরে আসে মালার কাছে। ঠিক সেই সময়টিতেই মালা নিজেও নিজেকে পরিপূর্ণ বলে ভাবে। কেরোসিনের ডিবরি-জ্বলা সন্ধ্যার অন্ধকারে, ভিজে মাটি, পচা শন ও চেরাবাঁশের তৈরি গৃহ-আবেষ্টনীতে, মাথায় উকুন ও পরনে ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড় নিয়ে ভদ্রমহিলাসুলভ সুমার্জিত সভ্যতার আসর সাজিয়ে বসে সে। কথকতায় সে দক্ষ, সুতরাং তার মুখে নিত্যশ্রুত গল্পেরও নবরূপায়ণের আকর্ষণে তার সামনে জড় হয় তার ছেলেমেয়েরা, কুবেরের পিসি, প্রতিবেশিনী গণেশপত্নী উলুপী, তার পুত্রকন্যা মনাই আর কুকী, সিধুর তোতলা হাবা মেয়ে বগলী এমনকি কদাচিৎ বাড়ী থাকা কুবেরও। মালা তখন স্বীয় অস্তিত্বগরবে গরবিনী একজন পূর্ণ নারী।

মালার এই মূর্তির পাশাপাহি তার সংকীর্ণ মনের একটি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতও লেখক দিয়েছেন। যখন সীমিত ক্ষমতায় কুবের ঘরের চালের জন্য বরাদ্দ শন দিয়ে মালার আতুড়ের বিছানা পাতে, তখন মালা তাকে অনুরোধ করে ভাঙ্গা ঘরের ফুটো চাল মেরামত করে ঘরে বর্ষার জল আটকাতে তার বিছানার থেকে শন নিয়ে যেতে।

লেখক তখন কুবেরের চোখ দিয়ে আমাদের দেখান — ''মালার মুখে এমন নিঃস্বার্থ উক্তি প্রায় শোনা যায় না। কুবেরের মুগ্ধ হওয়া উচিত ছিল....।'' কিন্তু এই সংকীর্ণতা তো একা মালার নয়, সামগ্রিকভাবে কেতুপুরের জেলেপাড়া সম্পর্কেই তো সত্য। তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য বঞ্চনা বেষ্টিত জীবনে স্ত্রী-পুরুষ কারও মধ্যেই- যে উদারতা বা স্বার্থত্যাগ নেই, সেকথা তো লেখক নিজেই ইতিপূর্বে স্বীকার করেন। তাই মালার মধ্যে ছেলেমেয়েদের জন্য উদ্বেগপ্রকাশ, রূপকথা বলা, ভাত মেখে খাওয়ানো ইত্যাদি আচরণে যে কোমলতা প্রকাশ পায়, মালা সেখানেই অন্য জেলে রমণীদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে।

মালার কোমলতা শুধুমাত্র সন্তানবাৎসল্যেই নয়, প্রকাশ পায় বন্যার সময় তার পিত্রালয়ের সবার খবর আনার জন্য কুবেরকে চরডাঙায় পাঠাবার ঘটনাতেও। কিন্তু এই মমতাই তার জীবনের কপিলারূপী বিপর্যয়কে ডেকে নিয়ে আসে। কপিলা তার সংসারে না এলে, ছলাকলার আবর্তে কুবেরকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা না করলে, কুবেরের কাছে মালা-কপিলার বৈপরীত্য ধরা না পড়লে, তার থিতু দাম্পত্য-জীবনে ফাটল ধরত না। মালার হাসিবিহীন বিষণ্ণ মুখ কুবেরকে কখনও বিরক্ত করেনি, যতদিন না কপিলা তার অকারণ উচ্চকিত হাসিতে কুবেরকে ক্ষণে ক্ষণে চমকিত, মুগ্ধ করেছে। বরং 'তাহার দারিদ্র্যপূর্ণ সংসারে ওই অলস অকর্মণ্য রমণীটির জন্য কুবের' নিবিড় স্নেহ অনুভব করতেই অভ্যস্ত ছিল। স্বামীর অক্ষমতা ও দারিদ্র্যের কারণে মালার চাহিদাও ছিল নিতান্ত ছোটমাপের — কখনও বা একপয়সার দশখানা সূচ, কখনও বিবাহযোগ্য গোপীর জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র বিবাহ-উদ্‌যোগ। কুবেরও মালার মতো স্ত্রী পেয়েই গর্বিত ছিল। কিন্তু কপিলা কুবেরের জীবনে আসার পর থেকেই মালার জীবনে উপেক্ষা নেমে আসে। চলে ফিরে বেড়াবার ক্ষমতা না থাকলেও নিজের ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সে বুঝে নেয় কুবের কপিলা সম্পর্কের গতি কোন পথে চলেছে। হয়তোবা তারই সংসারের আবেষ্টনীর মধ্যে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে কুবের-কপিলার অন্যায় মাখামাখিও তার চোখে পড়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, নিজের অধিকার বজায় রাখতে কোনো দোষারোপ সে কাউকে করেনি। বরং এক আশ্চর্য যুক্তিবোধে সে নিজের কমতি কোথায় তা বুঝে নিয়ে সেটুকুকে পুষিয়ে নিতে চেয়েছে। গোপীর আমিনবাড়িতে চিকিৎসা করিয়ে পা সারিয়ে তোলার পর থেকেই মালার উদ্‌গ্রীব চেষ্টা দেখা যায় — তার নিজের পায়েরও খুঁতটুকু সারিয়ে নেবার। এ ব্যাপারে কুবেরের অনীহা তাকে ক্রমশ ক্ষিপ্ত করে তোলে। মরিয়া চেষ্টায় সে লখাকে সঙ্গে নিয়ে একসময় মেজবাবুর সঙ্গে আমিনবাড়ির হাসপাতালে যায়, কুবেরের অজান্তে। হতাশ হয়ে ফিরতে হয় তাকে কারণ তার পায়ের খুঁত সারবার নয় — ডাক্তারের এই রায় তার মনের সমস্ত উৎসাহকে নির্বাপিত করে। কিন্তু এই হতোদ্যম অবস্থায় তাকে সান্ত্বনা দেওয়া দূরে থাক, কুবেরের স্বামীসুলভ ক্রোধ তার সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দেয়। কলহের এক তুঙ্গ মুহূর্তে সে জানিয়ে দেয় — কুবের কপিলার হোটেলে একত্রে রাত্রিবাসের কথা সে জানে। কপিলার মোক্তারবাবুর বাড়ী রাত্রিযাপনের গল্প সে তার নারীসুলভ বুদ্ধিতেই খারিজ করে দেয়। কুবেরের নতুন পাওয়া সুখের উৎস কি তা বুঝেও এতদিন এক অসহায় চিরস্থায়ী অক্ষমতার কারণেই সে চুপ করে ছিল। ধরা পড়া আহত পশুর মতো কুবেরের দেওয়া শারীরিক আঘাতই তার অনুমানের সত্যতাকে দৃঢ়ভাবে তার কাছে প্রতিষ্ঠিত করে।

মালা ছেলেবেলা থেকেই তার স্নেহ-প্রেমের প্রতিদান হিসাবে আঘাত পেতে অভ্যস্ত। ছেলেবেলায় ভ্রাতৃপ্রেমের মূল্যস্বরূপ তাকে ছেঁচা খেতে হত অন্য দুর্দান্ত বালকদের কাছে। বিবাহ-উত্তর পর্বে সন্তানস্নেহের মূল্যও সে লখা-চণ্ডীর কাছে পায়নি। পিতৃ পরিবারের প্রতি মমত্ব প্রকাশের মূল্য তাকে দিতে হয়েছে কপিলার হাতে কুবেরকে অসহায়ভাবে সমর্পণ করে। সহোদরা হয়েও কপিলা ও মালার অবস্থান জীবনের দুই বিপরীত মেরুতে। একজন দুর্বার, বেপরোয়া, প্রাণোচ্ছল, স্ব-প্রকাশ, গতিময়। অপরজন স্থির, অচঞ্চল, উচ্চলতাহীন, মমতাময়ী কিন্তু তীব্র

সংবেদনশীল। তার এই সংবেদনশীলতার প্রকাশ ঘটতে দেখি তখন — কুবের যখন অধরের কাছে কপিলার চরডাঙায় এসে থাকার কথা শুনে, দোল-উপলক্ষে বিনা-নিমন্ত্রণেই মালাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠে। পুরুষের বহুচারিতার কথা তার অজানা নয়। তাই সন্দিগ্ধ মালা কুবেরের এই অহেতুকী লৌকিকতা রক্ষাকে প্রশ্রয় দেয়নি। সংসারে নিজের অস্তিত্বকে সে জাহির করেনি কখনোই। কিন্তু সে নির্বোধ, জড়ও যে নয়, তাও সে ক্রমশ কুবেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

নিজের অধিকারের ভূমিটুকুও যে শেষ পর্যন্ত তাকে হারাতে হয়েছে, তার কারণ এক অসম যুদ্ধ। কুবের কপিলার সম্পর্ক সুচতুর হোসেনের নজর এড়ায়নি। মালা-কুবেরের দাম্পত্যবন্ধনের শৈথিল্যও হোসেন টের পেয়েছে। শেষপর্যন্ত তাদের সম্মিলিত চক্রান্তই মালাকে কেতুপুরে ফেলে রেখে যায় অসহায়, নিঃসম্বল, কতগুলি নাবালক সন্তানের রক্ষায়। যদিও হোসেন কুবেরকে প্রবোধ দেয় যে মালা ও তার সন্তানদের সে পরে ময়নাদ্বীপে নিয়ে যাবে। কিন্তু পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারেন — এ নিছক কথার কথা। ময়নাদ্বীপের সমাজে অক্ষম, পঙ্গুর স্থান নেই, যে কারণে বসিরকে বিতাড়িত হতে হয়। কুবেরের মধ্যে সামান্যতম দায়বদ্ধতা বা বিবেক দংশন ঘটলে তার থেকে তাকে মুক্ত করে দেওয়াই ছিল হোসেনের এইকথা বলার উদ্দেশ্য। কুবেরও দায়মুক্ত হয়ে কপিলাকে নিয়ে গিয়ে ওঠে হোসেনের নায়, অভিমুখী হয় ময়নাদ্বীপের। পিছনে পড়ে থাকে অসম্পূর্ণ, অবহেলিত, অক্ষম মালা, চরম উপেক্ষার অন্ধকারে হারিয়ে যায় তার অস্তিত্ব।

৫৮.৫ কপিলার চরিত্র ঃ কুবেরের জীবনের নিয়ন্তা

কপিলার চরিত্র বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক মৌলিক চরিত্র হিসাবে, সমালোচকগণের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু একটু পিছিয়ে গিয়ে অন্বেষণ করলে, কপিলাকে যে-কারণে বিস্ময়কর বলে মনে হয়, বাংলা সাহিত্যে তার পূর্বাভাস অনেক নারীর মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে — একথাও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই। নারীত্ব সম্পর্কে যুগসঞ্চিত যে সংস্কার, প্রথা আমাদের মনে কায়েম হয়েছিল তাকে এক কথায় বলতে গেলে বরং বলা ভালো — তা একপ্রকার জড়সুলভ মৌনতা ও সহনশীলতা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে প্রথম সেই প্রচলিত প্রথাকে আঘাত করে সৃষ্টি করলেন এমন কিছু নারীচরিত্রের যারা স্পষ্টবাদী, অধিকার সচেতন, প্রগলভ। দাবি প্রকাশে, ধিক্কারে, সমালোচনায় এমনকি অসামাজিক প্রেম-নিবেদনেও তারা অকুণ্ঠ। সেই পথেই কালক্রমে এসেছে বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা ('দুর্গেশনন্দিনী'), রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী ('চোখের বালি') শরৎচন্দ্রের কমল ('শেষ প্রশ্ন')। এই সূত্রে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকবর্গের সৃষ্ট অন্যান্য আরও কিছু নারীচরিত্রও উল্লিখিত হবার দাবী রাখে। আমাদের মনে রাখতে হবে — এরা সবাই কপিলার পূর্বজা। তা সত্ত্বেও কপিলার উদয় আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয় কারণ তার অগ্রজারা সবাই সমাজের উচ্চ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। শিক্ষা, অর্থ, প্রগতি তাদের পাদপীঠ হিসাবে ছিল। অপরপক্ষে শিক্ষা-বিত্তহীন, গ্রাম্য নারী হিসাবেই কপিলার পরিচিতি সীমাবদ্ধ। এহেন কপিলার অমার্জিত রূপের মধ্যে সাহস ও কোমলতা, শাসনবশ্যতা ও বিদ্রোহ, ছলনা ও প্রগলভতা যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, তা-ই তাকে অভিনবত্বের জায়গায় নিয়ে গেছে।

লেখকের নারীচরিত্রের উপর ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের পরীক্ষামূলক প্রয়োগের ফসল — কপিলা। তার মধ্যে যে আদিম মনোবৃত্তি নিহিত তা যেন সৃষ্টির আদি রহস্য। তার চরিত্রগত তারল্য তার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সমীকৃত। তাই উপন্যাসে অধিকাংশ সময়ই কপিলা-কুবের সাক্ষাৎপর্ব ঘটে জলের নিকটবর্তী স্থানে। কুবেরের বিয়ের সময়

কপিলা এক দুরন্ত কিশোরী, পুকুরের জলে, নদীর জলে তার লীলায়িত নানা ভঙ্গিমা তখন থেকেই কুবেরের চোখ ঝলসে দেয়। দীর্ঘ অদর্শনের পর, বন্যার সময় মালার অনুরোধে চরডাঙ্গা থেকে মালার ভাই বোনদের কেতুপুরে নিয়ে যেতে এসে কুবেরের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হয় কপিলার। সর্বপ্লাবী সেই জলের মধ্যে কপিলা জলবৎ তারল্যে কুবেরের চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কেতুপুরে এসে নিকটবর্তী পদ্মার উদ্দামতা, গতিময়তা, রহস্যপরায়ণতা সবকিছুই যেন কপিলা আত্মস্থ করে নেয় তার মধ্যে। কুবেরের কাছে পদ্মার মতই সে দুর্বোধ্য অথচ আকর্ষনীয়।

দুরন্ত কপিলার আকর্ষণ কুবেরের কাছে যতই থাক না কেন, তার মা এবং অগ্রজা মালার কাছে কিন্তু তা প্রশ্রয় পায়নি, বরং বিরক্তি অসন্তোষ ঝরে পড়েছে তাদের কণ্ঠে। মালা-কপিলার মা বলে — ''তোমারে কমু কী, মাইয়ারে নিয়া জইলা মরি — হরে বাপ, কপিলার কথা কই ..... এই পোড়াকপাইল্যার কথা কই ..... অলক্ষ্মীর মরণ নাই। '' স্বামী হিসাবে শ্যামাদাসকে অপছন্দ হতেই তার স্বেচ্ছায় স্বামীগৃহ ত্যাগ করার দুঃসাহসিকতা তার আপনজনেরাও ভালো চোখে দেখেনি। কিন্তু বাঁশের কঞ্চিত মত অবাধ্য সে। নিজের মনের কাছে ছাড়া সহজে বশ্যতা স্বীকার করার ধারাই তার নয়। তাই যখন ইচ্ছা হয় জেদ করে কেতুপুরে আসে, সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বড় ভাই অধর এলে ঝগড়া করে, গাল দিয়ে তাকে ফিরিয়ে দেয়। আবার নিজেই একসময় বাধ্য ঘরের বউটি হয়ে শ্যামাদাসের সঙ্গে চলে যায় আকুর-টাকুরে, পিছনে বিভ্রান্ত, হতবুদ্ধি কুবেরকে ফেলে রেখে।

এই কেতুপুরে থাকার সময়ই কুবেরকে ঘিরে কপিলার নিজের মনে একটি স্বপ্নের জাল বুনে তোলার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠতে তাকে। তাই মালার ভাইবোনদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে ফতুর-হতে-বসা কুবের তাদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেও রাত্রির নির্জন অন্ধকারে কপিলার তামাক পৌঁছে দেবার ছলে নিভৃত সঙ্গলাভ তাকে লোভাতুর করে তোলে। কপিলার সেবা, উদ্দামতা, শারীরিক বিভঙ্গ, খুনসুটি — সবকিছুই কুবেরের কাছে গ্রহণযোগ্য, সহনীয়। বর্ষার উথলে ওঠা পদ্মার মতো কপিলা 'ঘুম আসিবার আগেই তাহাকে স্বপ্নও আনিয়া দেয়'।

গোপীর আহত পায়ের চিকিৎসা উপলক্ষে আমিনবাড়ির হাসপাতালে যাওয়া, বিকেলে সবাই ফিরে এলেও কপিলার জেদ করে কুবেরের সঙ্গে থেকে যাওয়া এবং তাদের একত্রে হোটেলে রাত্রিবাস — এই সবকটি ঘটনাতেই উদ্যোগহীন, স্বল্পতুষ্টির কুবেরকে উজ্জীবিত করতে কপিলার দুঃসাহসিক পদক্ষেপ লক্ষ করা যায়। কপিলার সাজসজ্জা, লীলাখেলা কুবেরের চারপাশে যে কুহক সৃষ্টি করে তুলেছিল, এইখানেই কুবের তাতে আত্মসমর্পণ করে। মালাকে নিয়ে যে গতানুগতিক জীবনে কুবের অভ্যস্ত ছিল, এইখানে এসেই তার দিক পরিবর্তন ঘটে গেল। তাই এরপর থেকেই কুবের একান্তভাবে কপিলা অভিমুখী। শ্যামাদাসের সঙ্গে কপিলা আকুরটাকুরে ফিরে গেল কুবের এক দুরন্ত মানসিক অস্থিরতায় নিক্ষিপ্ত হয়। ভুলে যায় কপিলার সঙ্গে তার সামাজিক সম্পর্কের দূরত্ব। জ্যা-নিক্ষিপ্ত তীরের মতো সে উপস্থিত হয় শ্যামাদাসের বাড়ীতে — অনাহুত, অবাঞ্ছিত অতিথি হিসাবে। সেখানে অপমানিত হয়েও দোলের সময় কপিলা চরডাঙ্গায় এসেছে শুনেই সে লখা চণ্ডীকে মামাবাড়ী নিয়ে যাবার ছলে, মালাকে উপেক্ষা করে উপস্থিত হয় সেখানে। কপিলার পুকুরের জলে অর্ধ-নিমজ্জিত শরীর কুবেরকে উদ্বেল করে তোলে। সে কপিলার কাছে স্বীকার করে 'তর লাইগা দিবারাত্র পরাণডা পোড়ায় কপিলা'। যে-কুবের নিজের আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনার একান্ত নিরুৎসাহ, নিজের প্রাপ্য বুঝে নিতে যে উদ্যমহীন, ভাগ্যের হাতে মার সইবার জন্য যে পিঠ পেতে দাঁড়ায়, সেই কুবের আধ-জাগা আধ-ঘুমন্ত ক্লান্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখতে থাকে ময়নাদ্বীপে গিয়ে হোসেনের কৃপায় কপিলাকে লাভ করার। এনায়েত এবং বসিরের স্ত্রীর মিলনে হোসেনের সহায়তা কুবেরকে আকাশ-কুসুম রচনায় উদ্দীপির করে — সেও কোনো একদিন প্রচলিত সমাজনীতির দাম্পত্য সংস্কারকে ত্যাগ করে ময়নাদ্বীপের মুক্ত, উদার, স্বাধীন জীবনে তার প্রার্থিত নারীটিকে লাভ করবে।

কুবেরের ঝিমিয়ে পড়া অস্তিত্বকে এইভাবে ভিতরে ভিতরে জৈবিক আকর্ষণের তাড়নায় জাগ্রত করার কৃতিত্ব কপিলার। চুরির অপরাধে জেল খাটার হাত থেকে বাঁচবার উপায় হিসাবে হোসেন-নির্ধারিত ময়নাদ্বীপে যাওয়া ছাড়া হয়ত কুবেরের গতি ছিল না। কিন্তু সেই অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎকে অন্তত রমনীয় করে তুলবার জন্য কপিলার সঙ্গ যে তার একান্ত কাম্য ছিল তা বোঝা যায় উপন্যাসের শেষাংশে। কপিলার কুবেরের প্রতি প্রায় মরিয়া যে প্রশ্ন — ''আমারে নিবা মাঝি লগে?'' তাতে কপিলারও অনাকাঙিক্ষত বিবাহ-বন্ধনকে অস্বীকার করার আমন্ত্রণ লুকিয়ে ছিল। শ্যামাদাসের নিরস সাংসারিক বুদ্ধির সঙ্গে কপিলার নিজস্ব প্রবণতার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। তার আরও কিছু পাওয়ার আকাঙক্ষা ছিল জীবনসঙ্গী পুরুষের কাছে, যে-আকাঙক্ষাপূরণের সম্ভাবনা সে খুঁজে পেয়েছিল নির্বিবোধ, পরিশ্রমী, ভাবুক কুবেরের মধ্যে। তাকে অধিকার করতে সে একে একে প্রয়োগ করেছে তার অধিকৃত সবটি রমনীয় অস্ত্রকে। নারীর চিরন্তন যে ঈপ্সা — বাঞ্ছিত পুরুষকে জয় করা, তাতে সে সাফল্য পেয়েছে কুবেরের ভাবভঙ্গী ও বাচনের মধ্য দিয়ে। নিরুদ্দেশ যাত্রার আগে কুবেরকে সে জেল খাটার অনুরোধ জানায় কারণ সামাজিক বন্ধনের শেষ রেশটুকু তখনও তার পায়ে জড়িয়ে ছিল। নিরুপায় কুবের ময়নাদ্বীপে যাবার জন্য নৌকোয় উঠে বসলে, কপিলার মন যে-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দোলাচলতায় দুলছিল তা ছিন্ন হয়ে যায়। অ-তৃপ্তির বন্ধন থেকে সাফল্য ও মুক্তির জীবনের বন্ধ কপাট খুলে নতুন জীবনে ভেসে যাবার লোভ হাতছানি দিয়ে ডাকে কপিলাকে। তাই কুবেরের সম্মতি পাওয়া মাত্র সে-ও উঠে আসে হোসেনের নৌকোয়, চলে যায় তাদের যুগ্ম স্বপ্নের বাস্তবায়নের পথে — ময়নাদ্বীপের বন্ধনহীন সমাজে।

গৃহের পরিধিতে বাঁধা যায়, কপিলার মধ্যে এমন গড়পরতা নারীত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই নানা ছুতোয় শ্যামাদাসের সংসার ফেলে সে কখনও চলে আসে চরডাঙ্গায় কখনও কেতুপুরে। সংসার নারীর আরও একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন — সন্তান। এদিক থেকেও কপিলা মুক্ত, তার একমাত্র কন্যাসন্তান মারা যাওয়ার পর নতুন কোনো বাৎসল্যবন্ধন তাকে শ্যামাদাসের সংসারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে রাখেনি। কপিলার উৎকেন্দ্রিকৃতা তাই তার ফেলে আসা সংসারে তেমন কোনো আলোড়নও জাগায় না। নিজের প্রার্থিত স্থানটি সে ক্রমশ খুঁজে পায় কুবেরের আগাগোড়া দারিদ্র্য-বেষ্টিত জীবনে, স্বেচ্ছায় সে ত্যাগ করে শ্যামদাসের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। কুবেরের অকপট স্বীকারোক্তিতে সে বোঝে — কুবেরের জীবনের কেন্দ্রভূমিটি স্থানান্তরিত হয়েছে কপিলার মধ্যে। মালার প্রতি মমতা, কুবেরর মালার সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও, নিজের স্থান খুঁজে নিয়ে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য সে তার যাবতীয় ছলাকলা দিয়ে গ্রাস করেছে কুবেরকে। কুবেরের যাবতীয় অভাববোধ, অনাস্বাদিত অভীপ্সার শূন্যতাকে সে সুকৌশলে ভরাট করে তুলেছে নিজের অস্তিত্ব দিয়ে। জীবনসঙ্গিনী হিসাবে মালা কুবেরের কাছে যতটাই সঙ্গতিহীন, কপিলা ততটাই সক্ষমতার পরিচয় রেখেছে। তাই নারী-পুরুষের যে প্রকৃতি নির্ধারিত সম্পর্ক — পারস্পরিক সমগ্রতা সৃষ্টি, সেদিক থেকেও কপিলাই যোগ্যতরা হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র হিসাবে কপিলা তার অস্তিত্বকে করে তুলেছে অনস্বীকার্য।

৫৮.৬ হোসেন মিয়া ঃ কেতুপুরের নিয়ন্তা

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের হোসেন মিয়া চরিত্রটি এমনই এক পরস্পরবিরোধী গুণাগুণের সমন্বয়, যে, সব সমালোচকই তাকে একবাক্যে জটিল বলে স্বীকার করে নেন। তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি না তাকে পুরোপুরি কেতুপুরের ধীবরগোষ্ঠীর অঙ্গীভূত করে, না তাকে তথাকথিত জমিদার ও তার তাঁবেদার গোষ্ঠীর একজন বলে পরিচিত করে। কিন্তু কেতুপুরে তার অস্তিত্ব বিধিলিপির মতই অলঙ্ঘ্য। কুবেরের অভিজ্ঞতায় সে যেমন প্রায় ঐশী

শক্তির সমতুল্য, তেমনি সমগ্র জেলেপাড়ার কাছেই সে তাই। 'সে যা ঘটায় তা সমস্তই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী' — এই সূত্রের উপর নির্ভর করেই উপন্যাসে হোসেনের আবির্ভাব, কুবেরের পরিণতি। লেখক তার প্রথম আবির্ভাবের বর্ণনায় তার পরিচয় দেন এইভাবে — 'একটু রহস্যময় লোক এই হোসেন মিয়া' আর 'বড় অমায়িক ব্যবহার হোসেনের।' প্রথম ক্ষেত্রে তার রহস্যময়তা ঘনীভূত প্রধানত তার পূর্বজীবন এবং বর্তমান কর্মজীবনকে কেন্দ্র করে। কেতুপুরে নোয়াখালি থেকে এসে কয়েকবছর ধরেসে বাস করছে। কিন্তু সেই কয়েকবছর আগে আসা হোসেন ছেঁড়া লুঙ্গি, একঝাঁক রুক্ষ চুল আর খড়ি-ওঠা গাত্রচর্মের অধিকারী এক হাঘরে মানুষ, আশ্রয়ের জন্য যাকে দরিদ্র জেলে জহরের বাড়িতে থাকতে হয়, জহরেরই নৌকা বাইতে হয়। অথচ কয়েকবছর বাদে সেই হোসেনই চুলে কলপ লাগিয়ে, নুর মেহেদীরঞ্জিত করে, আতর মেখে, তার 'বেঁটে-খাটো তৈলচিক্কন শরীরটি' আজানুলম্বিত পাতলা পাঞ্জাবীতে ঢেকে নিজের পানসিতে পদ্মায় পাড়ি দেয়। জমিজায়গা কিনে, ঘরবাড়ি তুলে, দুটি স্ত্রীসহ সে এখন পরম সুখে দিন কাটায়। এই সুখ ও সচ্ছলতা অর্জনের পথটিই তার রহস্যময়তার দ্বিতীয় কারণ। তার ব্যবসায়িক কীর্তিকলাপের কোনো সুস্পষ্ট হদিশ কেতুপুরের মানুষজন পায় না। নিত্যনতুন উপার্জন পদ্ধতি, পনেরোদিন একমাসের জন্য উধাও হয়ে যাওয়া, হঠাৎ গ্রামে ফিরে একেবারে কিছুই না করে কয়েকদিন বসে থাকা — এই সকল কাজ ধীবরগোষ্ঠীর পরিচিত জীবিকার্জনের অভিজ্ঞতার বাইরে। তাই হোসেনের কর্মকুশলতা যেমন তাদের চমৎকৃত করে, তেমনি কোনো অজানা আশঙ্কায় তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতেও তারা সচেষ্ট হয়।

কেতুপুরের মানুষ না হয়েও একঅর্থে কেতুপুরের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠা — হোসেনের এই উত্থানের পেছনে একদিকে যেমন তার অর্থনৈতিক উন্নতি সক্রিয় হয়েছে, অপরদিকে তেমনি সকলের সঙ্গে সহজ সম্পর্কসূত্র, নৈকট্যসৃষ্টির বিশেষ ক্ষমতাটিও দায়ী বলা যায়। কেতুপুরের মানুষজনের একেবারে ঘরের ভিতরে এসে তাদের কুশলসংবাদ নেয়, 'ভাঙা কুটীরের দাওয়ায় ছেঁড়া চাটাই-এ বসিয়া দা-কাটা কড়া তামাক টানে', রসিকতা করে গোপী বা রসুলের বালিকাকন্যাকে 'বিবিজান' বলে ডাকে, কুবের বা রাসু তার সম্বোধনে 'কুবিরবাই' বা 'রাসু বাই' হয়ে ওঠে। অন্তঃপুরেও হোসেনের অপ্রতিহত প্রভাবের কথা আমরা বুঝতে পারি যখন মালা সামান্য একপয়সায় দশটি সূঁচের জন্যও হোসেনের উপর নির্ভর করে। ঝড়ে ঘর পড়ে গেলে, বর্ষায় ঘরের ফুটো চাল মেরামতিতে শন চাইতে, উপবাসের সময় বিনাসুদে কর্জ চাইতে এমনকি বিবাহযোগ্য কন্যার পাত্র খুজতেও কেতুপুরের কাছে হোসেনমিয়াই একমাত্র উপায়, মুস্কিল-আসান। এহেন হোসেন মিয়ার যে অবাধ গতিবিধি, অপ্রতিহত প্রভাব জেলেপাড়ায় থাকবে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

তবে হোসেনের এই অপরিহার্যতা জেলেপাড়ার উপর অনেকটাই তার স্ব-আরোপিত। তার উপর সর্ববিষয়ে নির্ভর করেও মনে মনে কেউই তাকে বিশ্বাস করেনা, অসংকোচ আপনত্বে বরণ করেনা। নিজেদের জীবনের অনতিক্রম্য দারিদ্র্য তাদের সমস্ত জগৎ, বিশেষতঃ স্বার্থলোভী অর্থবান মানুষদের প্রতি অবিশ্বাসী করে তুলেছে। তাই হোসেনের অন্তরঙ্গতা স্থাপন আসলে তার আশু কোনো মতলব হাসিলের আয়োজন — এই শঙ্কায় তারা নীরবে তাকে সহ্য করে মাত্র। ''এইসব অর্ধ-উলঙ্গ, নোংরা মানুষগুলির জন্য বুকে যেন তাহার ভালবাসা আছে। উপরে উঠিয়া গিয়াও ইহাদের আকর্ষণে নিজেকে সে যেন টানিয়া নীচে নামাইয়া আনে।''— এই কথাগুলির 'যেন' শব্দটিই হোসেনের উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে তার নৈকট্যের ছলনাসৃষ্টির কূটকৌশলটিকে আমাদের কাছে পরিস্ফুট করে তোলে। ''ধনী-দরিদ্র, ভদ্র-অভদ্রের পার্থক্য তাহার কাছে নাই, সকলের সঙ্গে সমান মৃদু ও মিঠা কথা'' এবং লালচে দাড়ির ফাঁকে সবসময়ের মিষ্টি হাসিটুকু তার মূলধন, যা দিয়ে সে কেতুপুরের বুকের উপর জাঁকিয়ে রাজত্ব করে।

কিন্তু অমায়িক হোসেনের ভালোমানুষির অপরপিঠে তার যে-মূর্তি আত্মগোপন করে আছে তা যেমনই নির্মম, তেমনই স্বার্থকেন্দ্রিক। যে শত্রু, যে তার ক্ষতি করে অর্থাৎ তার স্বার্থে ঘা দেয়, তাকে সে মর্মান্তিকভাবে শাস্তি দেয় — এই সংবাদ স্বয়ং লেখকই আমাদের দিয়ে দেন। গরিবের দুঃখমোচনের ভেক আসলে তার স্বার্থসিদ্ধিরই কৌশল। তাই জমিদার মেজবাবুর চেয়ে অনেক বেশী টাকা রোজগার করেও, মাঝিত্বের পুরনো জীর্ণ খোলসটি গা থেকে না খসিয়েই সে মাঝিদের দল ভিড়ে যায়। রাসুর ময়নাদ্বীপ থেকে ফিরে আসার পর, প্রকাশ্য জমায়েতে হোসেনের কীর্তির কথা ফাঁস করা সত্ত্বেও, অমায়িক হোসেন রাসুকে অবধারিত শাস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি দেয়, আরও গভীর, জটিল কোনো উদ্দেশ্যসাধনে তাকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে। উপন্যাসের শেষপর্বে গোপীকে বিয়ে করতে চেয়ে কুবেরের সঙ্গে রাসুর যে বিবাদ ঘনিয়ে ওঠে এবং পীতমের ঘটি চুরের কাণ্ডে রাসু অথবা কুবেরের জড়িয়ে থাকার প্রশ্নে, হোসেনের পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্তেরই সফল রূপায়ণ ঘটেছে, এমন একটি আভাস আমরা লক্ষ্য করি।

আসলে হোসেন এক ধূর্ত ব্যবসায়ী। সাহিত্যের প্রচলিত অর্থে খল চরিত্র যাকে বলা হয়, তেমন সরলীকরণ তার স্বভাব সম্পর্কে করা যায় না। গোরুছাগল থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত, এমনকি আফিম চালান দেওয়ার ব্যবসাতেও তার দ্বিধা নেই। তার কর্মক্ষমতা, তীক্ষ্ণ লোকচরিত্র জ্ঞান, দক্ষ ব্যবসায়িক বুদ্ধি এবং কূটকৌশলই তাকে তার স্বপ্নের বাস্তবায়নে, উদ্দেশ্যের সফল রূপায়ণে পৌঁছে দেয়। ধর্মের প্রতি তার আস্থা নেই, সে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী। নিজের ভাগ্যকে সে নিজের হাতেই বিপরীতমুখী চালিত করেছে। নৌকায় বসে যে-হোসেন কম্পাসের দিকে স্থিরনেত্র হয়ে থাকে, সেই একই একাগ্রতা তার ইচ্ছা হাসিলের ক্ষেত্রেও। কী সীমাহীন তার ধৈর্য ও অধ্যবসায় তা কুবেরের মতো স্বল্পবুদ্ধির মানুষও অনুভব করতে পারে, অনুভব করে বিস্মিত হয়। ''কী প্রতিভা লোকটার, কী মনের জোর''— কুবেরের এই মন্ত্রমুগ্ধ প্রশংসা হোসেন মিয়ার সেই কর্মবীরসুলভ মূর্তিকেই আমাদের কাছে প্রকট করে তোলে। কুবেরের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ যেন আমরাও বিশ্বাস করতে থাকি হোসেনের অসাধ্য কিছুই নেই।

হোসেনের এই অসাধ্যসাধন ক্ষমতাকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতেই বোধহয় লেখক তাকে স্বভাবিকবিত্ত বানিয়ে তুলেছেন। ছেঁড়া কাপড়ে, আধপেটা খেয়ে, জলে কাদায় ঘুরতে ঘুরতেও তার মনে ভেসে আসত গানের চরণ। আজ সম্পন্নতায়, স্বাচ্ছল্যে হোসেন তার থেকে দূরে সরে এলেও গানের ভান্ডার তার নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তাই কুবেরের ঘরের ফুটো চালার নীচে; ময়লা চাটাইয়ের বিছানার, উদরে উপবাস নিয়ে রাত্রিযাপন করেও কুবেরের কাছে গানের প্রসঙ্গে তার লাজুক স্বীকারোক্তি প্রকাশ পায় এইভাবে — 'আমি বাইন্ধবার পারি'। কুবেরের মত মুগ্ধ, একনিষ্ঠ শ্রোতা পেয়ে সে তাৎক্ষণিক সৃজনক্ষমতায় সুর করে, মুখে মুখে গান বাঁধে। অভিভূত কুবেরকে অ-বাক্ করে রেখে সে ঘোষণা করে — ''খুশ হলি না পারি কী?'' তার এই গানের কথার মধ্যেই হোসেনের নিজস্ব জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। 'কত ঘুমাইবা' এই ধুয়ার মধ্যে যে সচেতন সতর্কবার্তা নিহিত আছে, সেখানেই হোসেনের কর্মক্ষমতা এবং কর্মপ্রিয়তার আত্মপ্রকাশ। পদ্মার তীরবাসী জেলেদের অতিমাত্রায় অদৃষ্ট নির্ভরতার পাশাপাশি হোসেন সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র। সে নিজেই নিজের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ রচনায় বিশ্বাসী। তাই অকূল জলরাশির মাঝখানে, অনুর্বর, জঙ্গল ও হিংস্র জন্তুজানোয়ারে ভরা, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে জর্জর দ্বীপকে মানুষের বাসোপযোগী করে তুলতে হোসেন মিয়া কঠিন হাতে পাঞ্জা লড়ে চলেছে। নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পনের বিরুদ্ধতাই তার জীবনের সারকথা। তাই এই গান আসলে হোসেনের মনোজগতেরই রূপক, কুবেরের মত উদ্যমহীন মানুষদের পক্ষে উদ্দীপক।

হোসেনকে এইভাবে নানা ঘটনায় কর্মকুশলতার চরম সীমায় উন্নীত করেও লেখক কিন্তু তাকে জমিদার বা ফিউডাল-তন্ত্রের প্রতিনিধিত্বের সঙ্গে সংলগ্ন করে রেখেছেন। কেতুপুরের মানুষমাত্রেই জানে যে সে 'সমুদ্রের মধ্যে ছোট একটা দ্বীপে প্রজা বসাইয়া জমিদারী পত্তন করিতেছে।'' অর্থাৎ মেজকর্তার মতোই সে-ও ভাবী জমিদার হিসাবেই জেলেদের কাছে পরিচিত। নেহাৎ মেজকর্তা তার মতো মাঝিদের কাছে তাঁর শ্রেণিদূরত্ব ঘোচাতে পারেননি বলেই তাঁর নামে অপবাদ রটেছিল। আভিজাত্যের প্রাচীরের আড়ালে পড়ে গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হয়েছিল — 'জেলেপাড়া মেজবাবুর প্রণয়িনীর উপনিবেশ'। জেলে-মাঝিদের অবস্থা ফেরাবার সদুদ্দেশ্য চাপা পড়ে গিয়েছিল এই রটনার অন্তরালে। কিন্তু হোসেনের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। মাঝিত্বের পরিচিত খোলসটিই ছিল তার রক্ষাকবচ, অন্তরঙ্গতা ও আত্মীয়তা তৈরির অস্ত্র। তারই আড়ালে স্বচ্ছন্দে সে চালিয়ে যেতে পেরেছে — ময়নাদ্বীপে তার নিজস্ব উপনিবেশ গড়ে তুলবার প্রক্রিয়াটিকে। তথাকথিত জমিদারদের থেকে তার শোষণের পদ্ধতিও তাই পৃথক, অনেকবেশী সূক্ষ্ম অথচ অমোঘ। সৎ-অসৎ, ধার্মিক-অধার্মিক নৈতিক-অনৈতিকতার কোনো প্রশ্ন সেখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি। নিজের মনোমত একটি দ্বীপের অধীশ্বর হয়ে তার ভূমির উপর অসংখ্য মানুষের কলগান শোনার আকাঙক্ষায় সে অধীর। আসলে সে যেন তার অন্তর্নিহিত শক্তিরই প্রতিফলন দেখতে আগ্রহী। নিজের বিশালতা, অপ্রতিহত সত্তাকে উপভোগের আকাঙক্ষায় সে যেন কেতুপুরের অস্তিত্বই মুছে দিয়ে, তার নিজস্ব উপনিবেশ ভরে তুলতে চেয়েছে কেতুপুরেরই মানুষজনকে নিয়ে। তাই একে একে সপরিবারে রাসু, আমিনুদ্দি, কুবের, আরও অনামা অনেক জেলেকে এককভাবে বা সপরিবারে সে নিয়ে যায় ময়নাদ্বীপে। ''তারা এবার শুধু খাটিবে ও জন্ম দিবে সন্তানের।'' এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যে উপযুক্ত, সমর্থ একক পুরুষের জীবনে সে নারীও যোগায় — এনায়েতের জন্য বৃদ্ধ বসিরের স্ত্রী, আমিনুদ্দির জন্য নছিবন, কুবেরের জন্য কপিলা। কুবেরের চিরতরে ময়নাদ্বীপ যাত্রার আগে কপিলাকে তার সঙ্গিনী হবার যে বিধান, তার উচ্চারণকারীকে সেই নাম না থাকলেও হোসেনের নির্দেশেই যে কুবের-কপিলার অসামাজিক সম্পর্ক ময়নাদ্বীপের পটভূমিতে স্থায়িত্বের দিকে অগ্রসর হয়, তা পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারেন।

এইভাবে হোসেন মিয়া এবং প্রচলিত ধর্মাচার ও সমাজনীতির থেকে বিচ্ছিন্ন ময়নাদ্বীপ উপন্যাসের মধ্যে বারবার ফিরে ফিরে আসে রহস্যের সঙ্গে শঙ্কা, অনির্দিষ্টতার সঙ্গে আকাঙক্ষাপূরণের প্রতীক হিসাবে। ময়নাদ্বীপ ও তার মালিকের এহেন উপস্থিতি আমাদের কাছেও একধরনের বিস্ময় ও কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে হোসেন ও তার দ্বীপের উপস্থাপনার কারণ ও উপযোগিতার ব্যাপারটিও একটু বিশেষভাবে লক্ষ করা প্রয়োজন। এখানে জেলে-মাঝিদের যে দারিদ্র্য-ম্লান ছবি লেখক এঁকেছেন, তার থেকে মুক্তি পাবার জন্যই তাদের কেতুপুর ত্যাগ, ময়নাদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা। এই যাত্রাপথ কষ্টকর, ময়নাদ্বীপে জীবনযাপন ততোধিক কষ্টকর ও বিপদসংকুল। তবুও দুঃখী, দীন মানুষগুলি সেখানে ছোটে বেঁচে থাকার অদম্য বাসনায়। জীবনকে এইখানে টিকিয়ে রাখতে তাদের একমাত্র সহায়ক হোসেন। সর্ব অর্থে সে তাদের পরিত্রাতা। পাঁক-পঙ্কিল, উপার্জনহীন, অনিশ্চিত জেলে জীবন থেকে সেই তাদের বাঁচবার তাগিদে শ্রমজীবী, কৃষিজীবীতে রূপান্তরিত করে।

বেঁচে থাকতে গেলে এই বৃত্তিগত রূপান্তর, গত্যন্তর, উপায়ান্তর অন্বেষণ — এ তো মানুষের সহজাত ধর্ম, জীবনপ্রীতির অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। দারিদ্রের কষাঘাতে কোনঠাসা হতে হতে জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে ধীবরকুলও ময়নাদ্বীপকে তাই উপায়ন্তর বলে গ্রহণ করে, তাকে বানিয়ে তোলে ইচ্ছাপূরণের কল্পলোক আর হোসেনমিয়াকে সেই কল্পনার বাস্তবায়নে পরিত্রাতা। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের প্রকাশকালের সমসাময়িক সমাজ ও অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততাকে কোনো কোনো সমালোচক এইসূত্রে গ্রথিত করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে

এদেশে যে অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারিত্ব, মূল্যবোধের বিনষ্টি, পারিবারিক ভাঙ্গন ইত্যাদি বহুমুখী নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, মধ্যবিত্ত মানুষ তার থেকে বেরিয়ে এইজাতীয় ক্লেদ থেকে মুক্ত, গ্লানিহীন কোনো জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। অভীপ্সিত এই জীবন বাস্তবে ছিল না বলেই তা মায়ার জগৎ, কল্পনার জগৎ হিসাবে দেখা দিয়েছিল। হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ-ও কেতুপুরের জীবনযুদ্ধক্লান্ত মানুষগুলির কাছে এমনই এক কুহক। হিংস্র জন্তু, রোগব্যাধি, কঠোর শ্রমের মধ্যেও সেখানে জেগে আছে প্রত্যাশার নীড়, উপনিবেশ হলেও সেখানেই আছে লোভ, অভাববোধ, হতাশায় সমাপ্তি, ভোগের সূচনা। এইভাবেই ময়নাদ্বীপ ও হোসেন মিয়া একাত্ম হয়ে ক্ষঠে একজাতীয় স্বপ্নসাধপুরণের প্রতীক রূপে দেখা দিয়েছে।—

৫৮.৭ উপন্যাসে বিধৃত নিয়তিবাদ

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে নিয়মিত অমোঘত্ব এতবার ঘোষিত হয়েছে যে অবধারিতভাবেই একটি অদৃশ্য চরিত্র হিসাবে এই নিয়তি কাহিনিবৃত্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। উপন্যাসের হোসেন ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রগুলি যেন নিয়তির হাতের খেলার পুতুল, যাদের কারও সাধ্য নেই নিয়তির বিরোধী, প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠার। যে-পদ্মাকে কেন্দ্র করে এই কাহিনি আবর্তিত, সেই পদ্মাই তাদের নিয়তি। কখনও পদ্মার সঙ্গে সমার্থক হয়ে উঠেছে প্রকৃতির রুষ্টতা কালবৈশাখীর ঝড়।

অবার এই প্রাকৃতিক নিয়তির প্রতিবিম্ব দেখা দিয়েছে হোসেন ও কপিলার মধ্যেও। অর্থাৎ নিয়তি সম্পর্কিত ধারণা প্রাকৃতিক শক্তি ও মানুষীশক্তির মেলবন্ধনে এক জটিল মূর্তি ধারণ করেছে। তার নিষ্ঠুরতা এবং দুর্জ্ঞেয়তাই পদ্মার মাঝি ও জেলেদের কাছে একমাত্র পরিচিত। তার প্রভাবও সব চরিত্রের ক্ষেত্রে সমান নয়। পদ্মা, ঝড় বা হোসেন এসেছে কেতুপুরের সমগ্র সমাজের শ্রেণি-নিয়তি হিসাবে, অন্যদিকে কপিলা এসেছে কেবলমাত্র কুবেরের জীবনের ব্যক্তি-নিয়তি হিসাবে। তবে উভয়পক্ষেরই প্রভাব অনিবার্য, এরাই নিয়ন্ত্রণ-শক্তি, এদের খেয়ালের উপরেই জেলে-মাঝিদের জীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভরশীল।

নিয়তি চেতনার মূলে আছে এক অধরা, অলক্ষ্য শক্তির উপস্থিতি, যা মানুষের সমগ্র জীবনের নিয়ামক এবং যা প্রভাবে মানুষের জীবনে ঘনিয়ে আসে অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়, দুঃখজনক কোনও পরিণতি। এই নিয়তি বিধিলিপির সঙ্গে কখনও কখনও সমীকৃত, দুর্ভাগ্য যার প্রতিরূপ। তার নিশ্চিত পরিণতির হাত থেকে রেহাই নেই কোনও মানুষেরই। তাই নিয়তি সম্পর্কে মানুষ চিরকালই শঙ্কাতুর। তাকে পূর্বনির্ধারণের সুযোগ নেই, তাকে অতিক্রম করার ক্ষমতাও কোনো সাধারণ মানুষের নেই বলেই তার রূপ মানুষের কাছে রহস্যাবৃত, ভয়ানক। পদ্মানদীর মাঝিদের জীবনেও দুরন্ত পদ্মা, বিধ্বংসী ঝড় এবং কূটকৌশলী হোসেনমিয়া এমনই অনির্ধারিত, অনিবার্য কয়েকটি শক্তি, যারা তাদের সুখ-দুঃখের উৎস, বাঁচা-মরার কারণ। কালবৈশাখী ঝড় চায় কেতুপুরের জীবনকে ভূমি থেকে উন্মূলিত করতে, পদ্মার বন্যা বর্ষার জল ভাসিয়ে নিয়ে যায় কেতুপুরের মানুষদের ঘরবাড়ি, রুক্ষ শীতের আঘাত উলঙ্গপ্রায় মানুষগুলির হাড়ে গিয়ে বাজে। আর এই অবকাশে হোসেন চায় ময়নাদ্বীপে এদের পুনঃপ্রোথিত করে প্রজা-উৎপাদনে, তার নিজস্ব জমিদারী পত্তনে। এর কোনো শক্তির কাছেই মাঝিদের নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙক্ষার স্বতন্ত্র্য মূল্য নেই।

লেখক স্বয়ং পদ্মার রূপ দেখে, পারিবারিক সূত্রে পদ্মা সম্পর্কে অবহিত হয়ে, জেলে-জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়ে, শ্রমজীবী এই মানুষদের জীবনে নিয়তিবাদের অনিবার্যতা উপলব্ধি করেছেন। যেখানে আত্মশক্তিতে

প্রাণপণ সংগ্রাম করেও ভাগ্য-বিড়ম্বনাকে এড়ানো যায় না, সেখানেই নিয়তির নিষ্ঠুর উপস্থিতি স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। অশিক্ষিত, দরিদ্র এই জেলে-মাঝিদের রোগ-শোক উপেক্ষা করে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরেও যে শোষণ, অর্থনৈতিক অসাম্য ও দারিদ্রের শিকার হয়ে থাকতে হয় - সেখানেই লেখক নিয়তির প্রভাব লক্ষ্য করেন। যে-নিয়তির অমোঘ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না পেরে শেষপর্যন্ত এই কাহিনীর চরিত্রগুলি ক্রমশ হয়ে ওঠে সংগ্রাম-বিমুখ, স্থাণু। কুবেরের ভাবনায়, উপন্যাসের শুরুতেই নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণপ্রবণ এইসব মানুষগুলির মনের কথা প্রতিফলিত হয়ে ওঠে — ''এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মত, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মত, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।'' অর্থাৎ নিয়তি কুবের ও তার সমগোত্রীয় মানুষগুলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। যে পদ্মা তাদের জীবিকার নির্ভরস্থল, সেই পদ্মাই তাদের আশ্রয়স্থল থেকে বিচ্যুতিরও কারণ। তার কৃপণ দান জেলেদের জালে রূপালি মুদ্রা হয়ে বাঁধা পড়ে না। তার ভয়াল বন্যা কুবেরসহ সব মাঝির জীবনে নিয়ে আসে বিষণ্ণ শঙ্কা। এরই সঙ্গে হাত মিলিয়ে আশ্বিনের ঝড় উৎখাত করে এই মানুষগুলির দীন বাসস্থানগুলিকে, ধ্বংস করে তাদের পারিবারিক সুস্থিতি যা আমিনুদ্দির কাহিনীতে স্পষ্ট স্তব্ধ করে দেয় জীবনের আশানুরূপ গতিকে — গোপীর পা ভেঙ্গে যুগলের মতো পাত্র পাওয়ার সম্ভাবনাকে নির্মূল করে। পদ্মা তাই এখানে রোমান্টিক সৌন্দর্যের আকর নয়, ক্রূর খেয়ালী নিয়তিশক্তির এক প্রকাশ, যার সঙ্গী ঝড়ের মত এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

তবে লক্ষণীয়, পদ্মার শত বিরূপতা সত্ত্বেও এর তীরবর্তী মাঝিরা তার সঙ্গ ত্যাগ করতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। রাসু ময়নাদ্বীপ থেকে ফিরে আসে কেতুপুরের পদ্মা-সান্নিধ্যে, যদিও ময়নাদ্বীপের থেকে উন্নত কোনো জীবনের হাতছানি তার জন্য কেতুপুরে অপেক্ষা করে ছিল না। আমিনুদ্দি ঘর ভেঙ্গে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা হারিয়েও মরিয়া স্পর্ধায় হোসেন মিয়ার কাছে ঘোষণা করে — ''ঘর দিয়া কাম নাই।'' কারণ প্রতিদানে তাকে হোসেনের আজ্ঞাবহ হিসাবে কেতুপুর ত্যাগ করতে হবে। কুবেরও হোসেনের বেতনভুক মাঝি হিসাবে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তার তীরবর্তী লোকজীবনের সঙ্গে পরিচয়ে প্রসন্নতা লাভ করেনি। আজন্ম-লালিত পদ্মার অঙ্গের স্পর্শবিরহিত কুবেরর সমুদ্রে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। পদ্মার এই সমস্ত খেয়ালিপনা সহ্য করেও, তাকে ভালোবেসে, তারই বুকে সঞ্চরণের বাসনা তাকে তার নিয়তির ব্যক্তিস্বরূপের সমীপে নিয়ে এসেছে — সে হোসেন মিয়া এবং কপিলা।

হোসেন শুধুমাত্র কুবেরের নয়, সমস্ত কেতুপুরেরই শ্রেণিনিয়তি। লেখক তার রহস্যঘন জীবন, পরিবর্তিত সৌভাগ্য, প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং প্রভুত্বকামিতা, দরিদ্র মাঝিদের কুক্ষিগত করার কৌশল ও বিনয়ী চাতুর্য, অমায়িক পরোপকারের ছদ্মবেশে স্বার্থসিদ্ধি, তার বিচিত্র ব্যবসা ও ময়নাদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের বিবরণ — কেতুপুর গ্রামনিবাসী জেলে মাঝিদের নিঃশব্দ অথবা ক্ষীণ প্রতিক্রিয়ার সূত্রেই উত্থাপিত করেছেন। ''হোসেন মিয়া হাসিমুখে একেবারে বাড়ির ভিতরে গিয়া জাঁকিয়া বসিয়া গোপনে তাহার গভীর ও দুর্জ্ঞেয় মতলব হাসিলের আয়োজন আরম্ভ করিলেও জেলেপাড়ায় কেহ নাই তাহাকে কিছু বলিতে পারে। বলিতে হয়ত পারে। বলে না শুধু এই জন্যে যে বলা নিরর্থক। তাতে কোনো লাভ হয় না। যা সে ঘটায় সমস্তই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী।'' এই হোসেন কুবেরের প্রতি অহেতুক মনোযোগ ও করুণা প্রদর্শনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তার সর্বগ্রাসী থাবা বিস্তার করে চলে, কুবেরকে কেতুপুর থেকে উৎপাটিত করে ময়নাদ্বীপে নির্বাসিত করতে। শেষপর্যন্ত মৎস্যশিকারীর পরিণতি হয়েছে তার শিকারেরই অনুরূপ। হোসেনের সহায়তার জালে আবদ্ধ কুবের তার ধৃত মৎস্যের মতই আছড়ে পড়েছে অদৃষ্টের গলুই-এ। কপিলাকে সে যখন ময়নাদ্বীপ যাবার আগের মুহূর্তে বলে — ''হোসেন মিয়া দ্বীপে আমারে নিবই

কপিলা'' তখন আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে সরল, নির্বোধ এই মাঝির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কুবেরের জীবনের দ্বিতীয় ব্যক্তি-নিয়তি কপিলা। কপিলার সান্নিধ্য কুবেরের কাছে একই সঙ্গে রোমাঞ্চ ও আশঙ্কার বাহক। মালার খঞ্জতা কুবেরকে বারবার টানে কপিলার চাঞ্চল্যের দিকে। তার রহস্যময় শরীরী-ভঙ্গি, ভাষা-ব্যবহার, ইঙ্গিত নিরীহ কুবেরকে প্রতিবারই শঙ্কিত করে তোলে — কী আছে কপিলার মনে। কপিলা শান্ত কুবেরের সংকুচিত অবস্থা দেখে টিটকিরি দেয়, একই সঙ্গে আকর্ষণ ও প্রত্যাখ্যানের টানাপোড়েনে তাকে উত্তেজিত করে তুলতে চায়। সমাজ ভয়, অভ্যস্ততা ও সংকোচের ঘেরাটোপে আবদ্ধ নিশ্চিন্ত কুবেরকে সে ক্রমশ করে তোলে অসহিষ্ণু, বিভ্রান্ত, হঠকারী। সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে কপিলাকে নিয়ে, কেতুপুরের সমাজ থেকে বিচ্যুত কোনো স্থানে তাকে লাভ করার। অবচেতন মনেই কুবের ময়নাদ্বীপকে নির্বাচন করে তার এই ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নভূমি রূপে।

এইভাবে হোসেনের স্বার্থ, কপিলার সাহস এবং কুবেরের স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্র হিসাবে ময়নাদ্বীপের অনিবার্যতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। নিয়তির অদৃশ্য হাতের টানে পদ্মার জেলে সমুদ্রের দূরতর দ্বীপের মাঝিতে পরিণত হয়। মানুষ যে তার বিশেষ কোনও আর্থ-সামাজিক পরিবেশে নিয়তির নিরুপায় ক্রীড়নক, সেই নিয়তির দ্বীপেই কুবেরের যাত্রা। কুবেরের মতো এক নগণ্য মানুষের দৈনন্দিন তুচ্ছতা, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাময় জীবনের উপর ছায়া বিস্তার করেই এই অমোঘ শক্তির আত্মপ্রকাশ।

৫৮.৮ সারাংশ

পদ্মার তীরবর্তী জেলেজীবন বহুচরিত্রের সমাবেশে পদ্মার মতোই বিশাল বিস্তার নিয়ে এই উপন্যাসে ধরা দিয়েছে। নদীর জলরাশি যেমনভাবে সমুদ্রে এসে মেশে, এই চরিত্রগুলিও তেমনি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ক্ষুদ্র বলয় থেকে অনন্ত জীবনসমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়েছে। তারই মধ্যে কয়েকটি চরিত্র কাহিনি বৃত্তে বিশেষ আবর্ত সৃষ্টি করে, যেমন-কুবের, মালা, কপিলা এবং হোসেন মিয়া। পদ্মার তীরবাসী মানুষদের সঙ্গে চরিত্রধর্মে এক হয়েও, বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তিগত প্রবণতার কারণে এরা পিণ্ডকার জনজীবন থেকে স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে কুবের চরিত্র, তার গোষ্ঠীস্বভাব থেকে ব্যক্তিস্বভাবে নিষ্ক্রমণ তথা মুক্তি। কাহিনির প্রথমদিকে তার উপস্থাপনা পদ্মা-নির্ভর, হরদরিদ্র ধীবরগোষ্ঠীর শ্রেণিপ্রতিনিধি হিসাবে। কিন্তু উপন্যাসে কপিলার আগমনের পর ক্রমশ কুবেরের ব্যক্তিগত জীবনের আশা-নিরাশা, সুপ্ত কামনার দ্বন্দ্ব-সংঘাতই বড় হয়ে ওঠে। তথাকথিক এই 'ছোটলোক' জেলের অসংস্কৃত, ভদ্রেতর জীবনবৃত্তে নানা ওঠাপড়া, নানা তরঙ্গাভিঘাত কাহিনিতেও সঞ্চারিত করে জটিলতা, যার পরিণতিতে কুবেরকে হারাতে হয় তার স্বাধীন জেলেজীবনের মুক্তির চাবিকাঠি, স্বেচ্ছায় পায়ে বাঁধতে হয় হোসেন মিয়ার দাসত্বশৃঙ্খল।

কুবেরকে ঘিরে আবর্তিত দুটি চরিত্র মালা এবং কপিলা, যে দুটিই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের অনন্যতায় শুধুই পরিচিত ধীবরনারীর বলয় থেকেই বেড়িয়ে এসেছে তা নয়, বাংলা উপন্যাসধারায়ও দুটি মৌলিক অভিনব নারীচরিত্র হিসাবে সংযোজিত হয়েছে। সহোদরা হয়েও তারা ভিন্নধর্মী। মালা পঙ্গু, অলস, নিরানন্দ। সংসারের কোণায় পড়ে থাকা তার বিধিলিপি হলেও জগতের সব খুঁটিনাটি সে তার দৃষ্টি ও অনুভবের পথে তীব্রভাবে শোষণ করে

নেয়। অন্যদিকে কপিলার দুরন্ত চঞ্চলতায় আদিম অসংস্কৃত মনোবৃত্তির পরিচয়। নারীপ্রকৃতির সনাতন রহস্য তার মধ্যে খুঁজে পেয়ে কুবের কামনায় উদ্বেল। তারই ছলকলায় বশীভূত হয়ে কুবের স্ত্রী মালা, সমগ্র পরিবার, আজন্ম-লালিত গ্রাম কেতুপুর সবকিছু থেকে ক্রমশ উন্মুলিত হয়ে যায়।

কুবেরের এই উৎকেন্দ্রিকতার সুযোগে তাকে আপন স্বার্থসিদ্ধির জালে চিরতরে বেঁধে ফেলে হোসেন মিয়া, চালান করে দেয় তাকে ময়নাদ্বীপে, কপিলাসহ, নিজের বশংবদ প্রজাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। হোসেনের ব্যক্তিচরিত্র কর্মোদ্যম ও স্বার্থপরতা, ক্রূরতা ও কবিত্বের সমিশ্রণে এক অদ্ভুত জটিল মূর্তি নিয়ে এখানে উপস্থিত। সমগ্র কেতুপুর তার কাছে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হয় কারণ বিপদের ত্রাতা হিসাবে একমাত্র সেই তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। আবার এই হোসেনই তাদের জীবনের যে কোনো বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারে যে কোনো মুহূর্তে, যেমন সে হয়েছে রাসু বা কুবেরের জীবনে।

হোসেনের রহস্যময় উপস্থিতি, কপিলার রহস্যময় ছলাকলা এবং পদ্মার রহস্যময় রোষতুষ্টি এই উপন্যাসে এক অদৃশ্য চরিত্র সৃষ্টি করেছে, যাকে নিয়তি বলে আমরা বারবার উল্লিখিত হতে দেখি। মানব বা প্রকৃতি - তাদের যা কিছু গভীর, গোপন, অশিক্ষিত এই জেলেমাঝিদের কাছে দুর্জ্ঞেয়, তাই-ই তাদের কাছে অজানা কোনো ভীতিপ্রদ শক্তি, নিয়তির প্রতিমূর্তি। পদ্মার বন্যাকে তারা রোধ করতে পারে না, হোসেনের বাড়ির ভেতরে এসে জাঁকিয়ে বসাও আটকাতে পারে না। এদের মধ্যে আবার কুবের অধিকন্তু কপিলার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে নিজেকেও বেঁধে রাখতে পারে না। এই ত্রিমুখী শক্তি একযোগে সক্রিয় হয়ে শেষপর্যন্ত কুবেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কেতুপুর থেকে ময়নাদ্বীপ অভিমুখে।

৫৮.৯ অনুশীলনী

ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। (২০০ শব্দের মধ্যে)।

১) ''কুবেরের সে অত্যন্ত অনুগত। জীবনের ছোটবড় সলক ব্যাপারে সে কুবেরের পরামর্শ লইয়া চলে''। —একথা কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে? এই মন্তব্যের সূত্রে চরিত্রটির স্বভাববৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।

২) ''এই ব্যবস্থা ও কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সমস্ত রাত্রিব্যাপী পরিশ্রমের ক্লান্তি ভুলিয়া কুবের প্রতিদিন খুশী হইয়া ওঠে।'' —কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে? কুবেরের এই ব্যবস্থায় খুশী হবার কারণ কী?

৩) ''রোজ আমারে মাছ দেওনের কথা না তর?'' —এই উক্তিটি কার? কাকে উদ্দেশ্য করে সে এই কথা বলেছে? এই উক্তির সূত্রে বক্তা ও শ্রোতার সম্পর্কটিকে ব্যক্ত করুন।

৪) ''শিক্ষা হোক। নিজের নিজের ভাগ বুঝিয়া লইতে শিখুক।'' —এই উদ্দেশ্য কার? কোন্ প্রসঙ্গে তার এই চিন্তাধারার প্রকাশ?

৫) ''জেলেপাড়ায় যাহারা দু-এক বিঘা জমি রাখে, মেজকর্তাকেই তাহারা খাজনা দিয়া থাকে।'' মেজকর্তা'র যে পরিচয় উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে তা সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

৬) ''হোসেন এখন লাজুক।'' —কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৭) ''সন্তানস্নেহের হিসাবে জেলেপাড়ার জননীদের মধ্যে মালার মৌলিকতা আছে।'' —এই মৌলিকতার প্রকাশ মালার মধ্যে কীভাবে ঘটেছে তার পরিচয় দিন।

৮) ''অলক্ষ্মীর মরণ নাই!'' —এই উক্তিটি কার? কাকে 'অলক্ষ্মী' বলে অভিহিত করা হয়েছে? কেনই বা একথা তার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে?

৯) ''এত দয়া-মায়া এমন কোমলতা জেলেপাড়ার আর কোন মেয়ের নাই।'' —একথা কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে? তার চরিত্রের কী বৈশিষ্ট্য এই উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে?

খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিশদ আলোচনাপূর্বক উত্তর দিন। (অনধিক ১০০০ শব্দের)

১) 'বাংলা উপন্যাসের নারীচরিত্র সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় 'কপিলা' চরিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর এক অভিনব সংযোজন' — এ সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

২) এই উপন্যাসে কপিলার পরিণতি আকস্মিক কি না তা চরিত্রটি আনুপূর্বিক বিশ্লেষণে বুঝিয়ে দিন।

৩) 'হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরের কুবের পাড়ি দিতে পারিবে না'। —এই বিধান কার, তা উপন্যাসে অস্পষ্ট। কুবেরের জীবন নিয়ন্ত্রণে কপিলার এই অপরিহার্যতা সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৪) কুবেরের জীবনবৃত্তে তার স্ত্রী মালার ভূমিকাটিকে নির্ধারণ করুন। মালাকে কি এই কাহিনীর 'কাব্যে উপেক্ষিতা' হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

৫) কপিলা ও মালা — এই দুই সহোদরা চরিত্রবৈশিষ্ট্যে পরস্পরের বিপরীত। কিন্তু ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের অনন্যতায় তারা দুজনেই ধীবর জীবনের অভ্যস্ত গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার করুন।

৬) উপন্যাসের ঘটনাক্রম এবং চরিত্রগত পরিকল্পায় পদ্মানদীর ভূমিকা কতখানি তা 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস অবলম্বনে বিশ্লেষণ করুন।

৭) হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ পদ্মানদীর মাঝিদের জীবনে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা বিশ্লেষণ করুন।

৮) এই উপন্যাসে জেলেদের জীবনচিত্রণে ঔপন্যাসিকের কি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট হয়েছে তা আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করুন।

৯) 'পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে কুবের চরিত্রের গোষ্ঠস্বভাব থেকে ব্যক্তিস্বভাবের নিস্ক্রমণ তথা মুক্তি।' —এই মন্তব্যের আলোকে কুবের চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

১০) মালার সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে কুবের কেতুপুরে আবদ্ধ, কপিলার সঙ্গে কুবের নিরুদ্দেশের যাত্রী। —মালাও কপিলার টানাপোড়েনে কুবের চরিত্রের যে ক্রমপরিণতি তা কতখানি বাস্তবসম্মত তা যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করুন।

১১) 'হোসেন মিয়া চরিত্রটি মহত্ত্ব ও শয়তানির সহাবস্থানে এই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা জটিল চরিত্র হয়ে উঠেছে'। —এই মন্তব্য অনুযায়ী হোসেন মিয়া চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করুন।

১২) হোসেন মিয়ার রহস্যময়তা উপন্যাসের ক্ষেত্রে কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে লেখক অবতারণা করেছেন তা নির্ধারণ করে দেখান।

৫৮.১০ গ্রন্থপঞ্জি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *পদ্মানদীর মাঝি*, ফাল্গুন ১৩৯৯, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ক'লকাতা।

ডঃ নিতাই বসু ঃ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা*, সঞ্জয় প্রকাশন, ক'লকাতা।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ঃ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পীরীতি*, জি. ই. এ পাবলিশার্স, ক'লকাতা।

নারায়ণ চৌধুরী ঃ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যমূল্যায়ন*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ক'লকাতা।

নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত ঃ *মানিক সাহিত্য সমীক্ষা*, পুস্তক বিপণি, ক'লকাতা।

ডঃ সরোজমোহন মিত্র ঃ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয়, ক'লকাতা।

একক ৫৯ ❑ উপন্যাসের গঠন কৌশল

গঠন

৫৯.১ উদ্দেশ্য
৫৯.২ প্রস্তাবনা
৫৯.৩ কাহিনির নির্মাণশিল্প
৫৯.৪ কাহিনির বিন্যাসরীতি
৫৯.৫ ভাষাগত বৈশিষ্ট্য
৫৯.৬ উপন্যাসে গানের প্রাসঙ্গিকতা
৫৯.৭ সারাংশ
৫৯.৮ অনুশীলনী
৫৯.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৫৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- আপনি এই উপন্যাসের পরিচ্ছেদ অনুযায়ী কাহিনির বিস্তার, ঘটনাবলীর স্থানিক পরিমণ্ডল এবং সময়ব্যাপ্তির বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন।
- কাহিনির উপস্থাপনা ভঙ্গী এবং বিন্যাস প্রক্রিয়ার লেখকের মূল উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারবেন।
- সংলাপে যে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তার যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- উপন্যাসে গানের প্রয়োগগত বিষয়টির অভিনবত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

৫৯.২ প্রস্তাবনা

যে কোন রচনার ক্ষেত্রেই তার নির্মাণরীতি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আঙ্গিকগত নিপুণতায় সেখানে কাহিনির পরতে পরতে ফুটে ওঠে ঘটনার পরম্পরা, চরিত্রের নানা গভীর জটিলতা, লেখকের নিজস্ব জীবনদর্শন। পদ্মার মাঝিদের জীবনকথা সম্বলিত এই উপন্যাসেও লেখক কাহিনিবৃত্তে ধরে দিতে চেয়েছেন জেলে মাঝিদের দারিদ্র্য-পীড়িত, শোষিত, একঘেয়ে, প্রায় মনুষ্যেতর জীবনযাপনের কথা। তাদেরই মাধ্যমে লেখক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের নির্মম নাগপাশে মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার গল্প পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চান। তথাকথিত 'ছোটলোক'-দের টিকে থাকার এই প্রাণপণ সংগ্রামের কাহিনি তাই তথ্যবহুল, সাংবাদিকসুলভ নিরাবেগ নির্লিপ্তিতে পরিবেশিত। উপন্যাসের সূচনায় নানা চরিত্রসমাবেশে, নানা স্থানিক পরিমণ্ডলে ঘটনাকে ছড়িয়ে দিয়ে বিশদভাবে সেই শোষণ

ও বিপর্যস্ত জীবনযাত্রার সঙ্গে লেখক আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। সেখানে গল্পের গতিও শ্লথ। কিন্তু ক্রমশ সময়ের গ্রন্থিতে নানা টুকরো ঘটনার জটিলতায় ব্যক্তিমানুষের জীবন কিভাবে অপ্রত্যাশিত বাঁক নিয়ে চলা শুরু করে, উপন্যাসের শেষাংশে সেই কথাই ফুটে ওঠে নাটকীয়ভাবে। গল্পের গতিও সেখানে দ্রুততা লাভ করে।

৫৯.৩ কাহিনির নির্মাণশিল্প

উপন্যাসের নির্মাণশিল্পের ক্ষেত্রে 'পদ্মানদীর মাঝি' লেখকের এক আশ্চর্য শিল্পসফল নিরীক্ষা। স্বল্পকথনের এক বিস্ময়কর সংযমে, সাংবাদিকসুলভ নির্লিপ্ততায় মাত্র শ'খানেক পৃষ্ঠার একটি উপন্যাস তিনি রচনা করনেল, যার পরিচ্ছেদ সংখ্যা সাত, ঘটনার পটভূমি কেতুপুর, চরডাঙ্গা, আমিনবাড়ী, আকুরটাকুর এবং ময়নাদ্বীপ, ঘটনার সময়পর্ব পুরো একটি বছরও নয়। এর মধ্যেই বিধৃত হয়েছে পদ্মার মাঝি ও জেলেদের জীবনকথা। এই উপন্যাসটি আদ্যোপান্ত পড়লেই আমরা বুঝতে পারি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে-বয়সে, যে-অপরিণত অভিজ্ঞতায় বা অসংগঠিত আদর্শেই এই উপন্যাসটি লিখুন না কেন, এক মহৎ সাহিত্যিক সম্ভাবনা জন্ম নিচ্ছিল তাঁর মনে। আমরা বুঝতে পারি, কেন তিনি বলেছেন — ''জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি।'' মাঝিদের গল্প বলতে বসে তাই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী বিকারহীন, সংস্কারমুক্ত, বাচনভঙ্গী নিরাবেগ, নির্লিপ্ত।

উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়েছে সাতটি পরিচ্ছেদে। এর সবগুলি সমদৈর্ঘ্যের নয় — দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি অন্যান্যগুলির তুলনায় দীর্ঘ, সপ্তম পরিচ্ছেদটি দীর্ঘতম। প্রথম পরিচ্ছেদ বিধৃত উপন্যাসের পটভূমি বা milieu, ধীবরশ্রেণী ও কেতুপুরের কথা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গ্রামকেন্দ্রিক লোকজীবনের পার্বনের কথা, তার সাথেই কুবেরের পারিবারিক জীবনকথা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে কুবের-মালার দাম্পত্য সম্পর্কের রেখাচিত্র, চতুর্থ পরিচ্ছেদে রাসুর প্রত্যাবর্তনে কেতুপুরের জনজীবনে চাঞ্চল্য ও কপিলার আগমনে কুবেরের মনোজগতে আলোড়ন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রকৃতির বিরূপতায় দুর্যোগ, ঝঞ্ঝা সমগ্র কেতুপুরকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে, যে সুযোগ পূর্ণমাত্রায় সদব্যবহার করেছে হোসেন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কপিলা-কুবের সম্পর্ক আমিনবাড়ি যাওয়া উপলক্ষ্যে আরও অন্তরঙ্গ উত্তেজনায় জটিল হয়ে উঠেও শেষপর্যন্ত কপিলার শ্যামদাসের সঙ্গে প্রত্যাবর্তনে কুবেরের উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠা। সপ্তম পরিচ্ছেদে একসঙ্গে বহু ঘটনার একত্র ও সমান্তরাল সমাবেশে, কুবেরের হোসেন ও কপিলার দ্বারা গ্রস্ত অবস্থায় ময়নাদ্বীপের যাত্রা — এখানেই কাহিনীর সমাপ্তি। বহু চরিত্র ও বহু ঘটনার বিক্ষিপ্ত কাহিনীসূত্রকে কার্যকারণ সম্পর্কে বেঁধে এখানে লেখক গুটিয়ে আনতে চেয়েছেন। এতগুলি ঘটনার চাপ একটিমাত্র পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নিয়ে আসায় সমালোচকদের দৃষ্টিতে আখ্যানভাগ খানিকটা ব্যাহত হয়েছে বলে মনে হয়েছে। দু'তিনটি পরিচ্ছেদে এগুলিকে সজ্জিত করে দিলেই ভাল হত বলে তাঁরা মনে করেছেন। হয়ত নানা পরস্পরবিরোধী ঘটনার এই জটিলতা এবং আকস্মিকতা সরল কুবেরকে বিমূঢ়, বিভ্রান্ত করে তুলবে আরও সহজে, তার পরিণতিও পাঠকের কাছে আরও বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে — এমনটি পরিকল্পনা করেই লেখক এইভাবে শেষ পরিচ্ছেদের ঘটনাবিন্যাস করেছেন।

স্থানিক পরিমণ্ডল হিসাবে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কাহিনি ও তার চরিত্রাবলী বিচরণ করেছে। এতে কোনো কোনো সমালোচক স্থানিক ঐক্য ক্ষুণ্ণ হওয়া ও কাহিনিসূত্র ছিঁড়ে যাওয়ার আভাস পান। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন, এই সবকটি জায়গাই কোনো না কোনো সময় কুবের-কপিলার বিরচণভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার

সঙ্গে সঙ্গে কেতুপুর, আমিনবাড়ি ও ময়নাদ্বীপে হোসেনের যাতায়াতও যথেচ্ছ। সেক্ষেত্রে কুবেরকে আপন আপন উদ্দেশ্যসাধনে যে দুটি মানুষ প্রায় ক্রীড়নকের মত ব্যবহার করেছে, তাদের কক্ষপথে যে তারা কুবেরকে টেনে নেবেই — এ ব্যাপার অতি স্বাভাবিক। কুবেরের দোলচলতা, মানসিক অস্থিরতা ও বুদ্ধিবিভ্রম, আশঙ্কা — যা কিছু এই দুটি মানুষকে ঘিরে উৎসারিত, তার কারণেই সে বারবার নিক্ষিপ্ত হয় এদের বলয়ে, স্ববশে থাকার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে।

সময়পর্ব হিসাবে উপন্যাসের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে পাঁচটি ঋতুর মধ্যে — বর্ষা থেকে বসন্ত। প্রতিটি ঋতুরই চরিত্র, তাদের মানসিক অবস্থা এবং জীবনযাপন প্রণালীতে এক বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যে-বর্ষা ইলিশের মরসুম, মাঝি ও জেলেদের উপার্জনের সবচাইতে লাভজনক সময়, তারই অবধারিত পরিণতি পদ্মা সংলগ্ন নীচু বসতি অঞ্চল বন্যায় ভেসে যাওয়া। এই বন্যাই কুবেরের জীবনে ও গৃহে কপিলাকে দুরন্তগতিতে ভাসিয়ে নিয়ে আসে। শরতে আসে ঝড় — যে-ঝড়ে ভাঙ্গে জেলেদের ঘর, পরিবার। গোপীর হাঁটু। হেমন্ত ও শীতের অভাবের পর্বে জেলেদের জীবনে দারিদ্র্য আরও বিকট মূর্তিতে দেখা দেয়। তাদের জীবনের এই উপর্যুপরি বিপর্যয়ের পূর্ণ সুযোগ নেয় হোসেন। তার কৃপা ও সাহায্যের ফাঁদে পা দিয়ে জেলেদের অমোঘ বিধিলিপি হয় ময়নাদ্বীপে যাত্রা। কুবেরের অনুভবের জগতেও কপিলার রহস্যময় হাতছানি, তাকে পাবার প্রলোভন অনিবার্য হয়ে ওঠে এই একই সঙ্গে। কুবের এই পর্বেই জেলে থেকে রূপান্তরিত হয় হোসেনের নৌকোর বেতনভুক মাঝিতে, কপিলার শ্বশুরবাড়ীর অনাহূত, অবহেলিত উপযাচক অতিথিতে। অপমানের জ্বালা ভুলতে তার বেশী দেরীও হয়না। বসন্তের আগমনে কুবেরের মন কপিলার উদ্দেশ্যে ধাবিত হয় দ্বিগুণ উৎসাহে। ঘটনাচক্রে পিতামমাঝির ঘটি চুরির ব্যাপারটিও ঘটে এই সময়েই। মানসিক উত্তেজনা ও পরিস্থিতিগত বিপর্যয়কে সে সামলাতে পারে না। হোসেন এই সুযোগেই কপিলাসহ কুবেরকে চালান করে ময়নাদ্বীপে।

পদ্মানদীর মাঝির এই জীবনকাহিনিকে আঙ্গিকগত নিপুণতায় সংবদ্ধ করার কোনো তাগিদ লেখকের মধ্যে আমরা দেখিনা। মাঝিদের জীবনযাত্রা যেমনই অগোছালো, আলুথালু, তাদের কাহিনি বিন্যাসও তেমনই শিথিলবন্ধন। পদ্মার ইলিশের মরশুম বর্ষায় যে কাহিনির সূচনা, বসন্তে হোলিখেলার রঙীনপর্বে ময়নাদ্বীপে যাত্রায় তার সমাপ্তি। মধ্যপর্বে ছড়িয়ে আছে শারীরিক পরিশ্রমের কষ্ট, মানসিক উত্তেজনাজাত যন্ত্রণা। উভয়ের মধ্যেই আছে আশা, স্বপ্ন — যা বাস্তবায়নের অপেক্ষায় দিন গোনে। মাছ ধরায় প্রাপ্তির সম্ভাবনা — যা সংবৎসরের নিশ্চিত আর্থিক স্বাচ্ছন্দের আশা জাগায়। আর কপিলার মতো নারী কুবেরের মতো মাঝির মনে কামনার তুষাগ্নি জ্বালিয়ে জীবন-উপভোগের আনন্দ ও তৃপ্তির আস্বাদন নিয়ে আসে। এই দুই আকাঙক্ষার তাড়নায় পদ্মানদীর কোনও এক মাঝি কুবেরের জীবন এক লক্ষ্য থেকে ভিন্নতর লক্ষ্যে এসে পৌঁছায়। নানা ব্যক্তিকাহিনি এই আখ্যানের মধ্যেই জড়িয়ে থাকে নানাসূত্রে — রাসুর কাহিনি, আমিনুদ্দির কাহিনি, যুগী-শীতলের বা এনায়েত-বসিরপত্নীর অসামাজিক সম্পর্ক। এগুলির সঙ্গে প্রধান চরিত্র কুবেরের কোনো যোগ নেই। তার ব্যক্তিগত জীবনের গতিও এগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। প্রকৃতপক্ষে পদ্মার তীরবর্তী কেতুপুরের গোষ্ঠীবদ্ধ মাঝি জীবনের পরিপূর্ণ ছবি উপস্থাপনের জন্যই কাহিনিতে এইসব কাহিনির সংযোজন — মাঝিদের জীবনচিত্রের বহুমাত্রিক অবয়ব নির্মাণের জন্য। এর ফলে কুবেরকেন্দ্রিক কাহিনি সরলরেখায় বিন্যস্ত না হয়ে অনেক সময়ই জটিল রূপ ধারণ করেছে। তবে শেষপর্যন্ত কাহিনি পূর্ণতা লাভ করেছে সেই কুবেরকে আশ্রয় করেই, যাকে অবলম্বন করে এই কাহিনির সূত্রপাত।

৫৯.৪ কাহিনির বিন্যাসরীতি

'পদ্মানদীর মাঝি' লিখিত হবার আগে বাংলা উপন্যাসে পদ্মাবিধৌত পূর্ববাংলার কোনো অঞ্চল আত্মপ্রকাশ করেনি। এই অঞ্চলের গ্রাম্য, অশিক্ষিত, শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা, সংস্কৃতি, আবেগ-অনুভব ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে পদ্মা-প্রকৃতির অমোঘ প্রভাবের রহস্যময়রূপ এক আশ্চর্য শিল্পদক্ষতায় এই উপন্যাসে ফুটে ওঠে। পদ্মানদী ও তার বুকে ভেসে বেড়ানো মাঝির দল — অর্থাৎ পটভূমি এবং চরিত্র এইভাবেই প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাসের নামকরণে। পদ্মানদীর উপস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক সীমা আভাসিত হয়েছে। অন্যদিকে 'মাঝি' শব্দটি একটি বিশেষ শ্রেণিচরিত্রকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। সর্বোপরি পদ্মার মত দুরন্ত, ভয়াল, বিধ্বংসী নদী যাদের জীবিকার উৎস, জীবনযাপনে প্রতিবেশী, তাদের কঠিন জীবনসংগ্রামের কথাও ব্যঞ্জনা লাভ করে 'পদ্মানদীর মাঝি' — এই নামকরণের মধ্য দিয়ে। তবে এই জীবন সমগ্র মাঝি গোষ্ঠীর হলেও ব্যক্তিচরিত্রের প্রাধান্য অনেক সময়ই আমাদের বিভ্রান্ত করে — এই কাহিনী কি কেতুপুর গোত্রীয় সব জায়গার না কি কুবেরের একার?

এর প্রধান কারণ উপন্যাসের সূচনা থেকেই কাহিনিগ্রন্থনে প্রযুক্ত হয়েছে কুবেরের দৃষ্টিকোণে। যদিও উপস্থাপনরীতি উত্তমপুরুষে নয়, লেখকের প্রত্যাশিত সর্বজ্ঞতার ঢঙেই। এই ধরণের দৃষ্টিকোণ প্রয়োগেই বহির্মুখী গোষ্ঠীজীবন এবং অন্তর্মুখী ব্যক্তি চৈতন্যের মধ্যে একটি বিভ্রম সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে কুবেরের মধ্যে এই দুই রূপেরই প্রকাশ। কাহিনির শুরুতে সে গোষ্ঠীজীবনের শরিক, মধ্যপর্বে এসে তার উপস্থিতি পারিবারিক বলয়ে, একই সঙ্গে সমাজ-বহির্ভূত প্রণয়চেতনার দ্বন্দ্বে একক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে দোলায়িত, তারপর উপন্যাসের পরিণতিতে আবার সে রাসু, আমিনুদ্দি, এনায়েত, বসিরের দলভুক্ত, মনয়াদ্বীপে হোসেনের ভাবী প্রজা।

উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই আছে জেলেদের জীবিকা-অর্জনের ঘাম-ঝরানো নিদারুণ পরিশ্রম এবং তৎসত্ত্বেও সামাজিক নানা বঞ্চনা ও শোষণে দারিদ্র্যের নিম্নতম সীমায় অবস্থানের চিত্র। সমগ্র কেতুপুরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটিকে লেখক এখানে তুলে ধরেছেন, যার একটি অঙ্গ কুবের ও তার পরিবার। এই পরিচ্ছেদের শেষদিক থেকেই চিত্রপট ক্রমশ সংকুচিত হয়ে এসেছে কুবের ও তার পরিবারিক বলয়ে। কুবেরের এই পারিবারিক জীবন, তার গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক জীবন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয় অবশ্য। তার জীবনকথা গণেশ সিধু বা রাসু, পীতম মাঝির ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আর তাই কুবেরের পারিবারিক জীবনবিন্যাসের ফাঁকে রথের মেলা, হোসেনমিয়ার বিচারসভা বা আশ্বিনের ঝড়ের কাহিনিতে ধীবরসমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের কিছু বিবরণও লেখক দিয়ে দেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে কুবেরের পারিবারিক জীবনপটের একটি স্পষ্ট ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। পরিবারের নানা খুঁটিনাটির বর্ণনায় একটি নিস্তেজ, নিরুত্তাপ, গতানুগতিক জীবনে কুবেরের বিচরণক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে কুবেরের জীবনে কপিলার উদ্দাম আবির্ভাব। পরস্ত্রী কপিলার প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের মধ্য দিয়েই কুবেরের চরিত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ সূচনা ঘটল। এই পরকীয়া প্রেমপর্বের ঠিক আগেই আমরা পেয়েছি কুবেরের সুস্থিত পারিবারিক জীবনকাহিনি। অ-সামাজিক প্রেমলুব্ধ কুবের একইসঙ্গে অভ্যস্ত পরিবারকেন্দ্রিকতা ও উৎকেন্দ্রিক প্রণয়বাসনায় বিভ্রান্ত, জটিল মানসিক দ্বন্দ্বে সে বিপর্যস্ত — সে ছবি এই অবস্থায় পাঠকের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যায়। এইখান থেকেই তার চরিত্রের বহুমাত্রিক, বাস্তব, দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্বের রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ক্রমশঃ তার গোষ্ঠীজীবনাশ্রিত রূপটি অস্পষ্ট হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, গোষ্ঠীবলয় থেকে মুক্ত

করে কুবেরের ব্যক্তিসত্তার জাগরণ ঘটার পেছনে মুখ্য উদ্দীপক কুবের-কপিলার পারস্পরিক আসক্তির প্রগাঢ়তা। বিবাহিত নারীর প্রতি বিবাহিত পুরুষের অবৈধ, প্রবল প্রণয়বাসনা এবং সেজন্য পুরুষের অপরাধবোধজনিত অন্তঃসংঘাতকে অবলম্বন করেই জেগে উঠেছে উপন্যাসের ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত নায়ক। সে ভুলতে পারেনা — সে কেতুপুরের এক গ্রাম্যসমাজভুক্ত মানুষ, তার অপেক্ষায় আছে তার পরিজনবেষ্টিত গৃহকোণ, তার দায়িত্ব, তার ভীরুতাকে। তাই কপিলাকে কেন্দ্র করে তার যে অস্থিরতা, মানসিক চাঞ্চল্য, দুরন্ত আদিম প্রবৃত্তি তা তাকে পুরোপুরি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তাই তার অবরুদ্ধ কামনা মাঝে মাঝেই আত্মপ্রকাশের তথা চরিতার্থতার পথ খোঁজে স্বপ্ন ও কাল্পনার জগতে, ''আধ-জাগা আধ-ঘুমানো অবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিতে থাকে, রচনা করিয়া চলে আকাশ-কুসুম।''

কুবের-কপিলা প্রণয়োপাখ্যান উপন্যাসে এক মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সচেতন পাঠকমাত্রেই অনুভব করবেন যে কুবেরের পরিণতি নির্ধারণে কপিলাই একমাত্র প্রভাবসৃষ্টিকারী উপাদান নয়। হোসেন ও ময়নাদ্বীপও কুবেরের জীবনে স্বতন্ত্র এক গুরুত্ব লাভ করেছে। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও শেষ পরিচ্ছেদে কপিলা-প্রসঙ্গ থাকলেও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে কাহিনির শেষ পর্যন্ত কুবেরের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে হোসেন ও তার ময়নাদ্বীপ প্রসঙ্গ। এর সর্বত্রই আমরা পাই কেতুপুরের মাঝিসমাজ ও বিশেষ করে কুবেরের দারিদ্র্য-বিড়ম্বিত জীবনে হোসেন মিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তারের ছবি। প্রকৃতির প্রতিকূলতায়, কঠিন প্রহারে তারা সবাই কোনো না কোনো ভাবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় হোসেনের কাছে। জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত, আত্মসমর্পণপ্রবণ মাঝিদের কাছে আপোষহীন, প্রকৃতির প্রতিস্পর্ধী, দুর্লভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হোসেন এক জীবন্ত বিস্ময়। এই বিস্ময়ের সঙ্গেই মিশে থাকে এই মানুষটি সম্পর্কে অপরিচয়জনিত একধরনের ভীতিবোধ। হোসেন সম্পর্কে সমগ্র ধীবরগোষ্ঠীর ভয়মিশ্রিত বিস্ময়চেতনা এবং নির্ভরতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, একটি বিশেষ ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যেই — সে হল কুবের।

এইভাবে কখনও গোষ্ঠী প্রতিনিধি হিসাবে কুবেরের চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে হোসেনের জাল, কখনও আবার একক ব্যক্তিত্বের সংকটে সে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে কপিলার প্রণয়জালে। শেষ পরিচ্ছেদে এসে নানা ঘটনার দ্রুততায় এবং আকস্মিকতায় বিমূঢ় কুবের পুরোপুরি ছায়াগ্রস্ত হয়ে যায় হোসেন ও কপিলার দ্বারা। উপন্যাসের শুরুতে সে ছিল মাছধরা জেলে, হোসেনের কৌশলে ও কৃপায় সে ক্রমশ নৌকার মাঝি এবং পরিশেষে বোধহয় শ্রমজীবী কৃষক। মিথ্যা চুরির অপবাদে কুবেরের কেতুপুর ত্যাগ ও কপিলাকে নিয়ে ময়নাদ্বীপ উদ্দেশ্যে যাত্রা — এই ঘটনায় কেতুপুরের আরও অনেকজনের ক্ষেত্রেই হোসেনের কৌশলে ঘটে যাওয়া ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। রাসু, আমিনুদ্দি, এনায়েত বা বসিরের সঙ্গে কুবেরের সেখানে কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু তারা কেউই কুবেরের মতো কোনও অবৈধ প্রণয়স্বপ্নে বিভোর হয়ে ময়নাদ্বীপকে স্বপ্নপূরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে ধরে নিয়ে পরিতৃপ্ত হয়নি। গোষ্ঠীজীবন ও ব্যক্তিজীবনের নানা সমস্যার কোনো সমাধান সরল, নির্বোধ, নিরীহ কুবেরের দ্বারা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি বলেই, মুক্তির আশায় সে শেষ পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছে ময়নাদ্বীপ অভিমুখে। সমগ্র উপন্যাস তথা কুবেরের পরিণতি এইভাবেই গোষ্ঠীজীবন ও ব্যক্তিজীবনের যুগ্ম-স্রোতে ভেসে গেছে অনিশ্চিত পরিণতির সমুদ্র অভিমুখে।

৫৯.৫ ভাষাগত বৈশিষ্ট্য

'পদ্মানদীর মাঝি' পূর্ববঙ্গের লোকজীবনের এক অংশের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। জেলেমাঝিদের জীবনের অনুপুঙ্খকে, একজন সমাজ-সচেতন ঔপন্যাসকি বাস্তবসম্মতভাবে মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন এখানে। দরিদ্র, শ্রমজীবী এই মানুষদের নিরাবরণ এবং নিরাভরণ জীবনের কথাও তাই তিনি বলেছেন একান্ত অনাড়ম্বর, সহজ সরল ভাষায়। একথা বলা বাহুল্য যে সকল উপন্যাসের ক্ষেত্রেই ভাষাপ্রঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার তরণী বেয়েই উপলব্ধির মোহনায় পৌঁছান সম্ভব। উপন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষার একপক্ষে থাকে সংলাপের দিক, অন্যপক্ষে বর্ণনার। এর মাধ্যমেই চরিত্রবৈশিষ্ট্য সৃষ্টি, আঞ্চলিকতার আরোপ, লেখকের উ দ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা। সেই কারণেই কোনো একটি বিশেষ রচনার উপযোগী করে ভাষারূপ নির্মাণ করে নিতে হয় সব লেখককেই — অঞ্চল, পটভূমি, মানুষ, চরিত্র, স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। কখনও প্রয়োজনে ভাষাকে দৃঢ়, ঋজু, তীক্ষ্ণ করে তুলতে হয়, কখনও আবার স্বপ্নময় কোমলতা, পেলব নমনীয়তা জড়িয়ে থাকে তার সর্বাঙ্গে। এইসব কারণেই একজন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী, নির্বাচিত বিষয়বস্তু অপর আরেকজন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর থেকে পৃথকরূপে পাঠকের কাছে ধরা দেয়। আবার একই উপাখ্যানকার বিভিন্ন জীবনযাপন বর্ণনা করেন বিভিন্ন ভাষায়।

এক কথায় বলতে গেলে শিল্পী-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভাষাভঙ্গীর হেরফের হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে সেইসঙ্গে একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে শিল্পীর নিজস্ব বাক্‌শৈলী উপন্যাসের চরিত্রের উপর আপতিত হওয়া অনভিপ্রেত। ভূমি থেকে উঠে আসা মানুষ ভূমিরই উপাদান তাই পটভূমি বদলের সাথে সাথে, ভূমি-সংলগ্ন মানুষের চরিত্র-গ্রন্থি উন্মোচনে, সেখানকার অভ্যস্ত ভাষাভঙ্গীর ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়। কোনো বিশেষ এক অঞ্চলের মানুষদের স্ব-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিতকরণের জন্য সেই অঞ্চলের ভাষার উচ্চারণ সংলাপে ও প্রয়োজনীয় প্রয়োগে থাকা উচিত - একথা সব সফল ঔপন্যাসিকই অনুভব করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম নন। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি তাই পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার প্রাণ স্পন্দনে জীবন্ত হয়ে ওঠে পূর্ববঙ্গের জেলেমাঝিদের জীবনালেখ্য উপস্থাপনে।

এই প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাস রচনায় নিজস্ব ভাষারীতির দিকটিকে আমরা লক্ষ করতে পারি। উপন্যাসে লেখক-পাঠক যোগসূত্র রচনার একটি বিশিষ্ট ভাষারূপ তিনি গড়ে নিয়েছিলেন, যা তাঁর শিল্পী স্বভাবেরই অনুরূপ। সাধুভাষা বা চলিতভাষা, যে ভাষাই তিনি ব্যবহার করুন না কেন, তার মধ্যে আগাগোড়া একধরনের নির্মম নিরাসক্তি ও নির্লিপ্তি আছে। সমালোচকের সন্ধানী বিশ্লেষণে তাঁর ভাষারীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত-মানিকের গদ্যভাষা ভাবের ভাষা নয়, 'ভাবনার ভাষা'। ঝঙ্কারবিহীন শাব্দিকবিলাসশূন্য একটি নির্ভীক নিস্তাপ ভাষারীতি সৃষ্টি করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে গদ্যরীতি লেখকের একান্ত নিজস্ব ভাবনার ফসল। একজন বিজ্ঞানীর মত নিরাবেগ দূরত্বে নিজেকে রেখে, চিন্তায় স্বচ্ছতায় অত্যন্ত কঠোর ভঙ্গীতে তিনি উপস্থাপনায় অভ্যস্ত। ভাবালুতাকে কোনোরকম প্রশ্রয় না দিয়ে, যে ভাষায় তিনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটির বর্ণনা দেন, সেই ভাষাতেই মানবচরিত্র বা সমাজের গভীরতম প্রদেশে নিহিত সত্যেরও পরিচয় দেন। শব্দ-ভাষা উপমা প্রয়োগের ব্যঞ্জনায় তাঁর সেই অত্যাশ্চর্য ভাষারীতি 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসেরও প্রাণবস্তু হয়ে ওঠে।

এই উপন্যাস রচনায় লেখকের ভূমিকা কখনও বিবৃতিকারের, কখনও ভাষাকার টিপ্পনীকারের। তাই কখনও তিনি মিশে গেছেন চরিত্রের সঙ্গে, কখনও আবার চরিত্রের সংলাপকেই অনুদিত করে দিয়েছেন নিজস্ব মন্তব্য

হিসাবে। আবার কখনও চরিত্রের পাশে দাঁড়িয়ে চরিত্রের ভিতরটাকে উন্মোচিত করে দিয়েছেন কোনো সংকোচভণিতা না করেই। জেলে নৌকার নিখুঁত বর্ণনা, তাদের জালের গঠন, জেলেপাড়ার সীমা নির্দেশনা, কুবেরের গৃহস্থালি, নদীতীরের গঞ্জ ও গ্রামের রূপ, ময়নাদ্বীপের চিত্র, পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য — কোনো ক্ষেত্রেই যথাযথ উপস্থাপনায় কোনো ত্রুটি নেই। বাহুল্যবর্জিত এক অনায়াস ভঙ্গীতে তিনি এইসবের পরিচয় দেন। এমনকি কুবেরের ঘরের ঢেঁকির কাঠমাত্রও তাঁর দাক্ষিণ্যে এক ইতিহাসের স্রষ্টা হয়ে ওঠে। অথচ এর কোনো ক্ষেত্রেই অনাবশ্যক একটি শব্দও তিনি সংযোজিত করেন না। এরই ফলে মাত্র শ'খানেক পৃষ্ঠার একটি উপন্যাসের জন্ম হয় 'পদ্মানদীর মাঝি' হিসাবে।

লেখকের সাংকেতিক মন্তব্যপ্রায় তীরের মতো নিক্ষিপ্ত হয় তথাকথিত ভদ্রমানুষদের উদ্দেশ্যে, ভদ্রেতর দরিদ্র জেলেমাঝিদের প্রতি সহানুভূতিতে। যেমন এই নিম্নোক্ত উক্তিগুলিতে—

ক) জোর বাতাসেও নৌকার চিরস্থায়ী গাঢ় আঁশটে গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারেনা।

খ) কলিকাতার বাতাসে পাওয়া যাইবে পদ্মার ইলিশমাছ ভাজার গন্ধ।

গ) জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না।

ঘ) ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এইসকল মর্মভেদী মন্তব্যে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণে বিধৃত হয় সুসভ্য মানুষের নির্লজ্জ ঔদাসীন্য, দারিদ্রের অভিশাপে একশ্রেণীর মানুষের অভদ্র, অমানুষ হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার অসহায়তা। লেখকের ভাষা কেমনভাবে নির্লিপ্ত থেকেও চরিত্রের ভাষা হয়ে উঠতে পারে, তার দৃষ্টান্তও ছড়িয়ে আছে এই উপন্যাসের সর্বত্র—

ক) কুবের ঝিমাইতে ঝিমাইতে নিদ্রাকাতর চোখে স্ত্রীর দিকে তাকায়। হ, ছেলে কোলে রোগা বউটিকে তাহার রাজরাণীর মত দেখাইতেছে বটে।

খ) আর হ, মালা রূপকথা বলে।

গ) হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারিবে না।

ঘ) তা বৈকি! কলঙ্ক কিনিবার সাধ যে কপিলার ষোল আনা দেখা যায়?

নাগরিক লেখক কুবেরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে বর্ণনার ভাষাতেও কুবেরের মুখের পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার রূপকে অবলীলায় ঠাঁই করে দিয়েছেন। লেখকের নিজস্ব বিবৃতি এবং চরিত্রের সংলাপের এই বিকল্প ব্যবহার— ভাষা ব্যবহারের এক চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত।

স্বভাবগম্ভীর কুবের কম কথা বলতেই অভ্যস্ত। কিন্তু তার মনে কখনও কপিলা কখনও হোসেনমিয়া এক অজ্ঞাত আশঙ্কা জাগিয়ে তোলে। কপিলা বা হোসেনের মুখোমুখি হলেই তার শঙ্কাতুর কুবেরমন আত্মপ্রকাশ করে বারংবার ব্যবহৃত, প্রায় সমধর্মী দুটি বাক্যে। কপিলার দুর্জ্ঞেয় রহস্য কুবেরকে উৎকণ্ঠিত করে এইভাবে — "কে জানে কী আছে কপিলার মনে।" হোসেনের অজ্ঞাত কৌশল সম্পর্কে সন্দিহান কুবের তাকে দেখলেই মনে করে — "কী মতলব করিয়াছে হোসেন মিয়া?" চতুর প্রতিষ্ঠাকামী ব্যবসায়ী হোসেন স্বভাবে ক্ষিপ্র। সময়ের কোনো

এক খণ্ডমুহূর্তও সে আলস্যে, অবসরে ব্যয় করে না। তার কর্মোদ্যম এবং কূটকৌশল তাকে করে তুলেছে অত্যন্ত মিতবাক্। সমস্ত উপন্যাসে হোসেনের কথায় তাই আপাতবিনয় ও মিষ্টতার আড়ালে ইস্পাততুল্য কাঠিনয ও দৃঢ়তা লক্ষ করা যায়। যেমন—

ক) আপন খুশিতে গেছিলা, ঝুট না কলি মানবা রাসুবাই।

খ) মুসলমান মসজিদ দিলি, হিঁদু দিব রাহুর ঘর — না মিয়া, আমার দ্বীপের মদ্যি ও কাম চলব না।

গ) ঘুমাও গা কুবির। আর শোন বাই, কী দেখলা কী শুনলা আঁধার রাতে মনে মনে থুইও, কইয়া কাম নাই।

ঘ) ময়নাদ্বীপি যাবা কুবির? চুরি আমি সামাল দিমু।

হোসেনের বা কুবেরের স্বল্পকথন এই উপন্যাসের লেখকের উপস্থাপন ভঙ্গীরই অনুরূপ। লেখকের উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে এক অসাধারণ তীক্ষ্ণ স্বভাবধর্মে। ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের প্রচলিত বিবৃতিধর্মিতাকে ত্যাগ করে, তিনি সূত্রাকারে নিজের সিদ্ধান্তকেই স্বল্পতম পরিসরে পৌঁছে দেন পাঠকের কাছে। ক্ষুরধার সেই মন্তব্যে আমরা চমকিত হই, আমাদের অ-সচেতন মন সচকিত হয়ে ওঠে তাঁর জীবন ও জগৎকে চিরে চিরে বিশ্লেষণ করার ভঙ্গীতে। কুবেরের পিছু পিছু পাঠককেও তিনি টেনে নিয়ে যান কেতুপুরের পঙ্কিল জীবনপটে, প্রায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে বাস্তব, তথ্যনিষ্ঠ প্রমাণ সহযোগে, সমাজের এই অবহেলিত হতদরিদ্র মানুষগুলির মনুষ্যেতর জীবনযাপনের চেহারাটাকে একটানে উন্মুক্ত করে দেন আমাদের চোখের সামনে। লক্ষণীয় এখানে তাঁর ভাষার সেই টানটান ভঙ্গী। গল্পের শুরুতে, প্রথম পরিচ্ছেদেই আছে হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত, জমিদার-মুহুরি-চালানবাবু-পুলিশ উপদ্রুত, দারিদ্র্য-অশিক্ষা ইতরতায় আভূমি নত কেতুপুর-এর কথা। কিন্তু কোথাও এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কাহিনীর গতিকে ব্যাহত করেনা। ভাবাবেগহীন, নৈর্ব্যক্তিক কণ্ঠে সাংবাদিকতার ঢঙে লেখক বলে যান জেলেমাঝিদের জীবনকথা। অতিরঞ্জনের অবকাশ থাকলেও তিনি তাকে স্বচ্ছন্দে এড়িয়ে যান। প্রথাগত মমতাপ্রকাশের ক্ষেত্রে বিরত থেকে, বিপরীত পথে কষাঘাতের ভঙ্গীই তাঁর কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে বেশী। যেমন নিম্নোক্ত অংশগুলিতে—

ক) জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ সঙ্কীর্ণতায়।

খ) ধর্ম যতই পৃথক হোক, দিনযাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে বড় এক অধর্ম পালন করে — দারিদ্র্য।

গ) নবজাত সন্তানকে তাহারা যেমন পাশবিক তীব্রতার সঙ্গে মমতা করে, বয়স্ক সন্তানের জন্য তাহাদের তেমনি আসে অসভ্য ঔদাসীনতা।

ঘ) ও তো মানুষের চোখের জল নয়, কমিবে বৈ কি।

এরকম কিছু নিষ্ঠুর, নির্বিকার মন্তব্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে লেখকের সত্য উপস্থাপনার উদ্দেশ্য। তাঁর উপজীব্য গোষ্ঠী বা সমাজের এই বিশেষত্বগুলিকে প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য হিসাবে না কোনো সংলাপ ব্যবহার করেন, না করেন কাহিনিবিস্তার। তাঁর নিরাবেগ অভিসন্ধি প্রকাশ পায় কুবেরের নিষ্ক্রিয়, আত্মসমর্পণপ্রবণ আচরণ বর্ণনায়, তির্যক উপমাসৃষ্টিতে — "যে দিন (কুবের বাড়িতে) থাকে, সেদিন বড়লোকের বাড়ির পোষা কুকুরের

মত উদাস চোখে এসব সে চাহিয়া দেখে, স্নেহমমতার এইসব খাপছাড়া কাণ্ডকারখানা। দেখিতে দেখিতে সে হাই তোলে, বড়লোকের পোষা কুকুরের মতই চাটাইয়ে একটা গড়ান দিয়া উঠিয়া বসে, মুখখানা করিয়া রাখে গম্ভীর।'' এইভাবে নিজেই নিজের সৃষ্ট চরিত্রকে তার অসংগতি নিয়ে বিদ্রূপ করা — এ একান্তভাবেই মানিকের নিজস্ব ভঙ্গী। যেন তিনি এর স্রষ্টা নন, নিছকই দ্রষ্টা মাত্র। চিরন্তন শোষিতের এক চেহারা ফুটে ওঠে ক্ষুব্ধ কুবেরের ভাবনার উদ্‌ঘাটনে, যা সমাজসত্যের এক জীবন্ত দলিল—

''গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশী ছোটলোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মত, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মত, অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।''

এই উপন্যাসে লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার রূপ। চরিত্র ও কাহিনীর বাস্তবতা রক্ষায় অবধারিত ভাবেই এই উপভাষার ব্যবহারিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। জল-মাটি-আকাশের উন্মুক্ততায় যেসব নরনারীর কথা লেখক বলতে চলেছেন, তাদের মাটি-ঘেঁষা করে রাখতেই সংলাপে তথাকথিত বাঙালভাষার প্রয়োগ। উচ্চারণের নিজস্ব রীতি, ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য, বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহার — এই সবকিছুই ফুটে উঠেছে প্রতিটি চরিত্রের ভাষায়। নাগরিক এবং পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষারীতিতে অভ্যস্ত লেখক সংলাপ রচনায় সৎ থাকার উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন যে মাঝিমাল্লাদের সংস্পর্শে কাটিয়েছেন একথাও আমরা জানতে পারি তাঁর স্বজনবর্গের মানিক সম্পর্কিত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। চরিত্র ও কথাবস্তু সম্পর্কে পাঠকের প্রতীতি জাগিয়ে তুলতে সংলাপ ছাড়া, প্রকৃতি বর্ণনায়ও তিনি উপভাষায় নানা শব্দকে আশ্রয় করেছেন। যেমন—

''কোথাও নদীর একটি ছাড়া তটরেখা নাই, কোথাও অপর তীরের গাছপালা অস্পষ্ট চোখে পড়ে। কাউয়া চিলা পাখিগুলে ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে।''

যদিও সাধুভাষাই তাঁর আখ্যানকথনের মূল মাধ্যম, তবুও তার মধ্যেই উপভাষার শব্দাবলীকে সুকৌশলে গ্রথিত করে দেওয়া নিঃসন্দেহে মানিকের নিজস্ব স্টাইল। সেইসঙ্গে এও লক্ষণীয় বিভিন্ন চরিত্রের উপযুক্ত সংলাপ তৈরী করতে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায়ও নানা আঞ্চলিক ভাষারূপকে তিনি প্রয়োগ করেছেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, ফরিদপুরী - বঙ্গালী উপভাষার নানা রূপবৈচিত্র্যকে তিনি বিভিন্ন চরিত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। এমনকি হোসেন বা আমিনুদ্দিন কথায় ইসলামী শব্দের প্রাচুর্যও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। পূর্ববঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের কথায় আরবী-ফার্সীজাত বা পশ্চিমা হিন্দীজাত শব্দের বহুল ব্যবহারের কথা আমরা সবাই প্রায় জানি। বাস্তবতা রক্ষায় সতর্ক লেখকের সংলাপ রচনায় তাই সেইসব শব্দকে নিয়ে আসতে ভুল হয় না, যেমন—পানী, আসমান, খুশ, জবর, ফয়দা, কাম, বিবিজান। মানিক ঢাকা সন্নিহিত অঞ্চল হিসাবে কেতুপুরকে বাছলেও, মাঝিদের নিরন্তর যাতায়াতের কারণে, তাদের কথায় কোনো একটিমাত্র নির্দিষ্ট উপভাষারূপকে প্রয়োগ না করে, নানারূপের মিশেলে যে অভিনব সংলাপ-রচন ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তা এককথায় অনবদ্য। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই সংলাপের ভাষায় হয়তো ত্রুটি অনেক আছে। কিন্তু জেলেমাঝিদের সতত সঞ্চরমান বা ভাসমান জীবনের প্রেক্ষিত তাতে অনেকখানি বিস্তারলাভ করেছে। পদ্মানদীর দুই পাড় ছাড়িয়ে কুবের-হোসেনদের ভৌগোলিক সীমা ছড়িয়ে পড়েছে পূর্ববাংলার অন্ত্যজ মানুষের অন্তঃপুরে।

৫৯.৬ উপন্যাসে গানের প্রাসঙ্গিকতা

পূর্ববাংলার জনজীবন ও সংস্কৃতিতে গান একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। উৎসব-অনুষ্ঠানে, শ্রমদানে গান একটি আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে এই অঞ্চলে গৃহীত। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস আমাদের আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেয় সেই সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলের কথা। বাংলা লোকসঙ্গীতের একটি বড় অংশ চির দারিদ্র্যবেষ্টিত জেলেদের জীবনকথাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই গানগুলির উৎসও ধীবরকূল। হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মাঝে অশিক্ষিত জেলে-মাঝিরা তাদের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার জগৎকে প্রকাশ করে তাদের স্বভাব কবিত্বে, গানের সুরে। নদীর স্রোত ধরা দেয় সেইসব লোকগীতের বহমান সুরে। নদী, নদীর তীরবর্তী পল্লীপ্রকৃতি আর পল্লীবাসী দরিদ্র মানুষ ধরা দেয় সেইসব গানে। পদ্মানদীর মাঝি আর জেলেরা তো আর এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। তাই তাদের জীবনকথা বলতে বসে অবধারিতভাবেই গানের প্রসঙ্গ লেখক নিয়ে আসেন।

কাহিনির শুরু থেকেই গান একটি বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এই উপন্যাসে। ধনঞ্জয়ের নৌকোয়, মালার অনুরোধ উপেক্ষা করে জ্বরগায়ে উপবাসী কুবেরের মাছ ধরার সময়, শীত কাটাতে গণেশ তাকে গান গাইতে বলে। কুবেরের গলায় তখন ঝাঁঝাল অস্বীকৃতি শোনা যায় — 'হ গীত না তর মাথা।'' পদ্মার এই মাঝির সকণ্ঠে, সারা উপন্যাসে একটি গানও আমরা শুনিনি ঠিকই, কিন্তু জেলেদের প্রথা এবং অভ্যাস মেনেই কুবেরও যে কখনও কখনও গান গায় একথা অন্তত গণেশের অনুরোধ থেকে আমরা বুঝতে পারি। তবে তার সে গান স্বরচিত নয় হোসেনের মত। অন্যের গানই হয়ত বা সে গায়। গান বাঁধবার ব্যাপার তার অক্ষমতার কথা সে হোসেনকেও জানায়। হোসেন যখন প্রশ্ন করে — ''কুবের, গাহান বাইন্ধবার পার?'' তখন কুবের বলে — ''আমি পারতাম না। আমাগোর যুগইলা পারে। মুখে মুখে ছড়া বাইন্ধ্যা দেয়।'' উদ্যমী, সম্পন্ন জেলে যুগল যার বৃত্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি কবিত্বও দখলে আছে। আছে গণেশের মত আপনভোলা, কুবেরের ছায়াসঙ্গী, কুবেরের মতই-উদ্যোগহীন একজন মাঝিরও, কুবেরকে গান গাওয়াতে না পেরে আপন মনে সে গান গেয়ে উঠতে পারে, একবার শুনেই 'বাক্য মাইয়া'র গাওয়া গান যে কণ্ঠে ধারণ করতে পারে।

এই উপন্যাসে গান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তিনবার। এর মধ্যে একটি হোসেনের মুখে গীত, তারই রচিত। বাকি দুটি গণেশের গাওয়া, যার কোনোটিই তার নিজের রচনা নয়। এর মধ্যে একটি আবার লেখকের দ্বারা বিবৃত, গানটির প্রত্যক্ষ শাব্দিক গঠন সেখানে ধরা পড়েনি। গণেশের এই দুটি গানই বিশেষভাবে সময়োপযোগী এবং ইঙ্গিতপূর্ণ। গণেশের গাওয়া প্রথম গানটির বিয়ষবস্তু — যে যাকে ভালোবাসে সে তাকে পায় না কেন, এমনই এক আত্মিক সংকটের প্রসঙ্গ। সে এই গান গাওয়ার সময় ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়ে গানের কথাগুলি শোনে। মানুষের মনের এই গভীর সমস্যার সমাধান যে বড় সহজ নয় সেই কথা তারা উপলব্ধিও করে। কুবেরের মনোজগতকে বুঝিয়ে দিতে এই গানটি গৌরচন্দ্রিকাতুল্য। মালাকে নিয়ে তার আপাত-তৃপ্তির আড়ালে অবচেতন মন যে কি এক অভাবের তাড়নায় মুষড়ে ছিল তা সে বুঝতে পারে কপিলাকে দেখে। নারীত্বের সংজ্ঞা বাস্তব রক্তমাংসের মূর্তিতে তার সামনে উপস্থিত হয় কপিলার রূপ ধরেই। নিরীহ কুবেরের মধ্যে অতৃপ্ত পুরুষটিকে যে কপিলার দুজ্ঞেয় নারীসত্তা হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল, ক্রমশ সেই আকর্ষণই হয়ে উঠেছিল দুর্বার। অথচ সমাজ-সংসার দুজনের মাঝখানে তৈরী করে রেখেছিল এক অলঙ্ঘ্য প্রাচীর। অপ্রাপ্তির সেই উৎকণ্ঠা ও আক্ষেপ, যা পরবর্তীকালে কুবেরকে বিভ্রান্ত করে তুলতে চলেচে, গণেশের প্রথম গানটিতে তারই পূর্বাভাস লক্ষ করা যায়।

গণেশের দ্বিতীয় গানটি তার স্বকণ্ঠে গীত। গানটির চটুল ভাষাভঙ্গী পল্লীজীবনের লোকগীতের বিষয়গত ও প্রকাশগত সরলতাকে ব্যক্ত করে। এই গানটিও প্রণয়ের জটিলতা বিষয়ক। গণেশ সব ব্যাপারেই কুবেরের ছায়াসঙ্গী, অনুগামী। তাই কুবেরের জীবনে কপিলা যখন অভ্যস্ততার গণ্ডী অতিক্রমের জন্য প্রেরণা যোগায়, ঠিক তখনই গণেশও উলুপী-সর্বজ্ঞ জীবনের বাইরে পা ফেলার দুঃসাহস সঞ্চয় করে। আমিনবাড়ী-র 'বাক্য মাইয়া' কেমন — সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে গণেশ এগিয়ে যায়। সেখানে সে শুনে আসে এই দ্বিতীয় গানটি। লক্ষণীয় অতি অল্প সময়েই গানটিকে সে কথা ও সুর সহযোগে কণ্ঠস্থ করে নিয়েছে। গানটিতে হাল্কাচালে প্রণয়ে দ্বিধাগ্রস্ততা, দোলাচলতার কথা বলা হয়েছে। লক্ষণীয় আরও একটি বিষয় — গণেশ আপনভোলা, দিলখোলা স্বভাবের মানুষ হলেও কুবেরের অবৈধ প্রণয়ের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেনি। তার শুভার্থী হিসাবেই যেন এই গানটি গণেশ শুনিয়েছে — নিজেকে বেঁধে রাখবার সতর্কবার্তা হিসাবে। কুবেরের মনোজগতকে তার নিজের কাছে চিনিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই গণেশের এই গান। কুবের-কপিলা প্রণয়কাহিনীর মধ্যপর্বে তাদের আত্মিক সংকটের কথাই গণেশের গানে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। লেখকও এই সূত্রেই গণেশকে দিয়ে, পাঠকের সামনে, কুবের ও কপিলার চিরন্তন প্রণয়ীসুলভ আবেগ-অনুরাগের ছবিটি পৌঁছে দিতে পেরেছেন। এই গানটির মর্মবাণী এতই স্পষ্ট যে তার ইঙ্গিত বুঝতে কুবেরের মতো মানুষেরও দেরী হয়নি। তার গোপন প্রণয় ও তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ততা, অনুগামী গণেশের কাছে প্রকাশিত হয়ে গেছে বুঝতে পেরেই কুবেরের স্বভাব-গাম্ভীর্য খসে পড়েছে। সে ধমক দিয়ে উঠেছে গণেশকে — ''কুচরিত্তির হইছস, আই?'' গণেশ প্রতিবাদ করে বলে — ''কুচরিত্তির কিবা? গীত শোননে দোষ নাই।'' গণেশের এই কথায় সমাজ আমাদের কতটুকু প্রশ্রয় দেয় তার সীমারেখা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। কুবেরকেও তার সীমা সম্পর্কে সচেতন করতে, গণেশের গাওয়া গানটিকে আরও একজন ব্যবহার করতে চায়, সে অন্তরালবর্তিনী মালা। আত্মসংযম শেখাতেই সে যেন কুবেরের কানের কাছে, তার শুভানুধ্যায়ী হিসাবে গণেশকে এই গানটি বারবার গাইতে অনুরোধ করে। সেই অনুরোধের মধ্যে আসলে যে মালার কুবেরকেই সাবধান করার ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে, সেকথা অনুভব করে কুবের মালাকেও ধমক দেয় — ''চুপ থাক, গীত শুইনা কাম নাই। '' মানুষের স্বভাবই এই। নিষিদ্ধ আনন্দ হাতছানি দিলে, বিবেকের পিছুটান যাতে পথরোধ করে না দাঁড়ায় তাই মানুষ বিবেককে জাগ্রত হতে দেয় না। কুবেরেরও গণেশ বা মালাকে ধমক দেওয়া আসলে তার নিজেরই কৃতকর্মজনিত অপরাধবোধের দিক থেকে চেষ্টাকৃত মুখ ফিরিয়ে থাকা।

এই উপন্যাসের তৃতীয় এবং সর্বাধিক আলোচিত গানটি হোসেন মিয়ার গাওয়া। বলা যায় এই গানটিই এই উপন্যাসের উদ্দিষ্ট সঙ্গীত। হোসেন মিয়ার চরিত্র ও কার্যকলাপের বিশ্লেষণে এই গানটির প্রসঙ্গ বারবার ফিরে আসে। নানা দিক থেকে এই গানটি ব্যাখ্যাত হয়েছে। কোনো কোনো সমালোচকের মতে এটি হোসেন মিয়ার সর্ববিদ্যা বিশারদ হবার পরিচায়ক। কূটকৌশলী, তীক্ষ্ণ ব্যবসায়িক বুদ্ধির পাশাপাশি কবিত্ব শক্তির অধিকারী রূপে হোসেনের ব্যক্তিত্বের পরিধি আরও বেশি বাড়িয়ে তোলার জন্যই এই গানটির অবতারণা করা হয়েছে — এই মত তাঁরা পোষণ করেন। আবার কোনো আলোচক মনে করেন এই গানটির নিহিতার্থ হোসেনের কর্মপটুত্ব ও উদ্যমের সঙ্গে সমীকৃত। তার মতো কর্মচঞ্চল মানুষের পক্ষেই, 'বোনধু কত ঘুমাইবা', 'মিয়া কত ঘুমাইবা' বা 'মাঝি কত ঘুমাইবা' বলে অপরকে সচেতন করা, জাগ্রত করা সম্ভব। নিশ্চেষ্টতা, উদ্যোগহীনতা পদ্মানদীর অধিকাংশ জেলে-মাঝির চরিত্রের সাধারণ ধর্ম। সেখানে তাদের কর্মের মাধ্যমে প্রতিকূলতাকে জয় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেই যেন হোসেনের এই গানটি রচিত। ধর্মের নামে, ভাগ্যের দোহাই পেড়ে, অবস্থার শিকার হওয়া মানুষের যে স্বাভাবিক দুর্বলতা, হোসেন সেই প্রবণতার থেকে মুক্ত। ঠিক তারই পাশাপাশি কুবেরের অক্ষমতা এবং অসহায়

আত্মসমর্পণ যখন আমরা দেখি, তখন কুবেরকে শোনাবার জন্য হোসেনের গাওয়া এই গানটি বিশেষ একটি মাত্রা লাভ করে।

গানটি হোসেনের স্বতঃস্ফূর্ত রচনা। আগের দিন প্রবল বর্ষণের অবকাশে হোসেন কুবেরের কুটিরে রাত্রিবাস করে, কুবেরকে আতিথেয়তা করার বিন্দুমাত্রও সুযোগ না দিয়ে। পরদিন সকালে কুবেরকে নিয়ে পথে বেরিয়ে, চারপাশের ভেজা মাটি, বৃষ্টিধৌত প্রকৃতি, মেঘ থমথমে আকাশ দেখে হোসেনের মনের কোণের স্বাভাবিক কবিত্বের জায়গাটি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এইরকম অশিক্ষিত কবিত্ব বা কবিতা রচনায় পটুত্ব তো গ্রামজীবনে সহজলভ্য। তা না হলে আমাদের পল্লীগীতি বা লোকগীতির ভাণ্ডার এতখানি পরিপূর্ণতার জায়গায় পৌঁছবে কেন? সেই সহজ পটুত্বে, কুবেরের অনুরোধে, খানিকটা হয়তো বা কুবেরকে প্রভাবিত করতেও, লাজুক হোসেন সুর করে তাৎক্ষণিক রচনায় গান ধরে — 'মাঝি কত ঘুমাইবা?' সে গানে একই সঙ্গে সৌন্দর্য্যবোধ ও কর্মোদ্যোগের কথা পরিস্ফুট। 'মানের পাতে রাইতের পানি হইল রূপার কুপি' — সূর্যালোকে কচুপাতার শিশিরকণা যার চোখে এইভাবে ধরা পড়ে, তাকে একজন রোমান্টিক কবি ছাড়া অন্যকিছু ভাবার অবকাশ আর থাকে না। আবার এই কবিই মাঝিকে তার মানবিক শক্তিমত্তা, কর্মক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে দিতে গেয়ে ওঠে — 'পাড়ি দেবার সময় গেল, মাঝি তবু থির — মাঝি কত ঘুমাইবা?' একজন কবির জীবন ও জগত সম্পর্কে এরকম সর্বাঙ্গীন বোধ থাকাই স্বাভাবিক। লোকগীতের রচয়িতা কবিরা সকলেই এরকম বহুমাত্রিক বোধের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের গানে। হোসেনও সাময়িক ভাবাবেশে তার কল্পনাশক্তি এবং কর্মশক্তির মেলবন্ধনে জীবন সম্পর্কে তার নিজস্ব উপলব্ধির জায়গাটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে এই গানে। যে হোসেন প্রকৃতির প্রতিকূলতাকে স্ববলে জয় করে মনুষ্যবসতি বানাতে পারে, সেই হোসেনই অনুকূল প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়, গীত বাঁধে। প্রকৃতি তখন তাকে খুশি করে। আর হোসেনের নিজের কথায় — 'খুশ হলি না পারি কী?'' তার সহজাত কাব্যপ্রতিভা তার খুশিরই অভিব্যক্ত রূপ। আর সেই কবিতার মধ্যেই আভাসিত তার স্বপ্নসাধ। কিছু গড়ে তোলার যে স্থির প্রত্যয় হোসেনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তা তো আসলে তার স্বপ্নেরই বাস্তবায়ন। আর কবিমাত্রেরই বিশেষ ক্ষমতা এই স্বপ্নদর্শন ও সৃজন। অভিজ্ঞতা ও আত্মোপলব্ধির দীর্ঘ পথ পার হয়ে হোসেন এগিয়ে চলেছে তার স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে, কবিমানুষের সৃজনশীলতার শক্তিতে ভর করে, কণ্ঠে নিয়ে এই উজ্জীবনগীত — 'বোন্ধু কত ঘুমাইবা।'

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের এই যে বিশেষ সাঙ্গীতিক পরিপার্শ্ব, যা তিনটি গানকে ঘিরে গড়ে উঠেছে, তার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। গানগুলির ভাব বা বিষয়বস্তু, সময় ও পরিবেশ থেকে স্বতোৎসারিত অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। কখনও প্রকৃতি, কখনও নারীপ্রকৃতি, কখনও বা আবার মনুষ্যপ্রকৃতি সম্পর্কে কিছু পরিচিত গানগুলির মধ্য দিয়ে আভাসিত হয়েছে। পল্লীগীতির এ এক অনন্য স্বভাবধর্ম। চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে উপযুক্ত গানটিকে যথাস্থানে প্রয়োগ করার কৃতিত্বও সেদিক থেকে ঔপন্যাসিকের প্রাপ্য। পটভূমি, বিষয়বস্তু, লোকায়ত জীবন, প্রকৃতি ও নিয়তি অনিবার্যভাবে এই সঙ্গীতময়তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেখা দিয়েছে। মাঝিদের জীবনে দারিদ্র্য-হতাশা-বিপর্যয় এমনকি প্রেমও যে তরঙ্গভঙ্গের সৃষ্টি করে, তারই টুকরো টুকরো অংশ গান হয়ে, পদ্মানদীর জোলো বাতাসের সঙ্গে মিশে বহমান হয়েছে দিগ্‌দিগন্তরে।

৫৯.৭ সারাংশ

সমগ্র উপন্যাসের কাহিনিকে লেখক সাতটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন, যার মধ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদটি দীর্ঘতম। স্থানগতভাবে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কাহিনি ও চরিত্রাবলি বিচরণ করেছে। সময়পর্বের দিক থেকে উপন্যাসের

সমগ্র ঘটনাবলি সংঘটিত হয়েছে। পাঁচটি ঋতুকালের মধ্যে — বর্ষা থেকে বসন্ত। স্থান-কাল-চরিত্রের এই বিন্যাস উপন্যাসের সূচনাংশে যতখানি শিথিল, কাহিনির গতি সেখানে যত মন্থর, উপন্যাসের শেষাংশে এসে সেটি ততই দৃঢ়গ্রন্থিতে আবদ্ধ, গল্পের গতিও সেখানে দ্রুত। ফলে কাহিনির এই অংশে নাটকীয়তা লক্ষণীয়।

সাধারণভাবে উপন্যাসের উপস্থাপন রীতিতে লেখক সর্বজ্ঞ বিবৃতিকারের ভূমিকা নেন। এখানেও লেখক সেই ভূমিকাই নিয়েছেন, কিন্তু দেখেছেন কুবেরের চোখ দিয়ে। তেমনি উদাসীন, নির্লিপ্ত দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করে লেখক কাহিনির চরিত্র ও তাদের জীবনযাপন সম্পর্কে সামাজিক ঔদাসীন্যের দিকটিকে পরিস্ফুট করে তুলতে চেয়েছেন।

এই সূত্রে আরও একটি বিশিষ্টতা এই উপন্যাসে লক্ষ করা যায় — তা হল ভাষাগত মৌলিকতা। সংলাপে বাস্তবতা রক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় প্রয়োগে কৌশলগত নতুনত্ব কিছু নেই একথা ঠিক। কিন্তু বিবৃতির ভাষায় যে আবেগবিহীন, নিরাসক্ত দূরত্ব সৃষ্টি করেন, তা এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটি অভিনব মাত্রা সংযোজিত করে। শব্দ-ভাষা-উপমাপ্রয়োগে বিলাসশূন্য, আটপৌরে, নিরুত্তাপ এক বাচনভঙ্গী এখানে আমরা পাই - যা লেখকের একান্ত নিজস্ব ভাবনার ফসল।

এই উপন্যাসের আরেকটি অবিনব বিষয় — গানের প্রয়োগ। পূর্ববঙ্গীয় জনজীবনে উৎসব অনুষ্ঠান শ্রমদান ব্যাপারে গান একটি আবশ্যিক অঙ্গ। তাই সেখানকার মানুষজনের কথা বলতে বসে অবধারিতভাবেই তাদের গাওয়া গান, কথা ও সুরের সহাবস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলি এসে পড়ে। তবে সাংস্কৃতির জীবনের এই সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলটুকুই শুধু নয়, গানগুলি এখানে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব উদ্ঘাটনেও অনেকখানি সহায়ক হয়ে উঠেছে। হোসেনের গানে তার স্বভাবের অনুরূপ কর্মোদ্যোগের আহ্বান, কুবেরের ছায়া সহচর গণেশের গানে কুবেরের প্রণয়-যন্ত্রণার প্রতিফলন। পটভূমি, বিষয়বস্তু, লোকায়ত জীবন, ঋতুবৈচিত্র্যে, সঙ্গীতময়তা — এইসব কিছু মাঝিদের জীবনের দারিদ্র্য-হতাশা-বিপর্যয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেখা দিয়েছে।

৫৯.৮ অনুশীলনী

১) পদ্মানদীর মাঝি-র জীবনে এবং এই উপন্যাসে গান এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। — আপনি এই মন্তব্যের সঙ্গে সহমত কি না তা বিচার করে দেখান। (অনধিক ১০০০ শব্দে)

২) 'পদ্মানদীর মাঝি' বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক অভিনবত্বের সূচক — সমালোচকের এই মন্তব্য উপন্যাসটির পটভূমি, কাহিনীনির্মাণ এবং চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে কতখানি গ্রহণযোগ্য তা বিচার করুন। (অনধিক ১০০০ শব্দে)

৩) 'পদ্মানদীর মাঝি'-দের ভাষা এই উপন্যাসে কতখানি বাস্তবানুগ হয়েচে তা দৃষ্টান্ত (বা উদ্ধৃতি) দিয়ে আলোচনা করুন। (অনধিক ১০০০ শব্দে)

৫৯.৯ গ্রন্থপঞ্জি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *পদ্মানদীর মাঝি*, ফাল্গুন ১৩৯৯, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ক'লকাতা।

ডঃ সরোজমোহন মিত্র ঃ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন সাহিত্য* , গ্রন্থালয়, ক'লকাতা।

ডঃ নিতাই বসু ঃ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা,* সঞ্জয় প্রকাশন, ক'লকাতা।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ঃ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পীরীতি,* জি. ই. এ পাবলিশার্স, ক'লকাতা।

নারায়ণ চৌধুরী ঃ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য মূল্যায়ন,* বেঙ্গল পাবলিশার্স, ক'লকাতা।

নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত ঃ *মানিক সাহিত্য সমীক্ষা,* পুস্তক বিপণি, ক'লকাতা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *দ্বন্দ্বের দুই মুখ, যুগান্তর চক্রবর্তী।*

বাংলা উপন্যাসের কালান্তর ঃ *সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।*

একক ৬০ ❑ বাংলা ছোটগল্প

গঠন

৬০.১ উদ্দেশ্য
৬০.২ প্রস্তাবনা
৬০.৩ মূলপাঠ — ১ ঃ বাংলা গল্পের উদ্ভব ও বিকাশ ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ
৬০.৪ অনুশীলনী — ১
৬০.৫ মূলপাঠ — ২ ঃ আধুনিক ছোটগল্প ঃ ওদেশে — এদেশে
৬০.৬ সারাংশ
৬০.৭ অনুশীলনী — ২
৬০.৮ মূলপাঠ — ৩ ঃ ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
৬০.৯ সারাংশ
৬০.১০ অনুশীলনী — ৩
৬০.১১ উত্তর সংকেত
৬০.১২ গ্রন্থপঞ্জি

৬০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি গল্প পড়ে যে আনন্দ পান তার উদ্ভবকাল ও বিবর্তন সম্বন্ধে সংক্ষেপে অনেক বিষয় জানতে পারবেন। জানতে পারবেন দেশ-বিদেশের গল্পের উৎসগুলি সম্বন্ধে। একটু গভীরভাবে ভাবলে বুঝতে পারবেন যে, গল্পগুলি লোকজীবন থেকে ক্রমশঃ উচ্চতর সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে কিভাবে স্থান করে নিয়েছে। পরবর্তীকালে, প্রয়োজন হলে এ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনাও করতে সক্ষম হবেন।

এই একটি পড়লে আপনি—

- গল্প ও ছোটগল্পের পার্থক্য বুঝতে পারবেন।
- দেশ-বিদেশের গল্পের উৎস ও বৈচিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- গল্পের সংজ্ঞা ও আঙ্গিক বা গঠন নিয়ে বিচার করতে পারবেন।

৬০.২ প্রস্তাবনা

আপনি লক্ষ করবেন যে, বর্তমান এককটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে প্রাচীন ও মধ্যযুগের গল্প সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই ধারণা দিতে গিয়ে দেশী ও বিদেশী নানা সাহিত্য থেকে কিছু উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় অংশে আধুনিক ছোটগল্প লেখার সূচনা পর্বের কিছু রচনা ও রচয়িতার উল্লেখ

করা হয়েছে। এই সব সূত্র থেকে আপনারা কৌতূহলী হলে গল্পগুলি মূলে বা অনুবাদে পড়তে আগ্রহী বোধ করলে সবিশেষ উপকৃত হবেন। তৃতীয় অংশে ছোট গল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য — অর্থাৎ গল্পের আঙ্গিকগত কিছু বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

এককের অংশত্রয়ী পাঠ করে আপনি গল্প ও ছোটগল্পের পার্থক্য যেমন বুঝতে পারবেন, সেই সঙ্গে ছোটগল্পের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন। বর্তমান এককের ধারণা নিয়ে পরবর্তী এককগুলির আটটি ছোটগল্প মূল পাঠসহ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ পড়ে আপনার গল্প বিশ্লেষণ ও তার মূল্যায়ন করা সহজ হবে। সেই সঙ্গে অনুশীলনীগুলির উত্তরও সহজে দিতে পারবেন।

আপাতত আপনি বর্তমান এককের প্রতিটি মূলপাঠ স্বতন্ত্রভাবে পড়ে, পরে সমগ্র পাঠ করলে, অনুশীলনীর সঠিক উত্তর দিতে পারবেন। প্রয়োজনে নির্ধারিত পাঠ্য গ্রন্থের সাহায্য নিতে পারেন। শেষে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলেয়ে নিন।

৬০.৩ মূলপাঠ — ১ ঃ বাংলা গল্পের উদ্ভব ও বিকাশ ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ

‘গল্প’ মানুষের আদিকালের সাহিত্যকৃতির সম্ভবত প্রধানতম নিদর্শন। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষ কল্পনা করে এসেছে তার পারিপার্শ্বিকের সব কিছুরই আড়ালে নানা অলক্ষ্য শক্তি সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সেই সমস্ত অনির্দেশ্য (এবং কল্পিত) শক্তিগুলির সম্পর্কে তাঁরা তৈরি করতেন অজস্র, অসংখ্য কাহিনী — যা ‘মিথ’ বা আদিম-পুরাণ কথা বলে পরিচিত এবং এখনও পৃথিবীর অসংখ্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে তার অনেকগুলিই প্রচলিত। এগুলিই হল মানুষের রচিত (অবশ্যই মৌখিকভাবে!) প্রথম ‘ছোট’ গল্প। বিদ্যুৎ কেন চম্‌কায়; বাঘের গায়ে ডোরা কেন; ভূমিকম্প কী করে হল; মানুষ মরে গেলে কোথায় যায়; খিদে পায় কী জন্যে; সূর্য অস্ত যায় কোন্ কারণে..... ইত্যাদি, ইত্যাদি অগণয সব জিজ্ঞাসার নিরসন তাঁরা নিজেদের বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার সীমাবন্দী উপকরণের সাহায্যে কল্পিত নানান ব্যাখ্যার মাধ্যমে করতেন। পুরুষানুক্রমে এই সমস্ত কাহিনী বিবর্তিত হয়ে এসেছে মানুষের সমাজে। রবীন্দ্রনাথ একেই উল্লেখ করেছেন ‘মজ্জায়-মিশে-থাকা’ ‘‘পিতামহদের কাহিনী’’ বলে।

কালের বিবর্তনেও এই কাহিনি রচনার অনিবার্য অভ্যাসটির কিন্তু পরিবর্তন হয়নি। সভ্যতার যত বিকাশ ঘটেছে, সমাজ ক্রমে-ক্রমে ততই সুসংহত হয়েছে; সামাজক এবং অর্থনৈতিক পালাবদলও হয়ে চলেছে সেই সঙ্গে। প্রত্যেক পর্যায়েই মানুষ তার নিজস্ব আর্থ-সামাজিক পটভূমিকার সঙ্গে মানানসই করে কাহিনী রচনা করেছে। সেগুলি একই সঙ্গে বিনোদন, সামাজিক অনুশাসন এবং জ্ঞানের চর্চায় প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবেও গণ্য হয়েছে। বিশ্বের সমস্ত সংস্কৃতিতে লোককাহিনী (বা ফোক টেল) গুলি এজন্যই এর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

এইভাবেই রচিত হয়েছে বিশ্বের সর্বত্রই গল্প-কাহিনী। ঋক্ সংহিতার ‘যম-যমী উপাখ্যান’ বা ‘সরমা-শুনী সংবাদ’, উপনিষদের ‘নচিকেতা ও যমের কাহিনী’; বুদ্ধের ‘পূর্বতন’ জন্মবৃত্তান্ত কল্পনা করে রচিত সাড়ে পাঁচশো ‘জাতক’ কথা; সোমদের ও বিষ্ণু শর্মার নামে প্রচলিত ‘হিতোপদেশ’ এবং ‘পঞ্চতন্ত্র’, গুণাঢ্যের লেখা ‘বৃহৎ কথা’, সোমদের ভট্টের ‘কথাসরিৎ সাগর’ ইত্যাদি সমস্ত গল্প কাহিনী আমাদের দেশের ছোটগল্পের প্রাচীর পরম্পরাটিকে

গড়ে তুলেছে। ঠিক একইভাবে ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট বই দুটির মধ্যেও সংকলিত হয়েছে অজস্র কাহিনী; সহস্র এক আরব্যরজনীর (ওরফে 'আলিফ লায়না'-র) গল্পসম্ভার, ঈশপের নামে প্রচলিত 'ফেবল্স' ইত্যাদি। আরও পরের আমলের গল্প রচনায় হদিশ মেলে লাতিন ভাষার 'জেস্তা রোমানোরাম' নামের সংকলন গ্রন্থে, ইতালীর লেখক বোকাচিওর 'দেকামেরণ' বইতে, ইংরেজ সাহিত্যিক জিওফ্রে চসারের 'ক্যান্টারবাজি টেল্‌জ' গল্পমালায়। ছোটগল্পের ক্রমবিবর্তন আদিকাল থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগ অবধি এইভাবেই হয়ে এসেছে।

৬০.৪ অনুশীলনী — ১

মূলপাঠ - ১ পড়ে গল্পের উৎস সম্পর্কে আপনার ধারণার মূল্যায়ন, আপনি যাতে নিজেই করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে নিচের প্রশ্নগুলি দেওয়া হোল। আপনি উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১২২-১২৩ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১) প্রথম রচিত ছোটগল্পের যে কোন *দুটির* বিষয়বস্তু উল্লেখ করুন।

২) **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

ক) .... মানুষের আদিকালের .... সম্ভবতঃ .... নিদর্শন।

খ) প্রত্যেক পর্যায়েই .... তার নিজস্ব .... পটভূমিকার সঙ্গে মানানসই করে .... রচনা করেছেন।

গ) বিশ্বের সমস্ত .... (বা ফোকটেল) গুলি .... স্থান অধিকার করে আছে।

ঘ) ঋক্ সংহিতায় .... উপাখ্যান, উপনিষদের .... কাহিনী, বুদ্ধের 'পূর্বতন .... কল্পনা করে রচিত .... গুণাঢ্যের লেখা ....' ইত্যাদি গল্প কাহিনী গল্পের প্রাচীন পরম্পরাটিকে গড়ে তুলেছে।

ঙ) ওল্ড ও নিউ .... বই দুটির মধ্যে সংকলিত হয়েছে .... কাহিনী। সহস্র এক আবর্য রজনীর (ওরফে ....) গল্পসম্ভার, ঈশপের নামে প্রচলিত ....।

৩) **সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন ঃ**

ক) বিষ্ণু শর্মার নামে প্রচলিত বই ———— হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর।

খ) বোকাচিওর বই ———— ফেবল্স্, ডেকামেরণ, নিউটেস্টামেন্ট।

গ) চসারের বই ———— 'ডেকামেরণ', 'আরব্য রজনী', 'ক্যান্টারবেরী টেল্স'।

৪) বিশেষ আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় যে কাহিনী রচতি হয়েছে মানুষের জীবনে তার অবদান বর্ণনা করুন।

৫) গল্পের আদি ইতিহাস বর্ণনা করে পাঁচটি বাক্য রচনা করুন।

৬০.৫ মূলপাঠ — ২ ঃ আধুনিক ছোটগল্প ঃ ওদেশ - এদেশে

গল্পের আদিযুগে চলমান জীবনের কতকগুলি প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। জীবনের দ্যুতি সেখানে মাঝে মাঝে ফুটে উঠলেও জনরঞ্জনই ছিল তার প্রধান প্রতিপাদ্য। কিন্তু আধুনিক ছোটগল্পে একটি কাহিনী থাকলেও তার প্লট গঠন-এর প্রধান লক্ষ্য হোল কোন একটি আলোকবিন্দুতে জীবনের পূর্ণরূপকে প্রতিবিম্বিত করা। এ যুগের লেখকরা তাই তাঁদের অভিজ্ঞতা নিঙ্‌রে জানা-দেখা চেনা মানুষের রক্ত-মাংসের উত্তাপে ভরা জীবনকে শিল্পীর শিল্পবোধ, তাঁর মনন-অনুরাগে রঞ্জিত করে গল্পের মুকুরে প্রতিবিম্বিত করতে লাগলেন। এখান থেকে গল্প সাহিত্য নতুন পথে বিচরণ করতে শুরু করল — বলা যেতে পারে গল্প-সাহিত্যের যথার্থ মুক্তির ভিত্তি রচিত হোল।

আধুনিক গল্পে এই সূত্রে যুক্ত হোল সমকালীন জীবন, আর গল্পের জীবনের সঙ্গে শিল্পীর জীবনের সেইসঙ্গে শিল্পীর ভাবলোকের একাত্মতা। ওদেশ-এদেশের গল্পকারদের রচনায় বিষয়বস্তু, ভাব ব্যঞ্জনায় নতুন নতুন অভিমুখ দৃশ্যময় হয়ে উঠল। ছোটগল্পের বহিরঙ্গ-অন্তরূপের ক্রমবির্তন ও পরিবর্তন ঘটল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রুশদেশে নতুন নতুন গল্পকারের আবির্ভাব হোল। ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যের সমান্তরাল রেখায় প্রাচ্য ভূখণ্ডে চীনে-ভারতে এবং আফ্রিকায় বহু বিচিত্র ছোটগল্প লেখকের আবির্ভবা ঘটল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যে ওয়াশিংটন আর্ভিং, এডগার অ্যালান পো, নাথায়িয়েল হথর্ন এবং ও হেনরি হলেন সর্বাগ্রগণ্য চার ছোট গল্পকার, রুশ সাহিত্যে এঁদের সমতুল্য হচ্ছেন আলেকজান্ডার পুশকিন, নিকোলাই গোগোল, লিও তলস্তয়, আন্তন ছেখভ ও ম্যাক্সিম গোর্কি; ফরাসি সাহিত্যে গী দ্য মোপাঁসা, আলফঁস দোদে, অন্যর দ বালজাক; ইংরেজি সাহিত্যে চার্লস ডিকেন্স, রর্বাট লুই স্টিভেনসন, সমারসেট মম, ডি.এইচ.লরেন্স ও এইচ. জি. ওয়েলস; জার্মান সাহিত্যে হার্মান হেস, জেরালড হাউপটম্যান, ফ্রানৎস কাফকা; চীনা সাহিত্যে লাও চাও, লিন উ টাং; এঁরা সকলেই ছোটগল্পের দিগ্বলয়কে সুবিস্তৃত ও প্রসারিত করেছেন।

এখনকার প্রখ্যাত লেখকদের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার গ্যাব্রিয়েলা মার্কেজ (কলম্বিয়া), জোর্গে লুই বোর্হেস (আর্জেন্তিনা), হুয়ান রুশফো (মেক্সিকো)। আফ্রিকার একেকিয়েল মেহফ্‌লি (দক্ষিণ আফ্রিকা), নাদিন গর্দিমান (ঐ) এমোস তুতুয়ালা (নাইজেরিয়া), চিনুয়া আকেরে (ঐ) প্রমুখ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

ভারতের বিভিন্ন ভাষায় ছোটগল্পের অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে এক শতাব্দীর কিছু বেশি সময়ে। বাংলায় সর্বাগ্রগণ্য অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঃ তাঁর এবং উত্তরকালের বাংলা ছোটগল্পের বিষয়ে পরে বলছি। তার আগে সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতক্ষির একটা পরিচিত বাঞ্ছনীয়। হিন্দি, উর্দু এবং বাংলায় প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্পকারের সংখ্যা অপরিমিত। হিন্দি সাহিত্যে প্রেমচন্দ, মহাদেবী বর্মা, মোহন রাকেশ, ফনীশ্বরনাথ রেণু এবং আরও অনেকে; উর্দুতে রাজিন্দর সিং বেদী, কৃষণ-চন্দর, ইসমত চুগতাই, সাদাৎ হাসাৎ হাসান মান্টো, নাদিম রিজভি, কুরতুল-আইন্ হায়দার প্রমুখ। ওড়িয়ায় গোপীনাথ মহান্তি, অসমিয়ায় বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মহিম বরা, নবকান্ত বরুয়া, মালয়ালমে টি, শিবশংকর পিল্লাই, মুহম্মদ বৈকম বশির, তামিলে জয়কান্তন, পুদুমপৈত্তন, পাঞ্জাবীতে অমৃতাপ্রিতম, কানাড়ীতে ইউ. আর. অনন্তমূর্তি গুজরাটিতে পান্নালাল প্যাটেল, মারাঠিতে অরবিন্দ গোখলে, গঙ্গাধর গ্যাডগিল প্রমুখও ছোটগল্পকার হিসেবে অত্যন্ত খ্যাতিমান।

ভারতীয় ছোটগল্পের মানকে উন্নীত করেছেন অত্যন্ত উঁচু নিরিখেই। সামগ্রিকভাবে ভারতের ছোটগল্প এখন এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখানে যেতে বিশ্বের অনেক ভাষার কথাশিল্পকারই এখনও উন্মুখ।

বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও বিশ্বজনীন নিয়মটির কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। মিথ, রূপকথা, পশুকথা, ব্রতকাহিনী, কিংবদন্তী ইত্যাদির মধ্যেই প্রারম্ভিকভাবেই তার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। ধীরে-ধীরে, মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূত্রে যখন থেকে সাময়িকপত্রও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে লাগল, গল্পেরও মুদ্রিত রূপ দেখা যেতে লাগল তখন থেকেই। তার আগে উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা' (যথাক্রমে ১৮০১ ও ১৮১২) বইদুটির মধ্যে ছোট-ছোট স্কেচ-ধর্মী কাহিনী সংকলিত হয়েছে। এরপর 'সমাচার দর্পণ', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রভৃতি পত্রিকায় এই ধরনের গল্পিকা যথেষ্ট সংখ্যায় প্রকাশ করা হতো।

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হলে সেখানে তাঁর 'ইন্দিরা' বেরোয়। পরে এই কাহিনীকে দীর্ঘায়িত করে তিনি ছোট একটি উপন্যাসে পরিণতি দিলেও, প্রথমে যেভাবে এটি বেরোয় তাতে ছোটগল্পের লক্ষণই ছিল সুস্পষ্ট। পরের বছর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'মধুমতী' এবং তার পরের বছর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দামিনী' এবং 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' এই দুটি ছোটগল্পও ঐ পত্রিকায় বেরোয়।

বলা যেতে পারে যে, যথা-অর্থে বাংলা ছোটগল্পের পত্তন-ই হয় এইখান থেকেই। অচিরে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত হলেন বাংলা ছোটগল্পের আসরে। ১৮৭৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'ভিখারিণী' নামে একটি গল্প। এরপরে, বাংলায় ছোটগল্পের মুখ শিল্পী হিসেবে তিনিই দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে এবং পরবর্তী সময়ে বাংলা ছোটগল্প রচনায় যাঁরা খ্যাতকীর্তি, তাঁদের মধ্যে আছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরশুরাম, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, সমরেশ বসু এবং আরও অনেকেই।

বস্তুপক্ষে বাংলা ছোটগল্প সামগ্রিকভাবেই এমন একটি উন্নতমান অর্জন করেছে, যার ফলে কৃতী ছোটগল্পকারের সংখ্যাও অজস্র। এই বিশেষ শিল্পধারাটিতে এখনও নতুন-নতুন লেখক আসছেন। কালের বিচারে তাঁরা অনেকেই যে স্থায়িত্ব লাভ করবেন, সেই কথা নিশ্চিন্তেই বলা যায়।

৬০.৬ সারাংশ

মূলপাঠ — ১ ও মূলপাঠ — ২-এ গল্প ও আধুনিক ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। যাঁর সংক্ষিপ্তসার মোটামুটি এই রকম ঃ

গল্প বলা ও শোনার আকর্ষণ সভ্যতার আদিযুগ থেকেই। পৃথিবীর সব ধর্মশাস্ত্রের এটি অন্যতম মৌল উপাদান। বেদে, উপনিষদে, পুরাণকথায় বীজাকারে অগণিত গল্পের উপাদান ছড়িয়ে আছে। বৌদ্ধ জাতকে, বাইবেল, ঈশপের রচনায়, আরব্য রজনীর কাহিনিতে জীবনের অনেক সঞ্চি অভিজ্ঞতা ক্রমশ অঙ্কুরিত হয়েছে। লোকায়ত জীবনের বহুবিচিত্র বর্ণনা পাওয়া যায় লোক কাহিনিতে। এ সব গল্পে অঙ্কুরিত জীবনচেতনায় অলৌকিক শক্তির ছিল অতি বিস্তার। জীবনের সীমারেখা ও স্বভাব ধর্ম সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞানের অভাব ছিল বলে বাস্তব জীবনের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়নি।

পরবর্তীকালে, মানুষ এলো তার রক্তমাংসের উত্তাপ নিয়ে। মানুষের জীবন নিয়ে। তাঁর চেতন-অচেতন আকাঙ্ক্ষার আলোকে, শিল্পী সমসাময়িক জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি ফুটিয়ে তুলতে আগ্রহী হলেন। শিল্পীর সৃষ্টির প্রকৃতিও বদলে গেল। নতুন রূপ সৃষ্টির প্রেরণা থেকে জন্ম নেয় ছোটগল্পের বিচিত্র কলাঙ্গিক (technique)। আমেরিকার এড্‌গার অ্যালেন পো, রুশ গল্পকার আন্তন চেকভ, ফরাসী গী দ্য মোপার্সা, ছোটগল্পের নতুন নতুন পথের স্রষ্টা। তাঁর ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এক সম্পূর্ণ জীবনকে।

এদেশেও আন্তর্জাতিক মানের অনেক মূল্যবান ছোটগল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি হিন্দি সাহিত্যে প্রেমচাঁদ, মহাদেবী বর্মা, ফণীশ্বর রেণু, উর্দুতে রাজিন্দর সিং, কৃষণ চন্দর, ইস্‌মত্‌ চুঘ্‌তাই, ওড়িয়ায় গোপীনাথ মহান্তি। অসমীয়ায় বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ন বকান্ত বড়ুয়া, মালয়ালমে শিবশংকর পিল্লাই, তামিলে জয় বান্তন, পাঞ্জাবীতে অমৃতা প্রিতম প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এঁদের সম্মিলিত অবদান ভারতীয় ছোটগল্প ধারায় যেমন বৈচিত্র্য এনেছে, তেমনি জীবনকে দেখবার, জানবার নিরতিশয় আগ্রহে নতুন নতুন পথে বিচরণ করেছে।

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস অনুসরণ করলে, গল্প সাহিত্যের আদি থেকে সাম্প্রতিক কালের বিবর্তন রেখাটি সহজে ধরা পরে। কেরী থেকে পর্যায়ক্রমে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছে বাংলা ছোটগল্প যথার্থই তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্র সমকালে এবং পরবর্তী সময়ে অনেকেই, সেই ধারায় রসসিঞ্চন করছেন। এঁদের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে, সবিস্তারে তার উল্লেখ এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।

৬০.৭ অনুশীলনী — ২

মূলপাঠ — ২ অংশটি একাধিক বার পড়ে নিন। এবার নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১২৩ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১) ক) ফরাসী সাহিত্যের দুজন ছোটগল্পকারের নাম করুন।

খ) জার্মান দু'জন গল্প লেখকের নাম লিখুন।

গ) আফ্রিকার দু'জন গল্পকারের নাম লিখুন।

ঘ) দু'জন উর্দু গল্পলেখকের নাম করুন

ঙ) একজন মালয়ালম ও তামিল গল্পকারের নাম লিখুন।

২) **সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন ঃ**

ক) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গল্পকার - ডি.এইচ.লরেন্স, এড্‌গার অ্যালান পো, সমারসেট মম।

খ) চীন গল্প লেখক - তুতুয়ালী, লাও চাও, কুরতুল।

গ) অসমীয়া ছোটগল্পকার - মহাদেবী বর্মা, সাজাৎ হোসেন, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

ঘ) প্রথম বাংলা ছোটগল্প - 'দামিনী', 'ভিখারিনী', 'মধুমতী'।

৬০.৮ মূলপাঠ — ৩ ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

ছোটগল্পের উৎস শিল্পীর নিবিড়-নিঃসঙ্গ অনুভবের গভীরতায়। ছোটগল্পের বিকাশভূমি লেখকের নিভৃত মনোলোক, আশ্রয় লেখকের পরিচিত বস্তুময় জীবন। জীবনকে আশ্রয় করেই একটি বিশেষ ঘটনার বা মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তের বা বিশেষ ভাবাবেগের ওপর সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোকপাত করা ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য। ঘটনার বা ভাবগত ক্ষেত্রে একটি নাটকীয় চমক দিয়ে ছোটগল্পের সমাপ্তি ঘটে। ছোটগল্পকে এজন্য বলা হয় মুহূর্তের সৌধ (Moments Monument) — চকিত বিদ্যুৎ-বিকাশেই রচনাটি তার বক্তব্যকে দিগন্ত প্রসারিত করে দেয়— উপকরণের বাহুল্য নয়, সযত্ন নির্ধারিত উপকরণের সাহায্যে ব্যঞ্জনায় বক্তব্য প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি পংক্তিতে ছোটগল্পের পরিচয় দিয়েছেন—

''ছোটোপ্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখ কথা / নিতান্তই সহজ সরল'' হল ছোটগল্পের বিষয়। আর তা পড়ে ''অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে /শেষ হয়ে হইল না শেষ।'' কথাসাহিত্যে ক্ষেত্রে ছোটগল্প হোল সাহিত্য জগতের সর্বকনিষ্ঠ প্রজাতি।

আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনার পরিভাষায় যা 'ছোটগল্প' বলে উল্লেখিত, তার উদ্ভব হয়েছে আরো পরে। প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় কাহিনীগুলি মূলত কিছু ঘটনার পরস্পরিক বর্ণনাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠত। কিন্তু আধুনিক কালের ছোটগল্পে নিছক বিবরণধর্মিতাই নয়, তার সঙ্গে আরও অনেক কিছুর সন্নিবেশ ঘটে। একটি সুনির্দিষ্ট ভাবনাকে ঘনসংবদ্ধভাবে অল্পকিছু চরিত্র এবং ঘটনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলাই হল আধুনিক ছোটগল্পের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এই ব্যাপারটি অবশ্য বিভিন্ন অগ্রগণ্য গল্পকারের লেখায় নানাভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

ছোটগল্পেরও উপন্যাসের মতো ঘটনা, চরিত্র, বহুক্ষেত্রে সংলাপও, পটভূমি, প্লট ইত্যাদি সবই থাকে, কিন্তু তাদের প্রয়োগসিদ্ধি ঘটে সীমাবদ্ধ একটি পরিসরের মধ্যে, যেখানে প্রয়োজনের বাইরে বাড়তি কিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে দেখানোর অবকাশ থাকে না। ঘটনা কিংবা ভাবের মধ্যে আচম্বিত একটা মোড় বদল হয়ে তৎক্ষণাৎই চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছনোই হল ছোটগল্পের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য — যেটা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সাধারণত হয় না। একটিই মূল কাহিনী তার উপজীব্য, শাখাকাহিনী, উপকাহিনীর কোনও স্থান নেই সেখানে — ফলে গল্পের প্লটের বুননটা জটিল হয় না। একটি ছিমছাম, হালকা চেহারার এই শিল্পকলা লিরিক কবিতা কিংবা স্কেচের সঙ্গে তুলনাযোগ্য বলেও মনে করেছেন অনেক সমালোচক। একটি গীতিকবিতায় যেমন একটি বিশেষ সময়কালের সুনির্দিষ্ট কোনও একটি অনুভূতিই ব্যক্ত হয়, বা একটি রেখাচিত্রে যেমন বক্ষ্যমাণ দৃশ্য বা মানুষটির বিশেষ কতকগুলি রূপই দেখানো হয়ে থাকে, ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেই রকমেরই হয় অনেকটা।

বিখ্যাত আমেরিকান ছোটগল্পকার ও হেনরির (উইলিয়াম সিড্‌নি পোর্টার) লেখা একটি গল্প 'দ্য গিফ্‌ট অব দ্য ম্যাজাই'-এর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ছোটগল্পের এই সব বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্দেশ করা যেতে পারে স্বচ্ছন্দেই।

দরিদ্র এক দম্পতি। তাদের আসন্ন বিবাহবার্ষিকীতে পরস্পরকে কিছু একটা সুন্দর জিনিষ উপহার দিতে চেয়ে দুজনেই উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। দুজনেরই ইচ্ছে ছিল এমন একটা কিছু দেবে যা হবে একই সঙ্গে খুব সুন্দর এবং খুব প্রয়োজনীয় জিনিষ। ..... স্বামী তার অতি প্রিয় হাতঘড়িটি বিক্রি করে দিয়ে স্ত্রীর একরাশ ঘনকালো চুলের জন্য কিনে নিয়ে এল একটা সোনার চিরুনি। আর ওদিকে, বউটি নিজের সেই একঢাল চুলকে কেটে ফেলে, সেই

গোছা-গোছা রেশমি চুল বিক্রি করে দিল সাজপোষাকওয়ালার কাছে অনেক দাম — আর ঐ টাকায় সে কিনে আনল বরের হাতঘড়ির জন্যে একটা সোনার ব্যাণ্ড!

এই দুটি ঘটনার একত্রে মিলে কাহিনির মধ্যে ক্লাইম্যাক্স (বা চূড়ান্ত বাঁক) সৃষ্টি করেছে — আবার এই বিচিত্র আনন্দ-বেদনার উপলক্ষ যখন দুজনের কাছেই উন্মোচিত হয়ে গেল, ঠিক তখনই ঘটল কাহিনীর পরিসমাপ্তি। ক্লাইম্যাক্স এবং পরিণাম এভাবে মিশে থাকাটাই যথার্থ ছোটগল্পের চরিত্রলক্ষণ। তাই সমস্ত গল্পটিই এক সুচিহ্নিত লক্ষ্যের পানে এগিয়ে গেছে দ্রুত এবং বাহুল্যবিহীন মূর্তিতে; চরিত্র, ঘটনা, কাহিনী —সর্বত্রই সেই পরিমিতি; কাহিনীর বুননে কোনও জটিল নকশা নেই — অথচ, সুগভীর মনস্তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা তাকে অতযন্ত হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছে। সীমায়ত পরিসরের মধ্যে জীবনের পরিপূর্ণ অনুভবকে ব্যক্ত করতে পারাব এই নিখুঁত শৈলীই হল ছোটগল্পের আসল পরিচয়।

৬০.৯ সারাংশ

ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও লক্ষণ নির্ণয় নিয়ে নানা মত আছে। সংক্ষেপে বলা যায়, ব্যক্তি জীবনের কোন একটি মুহূর্ত, ঘটনা বা ভাব অবলম্বনে ন্যূনতম উপাদান নিয়ে রচিত গল্প বিশেষ। গল্প উপস্থাপনায় নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন গল্পে ঘটনা বা ভাবের অকল্পনীয়, আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত পরিণতি চমক সৃষ্টি করে। ছোটগল্পে সমকালের সুনির্দিষ্ট অনুভূতিই ব্যক্ত হয়। এখানে কোন বাহুল্যের স্থান নেই। সীমাবদ্ধ পরিসরে জীবনের পরিপূর্ণ অনুভবকে প্রকাশ করাই ছোটগল্পের লক্ষ্য।

৬০.১০ অনুশীলনী — ৩

মূলপাঠ — ৩ ভাল করে পড়ে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। উত্তর শেষে ১২৩ পৃষ্ঠা উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১) **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

ক) ছোটগল্পকে বলা হয় ———— ————।

খ) ছোট প্রাণ ——— ———— ছোট ছোটো ——— ———— নিতান্তই সহজ সরল।

গ) ছোটগল্প হোলা ——— ———— সর্বকনিষ্ঠ ————।

২) ও হেনরি-র লেখা গল্পটির নাম লিখুন এবং গল্পের সাংরাস সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩) 'ছোটগল্প' সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখুন।

৬০.১১ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী — ১

১) যেমন 'বিদ্যুৎ কেমন চমকায়', 'বাঘের গায়ে ডোরা কেন'—ইত্যাদি।

২) ক) গল্প, সাহিত্যকৃতির, প্রধানতম।

খ) মানুষ, আর্থ-সামাজিক, কাহিনী।

গ) সংস্কৃতিতে, লোককাহিনী, গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ) 'যম-যমী', 'নচিকেতা ও যমের', 'জন্মবৃত্তান্ত', 'জাতক', 'বৃহৎ-কথা'।

ঙ) 'টেস্টামেন্ট', অজস্র, 'আলিফ্-লায়লা'-র 'ফেবলস্'।

৩) ক) পঞ্চতন্ত্র, খ) 'ডেকামেরণ', গ) 'ক্যান্টারবেরি টেলস্'।

৪) পাঠ্য অংশেই এর উত্তর পাবেন। ভাল করে মূলপাঠটি পড়ুন।

৫) মূলপাঠ — ১ একাধিক বার পড়ে, নিজেই উত্তর করতে পারবেন।

অনুশীলনী — ২

১) ক) বালজাক, গী দ্য মোপার্সা — অন্যতম।

খ) হার্মান হেস্, ফ্রানক্ কাফ্কা — অন্যতম।

গ) নাজিন গর্জিমান, এমোস তুতুয়ালা — অন্যতম

ঘ) কৃষণ-চন্দর, ইস্মত চুগতাই — অন্যতম।

ঙ) শিবশংকর পিল্লাই, জয়কান্তন।

২) ক) এডগার অ্যালান পো, খ) লাও চাও, গ) বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ঘ) মধুমতী।

অনুশীলনী — ৩

১) ক) মুহূর্তের সৌধ। খ) ছোটো ব্যথা, দুঃখ কথা। গ) সাহিতয জগতের, প্রজাতি।

২) 'দ্য গিফ্ট অব দ্য ম্যাজাই'। গল্পের সারাংশের জন্য মূলগল্পটি দেখুন।

৩) মূলপাঠ — ৩ অবলম্বনে উত্তরটি প্রস্তুত করুন।

৬০.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ — ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু।

২) সাহিত্যের রূপ-রীতি — ড. উজ্জ্বল কুমার মজুদার।

৩) বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার — ড. ভূদেব চৌধুরী।

৪) বাংলা ছোটগল্প — প্রসঙ্গ ও প্রকরণ — ড. বীরেন্দ্র দত্ত।

৫) সাহিত্যে ছোটগল্প — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

৬) বাংলা ছোটগল্প — শিশিরকুমার দাশ।

একক ৬১ ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'স্ত্রীর পত্র'

গঠন

৬১.১ উদ্দেশ্য

৬১.২ প্রস্তাবনা

৬১.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও ছোটগল্প

৬১.৪ মূলপাঠ ঃ স্ত্রীর পত্র

৬১.৫ সারাংশ

৬১.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

৬১.৭ অনুশীলনী

৬১.৮ উত্তর সংকেত

৬১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৬১.১ উদ্দেশ্য

প্রথম একক পাঠ করে আপনি গল্প ও ছোটগল্পের উদ্ভব-বিকাশ সম্পর্কে জেনেছেন। সেই সঙ্গে জেনেছেন ছোটগল্পের সাধারণ লক্ষণগুলি। বর্তমান এককটিতে আপনি 'রবীন্দ্র' গল্প সাহিত্যের একটি স্মরণীয় রচনার সঙ্গে পরিচিত হবেন। এই গল্পটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের অভাবনীয় ব্যক্তিত্বের, জীবন-ভাবনার এক অনন্য পরিচয় পাবেন। সাম্প্রতিক নারীবাদী আন্দোলনের বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ সামন্ততান্ত্রিক বাংলার সমাজে নারীর লাঞ্ছনার অবমাননার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র অবলম্বনে তিনি নারীর নারীত্ব, তাঁর মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্র ছোটগল্পের সংসারে এরকম আরও কয়েকটি গল্প আছে, যার নায়িকারা বুদ্ধি, যুক্তি, চিন্তা ও চৈতন্যে সমকালকে অতিক্রম করে কালাতীত মূল্যবোধকে তুলে ধরেছে।

এককের মূলপাঠ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে আপনি যে জ্ঞান আহরণ করবেন, তার সাহায্যে আপনার—

- রবীন্দ্রনাথের একটি অসামান্য গল্পের সঙ্গে পরিচয় হবে।
- গল্পটির মাধ্যমে রবীন্দ্র-গল্প সাহিত্য সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা অর্জন করবেন।
- উপলব্ধি করতে পারবেন রবীন্দ্রনাথের যুগাতিশায়ী মনন ও মনীষার পরিচয়।
- চিঠির আকারে লেখা এই রচনাটির মাধ্যমে আপনার পরিচয় হবে গল্প-রচনার এক নতুন আঙ্গিকের সঙ্গে।

৬১.২ প্রস্তাবনা

প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' মাসিক পত্রিকা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি মনন, বিষয় ভাবনা, উপস্থাপনা ও ভাষাশৈলীর ক্ষেত্রে নতুন বার্তা বয়ে এনেছিল। এ পর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি পূর্ববর্তী 'হিতবাদী', 'সাধনা', ভারতী' যুগ থেকে অনেকাংশেই স্বতন্ত্র। এ সময়ের গল্পে জীবন ও সমাজের নানা সমস্যার সচেতন বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। নারীর সামাজিক ভূমিকা নিয়ে নানা চিন্তা ভাবনা রবীন্দ্র মননকে আশ্রয় করেছে। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত অনেক গল্পে তাই দেখা যায় ব্যক্তি হিসেবে পুরুষ থেকে নারীর ব্যক্তিত্বই তাঁর গল্পে অনেকটা জায়গা করে নিয়েছে। পুরুষ চরিত্র এখানে অবহেলিত না হলেও, নারী এ পর্বে অনেকটা দীপ্তিময়ী উজ্জ্বল এবং মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। প্রসঙ্গতঃ 'হৈমন্তী', 'পয়লা নম্বর' স্মরণীয়। এসব গল্পে নারী যে শুধুই স্ত্রী নয়, তাঁরও একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্তা আছে — তা তুলে ধরা হয়েছে।

'স্ত্রীর পত্র' পত্রাকারে লেখা 'ছোটগল্প'। বাংলা সাহিত্যে এই বিশেষ ধরনের আঙ্গিকের ব্যবহার প্রথম দেখা যায় মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে। ঐ কাব্যটি ওভিদের 'হেরোইদায়' কাব্য অনুসরণে রচিত। 'বীরাঙ্গনা'-য় নায়িকারা দীপ্তিময়ী, তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ জানিয়েছেন। 'সবুজপত্রে' 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের প্রকাশ ১৯১৪। অর্থাৎ ১৩২১ বঙ্গব্দের শ্রাবণ সংখ্যায়। মূলগল্প পাঠের সময় বর্তমান আলোচনা গল্পের প্রতিপাদ্য বুঝতে সহায়ক হবে।

৬১.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে। তাঁর কাব্য রচনার আনুষ্ঠানিক সূচনা বলা যায় ১৮৭৫ — চতুর্দশ বর্ষীয় বালক হিন্দুমেলায় স্বরচিত কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে। ১৮৭৭-এও আর একটি কবিতা পড়েছিলেন। এরপর নগরবাসী রবীন্দ্রনাথ মনের সহজ অনুভবের একান্ততা থেকে জোড়াসাঁকোর সীমাবদ্ধ জীবন থেকে যখনই বেরিয়েছেন, অনুভব করেছেন, পল্লীপ্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে একাত্মতা — ক্রমে দেশের সুবৃহৎ জনজীবনের বেদনাও তাঁর নিভৃত অন্তরে প্রবেশলাভ করেছিল। কিন্তু তখনও কবির গ্রাম-বাংলার সঙ্গে গভীর নৈকট্য স্থাপিত হয়নি। অন্তরের এই প্রাণ-প্রীতি থেকে গ্রাম-জীবন। সম্পর্কে আবাল্য আকর্ষণ অনুভব করেছেন। এই সত্যকে স্বীকার করলেই রবীন্দ্র-গল্প সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন সূত্রকে অনুধাবন করা যাবে। তাঁর ছোটোগল্পে বস্তুত বাঙালি-জীবনমুখীনতাই প্রকাশ পেয়েছে। 'ঘাটের কথা' (কার্ত্তিক, ১২৯১), 'রাজপথের কথা' (১৩০০) ঠিক গল্প নয়। গল্পাভাস গল্পচিত্র বিশেষ। শেষোক্তটির কাহিনীর স্বপ্লতায় দার্শনিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। ফলত ছোটগল্প হয়ে ওঠেনি।

১২৯৮ জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্রনাথ 'হিতবাদী' পত্রিকায় পরপর ছটি ছোটগল্প লেখেন। এখান থেকেই তাঁর যথার্থত ছোটগল্প লেখা শুরু। এ সময় কবি শিলাইদা, পতিসর, নাটোর নানা জাগয়াগ নদীপথে ঘুরছেন — জমিদারী দেখার কাজে। পদ্মা-বাস পর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুললেন। বাংলার গ্রাম যেন বস্তুঘন জীবনভূমিতে নেমে এলো বাংলা কথাসাহিত্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বাদ্‌শা, রাজা, জমিদার প্রভৃতি সামন্ত প্রভুরা আধা গ্রাম-শহর ছেড়ে অন্তর্হিত হলেন গ্রাম-বাংলা ও তার জনজীবন স্থান করে নিল। বাংলা গল্পের পট পরিবর্তন হল।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি পর্ব চিহ্নিত করা যায়। প্রথম পর্বের লেখাগুলি মূলত 'হিতবাদী' পত্রিকাকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করে। পরের পর্বটি 'সাধনা' পত্রিকাকেন্দ্রিক। তৃতীয় পর্যায়টিকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'সবুজপত্র'-এর যুগ; এবং শেষপর্বটি তাঁর জীবনের সায়াহ্নকালে আত্মপ্রকাশ করে, সমালোচক মহলে যার নাম 'তিনসঙ্গী' পর্ব। এর বাইরে 'নবজীবন', 'ভারতী', 'বালক' প্রভৃতি পত্রিকাতেও কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম তিনটি পর্বেকে অবলম্বন করে 'গল্পগুচ্ছ' তিনখণ্ড প্রকাশিত হয় পরবর্তীকালে। চতুর্থ পর্বের লেখাগুলির সঙ্গে 'লিপিকা', 'গল্পসল্প' এবং 'সে' গ্রন্থের কাহিনিগুলিও একত্রে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১৮৭৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' প্রকাশিত হয়। শেষ লেখাগুলি ১৯৪০ সালের 'গল্পসল্প' বইতে প্রাপ্য। 'হিতবাদী' পর্বে তিনি মূলত গ্রামজীবনকে অবলম্বন করেই লেখেন। 'সাধনা' পর্বে, তাঁর লেখায় তার সঙ্গে নগরজীবন প্রতিভাত হতে থাকে। 'সবুজপত্র'-র আমলে মনোবিশ্লেষণমূলক গল্প রচিত হয়। এবং এই ধারাটিই পুনর্বিকশিত হয়ে শেষপর্বে।

সাধারণ মানুষের জীবন তাঁর গল্পে ব্যাপকভাবে স্থান অধিকার করেছে। জবিদারী প্রথা, পণপ্রথা, নারী-পুরুষের পারস্পরিক উপলব্ধির বহু বিচিত্রতা, সামাজিক এবং রাজনৈতিক টাপাপোড়েন, মনের অন্তর্বিলীন গহেনে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠা নানা কূটৈষণা আপাত-অলৌকিকতা ইত্যাদি তাঁর লেখা গল্পগুলিতে ব্যাপক স্থান অধিকার করেছে। তাঁর ছোটগল্পের শিল্পনির্মিতি এবং বিষয় গভীরতার জন্য, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারদের সঙ্গে তাঁকে নির্দ্বিধায় একাসনস্থিত করা যেতে পারে।

৬১.৪ মূলপাঠ ঃ স্ত্রীর পত্র

শ্রীচরণকমলেষু

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখি নি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি — মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি; চিঠি লেখাবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায়নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাছে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে-সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই; সে তোমার দেহমনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে; তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজো বউয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জানত না, সেই শিশুবয়সে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠলুম। পাড়ার সব মেয়েরাই বলতে লাগল, ''মৃণাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত?'' চুরিবিদ্যাতে যম পাকা, দামি জিনিসের 'পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বসেছি।

যেদিন তোমাদের দূরসম্পর্কের মামা তোমার বন্ধ নীরদকে নিয়ে কনে দেখতে এলেন, তখন আমার বয়স বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলা শেয়াল ডাকে। স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ শ্যাক্‌রা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পাল্‌কি করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছনো যায়। সেদিন তোমাদের কী হয়রানি। তার উপরে আমাদের বাঙাল দেশের রান্না — সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেন নি।

তোমাদের বড়োবউয়ের রূপের অভাব মেজোবউকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন? বাংলাদেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না — তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বুক দুর্‌দুর্‌ করতে লাগল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু, সেই রূপের গুমর তো মেয়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে-দামই দেবে সেই তার দাম। তাই তো হাজার রূপে গুণেও মেয়ে-মানুষের সংকোচ কিছুতে ঘোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন কি, সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল — আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজতে লাগল — তোমাদের বাড়িতে এসে উঠলুম। আমার খুঁৎগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন, মোটের উপর আমি সুন্দরী বটে। সে-কথা শুনে আমার বড়ো জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু, আমার রূপের দরকার কী ছিল তাই ভাবি। রূপ-জিনিসটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন, তাহলে ওর আদর থাকত; কিন্তু, ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে, সে-কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু, আমার যে বুদ্ধি আছে, সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু কী করব বলো। তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে। তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা; অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখান তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে, সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি; আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সব চেয়ে যেটা আমার মনে জাগছে সে তোমাদের গোয়ালঘর। অন্দরমহলের সিঁড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোরু থাকে, সামনের উঠোনটুকু ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাব্‌না দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ, উপবাসী গোরুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব্‌লা করে দিত। আমার প্রাণ কাঁদত। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে — তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত শহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মতো আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নতুন বউ ছিলুম নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম; যখন বুড়ো হলুম তখন গোরুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকত তাহলে সেই আমার জীবনে যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সত্য সমস্ত এনে দিত; তখন মেজবউ থেকে একেবারে মা হয়ে বসতুম। মা যে এক-সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্ব-সংসারের। মা হবার দুঃখটুকু পেলুম কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।

মনে আছে, ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জা আসবাবের অভাব নেই। আর, অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্‌টো পিঠ; সেদিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সেদিকে আলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলে; হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে; উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু, ডাক্তার একটা ভুল করেছিল; সে ভেবেছিল, এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ঠিক উল্‌টো — অনাদর জিনিসটা ছাইয়ের মতো, সে ছাই আগুনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেই জন্যে তার বেদনা নেই। তাই তো মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি, মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে, এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়, তাহলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো; আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।

যেমন করেই রাখ, দুঃখ যে আছে, এ কথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসে নি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়াল, মনে ভয়ই হল না। জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে ? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তাহলে আল্‌গা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়সুদ্ধ আমি তেমনি করে উটে আসতুম। বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু, এমন মরায় বাহাদুরিটা কী। মরতে লজ্জা হয়; আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।

আমার মেয়েটি তো সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম এবং গোরুবাছুর নিয়ে পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত কেটে যেত, আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু, বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথগাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইঁটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল; তারপর থেকে ফাটল শুরু হল।

বিধবা মার মৃত্যুর পর আমার বড়ো জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে

তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে, তোমরা সেদিন ভাবলে, এ আবার কোথাকার আপদ। আমার পোড়া স্বভাব, কী করব বলো — দেখলুম, তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ, সেইজন্যেই এই নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একবারে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া সে কতবড়ো অপমান। দায়ে পড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল, তাকে কি এক পাশে ঠেলে রাখা যায়।

তারপরে দেখলুম আমার বড়ো জায়ের দশা। তিনি নিতান্ত দরদে পড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু, যখন দেখলেন স্বামীর অনিচ্ছা, তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই, যেন একে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন, সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সংকট দেখে আমার মন আরও ব্যথিত হয়ে উঠল। দেখলুম, বড়ো জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়াপরার এমনি মোটারকমের ব্যবস্থা করলেন এবং বাড়ির সর্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার, কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর, অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।

আমাদের বড়ো জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিল না — রূপও না, টাকাও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে তো সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে যতদূর সম্ভব সংকুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন।

কিন্তু তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো মুশকিল হয়েছে। আমি সলক দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারি নে। আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর-কারও খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয় — তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম। দিদি বললেন, ''মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেন।'' আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম, এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে যে-স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হালকা হল। আমার বড়ো জা বিন্দুর বয়স থেকে দু-চারটে অঙ্ক বাদ দিয়ে চেষ্টা করতেন। কিন্তু, তার বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল না, এ কথা লুকিয়ে বললে অন্যায় হত না। তুমি তো জান, সে দেখতে এতই মন্দ ছিল যে পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেঝেটার জন্যেই লোকে উদ্‌বিগ্ন হত। কাজেই পিতা-মাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মতো মনের জোরই বা কজন লোকের ছিল।

বিন্দু বড়ো ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগলে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো শর্ত ছিল না; তাই সে কেবলই পাশ কাটিয়ে, চোখ এড়িয়ে চলত। তার বাপের বাড়িতে তার খুড়তুতো ভাইরা তাকে এমন একটু কোণও ছেড়ে দিতে চায় নি যে-কোণে একটা অনাবশ্যক জিনিস পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জনা ঘরের আশে-পাশে অনায়াসে স্থান পায়, কেননা মানুষ তাকে ভুলে যায়, কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমানুষ যে একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শক্ত, সেইজন্যে আঁস্তাকুড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খুড়তুতো ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জোর নেই। কিন্তু, তারা বেশ আছে।

তাই, বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আনলুম, তার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। তার ভয় দেখে আমার বড়ো দুঃখ হল। আমার ঘরে যে তার একটুখানি জায়গা আছে, সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম।

কিন্তু, আমার ঘর শুধু তো আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হল না। দু-চারদিন আমার কাছে থাকতেই তার গায়ে লাল-লাল কী উঠল, হয়তো সে ঘামাচি, নয় তো আর-কিছু হবে। তোমরা বললে বসন্ত। কেননা, ও যে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্তার এসে বললে, আর দুই-একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সেই দুই-একদিনের সবুর সইবে কে। বিন্দু তো তার ব্যামোর লজ্জাতেই মরবার জোর হল। আমি বললুম, বসন্ত হয় তো হোক, আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, আর-কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্তি ধরেছ, এমন-কি বিন্দুর দিদিও যখন অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করছেন, এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলে। বললে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ও যে বিন্দু।

অনাদরে মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ শরীরটাকে তাতে একেবারে অজর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চায় না — মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল, কিছুই হল না। কিন্তু, এটা বেশ বোঝা গেল, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন। আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষম।

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর এক গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালোবাসতে শুরু করলে যে, আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালোবাসার এরকম মূর্তি সংসারে তো কোনোদিন দেখি নি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে-পুরুষের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিল সে-কথা আমার মনে করবার কোনো কারণ বহুকাল ঘটে নি — এতদিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বলত, ‘‘দিদি, তোমার এই মুখখানি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় নি।’’ যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম, সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে নাড়তে-চাড়তে তার ভারি ভালো লাগত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের তো দরকার ছিল না। কিন্তু, বিন্দু আমাকে অস্থির করে রোজই কিছু-না-কিছু সাজ করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তরদিকের পাঁচিলের গায়ে নর্দমার ধারে কোনো গতিকে একটা গাবগাছ জন্মেছে। যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠেছে, সেইদিন জানতুম, ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি বুঝলুম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে — সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দুর ভালোবাসার দুঃসহ বেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। এক একবার তার উপর রাগ হত, সে-কথা স্বীকার করি, কিন্তু তার এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।

এদিকে, বিন্দুর মতো মেয়েকে আমি যে এতটা আদরযত্ন করছি, এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খুঁৎখুঁৎ-খিট্‌খিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেল, সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকমের হাত ছিল, এ-কথার আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল না। যখন স্বদেশী হাঙ্গামার লোকের বাড়িতল্লাসি হতে লাগল তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ করে বসলে যে, বিন্দু পুলিসের পোষা মেয়ে চর। তার আর কোনো প্রমাণ ছিল না কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি করত — তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাশ করলে, ও-মেয়েও একেবারে সংকোচে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। এইসকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখলুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগে নি। বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলেন যে, আমার হাতখরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর, মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল, তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুশি হও নি। আমাকে খুশি না করলেও চলে অঅর তোমাদের খুশি না করলেই নয়, এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্যন্ত আমার ঘটে এল না।

এদিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য হই, তোমরা জোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাও নি। আমি বেশ বুঝি, তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় কর। বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় করতে না পেরে তোমরা প্রজাপতি দেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড়ো জা বললেন, ‘বাঁচলুম, মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা করলেন।''

বর কেমন তা জানি নে; তোমাদের কাছে শুনলুম, সকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল; বললে, ''দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন।''

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, ''বিন্দু, তুই ভয় করিস নে — শুনেছি, তোর বর ভালো।''

বিন্দু বললে, ''বর যদি ভালো হয়, আমার কী আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে।''

বরপক্ষেরা বিন্দুকে তো দেখতে আসবার নামও করলে না। বড়দিদি তাতে বড়ো নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু, দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর থামতে চায় না। সে তার কী কষ্ট, সে আমি জানি। বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি কিন্তু ওর বিবাহ বন্ধ হোক, এ-কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বলব। আমি যদি মারা যাই তো ওর কী দশা হবে।

একে তো মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে — কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে-কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

বিন্দু বললে, ''দিদি, বিয়ের আর পাঁচদিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি।''

আমি তাকে খুব ধমকে দিলুম, কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তাহলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বললে, ''দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বলবে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।''

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু, শুধু হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে। তিনি বললেন, ''জানিস তো, বিন্দি, পতিই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি মুক্তি সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না।''

আসল কথা হচ্ছে, কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই — বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হোক।

অআমি চেয়েছিলুম, বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু, তোমরা বলে বসলে, বরের বাড়িতেই হওয়া চাই — সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বুঝলুম, বিন্দুর বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ করতে হয়, তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুপ করে যেতে হল। কিন্তু, একটি কথা তোমরা কেউ জান না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাই নি, কেননা তাহলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন — আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নি। দোহাই ধর্মের, সেজন্যে তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, ''দিদি, আমাকে তোমরা তাহলে নিতান্তই ত্যাগ করলে?''

আমি বললুম, ''না বিন্দি, তোর যেমন দশাই হোক না কেন, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করবে না।''

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিল, তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লা রাখবার ঘরের এক পাশে বাস করতে দিয়েছিলুম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আসতুম; তোমার চাকরদের প্রতি দুই-একদিন নির্ভর করে দেখেছি, তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি, বিন্দু এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

বিন্দুর স্বামী পাগল।

'সত্যি বলছিস, বিন্দি?''

''এত বড়ো মিথ্যা কথা তোমার কাছে বলতে পারি, দিদি? তিনি পাগল। শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না — কিন্তু তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে

তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।''

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়লুম। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুস দয়া করে না। বলে, 'ও তো মেয়েমানুষ বই তো নয়। ছেলে হোক-না পাগল, সে তো পুরুষ বটে।'

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে, তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল। বিন্দু দুপুরবেলায় পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রানী রাসমণি; বেহারাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রানীকে তার নিজের থালার ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দু তো ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বললে, বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরও ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে ঢুকতে হল। স্বামী সে-রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু, ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বললুম, ''এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দু, তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক্, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।''

তোমার বললে, ''বিন্দু মিথ্যা কথা বলছে।''

আমি বললুম, ''ও কখনো মিথ্যা বলে নি।''

তোমরা বললে, ''কেমন করে জানলে।''

আমি বললুম, ''আমি নিশ্চয় জানি।

তোমরা ভয় দেখালে, ''বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিস-কেস করলে মুশকিলে পড়তে হবে।''

আমি বললুম, ''ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ-কথা কি আদালত শুনবে না।''

তোমরা বললে, ''তবে কি এই নিয়ে আদালত করতে হবে নাকি। কেন, আমাদের দায় কিসের।''

আমি বললুম, ''আমি নিজের গয়না বেচে যা করতে পারি করব।''

তোমরা বললে, ''উকিলবাড়ি ছুটবে নাকি।''

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কী করব।

ওদিকে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির থেকে ওর ভাসুর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বলছে, সে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কী জোর আছে জানি নে — কিন্তু কসাইয়ের হাত থেকে যে গোরুপ্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে পুলিসের তাড়ায় আবার সেই কসাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে, এ কথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্ধা করে বললুম, ''তা দিক্ থানায় খবর!''

এই বলে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি, বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদপ্রতিবাদ যখন চলছিল তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাসুরের কাছে ধরা দিয়েছে। বুঝেছে, এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেলবে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরও বাড়ালে। তার শাশুড়ির তর্ক এই যে, তার ছেলে তো ওকে খেয়ে ফেলেছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয়, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড়ো জা বললেন, ''ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কী করব। তা পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে।''

কুষ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে সতীসাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল; জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচবোধ হয় নি, সেই জন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছে, তোমাদের মাথা হেঁট হয় নি। বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেলে কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিল না। আমি তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন। তোমাদের এই সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না।

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আসবে না, কিন্তু আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম যে, তাকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোটো ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ছিল; তোমরা জানই তো যত রকমের ভলন্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁদুর মারা, দামোদরের বন্যায় ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি দুবার যে এফ. এ. পরীক্ষায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে যায় নি। তাকে আমি ডেকে বললুম, ''বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না, লিখলেও আমি পাব না।''

এরকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম, বিন্দুকে ডাকাতি করে আনতে কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তা হলে সে বেশি খুশি হত।

শরতের সঙ্গে আলোচনা করছি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বললে, ''আবার কী হাঙ্গামা বাধিয়েছ''।

আমি বললুম, ''সেই যা-সব গোড়ায় বাধিয়েছিলুম, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম — কিন্তু সে তো তোমাদেরই কীর্তি।''

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, ''বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ?''

আমি বললুম, ''বিন্দু যদি আসত তা হলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আসবে না, তোমাদের ভয় নেই।''

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরও বেড়ে উঠল। আমি জানতুম, শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে, এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল, ওর 'পরে পুলিসের দৃষ্টি আছে — কোন্ দিন ও কোন্

রাজনৈতিক মামলায় পড়বে, তখন তোমাদের সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।

তোমার কাছে শুনলুম, বিন্দু আবার পালিয়েছে, তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাসুর খোঁজ করতে এসেছে। শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বিঁধল। হতভাগিনীর যে কী অসহ্য কষ্ট তা বুঝলুম অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই।

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বললে, ''বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু তারা তুমুল রাগ করে তখনই আবার তাকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। এর জন্যে তাদের খেসারত এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘটেছে, তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরে নি।

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বললুম, ''আমিও যাব।''

আমার হঠাৎ এমন ধর্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুশি হয়ে উঠলে যে, কিছুমাত্র আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্ দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

বুধবারে আমাদের যাবার দিন, রবিবারের সমস্ত ঠিক হল। আমি শরৎকে ডেকে বললুম, ''যেমন করে হোক, বিন্দুকে বুধবারে পুরী যাবার গাড়িতে তোকে তুলে দিতে হবে।''

শরতের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল; সে বললে, ''ভয় নেই, দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্যন্ত চলে যাব — ফাঁকি দিয়ে জগন্নাথ দেখা হয়ে যাবে।''

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তার মুখ দেখেই আমার বুখ দমে গেল। আমি বললুম, ''কী শরৎ? সুবিধা হল না বুঝি?''

সে বললে, ''না।''

আমি বললুম, ''রাজি করতে পারলি নে?''

সে বললে, ''আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলুম, তার কাছে খবর পেলুম, তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল, কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছে।''

যাক্, শান্তি হল।

দেশসুদ্ধ লোক চটে উঠল। বলতে লাগল, ''মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাশান হয়েছে।''

তোমরা বললে, ''এ সমস্ত নাটক করা।'' তা হবে। কিন্তু নাটকের তামাসটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালি বীর পুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দিটার এমনি পোড়া কপাল বটে। যতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো যশ পায় নি — মরবার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনের মরবে যাতে দেশের পুরুষরা খুশি হবে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না। মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু সে কান্নার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। যাই হোক্-না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে, মরেছে বই তো না! বেঁচে থাকলে কী না হতে পারত।

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হয় তা হলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধ্বী বড়ো জায়ের মতো পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাই নে — আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়।

কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তার পরে এও দেখেছি, ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক্-না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়ো। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামতো আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্ — সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম, জগতের মধ্যে যা-কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যকার চারি-দিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্‌বুদটা এমন ভয়ংকর বাধা কেন। তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে করে যেমন করেই ডাক দিক না, এক মুহূর্তের জন্যে কেন আমি এই আন্দরমহলটার এইটুকু মাত্র চৌকাঠ পেরতে পারি নে। তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইঁটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত বাঁধা মার — কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশবন্ধনেরই হবে জিত — আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল — কোথায় রে রাজমিস্ত্রীর গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া; কোন্ দুঃখ কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে। ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে! ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর! তোর মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না।

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলেন। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই অভবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।

তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি — ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল — তার শিকলও তো কম ভারি ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয় নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু — তাতে তার যা হবার তা হোক।' এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন —

মৃণাল

শ্রাবণ ১৩২১

৬১.৫ সারাংশ

'স্ত্রীর পত্র' গল্পের উপস্থাপনায় সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলির বাড়ীর মেজ বৌ মৃণাল পিস্ শাশুড়ীর সঙ্গে শ্রীক্ষেত্র গিয়ে তাঁর স্বামীকে চিঠি লিখছে।

বিয়ের পনেরো বছর পর সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সে জগত এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ জানতে পেরেছে - এ সংবাদ স্বামীকে জানিয়েছে।

মৃণাল দুর্গম পাড়া গাঁয়ের মেয়ে। বৌ — মেজবৌ হয়ে এসেছে কলকাতার ইট কাঠের চার দেওয়ালের অন্দরমহলে। এ বাড়ীর বৌয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার, অসতর্ক বিধাতা মেজেবৌকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি বুদ্ধি দিয়েছেন শুধু নয়, সেই সঙ্গে তাঁর ছিল কবিতা লেখার ক্ষমতা।

কোলকাতার বনেদি বাড়ীর আভিজাত্য — বাড়ীর সদরের বাগান, ঘরের সাজসজ্জা — আসবাবের অভাব নেই; কিন্তু অন্দরটি ছিল তার উল্‌টো — সেখানে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। আলো জ্বলে মিট্‌মিট্ করে। হাওয়া চোরের মত প্রবেশ করে। উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না, দেওয়াল, মেঝের কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। এখানে মেয়ে-মানুষকে দুঃখ পেতেই হবে এইটে নিয়ম।

এ বাড়ীর আতুড়ঘরে মেজবৌয়ের মেয়েটি জন্ম নিয়ে মারা গেল। মায়েরও ডাক এসেছিল। ছোট একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে সন্ধ্যা তারার মত ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল — মা হবার দুঃখটুকু পেলেও মা হবার মুক্তিটুকু পেলে না। মেজ বৌ থেকে মা হয়ে সংসারে থেকেও বিশ্বসংসারের হয়ে উঠতে পারলে না।

মেজবৌ সংসারের নিত্য কর্মে আবার জড়িয়ে পড়ে। বড় জায়ের বোন বিন্দু সংকটে পড়ে দিদির কাছে আশ্রয় নেয়। বাড়ীর লোকেরা ভাবলে এ আবার কোন আপদ। মেজবৌ সমস্ত মন, সমবেদনা নিয়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বড়বৌ বিন্দুকে সাংসারিক কাজে নিযুক্ত করে খাওয়া পড়ার যৎসামান্য ব্যবস্থা করলেন। বড়জা'র সংকট ও বিন্দুর দুরবস্থা দেখে মেজবৌর মন ব্যথিত হয়ে ওঠে — সে শুধু দুঃখ নয়, লজ্জাবোধ করে — বিন্দুকে নিজের ঘরে টেনে নেয়। বিন্দু ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে গেল। স্নেহস্পর্শে বুঝল তার আশ্রয়কে। বিন্দুর ভয় ভাঙল। সে মেজবৌকে এমন গভীরভাবে ভালবাসলে যেন পাগল হয়ে উঠল। প্রকৃতিতে বসন্তের ছোঁয়া যখন লাগল, বিন্দুর অনাদৃত চিত্তও যে আগাগোড়া রঙিন হয়ে উঠল; মেজবৌও তখন হৃদয়ে অনুভব করলে, জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে — সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে। এই ভালবাসার মধ্য দিয়ে মেজবৌ তার নিজের স্বরূপকে দেখেছে — আবিষ্কার করেছে জীবনের মুক্ত রূপ।

বিন্দুকে নিয়ে প্রতিকূলতার সীমা ছিল না। কিন্তু সব বাধা অস্বীকার করে বিন্দুর আনুকূল্য করায়, তাঁর হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

অবশেষে, বিন্দুর বয়স বেড়ে যাওয়ার বিব্রত হয়ে তাকে বিদায় করবার উপায় তৈরী হোল। বিন্দুর বর ঠিক হোল। বিয়ের পর জানা গেল সে পাগল। বিন্দুর শাশুড়িও পাগল। বিন্দু পালিয়ে এসে, গোপনে এ বাড়ীতে আশ্রয় নিলে। পরে এ বাড়ীর সংকট এড়াতে সে শ্বশুরবাড়ী চলে যায়। সেখানে, শেষে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে।

বিন্দুর এমনই পোড়া কপাল সে বেঁচে থেকেও রূপ-গুণের জন্য কোন যশ পায় নি। মরে গিয়েও লোকেদের চটিয়ে দিলে। মেজবৌ মৃণাল বলেছে, সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে খাওয়া পরায় অস্বচ্ছলতা ছিল না, কারও বিরুদ্ধে সেরকম কোন নালিশ না থাকলেও এটা বোঝা গেছে এ বাড়ীতে মেয়েদের কোন স্বতন্ত্র পরিচয় নেই। কিন্তু বিন্দু তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এটা বুঝিয়ে দিয়েছে সে কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, সে তার হতভাগ্য মানব জন্মের চেয়ে বড়ো। বিন্দুর এই মৃত্যুতে মৃণাল নতুনতর সত্যকে আবিষ্কার করেছে, অভ্যাসের অন্ধকার এতদিন তাকে ঢেকে রেখেছিল, বিন্দু তার মৃত্যু দিয়ে সেই আবরণ আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়েছে — মেজবৌ মরেছে, মৃণালের সামনে আজ নীল সমুদ্র, মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ। তাঁর শেষ কথা — আমি বাঁচব, আমি বাঁচলুম। মীরাবাঈকে বাঁচবার জন্য মরতে হয়নি।

৬১.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) লিখেছিলেন 'সবুজপত্র'-এর ১৩২১ সনের শ্রাবণ সংখ্যায়। এটি চলিতভাষায় লেখা তাঁর প্রথম গল্প। এদিক থেকে বিচার করলেও, এই গল্পের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। শুধু বিষয়বস্তুই নয়, প্রকাশ মাধ্যমের ব্যাপারেও এর অভিনবত্ব লক্ষণীয়। চলিত ভাষায় লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠির আয়তনে রচিত এই গল্পের মাধ্যমে নারীর আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠার যে ঘোষণা সোচ্চার হয়েছে, তাকে আমাদের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে একান্তভাবে উল্লেখনীয় বলেই মানতে হবে। যেদেশে নারীত্বের আদর্শ হিসেবে সর্বদাই শেখানো হয়েছে যে, স্ত্রী হবে স্বামীর ''ছায়া ইব অনুগতা'' সেখানে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির আর সকলের অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া এবং নিজের সেই উপলব্ধিকে বাঙ্‌ময় করে তোলার এমন নজির

গত শতাব্দীর প্রথমদিকের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল নেহাৎই অকল্পনীয়। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের সূত্রে নারীর স্বপ্রতিষ্ঠ হবার, স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করার অনাগত কালকেই যেন পূর্বঘোষিত করতে চেয়েছেন।

অবশ্য সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রতিবাদিনী নারী এই গল্পের নায়িকা মৃণালই একা নয়। তার মতোই 'মানভঞ্জন'-এর গিরিবালা কিংবা 'পয়লা নম্বর' গল্পের অনিলা উপেক্ষা, অপমান ও অবিচারের প্রতিবাদ জানিয়ে স্বামীকে ত্যাগ করেছে। এদের তিনজনের মধ্যে যে ভাবগত মিলটা আছে, তা হল এরা প্রত্যেকেই স্বামীগৃহের রক্ষণশীল, পুরোনোপন্থী আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধকে বর্জনীয় বলে উপলব্ধি করেছে এবং তার চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে চলে গেছে নিজের পায়ের তলার জমি নিজেই খুঁজে নেবার অভীপ্সায়।

এই ধরনের আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী আরও যেসব নারীকে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এবং কথাসাহিত্যে আমরা দেখি (যেমন ঃ 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের চিত্রাঙ্গদা, 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনী; 'গোরা'-র ললিতা; 'চতুরঙ্গ'-এর দামিনী, 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনী; কাহিনী-কাব্য 'নিষ্কৃতি'-র মঞ্জুলিকা এবং 'অমৃত'-র অমিয়া) তাদের সঙ্গে মৃণাল এবং অনিলা-গিরিবালার পার্থক্য আছে। তারা আত্মস্বাতন্ত্র্যের দীপ্র ঘোষণায় মুখর ঠিকই কিন্তু এই তিনজনের মতন সামাজিক-পারিবারিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মেল-শ্যভিনিজ্‌মকে ধিক্কার দিয়ে বিদ্রোহ করেনি। মৃণালের বিদ্রোহ আবার এই তিনজনের মধ্যে তীব্রতর — কেননা, সে তার চিঠির মাধ্যমে শ্বশুরবাড়ির সমস্ত পরিবারটাকেই যেন ন্যায়-নীতির কাঠগড়ায় আসামী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

মৃণাল যেভাবে তার স্বামীকে সম্বোধন করে চিঠি শেষ করেছে (''তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন মৃণাল'') তার সঙ্গে তার প্রারম্ভিক সম্বোধনটির (''শ্রীচরণকমলেষু'') তুলনা করলেই বোঝা যায় যে, এই কাহিনীর মধ্যে কীভাবে তার জীবনাদর্শটি বাঙ্‌ময় ও প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। তার যে-চিন্তার স্বাতন্ত্র্য এই গল্পের মুখ্য উপজীব্য, সেটি তো এদেশের পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক মূল্যবোদের প্রেক্ষিতে নারীর মর্যাদাবোধ ও ন্যায়সঙ্গত পারিবারিক-সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ আত্মসমীক্ষা। সমাজ বাস্তবতার এই গভীর উপলব্ধির স্তরটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে একটি প্রত্যক্ষ-বহিরঙ্গের কাহিনী, যা গড়ে উঠেছে বিন্দুর জীবনের করুণ ট্র্যাজেডির অনুষঙ্গে।

ধনীগৃহে আশ্রিতা আত্মীয়কন্যার প্রতি সমগ্র পরিবারের উপেক্ষা এবং হৃদয়হীনতার কাহিনী অবশ্য সেযুগের বাংলা কথাসাহিত্যে বিরল ছিল না। কিন্তু বিন্দুর জীবনে বিবাহ নামক 'দুর্ঘটনাটি' সাংসারিক সীমানাকে অতিক্রম করে একটা সামাজিক ভ্রষ্টতার বিধানকেই স্পষ্টচিহ্নে সূচিত করে তুলেছে। আর সেই উপলক্ষেই মৃণাল বিদ্রোহ করেছে নিজের শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। বস্তুত, তার ঐ বিদ্রোহ আসলে চিরাভ্যস্ত সামাজিক-বিধিবিধানের অপহ্নবী চরিত্রের বিরুদ্ধেই — এমন বললেও ভুল হবে না।

বিন্দুর বিয়ে এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলীর সূত্রে যে-অমানবিক হৃদয়হীনতার উদ্‌ঘাটন ঘটেছে এই গল্পে, তা আমাদের সমাজে খুবই পরিচিত, সুলভ; হয়ত আজও। বিন্দুর ট্র্যাজেডিকে হয়ত আমরা ব্যক্তিগত বেদনার কাহিনী হিসেবেই গণ্য করতাম, যদি-না মৃণালের জবানিতে সেটার অন্তর্বীক্ষণ করতে বাধ্য হতাম আমরা, এই গল্পের পাঠকরা, যদি না তার 'চোখে' আমরা সমস্ত ঘটনাগুলিকে প্রত্যক্ষ করতাম; যদি এই ব্যক্তিগত চিঠিকে ন্যায়নীতির এজলাসে দাঁড়ানো আসামীরূপে ভ্রান্ত সামাজিক-মূল্যবোধের উদ্দেশে তর্জনী তোলা একটি অভিযোগপত্র বলে অনুভব করতাম না আমরা।

।।২।।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে উদ্দিষ্ট স্বামীট নামহীন; সেটা আমাদের তৎকালীন দেশাচার হিসেবে খুবই স্বাভাবিক বটে, কিন্তু এর একটি প্রতীকী তাৎপর্যও আছে। মৃণালের এই 'নামহীন' স্বামীটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের চিরাচরিত সমাজব্যবস্থার নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা 'স্বামী-সাধারণের' প্রতিনিধি। তাই গল্পের শুরুতে মৃণালের সম্বোধনে সে একা (তাই, ''শ্রীচরণকমলেষু''); কিন্তু কাহিনীর শেষে সে, গোটা পরিবারের (হয়ত সমগ্র সমাজবিধানের বাহকদেরই) প্রতিনিধি। আর সেই কারণেই সম্বোধনটা রূপান্তরিত হয়েছে বহুবচনে (''তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন'')। এই বহুবাচনিক উক্তিটি তাই সমগ্র পুরুষ-শাসিত সমাজবিধিবাহকদের উদ্দেশেই যে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না আদৌ।

'শ্রীচরণকমলেষুর' আশ্রয় থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে নিয়ে মৃণাল নিজের স্বাধীন সত্তাকে উন্মুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছে। পনেরো বছরের বিবাহিত জীবনে শ্বশুরবাড়ির সদর দরজার ওপারে সে পা বাড়ায়নি; তাই স্বামীকে চিঠি লেখারও কোনও উপলক্ষ তার ঘটেনি (বা, জোটেনি)। কিন্তু সেই অতিপরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার মাঝেই যে-সুপ্রবল এক অপরিচয় লুকিয়েছিল, তাই প্রমাণিত হয়েছে মৃণালের এই চিঠিতে। শ্বশুরবাড়ির ঐ দম-আটকানো পরিবেশেও (যাকে রবীন্দ্রনাথেরই 'মুক্তি' কবিতার একটি পংক্তি উদ্ধৃতির সূত্রে বলতে পারি ''রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা'') তার স্বকীয় অস্তিত্বের বোধটাকে নির্মূল করে তুলতে পারেনি। ঘরকন্নার বাইরে মৃণালের সঙ্গোপন আত্মিক মুক্তি কবিতা লেখায়। সেখানে কোনও পারিবারিক বা সামাজিক অনুশাসনের প্রাকারই তার একান্ত-নিজের অস্তিত্ববোধটাকে বন্দী করে রাখতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু তার এই কবিতা লেখার কথাটা পনেরো বছরের মধ্যে কেউই — এমনকী তার স্বামীও জানতে পারেনি। মৃণালের সৃষ্টির আবেগের অংশ নিতে পারেনি সে। সেই অপরিচয়ের ব্যবধানটুকু দেড় দশক ধরে উত্তরোত্তর বেড়েই গেছে দুজনের মধ্যে — সদ্যোজাত কন্যার মৃত্যুও তাদের সেই বিচ্ছিন্নতাকে একই অনুভবের অংশীদার করতে পারেনি। মৃণাল যে শিশুটির মা হয়ে 'মাতৃত্বের যন্ত্রণাটুকু' পেয়েছিল, কিন্তু 'মাতৃত্বের মুক্তিটুকু' পায়নি — সেই 'মেয়েসন্তান'-টির মৃত্যুরও কারণ ছিল তাদের পারিবারিক-সংস্কারাচ্ছন্নতাই। আঁতুড়ঘরের অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক থেকে বার হয়ে শোবার ঘরের সুস্থ পরিবেশে সে ঢুকতে পায়নি। মৃণালের নিজেরও তখন মুমূর্ষু অবস্থা ঃ ''আগলা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে'', যম ঠিক মতো টান মারলে সেদিন 'শিকড়সুদ্ধ' সেও উপড়ে যেতো। এই 'আলগা ঘাসের চাপড়া' চিত্রকল্পটি তো আসলে মৃণালের নিজেরই প্রতীক ঃ তাই তার 'বিচারবুদ্ধি' (যম নয়!) যখন তাকে টান মেরেছে, সে-ও ঐ ভাবেই সংসারের জমিনের থেকে হয়ে গেছে শিকড়সমেত উন্মুলিত। বিন্দুর প্রতি ঐ ২৭নং মাখন বড়ালের গলির অন্য সমস্ত বাসিন্দাদের হৃদয়হীনতা সেই বিচারবুদ্ধির পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র। বিন্দুর আত্মহননে তা চূড়ান্ত হয়ে গেল।

বিন্দু যখন ২৭নং বাড়িতে আশ্রয়ভিখারী হয়ে এসেছে, তখন সারা পরিবারের (মায়, তার আপন দিদিরও!) বিরক্তি, গঞ্জনার বিপরীতে একমাত্র মৃণালই তাকে স্নেহ এবং মমতা দিয়ে বাঁচাতে চেয়েছে। অসুস্থ সেই কিশোরী মেয়েটিকে নিয়ে সেই আঁতুড়ঘরেরই (যেখানে তার সদ্যোজাত কন্যাটি মারা যায়) এককোণে আশ্রয় নেওয়াটা তার বুভুক্ষু মাতৃসত্তারই এক অলক্ষ্য আত্মপ্রকাশ। তার মরে যাওয়া ঐ মেয়েটিকেই সে যেন ঐ ঘুপচি আঁতুড়ঘরের অন্ধকারে ফিরে পেল বালিকা বিন্দুর মধ্যে। এবং ঠিক এই কারণেই বিন্দুর প্রতি অবিচারগুলো মৃণালের মনের গভীরে বিম্বিত হয়েছে তার নিজের মৃতা মেয়েটির প্রতি অবিচার হিসেবেই — যে জন্মের কদিন পরেই পৃথিবী

ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল তার 'আপনজন'দের (!) অবিমৃষ্যকারী সংস্কারাচ্ছন্নতার পরিণামে (ইংরেজ ডাক্তারের তিরস্কারের কথাটা এখানে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য অবশ্যই)। তাই পরবর্তীকালে বিন্দুর মর্মান্তিক মৃত্যু (প্রকৃতপক্ষে যার জন্যে দায়ী মৃণালের শ্বশুড়বাড়ির লোকজনই) নতুন করে তার নিজের কন্যাবিয়োগের স্মৃতিকেই নতুন করে জাগিয়ে তুলল; এবং সেটাই মৃণালের এতবড় গুরুতর সিদ্ধান্ত নেবার পথটাকে খুলে দিল একবারে। গায়ে আগুণ ধরিয়ে বিন্দুর আত্মহননকে মৃণাল পারিবারিক-সামাজিক অনুশাসনের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ হিসেবে গণ্য করেনি; তার কাছে সেটা প্রতীত হয়েছিল সমস্ত নির্যাতিতা নারীর হয়ে এক প্রজ্জ্বলন্ত প্রতিবাদের প্রবল প্রতীক হিসেবেই, সেই প্রতিবাদের অনল-আলোকে মৃণাল নিজের মনেরও সকলটুকুকে পুরোপুরি দেখতে পেয়েছিল, আর পরিণামে তার নিজের প্রতিবাদের মশালও সে যেন ঐ 'আগুনেই' জ্বালিয়ে নিয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মৃণাল, স্বামীকে ছেড়ে আসার এই দলিলে মীরাবাইয়ের কথা উল্লেখ করেছে। মহারাণী মীরার সঙ্গে মেবার রাজপরিবারের দ্বন্দ্বটাও ছিল আদর্শগত, যদিও তা একান্তভাবেই আধ্যাত্মিক। মৃণাল নিজে কবিতা লিখত; তাই সে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের কথাটাও স্মরণ করতে পারত হয়ত। বা জাহ্নবী কর্তৃক শান্তনুকে পরিত্যাগ করে যাবার কথাটা তার মতো মেয়ের জানা থাকাই স্বাভাবিক। তবে মৃণালের এইভাবে স্বামীকে ছেড়ে যাবার অন্তরালে কোনও আধ্যাত্মিক, কিংবা পৌরাণিক প্ররোচনা নেই। চিরকাল এদেশে 'পতিদেবতারাই' স্ত্রীদেব পরিত্যাগ করে এসেছেন — এখানে ঘটল তার ঠিক বিপরীত ব্যাপারটাই। এক্ষেত্রে অবশ্য মৃণালই প্রথমা নয়; 'কৃষ্ণকান্তের উইল' — এর ভ্রমর তার পূর্বসূরিকা। কিন্তু মৃণালই সর্বপ্রথম স্বামীকে উপলক্ষ করে সমগ্র সমাজবিধানটাকেই আসামীর কাঠগড়ায় তুলেছে। ভ্রমরের মতো স্বামীর ব্যভিজারের জন্য নয়, গোটা পরিবারের এবং সমাজের অনাচারের শরিক হবার কারণেই মৃণাল স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে। খাওয়া-পরার অস্বচ্ছল দুঃখ তার ছিল না স্বামীর সংসারে, ছিল না স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার কোনও অপ্রতুলতা। তার স্বামীর নৈতিক চরিত্রও ছিল অকলঙ্ক। তবু মৃণাল স্বামীকে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। তার নারীত্ব, তার মাতৃত্ব, তার মনুষ্যত্ব এবং আত্মস্বতন্ত্র সম্মানের বোধ মিলেমিশে একাকার হয়ে তাকে প্রণোদিত করেছে এতবড় কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে। ২৭ নং মদন বড়ালের গলির পাঁচিলবন্দী পনেরো বছরের জীবন থেকে বেরিয়ে পড়ে সে ঠাঁই নিয়েছিল মহাসমুদ্রের উন্মুক্ত উপকূলে — পুরীধামে। এটিও একভাবে প্রতীকী ব্যঞ্জনাবহ বৈ কি! মীরাবাই, কি ভ্রমর, বা গিরিবালা, কিংবা জাহ্নবী, অথবা অনিলার স্বামী-সংসার ত্যাগের সঙ্গে এই জন্যে মৃণালের সব ছেড়ে চলে যাওয়াটা মেলে না। এমন কী, এই গল্পের সমসাময়িক 'বোষ্টমী' গল্পের নায়িকাও স্বামী ছেড়ে চাওয়ার সঙ্গে এর গরমিল! বোষ্টমী স্বামীকে ছেড়ে চলে যায় স্বামীর অনুমতি নিয়েই — বৃহত্তর এক হৃদয়াবেগের আকুতিতে আকূল হয়েই। মৃণালের বেলায় তো তা হয়নি!

॥ ৩ ॥

হেনরিক ইবসেনের 'এ ডল'স হাউজ'-এর নোরার সঙ্গেও মৃণালের তুলনা করার একটা রেওয়াজ আমাদের দেশের সমালোচক মহলে রয়েছে। নোরার প্রতিবাদ সোচ্চার হয়েছিল, সে তার স্বামীর খেলার পুতুল হয়ে থাকতে চায়নি বলে। সেও যে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একটি নারী, একজন মানুষ - একথা তার স্বামী উপলব্ধি না করে, তাকে আদরে-আহ্লাদে, পোশাকে-গয়নায়, উচ্ছ্বাসে-উৎসাহে নিজের একটি জীবন্ত খেলনা হিসেবে দেখতেই ব্যতিব্যস্ত ছিল! এর বিরুদ্ধেই নোরার প্রতিবাদ এবং শেষ দৃশ্যে সজোরে সদর দরজা বন্ধ করে স্বামীর ঘর থেকে চিরকালের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ঘটনাটা তারই দ্যোতনাবাহী। নোরার ঐ আত্মস্বাতন্ত্র্য ঘোষণা - নারীর

মানবিক মুক্তির এক ধরনের অভিপ্রকাশ; আর মৃণালের এই বিদায়, আর একভাবে, আর এক পরিপ্রেক্ষিতে সেই নারীরই মুক্তি ঘোষণার প্রয়াস।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি যতই সামাজিক তাৎপর্যময় হোক না কেন, তার কয়েকটি দুর্বলতার কথাও কিন্তু উল্লেখ না করে আলোচনা শেষ করা যায় না। এই গল্প, 'একটি' নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দলিল হিসেবে যতখানি দামী, ততখানি শিল্পঋদ্ধ নয়। মৃণালের চরিত্রও যতটা দীপ্র এবং বলিষ্ঠ, ততটা সূক্ষ্ম জটিল অনুভবে উদ্বেল হয়নি। তার মগ্নচৈতন্যের গভীরে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে-পরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের যে টানাপোড়েন প্রত্যাশিত ছিল, তা কোনও প্রতিভাস এতে ব্যঞ্জিত হয় নি, কোনও সময়েই না। বিন্দুকে উপলক্ষ করে তার যে নিজস্ব আবেগ ক্রিয়াশীল ছিল — সেটাও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের সঙ্গে মিশে গেছে। নিজের রূপ এবং বুদ্ধি এবং কবিত্ব — এই সব নিয়ে একটা অনুচ্চারিত অহংবোধও তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। বৃহত্তর সামাজিক জটিলতার দিকে তার চিঠির মাধ্যমে পাঠকের দৃস্টি পড়ে ঠিকই, কিন্তু মূলত সেটা ২৭নং মদন বড়ালের গলির বাসিন্দা একটি পরিবারের সেজ বউয়ের 'পার্সনাল টেস্টামেন্ট' হিসেবেই স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে।

এই একক প্রতিবাদ অনাগত সামাজিক বিপ্লবের পূর্বপ্রতিভা হিসেবে কতখানি গণ্য হয়েছে বা হতে পারে, সেই নিয়ে বিতর্ক অবশ্যই থাকবে। কিন্তু সবটুকু মিলিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটা নতুন ভাবনার মুক্তি ঘটালেন যে আমাদের কথা কথাসাহিত্যে, সে কথা অনস্বীকার্য।

৬১.৭ অনুশীলনী

ক) বিস্তৃত আলোচনামূলক ঃ

১) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিকে নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যের ঘোষণাপত্র বলা যায় কি-না বিশ্লেষণ কর।

২) 'স্ত্রীর পত্র' অবলম্বনে ১৯শ শতকের শেষভাগে / ২০শ শতকের গোড়ায় কলকাতার বনেদী গৃহস্থ পরিবারগুলির একটি লেখচিত্র রচনা কর।

৩) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের চিঠির শেষে মৃণালের যে উক্তি, ''আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।''— এর তাৎপর্য কী বিশ্লেষণ করে দেখাও।

খ) সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক ঃ

১) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে চিঠির শুরুতে মৃণাল স্বামীর উদ্দেশে লিখেছে, ''শ্রীচরণকমলেষু'' এবং সব শেষে লিখেছে, ''তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন'' — এই পার্থক্যের কারণ কোথায় নিহিত?

২) 'আ ডল'স হাউজ'-এর নোরার সঙ্গে এবং মেবারের মহারাণী মীরাবাঈয়ের সঙ্গে মৃণালের পার্থক্য কোথায়?

৩) 'মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেন।'' — এটা কার উক্তি? এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি?

৪) ইংরেজ ডাক্তার বিন্দুদের বাড়িতে কেন এসেছিলেন? তিনি কী করেছিলেন? কেন?

৫) ''তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে।'' — একথার নিহিতার্থ কী?

৬) স্বামী-সংসার ছেড়ে মৃণাল শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল কেন?

৭) ''ঘাসের চাপড়া'' কথাটি 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে কোন্ তাৎপর্য বহন করে?

গ) সুনির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক ঃ

১) বিন্দুর সঙ্গে মৃণালের পারিবারিক এবং মানসিক সম্পর্ক দুটি কী কী?

২) ''ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা'' মৃণালের গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকার করতে লাগলেন কেন?

৩) মৃণালের শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা কী?

৪) শরৎ কে? সে কী খবর এনেছিল?

৫) মৃণাল শরতের কাছে ''লোক দিয়ে'' কী পাঠিয়ে দিত?

৬) বিন্দু শ্বশুরবাড়ি থেকে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল?

৭) বিন্দুর পাগল স্বামী তাকে কে বলে ভাবত?

৮) শরৎ কোন্ পরীক্ষায় ফেল করেছিল? কেন?

৯) মৃণালের বিয়ের আগে পাত্রী দেখতে ক-জন গিয়েছিল?

১০) মৃণাল বসন্তের আগমনী-সংকেত কীভাবে পেত?

৬১.৮ উত্তর সংকেত

বিস্তৃত আলোচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১) প্রাথমিক আলোচনার প্রথম অংশটি লক্ষ্য করুন। এরপর মূলপত্রের উত্তর করুন।

২) গল্পে বর্ণিত মৃণালের বাড়ীর পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট পারিবারিক চিত্র সংক্ষেপে লিখুন।

৩) মৃণাল স্বামী গৃহের রক্ষণশীল, পুরনোপন্থী, আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা পীড়িত বোধ করেছে। তার থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। উক্তিটির মধ্যে তা-ই ব্যঞ্জিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়ে যথাযথ উত্তর করতে সচেষ্ট হোন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১) প্রাসঙ্গিক আলোচনার চতুর্থ অনুচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম-দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ পড়ে উত্তর করুন।

২) প্রাথমিক আলোচনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ অনুচ্ছেদ এবং তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়ে উত্তর করুন।

৩) উক্তিটি বিন্দুর দিদির। মেজবৌ মৃণালের বড়জা-র। মৃণাল বিন্দুকে স্নেহাশ্রয় দেওয়ায় বড়বৌ বলে মনে খুশী হলেন এবং বাড়ীর অন্যান্যদের অনুযোগ থেকে বেঁচে গেলেন। তিনি তাঁর ছোট বোন বিন্দুকে ভালবাসলেও নিজে সেই স্নেহ দেখাতে পারতেন না। মেজ-বৌ সস্নেহে তাকে গ্রহণ করায় তাঁর মনটা হাল্‌কা হয়েছিল। কিন্তু এ কথা প্রকাশ করার শক্তি তার ছিল না বলে, উদ্ধৃত মন্তব্য করেছিলেন। বাইরে তাই এমন একটি পরিমণ্ডল তৈরী করতে লাগলেন যে এজন্য তিনি দায়ী নন।

৪) বিন্দুর মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। বিন্দুর অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হলে ইংরেজ ডাক্তার ডাকা হয়। তিনি অন্দর দেখে আশ্চর্য হলেও আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিলেন। কেননা সেখানে আলো জ্বলে মিটমিট করে। হাওয়ায় চোরের মত ঢোকে, উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না। দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য কারও যেন লজ্জা বা দুঃখবোধ ছিল না।

৫) মেজবৌ মৃণালের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে উত্তর দিন।

৬) বিন্দুর মৃত্যুর পর মেজবৌ মৃণালের মনে নতুন ভাবোদয় হয়। ২৭ নম্বর বাড়ীর মধ্যেকার চারিদিকে প্রাচীর তোলা নিরানন্দের অন্দর মহলের তুচ্ছ ইট কাঠের আড়ালে টিকে থাকার চেয়ে বাড়ীর চৌকাঠ পেরিয়ে মেজবৌ-এর খোলস ছিন্ন করে বিশ্বজগতের ছয় ঋতুর সুধাপাত্রে ভরা আনন্দলো যাত্রার উদ্দেশ্যে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

৭) মূলপাঠ পড়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন।

সুনির্দিষ্ট উল্লেখন মূলক প্রশ্ন ঃ

আলোচনা নিষ্প্রয়োজন / মূলপাঠ পড়লেই সঠিক উত্তরের সন্ধান পাবেন / উত্তর লিখুন।

৬১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — *গল্পগুচ্ছ* (৩য় খণ্ড)

২) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — *কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ*

৩) প্রমথনাথ বিশী — *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*

৪) শিশির দাস — *বাংলা ছোটগল্প* (১৮৭৩ - ১৯২৩)

৫) ক্ষেত্র গুপ্ত — *রবীন্দ্রগল্প ঃ* অন্য রবীন্দ্রনাথ

৬) তপোব্রত ঘোষ — *রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ*

৭) ভূদেব চৌধুরী — *বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার।*

একক ৬২ ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ধ্বংস

গঠন

৬২.১ উদ্দেশ্য

৬২.২ প্রস্তাবনা

৬২.৩ মূলপাঠ

৬২.৪ সারাংশ

৬২.৫ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষর

৬২.৬ অনুশীলনী

৬২.৭ উত্তর সংকেত

৬২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৬২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি বুঝতে পারবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুচ্ছ খণ্ডত্রয়ী ছাড়াও যে অন্য গল্প গ্রন্থ আছে এবং তার সাহিত্যমূল্যও যে খুব ন্যূন নয়। সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারবেন। 'ধ্বংস' গল্পটি সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পসল্প' নামে একটি বই থেকে। এটি ছাড়াও তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থ হোল — 'তিনসঙ্গী', 'সে', 'লিপিকা' নামে একটি বই আছে, যার মধ্যে ভিন্ন স্বাদের অভিনব কয়েকটি 'গল্পিকা' পাওয়া যায়।

বর্তমান গল্পটি লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবন সায়াহ্নে, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। এর পটভূমিকায় রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব। সভ্যতাভিমানী পশ্চিমী দেশগুলির পাশব শক্তির দানবীয় প্রকাশ হিংস্রতম পশু শক্তিকেও হার মানায়।

কিন্তু সে সৌন্দর্যের পূজারি। নতুন নতুন সৃষ্টির অপরূপ রূপ লাবণ্য। প্রাণের নতুন নতুন অভিব্যক্তি তাঁকে টানে। তাই ধ্বংসের বিভীসিকা তাঁকে বিচলিত করে। কবি তাই এ গল্পটিতে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবি পরিণতি যে ধ্বংস, তারই প্রতিবাদ করেছেন। এ গল্পটি পড়ে আপনি —

- সৃষ্টির আনন্দ ও ধ্বংসের বিভীষিকা দুটি রূপকেই দেখতে পাবেন।
- আজীবন যুদ্ধ, হিংসা বিরোধী কবি — গল্পকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অপদ্ধতিগুলি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতেন তা জানতে ও জানাতে পারবেন।
- গল্পের সঙ্গে একটি কবিতা সংযোজতি হয়েছে, সেটি যে গল্পের অন্তর্গূঢ় ভাবনাবাহী তা উপলব্ধি করবেন। গদ্য-পদ্যের এই যুগ্ম উপস্থাপনা একেবারেই অভিনব, কিন্তু অর্থহীন নয়।

৬২.২ প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছোটগল্প যথার্থ পূর্ণতা পেয়েছিল। তিনি তাঁর এই গল্পে জগত ও জীবনকে দেখার এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর গল্পগুচ্ছের গল্পের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে বাংলার গ্রাম-শহরের মধ্যবিত্ত জীবনের নতুনতর স্বাদের সন্ধান পাওয়া যায়। আশৈশব-কৈশোর শহর বাসে থেকেও গ্রামীণ মানুষের — দেশের বৃহৎ জনজীবনের বেদনা অন্তরে অনুভব করলেও 'গল্পগুচ্ছ' পর্বে (১৮৯০-১৯১৭) গ্রাম বাংলার নিকট সান্নিধ্যে এসে পূর্ণতা পায়। এ গল্পে এক ধরনের সতেজতা ছিল। তখন পল্লী প্রকৃতির অপরূপ লাবণ্য কবির মনে যে আনন্দধারা সৃষ্টি করত তা-ই প্রবাহিত হয়েছিল, তাঁর নিরলঙ্কৃত গল্পগুলিতে।

১৯০১-এ কবি শিলাইদহের বাস তুলে শান্তিনিকেতনে বোর্ডিং বিদ্যালয় ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন। বাসকালে গল্পগুচ্ছের গল্পে গ্রামবাংলার চিত্রমালা ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে অন্তরে ও বহিরঙ্গে নতুন ছাপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। 'নষ্টনীড়' (১৩০৮) তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ গল্পের বিষয়বস্তু সুকঠিন বাস্তব। পরিবার ও সমাজ-সমস্যামূলক। এখানে মনোবিকলন ও বিশ্লেষণ সুচরিত। এই পর্বের বেশ করে কটি গল্পে নানা ব্যক্তিগত ও সমাজ সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। সবুজপত্র যুগে (১৯১৪) রচিত 'স্ত্রীর পত্র', 'হৈমন্তী', 'পয়লা নম্বর' প্রসঙ্গ পূর্ববর্তী এভাবে আলোচিত হয়েছে।

সবুজপত্র যুগ শেষ হয়েছিল ১৯১৭ — বাংলা ১৩২৪ সালে। এরপরেই এলো নতুনতর 'কথা'র ঝোঁক — আকারে ও প্রকারে যারা অভিনব। কবি যাকে বলতে চেয়েছেন — 'কথিকা', আমরা বলতে চাই 'গল্পিকা' — 'লিপিকায়' (১৩২৮, ১৯২১) যেগুলি গ্রন্থিত হয়েছে। এর কতকগুলিকে বলা যেতে পারে 'রম্য রচনা' আর বেশ কিছুতে গল্পের উপাদানের সঙ্গে রূপকথার আভাস — যার কথাবস্তুতে একটি ভিন্নতর স্বাদ পাওয়া যায়। রচনাগুলির পরিণামী আবেদন — মন্ময়, গভীর ও অনির্বচনীয়।

'গল্পসল্প'তে রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা'র কলা শিল্পকে অনুমান করলেও, এই রচনাগুলি, রূপকথার আধারে বড়োদের গল্প হয়ে উঠেছে। বিশ্ব সম্পর্কে কৌতূহল ও তার নানা সমস্যা, জীবনের নিভৃততম কামনার সঙ্গে নানা সংঘাত ও অন্তহীন জিজ্ঞাসার আভাস আছে 'গল্পসল্পে'র গল্পে।

এ রকমই একটি গল্প 'ধ্বংস'। নতুন নতুন সৃষ্টির আনন্দ যার প্রাণ সংহারী যুদ্ধের তারডব ও তার বিভীষিকা এই দুইয়ের কোনটি সত্য — এই প্রশ্ন গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যুদ্ধ বিজ্ঞানের সাফল্যকে তুলে ধরলেও, তা আসলে দানবের কুশলতা, অসুরের দক্ষতা। যুদ্ধ প্রাণীকে, সুন্দরকে ধ্বংস করে। কিন্তু সৃষ্টির চেয়ে মহত্তর কিছু নেই।

৬২.৩ মূলপাঠ ঃ ধ্বংস

দিদি, তোমাকে একটা হালের খবর বলি —

প্যারিস শহরের অল্প একটু দূরে ছিল তাঁর ছোটো বাসাটি। বাড়ির কর্তার নাম পিয়ের শোপ্যাঁ। তাঁর সারা জীবনের শখ ছিল গাছপালার জোড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে, তাদের চেহারা, তাদের রঙ, তাদের স্বাদ বদল করে নতুন রকমের সৃষ্টি তৈরি করতে। তাতে কম সময় লাগত না। এক-একটি ফুলের ফলের স্বভাব বদলাতে বছরের পর বছর কেটে যেত।

এ কাজে যেমন ছিল তাঁর আনন্দ তেমনি ছিল তাঁর ধৈর্য। বাগান নিয়ে তিনি যেন জাদু করতেন। লাল হত নীল, সাদা হত আলতার রঙ, আঁটি যেত উড়ে, খোসা যেত খসে। যেটা ফলতে লাগে ছ মাস তার মেয়াদ কমে হত দু মাস। ছিলেন গরিব, ব্যবসাতে সুবিধা করতে পারতেন না। যে করত তাঁর হাতের কাজের তারিফ তাকে দামি মাল অমনি দিতেন বিলিয়ে। যার মতলব ছিল দাম ফাঁকি দিতে সে এসে বলত, কী ফুল ফুটেছে আপনার সেই গাছটাতে, চার দিক থেকে লোক আসছে দেখতে, একেবারে তাক লেগে যাচ্ছে।

তিনি দাম চাইতে ভুলে যেতেন।

তাঁর জীবনের খুব বড়ো শখ ছিল তাঁর মেয়েটি। তার নাম ছিল ক্যামিল। সে ছিল তাঁর দিনরাত্রের আনন্দ, তাঁর কাজকর্মের সঙ্গিনী। তাকে তিনি তাঁর বাগানের কাজে পাকা করে তুলেছিলেন। ঠিকমতো বুদ্ধি করে কলমের জোড় লাগাতে সে তার বাপের চেয়ে কম ছিল না। বাগানে সে মালী রাখতে দেয় নি। সে নিজের হাতে মাটি খুঁড়তে, বীজ বুনতে, আগাছা নিড়োতে, বাপের সঙ্গে সমান পরিশ্রম করত। এছাড়া রেঁধেবেড়ে বাপকে খাওয়ানে, কাপড় শেলাই করে দেওয়া, তাঁর হয়ে চিঠির জবাব দেওয়া —সব কাজের ভার নিয়েছিল নিজে। চেস্ট্‌নাট গাছের তলায় ওদের ছোট্ট এই ঘরটি সেবায় শান্তিতে ছিল মধুমাখা। ওদের বাগানের ছায়ায় চা খেতে খেতে পাড়ার লোক সে কথা জানিয়ে যেত। ওরা জবাবে বলত, অনেক দামের আমাদের এই বাসা, রাজার মণিমানিক দিয়ে তৈরি নয়, তৈরী হয়েছে দুটি প্রাণীর ভালোবাসা দিয়ে, আর কোথাও এ পাওয়া যাবে না।

যে ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহের কথা ছিল সেই জ্যাক মাঝে মাঝে কাজে যোগ দিতে আসত; কানে কানে জিগ্‌গেস করত, শুভদিন আসবে কবে। ক্যামিল কেবলই দিন পিছিয়ে দিত, বাপকে ছেড়ে সে কিছুতেই বিয়ে করতে চাইত না।

জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধল ফ্রান্সের। রাজ্যের কড়া নিয়ম, পিয়েরকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গেল। ক্যামিল চোখের জল লুকিয়ে বাপকে বললে, কিছু ভয় কোরো না, বাবা। আমাদের এই বাগানকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব।

মেয়েটি তখন হলদে রজনীগন্ধা তৈরী করে তোলবার পরখ করছিল। বাপ বলেছিলেন, হবে না; মেয়ে বলেছিল, হবে। তার কথা যদি খাটে তা হলে যুদ্ধ থেকে বাপ ফিরে এলে তাঁকে অবাক করে দেবে, এই ছিল তার পণ।

ইতিমধ্যে জ্যাক এসেছিল দু দিনের ছুটিতে রণক্ষেত্র থেকে খবর দিতে যে, পিয়ের পেয়েছে সেনানায়কের তক্‌মা। নিজে না আসতে পেরে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে এই সুখবর দিতে। জ্যাক এসে দেখলে, সেইদিন সকালেই গোলা এসে পড়েছিল ফুলবাগানে। যে তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার প্রাণসুদ্ধ নিয়ে ছারখার হয়ে গেল বাগানটি। এর মধ্যে দয়ার হাত ছিল এইটুকু, ক্যামিল ছিল না বেঁচে।

সকলের আশ্চর্য লেগেছিল সভ্যতার জোর হিসাব করে। লম্বা দৌড়ের কামানের গোলা এসে পড়েচিল পঁচিশ মাইল তফাত থেকে। একে বলে কালের উন্নতি।

‘সভ্যতার কত যে জোর, আর-এক দেশে আর-একবার তার পরীক্ষা হয়েছে। তার প্রমাণ রয়ে গেছে ধুলার মধ্যে, আর-কোথাও নয়। সে চীনদেশে। তাকে লড়তে হয়েছিল বড়ো বড়ো দুই সভ্য জাতের সঙ্গে। পিকিন শহরে ছিল আশ্চর্য এক রাজবাড়ি। তার মধ্যে ছিল বহুকালের জড়ো করা মন-মাতানো শিল্পের কাজ। মানুষের হাতের তেমন গুণপনা আর কখনো হয়নি, হবে না। যুদ্ধে চীনের হার হল; হার হবার কথা, কেননা মার-জখমের কার্‌দানিতে সভ্যতার অদ্ভুত বাহাদুরি। কিন্তু হায় রে আশ্চর্য শিল্প, অনেক কালের গুণদের ধ্যানের ধন, সভ্যতার অল্প কালের আঁচড়ে কামড়ে

ছিঁড়েমিড়ে গেল কোথায়। পিকিনে একদিন গিয়েছিলুম বেড়াতে, নিজের চোখে দেখে এসেছি। বেশ কিছু বলতে মন যায় না।

★ ★ ★

মানুষ সবার বড়ো জগতের ঘটনা,
মনে হত, মিছে না এ শাস্ত্রের রটনা।
তখন এ জীবনকে পবিত্র মেনেছি
যখন মানুষ বলে মানুষকে জেনেছি।
ভোরবেলা জানালায় পাখিগুলো জাগালে
ভাবিতাম, আছি যে স্বর্গের নাগালে।
মনে হত, পাকা ধানে বাঁশি যেন বাজানো,
মায়ের আঁচল-ভরা দান যেন সজানো।
তরী যেন নীলাকাশে সাদা পাল মেলিয়া,
প্রাণে যেত অজানার ছায়াখানি ফেলিয়া।
বুনো হাঁস নদীপারে মেলে যেত পাখা সে,
উতলা ভাবনা মোর নিয়ে যেত আকাশে।
নদীর শুনেছি ধ্বনি কত রাতদুপুরে,
অপ্সরী যেত যেন তাল রেখে নূপুরে।
পূজার বেজেছে বাঁশি ঘুম হতে উঠিতেই
পূজায় পাড়ার হাওয়া ভরে যেত ছুটিতেই।
বন্ধুরা জুটিতাম কত নব বরষে,
সুধায় ভরিত প্রাণ সুহৃদের পরশে।
পশ্চিমে হেনকালে পথে কাঁটা বিছিয়ে
সভ্যতার দেখা দিল দাঁত তার খিঁচিয়ে।
সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা—
আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিতা।
কলবল সম্বল সিভিলাইজেশনের,
তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।
মানুষের সাজে কে যে সাজিয়েছে অসুরে,
আজ দেখি 'পশু' বলা গাল দেওয়া পশুরে।
মানুষকে ভুল করে গড়েছেন বিধাতা,
কত মারে এত বাঁকা হতে পারে সিধা তা।
দয়া কি হয়েছে তাঁর হতাশের রোদনে,
তাই গিয়েছেন লেগে ভ্রমসংশোধনে।
আজ তিনি নবরূপী দানবের বংশে
মানুষ লাগিয়েছেন মানুষের ধ্বংসে।

৬২.৪ সারাংশ

প্যারিসের উপকণ্ঠে থাকেন পিয়ের শোপ্যাঁ আর তাঁর একমাত্র সঙ্গী মেয়ে ক্যামিল। পিতা-পুত্রের শখ ছিল গাছপালার জোড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে, তাদের চেহারা রঙ ও স্বাদ বদল করে নতুন কিছু সৃষ্টি করা। মানুষের প্রশংসা এবং বিস্ময়েই ছিল তাঁদের একমাত্র আগ্রহ।

ক্যামিল ছিল শোপ্যাঁর যোগ্য সহকারী। সেও কলমের জোড় তৈরী করতে সুযোগ্য হয়ে উঠেছিল। বাপ-মেয়ের ছোট্ট সংসার সেবায় শান্তিতে ছিল মধুমাখা। আবিষ্কারের আনন্দে, নতুন সৃষ্টির উৎসাহে তাঁদের দিন বেশ কাটছিল। জ্যাক নামে যে-ছেলে ক্যামিলকে বিয়ে করবে বলে ঠিক ছিল, সে-ও মাঝে মধ্যে একে ওদের সঙ্গে যোগ দিত। ক্যামিলকে কানে কানে সে জিগ্‌গেস করত, শুভদিন কবে আসবে। বাবাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে ক্যামিল কেবলই দিন পিছিয়ে দিত।

জার্মানির সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধল। রাষ্ট্রের বিধানে পিয়েরএবং জ্যাককে যুদ্ধে যেতে হোল। ক্যামিল এ সময় হলদে রজনী গন্ধা তৈরীর পরখ করছিল। সে বাবাকে আশ্বাস দিল, তাঁদের বাগানকে সে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে।

দু'দিনের ছুটিতে জ্যাক এসেছিল ক্যামিলকে আনন্দের খবর দিতে — পিয়ের সেনানায়কের সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু সেদিনই সকালে পঁচিশ মাইল দূর থেকে কামানের গোলা এসে ধ্বংস করে দিয়েছে তাঁদের সাধের ফুলবাগান — ফুল এবং ফুলের মতো মেয়ে ক্যামিল দুই-ই শেষ হয়ে গেছে সেই নির্মম আঘাতে।

সভ্যতার জোরের আরও একবার পরীক্ষা হয়েছে চীন দেশে। বড়ো দুই সভ্যজাতের সঙ্গে লড়তে গিয়ে তাকে হারাতে হয়েছে আশ্চর্য শিল্প সমৃদ্ধ পিকিং-এর রাজবাড়ী। এভাবে সভ্যতাভিমানী দুটি জাত মার-জখমের কারদানিতে সভ্যতার অদ্ভুত বাহাদুরি দেখিয়েছে।

এরপর গল্পটিতে যুক্ত হয়েছে একটি কবিতা যেখানে গল্পটির মূল ভাব বস্তু তুলে ধরা হয়েছে - 'মানুষ সবার বড়ো', একথাটি যে একসময় সত্য বলে মনে হতো। কিন্তু পশ্চিমী দাঁতাল সভ্যতার ভয়াবহ রূপ দেখে এ প্রত্যয় হয়েছে মানুষের সাজে কে যে সাজিয়েছে অসুরে / আজ দেখি 'পশু' বলা গাল দেওয়া পশুরে।

৬২.৫ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'গল্পসল্প' (১৯৪১) বই থেকে গৃহীত হয়েছে। 'গল্পসল্প' তাঁর শেষ গল্পগ্রন্থ। জীবনাবসানের কিছুদিন আগে প্রকাশিত এই বইয়ের কিছুটা অভিনবত্ব আছে। প্রতিটি গল্পের সঙ্গেই জোড় বেঁধে একটি করে সমরূপ ভাবনার কবিতা সন্নিবিষ্ট করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে। এই গল্পও তার ব্যতিক্রম নয়; প্রাসঙ্গিকভাবে তুলনাযোগ্য একটি কবিতা এর সঙ্গেও সংকলিত হয়েছে।

'ধ্বংস' গল্পটি রচিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটার পটভূমিতে (মার্চ, ১৯৪১)। ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও ইতালি এবং তাদের সহযোগী জাপানের সঙ্গে তখন সোভিয়েত রাশিয়া, ইংলন্ড, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগ্রামে সমস্ত বিশ্ব উত্তাল হয়ে উঠেছে। জার্মান বিমানের হানাদার বাহিনীর নিরন্তর আক্রমণে তখন ফ্রান্স ও ইংলন্ডের জনজীবন তছ্‌নছ্‌ হয়ে যাচ্ছে। ফরাসি দেশের অভ্যন্তরেও ঠিক সময়ে জার্মান স্থলসৈন্যবাহিনী ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে চলেছিল। ঠিক এই প্রেক্ষিতে 'ধ্বংস' গল্পটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একেবারে সাম্প্রতিক কোনও উপলক্ষ নিয়ে লেখা এইটি তাঁর একমাত্র গল্প।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই পররাজ্য আগ্রাসন, যুদ্ধ, হিংসা ইত্যাদি মানবসভ্যতার সমস্ত অনাচারী সংগঠনকে অন্তর থেকে ঘৃণা করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন নিজের সৃষ্টির মধ্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি লগ্নে দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধ ও চীনের বক্সার যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লিখেছিলেন 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৬৪-সংখ্যক সনেটটি ("শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে অস্ত গেল") লেখেন। এর অল্প আগেই দক্ষিণ আফ্রিকারই মাটাবিল আদিবাসীদের উপর ইউরোপীয় শাসকদের হিংস্র আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লিখেছিলেন 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা ('চিত্রা কাব্য')। ইতালির আবিসিনিয়া দখলের প্রেক্ষিতে লেখা হয় তাঁর বিখ্যাত 'আফ্রিকা' কবিতা ('পত্রপুট')। জার্মানির চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের পটভূমিতে রচিত হয়েছিল 'আহ্বান' কবিতা ('নবজাতক')। এছাড়া, প্রবন্ধ-নিবন্ধের মধ্যে তো অজস্রবারই যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তিনি। 'চীনে মরণের ব্যবসায়' (১৮৮৮), 'সমাজভেদ' (১৯০১), 'বাতায়নিকের' (১৯১৯), 'কালান্তর' (১৯৩৩), 'সভ্যতার সংকট' (১৯১৪) প্রভৃতি এই সূত্রে তো অবশ্যই স্মরণযোগ্য। আঁরি বারবুস, রোমাঁ রলাঁ প্রমুখ সমকালীন অন্যান্য মনীষীদের সঙ্গে একযোগে তিনিও বিশ্বজোড়া যুদ্ধ-বিরোধী, শান্তির আন্দোলনের একজন প্রধান পুরোধা ছিলেন। এই সমস্ত পটভূমিকাটি স্মরণে রেখেই 'ধ্বংস' গল্পটির মূল্যায়ন করা বাঞ্ছনীয়।

তবে গল্পের সহযোগী কবিতাটির ভাববিশ্লেষণ আগে করে না নিলে ঐ মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হবেনা। কবি সেখানে বলেছেন যে, মানুষ নিজেকে ভাবে এবং বলে থাকে — সে হল পৃথিবীর মহত্তম সৃষ্টি। অথচ, বাস্তবে এটাই দেখা যায় যে, সে বহু সময়েই পশুর তুল্য — এমনকী তাদের চেয়েও হীনতর বলে প্রতীত হবে যদি হিংস্রতার পরিভূমিতে তাকে বিচার করা হয়। নিসর্গ প্রকৃতির মনকাড়া সব সৌন্দর্য্য —পাখির ভোরাই গান সাদা মেঘের ভেলা-ভাসা নীল আকাশ, সোনার বরণ ধানে ভরা ভর্তি দিগন্তজোড়া মাঠ, নদীর কলকল্লোল, আপনজনেদের স্নেহনিবিড় ঘনিষ্ঠতা — এইসব অঢেল, অজস্র সুখের অনুভূতির উৎসগুলিকে মানুষ যে মাঝে মাঝেই হারায়, তার কারণ নিজের সৃষ্ট ধ্বংসের বিভীষিকায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তার বৃথাই অহমিকা যে, সে উত্তরোত্তর সভ্যতার তুঙ্গশীর্ষে আরোহন করছে। বস্তুতপক্ষে এই সমস্ত দানবীয় মারণযজ্ঞের কারণে সে ঐ সভ্যতার দাবী আর করতে পারে না — কবি এটাই ব্যক্ত করেছেন। কবি বিদ্রূপ করে আরও বলছেন যে, মানুষের সাজে যারা চারিদিকে ঘোরাফেরা করছে তারা আসলে অসুরতুল্য। তারা এতই পাশবিক ও হিংস্র যে, এখন পশুকে 'পশু' বলা মানে তাকে অপমান করা। পশ্চিমী দুনিয়ার এই হিংস্র মারণযজ্ঞেরই একটি খণ্ডচিত্র এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ এরপরে এই 'ধ্বংস' গল্পের মধ্যে।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্রনাথ যদিও বিশ্বজোড়া দানবির যুদ্ধোন্মত্ততার সঙ্গে সংগ্রাম করার আহ্বান জানিয়ে ১৯৩৮ সালে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগের বছর) লিখেছিলেন —

> "নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
> শান্তির ললিতবাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস,
> বিদায় নেবার আগে তাই
> ডাক দিয়ে যাই
> দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তবে
> প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

তবু অন্তরের গভীরতম স্তর থেকে এক পরম আকুলতা তাঁকে উদ্বেল করত শান্তির সর্বব্যাপ্ত প্রকাশ আকাঙ্ক্ষা করে। ''হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'' তাঁকে ব্যথিত করত, পীড়িত করত। এই গল্পটির মধ্যেও সেই ব্যথাই অনুরণিত হয়েছে, বিশেষত কাহিনীর ট্র্যাজিক পরিণতিটুকু বর্ণনা করার পরে।

এক জ্ঞানতাপস প্রৌঢ়, তাঁর সুযোগ্য তরুণী কন্যা এবং তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী একটি যুবক-মাত্র এই তিনজন কুশীলবকে নিয়ে রচিত এই গল্প। একটি ছোট বাগান এর ঘটনাস্থল। মাত্র এই সামান্য উপকরণ নিয়েই রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছেন এক অসামান্য ট্র্যাজেডি। অথচ প্রচলিত অর্থে একটা গল্পের নিটোল আয়তন ও অবয়ব যে এতে আছে, এমনও নয়। তবু এর বিবরণী দেবার ভঙ্গীর মধ্যেও একটা সুন্দুর গল্পরূপ ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে। সমালোচনার পরিভাষায় যাকে 'নন্-ফিকশ্যন' বলে, এই কাহিনীর বহিরঙ্গে তেমনই একটা খবর বলার মতো ভঙ্গী রয়েছে (গল্পটা শুরুই হচ্ছে এভাবে ঃ ''দিদি, তোমাকে একটা হালের খবর বলি'')। দাদু (অর্থাৎ লেখক / কথক) এবং তাঁর নাতনি কুসমি — এঁদের আলাপনের মাধ্যমে 'গল্পটি' বা (খবরটি) বর্ণিত হয়েছে। 'হালের খবর' অর্থে সমকালীন বিশ্বযুদ্ধের সমাচার — যার প্রেক্ষিতে এই করুণ কাহিনিটি তৈরি করা হয়েছে।

''হালের খবর''টা হল এই ঃ

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের শহরতলি অঞ্চলে বিপত্নীকে প্রৌঢ় বিজ্ঞানী পিয়ের শোপ্যাঁ বাস করেন একখণ্ড ফুলবাগান আর অবিবাহিতা তরুণী দুহিতা ক্যামিলকে নিয়ে। পিতাপুত্রীর সাধনা (বা 'হবি') ছিল নানাজাতের গাছপালার জোড়কলম বানিয়ে নিত্যনতুন ফুল-ফল সৃষ্টি করা। সাধারণের চোখে বাবা-মেয়ের এই শখটা বাতিক বলে গণ্য হতো হয়ত — যদিও বিনামূল্যে সেগুলি তাঁদের কাছ থেকে পেতে প্রায় কারুরই অনাগ্রহ ছিল না। ঐ সব বিচিত্র রং-রূপ সুরভিমণ্ডিত ফুল-ফলের বাণিজ্য করে পিয়ের এবং ক্যামিল সুপ্রচুর স্বাচ্ছল্য অর্জন করতেই পারতেন হয়ত; কিন্তু তাতে পিতাপুত্রী কারুরই কোনো খেয়াল নেই। মানুষের বিস্মিত প্রশংসাতেই তাঁদের সাধনার চরিতার্থতা অনুভব করেন তাঁরা। সৃস্টি আর অন্বেষণের আনন্দেই দুজনে মশগুল। জ্যাক নামে ক্যামিলের পাণিপ্রার্থী ছেলেটিও ওঁদের সঙ্গে বাগানের তরিবৎ-পরিচর্যায় হাত লাগিয়ে সাহায্য করত। ক্যামিল তাতে পছন্দ করলেও, ঐ সাধনাক্ষেত্র ছেড়ে যেতে হবে ভাবলেই বিয়ে করার ব্যাপারে যেত পিছিয়ে। এর মাঝে শুরু হ ল বিশ্বযুদ্ধ; জার্মান বাহিনী ফরাসি দেশ দখল করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেশের ডাকে প্রবীণ পিয়ের শোপ্যাঁকে পর্যন্ত যেতে হল যুদ্ধক্ষেত্রে — তরুণ বয়সী জ্যাককে তো যেতে হবেই। সেই সময়ে বাবা আর মেয়ে নিমগ্ন ছিলেন হলুদরঙিন রজনীগন্ধা ফোটানোর প্রয়াসে। বাবার ফেলে রাখা কাজটা সমাপন করার দায়িত্ব নিয়ে ক্যামিল তাঁকে নিশ্চিন্ত করতে চেষ্টা করে। বাবা বাড়ি ফিরে দেখবেন বাগানভরা হলুদ রজনীগন্ধার গুচ্ছ। ...... বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পর দুদিনের ছুটি মেলে জ্যাকের। একটা আনন্দের সংবাদ নিয়ে ফেরে সে — বীরত্বের জন্যে পিয়ের তাঁর বাহিনীর একজন সেনানায়কের পদে উন্নীত হয়েছেন। কিন্তু সেই খবর ক্যামিলকে আর দেওয়া হল না। ...... সেই সকালেই জার্মানদের কামানের গোলা পঁচিশ মাইল দূরের পথ পেরিয়ে এসে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে ফুলের বাগানটুকু — আর ক্যামিলও হারিয়ে গেছে সেই বিস্ফোরণের পরিণামে।

এই কাহিনির সূত্র ধরেই এরপরে 'লেখক' তাঁর নিচের চোখে দেখা একটি ধ্বংস পরিণামের স্মৃতিচারণ করেছেন। মহাচীনের রাজধানী 'পিকিন' (অর্থাৎ পেইচিং বা বেজিং) মহানগরীর গর্বস্বরূপ একটি অনবদ্য স্থাপত্যকীর্তি কেমন করে বিধ্বস্ত হয়ে এক বিশাল ভগ্নস্তূপে পরিণতি পেয়েছিল দুটি সভ্য বলে পরিচিত শক্তিধর জাতির সংঘাতের ফলে তার বিবরণী তিনি দিয়েছেন নাতনিকে। এবং ঠিক তারপরেই বিন্যস্ত হয়েছে সেই

কবিতাটি — এখনি যার আলোচনা করা হল। মূল গল্প, চীনের 'স্মৃতি' এবং এই কবিতা —সব কিছু মিলিয়েই 'ধ্বংস'-এর পরিপূর্ণ ভাবনাটি প্রতিবেদন করা হয়েছে।

॥ ৩ ॥

যুদ্ধ, সংঘাত, হিংসা ধ্বংস — আজীবন এর সমস্ত কিছুই রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে নিন্দিত ও ধিক্কৃত হয়ে এসেছে। এই কাহিনির মধ্যেও তাঁর সেই শান্তিকামী, মানবতাবাদী সৃষ্টিশীল মনটিই ব্যক্ত করেছে নিজেকে। শান্তির প্রবক্ত হিসেবে তাঁর যে পরিচয় সর্বজনজ্ঞাত — এখানেও সেটিকেই দেখি আমরা। দুজন বিজ্ঞানতপস্বী — যাঁরা চেয়েছিলেন প্রকৃতির সহজাত সৌন্দর্যকে সুন্দরতর করতে, তাঁদের সেই স্বপ্ন ও সাধনা কীভাবে 'সভ্য' মানুষের মারণযজ্ঞের আগুণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। নানা রঙের নানান্ সৌরভের ফুলের পরাগ ও রেণুর বিচিত্র মিশ্রণে অভিনব কিছু সৃষ্টির মাধ্যমে পিতাপুত্রী যে-সুন্দরের সাধনা করছিলেন মানুষেরই দানবীয়তায় তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে ''সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে'', এখানে আর 'বন্ধন' নয়, সুন্দরের নিসূদন ঘটেছে নিষ্ঠুরের হাতে। সুন্দরের সাধনাকে চুরমার করে দেয় ভয়াল হিংস্রতা। পৃথিবীতে যত কিছু সুন্দর — যেমন পিতাপুত্রীর ঐ আশ্চর্য পুষ্পোদ্যানটি — তা যদি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় বিক্রমে এভাবে তছ্নছ্ হয়ে যায়, তাহলে তাকে কি মানব সভ্যতার উন্নতি বলে মনে করা যায়? ঠিক এই জিজ্ঞাসাই মুখর হয়ে উঠেছে এই গল্পের পরিণামে। বিজ্ঞানের হিংস্র রূপটা বিধ্বস্ত করে দিল বিজ্ঞানেরই সুন্দর রূপমূর্তিকে।

এই যে মারণযজ্ঞ, এতে যোগ দিয়ে বাধ্য হন এক জ্ঞানতাপস প্রবীণ বিজ্ঞানীও। তাঁর ল্যাবরেটরির এক্সপেরিমেন্ট ঘুচে যায়, তাঁকেও হাতে তুলে নিতে হয় মারণাস্ত্র। এই মরণআহব ভেঙে দেয় স্নেহ-বাৎসল্যে পরিপূর্ণ একটি সংসারকে। এর আঘাতে ঘুচে যায় তরুণ-তরুণীর প্রেম, প্রত্যাশিত গৃহকোণের স্বপ্ন। নিহত হয় একটি প্রাণোচ্ছলা মেধাবিনী পুষ্পলাবী তরুণী। তাই এই বিজ্ঞানসিদ্ধ সংগ্রাম, এতো বস্তুতপক্ষে দানবের বীভৎস কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে, মানুষের হিংস্রতার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ আজীবন মুখর হয়েছেন ঠিকই; কিন্তু এই গল্পের মাধ্যমে তিনি যে মর্মস্পর্শী দক্ষতায় তাকে ধিক্কারের উপজীব্য করে তুলেছেন, তা তো একান্তই তুলনাবিহীন। গল্পটি পড়ে শেষ করার পরও দীর্ঘক্ষণ তার অনর্বিলীন বেদনার রেশটুকু আতীব্র হয়ে স্পন্দিত থাকে পাঠকের মনের গভীরতম প্রত্যন্তে। শিল্প হিসেবে এই গল্পের মূল্য তাই অনেকই। নিছক যুদ্ধবিরোধী প্রপাগ্যান্ডা বলে একে চিহ্নিত করা যায় না ঠিক এই কারণেই। প্রচারধর্মিতাকে ছাপিয়ে বহু দূর চলে গেছে এর নান্দনিক উপলব্ধি।

॥ ৪ ॥

একথা অবশ্য মানতেই হবে যে, সাহিত্যতত্ত্বের প্রথাসিদ্ধ মানদণ্ডে যাকে 'গল্প' বলে নির্দিষ্ট করা যায়, তার সঙ্গে এই কাহিনীর বেশ পার্থক্য রয়েছে। মাত্র তিনটি চরিত্র এতে এবং তারাও কেউ প্রত্যক্ষভাবে এ কাহিনীতে সংলাপ কিংবা ঘটনার মাধ্যমে একে গড়ে তোলেনি। সমস্তটাই উপস্থাপিত হয়েছে সংবাদ প্রতিবেদনের ছকে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে এর চেহারাটা — সমালোচনার ভাষায় যাকে 'নন্-ফিকশ্যন' বলে, সেই রকম হয়েছে। অথচ এর মধ্যে গাঢ়বদ্ধ হয়ে রয়েছে মানবিক কতকগুলি আবেগ — সুন্দরের জন্য মুগ্ধতা, পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্রে গড়ে ওঠা মমত্ব এবং হিংস্রতার বিরুদ্ধে জুগুপ্সা — ফলে 'নন্ফিকশ্যন' রূপটি পরিগ্রহ করলেও এর মধ্যে যে ট্র্যাজিক অভিভব সঞ্জাত হয়েছে কাহিনীর শেষে, তার ফলে এর শিল্পময় রূপটি আপনা হতেই গড়ে উঠেছে। ফলত, ফিকশ্যনে ননফিকশ্যনে মেশামেশি হয়ে এ এক অভিনব সাহিত্যকৃতি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। একটি যথার্থ ছোটগল্পের ভাব কিংবা রূপ এখানে অনুপস্থিত হয়নি। অতযন্ত সীমায়ত শৈলীতে একটি দুটি বাক্যবন্ধের সাহায্যে এর বিন্যাসটা ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

''তোমাকে একটা হালের খবর বলি''— এই উক্তি দিয়ে যেভাবে এ-কাহিনীর মুখপাত করা হয়েছে, সেখানেই এর নন্‌ফিকশ্যন ধর্মটি সুস্পষ্ট। আবার সংলাপবিহীন, ঘটনার প্রত্যক্ষ রূপায়ণহীন হওয়া সত্ত্বেও এর তিনটি চরিত্রকেই যেমনভাবে রবীন্দ্রনাথ তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং পরিশেষে যে আকস্মিক বিপর্যয়কে চিত্রিত করে এর ট্র্যাজিক ভাবরূপকে সুপরিব্যাপ্ত করেছেন, তাতে এর ছোটগল্পধর্মিতাও ব্যক্ত হয়েছে। এজন্যই বলতে পারি, এর বিষয়বস্তুর মতো, আঙ্গিকও খুব অভিনব ধরনের।

শুধুমাত্র বর্ণনার মাধ্যমেই তিনটি চরিত্রকে পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। কাজে-বিভোর, সাংসারিক লাভ-লোকসানের বোধহীন এক আপনভোলা বৈজ্ঞানিক হলেন পিয়ের শোপ্যাঁ, যিনি তাঁর 'সৃষ্টি-করা' বিচিত্র ফুল-ফলের প্রশংসাটুকু শুনলেই কৃত-কৃতার্থ হয়ে যান, বিনামূল্যেই সেই (হয়ত!) কূটবুদ্ধি-প্রশংসাকারীকে দিয়ে দেন ঐসব অমূল্য সৃষ্টিগুলিকে। যেভাবে বিভিন্নজাতের ফুলগুলিকে রেণুমিলিয়ে, কলম বেঁধে নতুন কিছু ফুল বা ফল তৈরি করতেন পিয়ের, তাতে তাঁর উদ্ভিদতত্ত্বে অগাধ জানেরই ইঙ্গিত মেলে। আবার, ঐ কাজে বিভোর বৈজ্ঞানিকই তাঁর মা-হারা মেয়েটিকে বড় করে তুলেছেন পিতার পরিপূর্ণ দায়িত্ববোধের পরিচয় রেখেই। এই মানুষই ফের ছুটে যান মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য, শত্রুর আক্রমণকে রুখতে।

একনিষ্ঠ বিজ্ঞানসাধক, স্নেহশীল পিতা, স্বদেশপ্রেমিক এবং সাংসারিক লাভ-ক্ষতির বোধবিহীন এই মানুষটি তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা অবশ্য পেয়েছেন; একজন সেনানায়কের পদে তিনি বৃত হয়েছেন তাঁর দেশপ্রেম ও বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ। কিন্তু একদিকে ঐ বিরাট সম্মান, আর অন্যদিকে তাঁর প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় যে দুটি জিনিস — তাঁর কন্যা এবং তাঁর পুষ্পোদ্যান, সে-দুটিই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সেই শত্রুদের আক্রমণেই, যাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সংগ্রামরত। এ যেন নিয়মিত এক অব্যাখ্যাত পরিহার।

ক্যামিল এই বাবারই সুযোগ্য কন্যা। বাবার বিজ্ঞানসাধনার সে সহকারিণী; তার নিজের বৈজ্ঞানিক প্রতিভাও অসাধারণ। আঁটি ছাড়া ফল ফলাতে, হলুদ রজনীগন্ধা ফোটাতে তার শুধু আকাঙ্খাই নয়, দক্ষতাও রয়েছে। তাঁর অন্তর কিন্তু নিছক বৈজ্ঞানিক সাধনায় রুক্ষ হয়ে যাওয়া এক মরুভূমিকল্প নয়। আর পাঁচটা সমবয়সিনীর মতো তারও জীবনে প্রেম এসে পৌঁছয়। কিন্তু প্রেমকে মর্যাদা দিলেও, তার সাধনাকে ফেলে রাখতে সে অনাগ্রহী। জ্যাক তার কাছে স্বামী হিসেবে কাম্য ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি প্রার্থিত সাধনায় সমব্রতী রূপে। পৃথিবীতে যে দুজন মাত্র মানুষ তার একান্ত আপন —বাবা এবং বাগদত্ত প্রেমিক — দুজনকেই সে অকুতোভয়ে বীরবেশে সজ্জিত দেখে খুশি হয়। তাঁদেরকে রণাঙ্গনে পাঠাতে সে বিচলিত হয় না একটুও। তাঁরা সংগ্রাম করবেন মাতৃভূমির রক্ষার্থে, আর সে নিয়োজিত রাখবে নিজেকে তার বিচিত্র সাধনায় — হলুদরমা রজনীগন্ধা সৃষ্টির অন্বেষণে। বাবাকে সে কথা দেয়, ফিরে এসে তিনি ঐ বিচিত্র অভাবিতপূর্বর ফুল দেখতে পাবেনই!... কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থ হয় সে। সেই ফুল ক্যামিলের প্রতিভার স্বাক্ষর সুরভিত হয়ে ফুটেছিল ঠিকই ; কিন্তু জার্মানদের কামানোর গোলায় তার সাধের বাগান এবং স্বয়ং সে মুছে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। পুষ্পতপা এই তরুণী তার আপনহাতে গড়া ঐ পুষ্পবনের সঙ্গে এক মুহূর্তে, একযোগে এভাবে হারিয়ে যাওয়ার যে বেদনার অভিব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে কাহিনীর শেষে, তা এর ট্র্যাজিক অভিভবকে গাঢ়তরই করেছে বলতে পারি।

পিয়ের এবং ক্যামিলের তুলনায় জ্যাক এ-কাহিনীতে কিছুটা গৌণ এক চরিত্র। তার প্রেমিকার পুষ্পতপস্যায় সেও অংশগ্রাহী; তাদের বিয়ে হবে কিনা, সেটা অনিশ্চত তবু তার ভালবাসায় কোনো ঘাটতি নেই। নিজের ঘর-বাঁধার স্বপ্নের চেয়ে ভালবাসার পাত্র সাধনার গুরুত্ব তার কাছে ঢের বেশী।

ক্যামিলের তো নিজের জীবনের চূড়ান্ত ট্র্যাজেডিকে অনুভব করতে এক লহমারও অবকাশ মেলেনি। পিয়েরও যুদ্ধক্ষেত্রে থাকার সুবাদে ঐ মর্মন্তুদ ঘটনার সংবাদ পাননি। কেবল জ্যাকই সেই ভয়ঙ্কর বেদনার শরিকহীন একমাত্র সাক্ষী। তাকে কেন্দ্র করেই এই কাহিনির বেদনা বিকীর্ণ হয়ে উঠেছে। পার্শ্বচরিত্র হওয়া সত্ত্বেও শেষ পরিণামে সেই এ কাহিনির ট্র্যাজিক অভিজ্ঞানের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যামিলের মৃত্যুটাকে রবীন্দ্রনাথ ''দয়ার হাত'' বলে যথার্থই অভিহিত করেছেন। কিন্তু নিয়তির নির্দয়তার হাত থেকে জ্যাক রেহাই পায়নি। ক্যামিল বেঁচে রইল, তার বাগান জার্মান কামানের গোলায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, এমন একটা অবস্থা হতো অকল্পনীয়ভাবে মর্মান্তিক। ''দয়ার হাত'' তাই সঠিকভাবেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সেটাই তো জ্যাকের পক্ষে চরমতম দুঃখের দণ্ডাঘাত। পিয়ের যখন ফিরে আসবেন, তখন সে দুঃখের ভাগীদার হবেন তিনি; তার আগে অবধি, জ্যাকই এই কাহিনীর করুণতম মানুষ।

'ধ্বংস' নামটি এ-কাহিনির পক্ষে একাধিক তাৎপর্য বহন করছে। একটি ফুলবাগানের ধ্বংসকথাই শুধু এর উপজীব্য নয়। ধ্বংস হয়েছে সুন্দরের সাধনা, সৃষ্টির অভীপ্সা। ধ্বংস হয়েছে একটি পুষ্পল তরুণী, তার প্রেমিকের সঙ্গে নীড়ের প্রত্যাশা, তার বাবার স্নেহ-বাৎসল্য। শুধু তাই নয়, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং শাশ্বত সৌন্দর্য্যের সত্যরূপ। আর তাই এই কাহিনির এমন শিরোনামটি একান্তই তাৎপর্যময়।

৬২.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত আলোচনামূলক ঃ

১) 'ধ্বংস' গল্পে রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধবিরোধী যে মনটি উদ্ভাসিত হয়েছে, তার পরিচয় দাও এবং গল্পের নামকরণের তাৎপর্য বিচার কর।

২) 'ধ্বংস' গল্পের সঙ্গে 'পিকিন' শহরের অভিজ্ঞতা এবং কবিতাটি কেন সংযোজিত হয়েছে বুঝিয়ে বল। এর ফলে কি গল্পের মূল অভিপ্রেত বিষয়টি শিল্পসম্মতভাবে দৃঢ়তর হয়েছে?

৩) 'ধ্বংস' গল্পে যে ট্র্যাজিক অনুভবটুকু কাহিনির পরিসমাপ্তি হবার মুখে পাঠকের মনে ছড়িয়ে পড়ে, তার উৎস কোথায় নিহিত বিশ্লেষণ করে দেখাও।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক ঃ

১) 'ধ্বংস' গল্পের সঙ্গে সংযোজিত কবিতাটি ভাবতাৎপর্য কী?

২) ''দয়ার হাত'' বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝিয়েছেন?

৩) 'পিকিন' শহরে 'দাদামশাইয়ের' কী অভিজ্ঞতা হয়?

৪) 'ধ্বংস' গল্পকে ''হালের খবর'' বলা হয়েছে কোন্ কারণে?

৫) ''বাগান নিয়ে'' পিয়ের কীভাবে ''জাদু করতেন''?

সুনির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক ঃ

১) পিয়ের শোপ্যাঁর ''সারা জীবনের শখ'' কী ছিল?

২) যুদ্ধ বাধবার সময়ে ক্যামিল কোন্ পরীক্ষা চালাচ্ছিল?

৩) বাগানটা কী দিয়ে ''তৈরি হয়েছিল''?

৪) কামানের গোলা কতদূর থেকে এসে পড়েছিল?

৫) পিয়েরকে যুদ্ধে যেতে হয়েছিল কেন?

৬) পিতাপুত্রীর ছোট্টঘরটি কোন্ গাছের তলায় ছিল?

৭) পিকিনের রাজবাড়িতে কী ছিল?

৮) পশুকে কী বললে গাল দেওয়া হয়?

৯) দাঁত খিঁচিয়ে কে দেখা দিয়েছিল?

১০) জ্যাক ক'দিনের ছুটি পেয়েছিল?

১১) ক্যামিল কেন বিয়ে করতে চাইত না?

১২) পিয়ের কী ভুলে যেতেন?

৬২.৭ উত্তর সংকেত

বিস্তৃত আলোচনামূলক ঃ

১) সংকেত নিষ্প্রয়োজন। প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ (৬১.৫) ভাল করে পড়লেই যথাযথ উত্তর করতে পারবেন।

২) সংকেত নিষ্প্রয়োজন। প্রাসঙ্গি আলোচনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষাংশের সাহায্যে উত্তর করুন।

৩) সংকেত নিষ্প্রয়োজন। প্রাসঙ্গি আলোচনা ভাল করে পড়ে উত্তর করুন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক ঃ

১) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা আছে, তাকে অনুমান করে উত্তর দিন।

২) প্রাসঙ্গিক আলোচনার তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে এ বিষয়ে আলোচনা আছে। তার অনুমানে উত্তর করুন।

৩) প্রাসঙ্গিক আলোচনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাহায্যে উত্তর করুন।

৪) গল্পটির রচনাকাল বাংলা ১৩৪৮, ইংরেজি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ। এ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। গল্পে সেই সময়ের প্রেক্ষাপট ব্যবহার করা হয়েছে।

৫) দ্রষ্টব্য মূলপাঠ প্রথম অনুচ্ছেদ। পিয়ের নানান গাছপালার জোড় মিলিয়ে রেণু মিলিয়ে তাদের চেহারা, রঙ ও স্বাদ বদল করে নতুনতর সৃষ্টি করতেন। লাল হোত নীল। সাদা হোত আলতার রঙ। আঁটি যেত উড়ে, খোসা যেত খসে। এভাবে বাগান নিয়ে তিনি যাদু করতেন।

সুনির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক ঃ

১) পিয়েরের শখ ছিল গাছ পালার জোড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে তাদের চেহারা, রঙ ও স্বাদ বদল করা।

২) ক্যামিল তখন হলদে রজনীগন্ধা তৈরী করবার পরখ করছিল।

৩) বাগানটি তৈরী হয়েছিল দুটি প্রাণীর (পিয়ের ও তার মেয়ে ক্যামিল) ভালবাসা দিয়ে।

৪) কামানের গোলা এসে পড়েছিল পঁচিশ মাইল দূর থেকে।

৫) জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে রাজ্যের কড়া নিয়মে পিয়েরকে যুদ্ধে যেতে হয়েছিল।

৬) চেস্টনাট গাছের তলায় পিতাপুত্রীর ছোট্টঘরটি ছিল।

৭) পিকিনের রাজবাড়িতে ছিল বহুকালের জড়ো করা মন মাতানো শিল্পের কাজ।

৮) পশুকে ‘পশু’ বললে গাল দেওয়া হলো।

৯) সভ্যতা দেখা দিল দাঁত তার খিঁচিয়ে।

১০) জ্যাক দু’দিনের ছুটি নিয়ে এসেছিল।

১১) বাপকে ছেড়ে যেতে হবে বলে সে কেবলই বিয়ের দিন পিছিয়ে দিত।

১২) যে পিয়েরের হাতের কাজের তারিফ করতো, তার কাছে দাম চাইতে তিনি ভুলে যেতেন।

৬২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — *গল্পগুচ্ছ*

২) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — *কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ*

৩) ভূদেব চৌধুরী — *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*

৪) ক্ষেত্র গুপ্ত — *রবীন্দ্রগল্প ঃ অন্য রবীন্দ্রনাথ*

৫) তপোব্রত ঘোষ — *রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ।*

একক ৬৩ ❑ রাজশেখর বসু (পরশুরাম) ঃ চিকিৎসা সঙ্কট

গঠন

৬৩.১ উদ্দেশ্য

৬৩.২ প্রস্তাবনা

৬৩.৩ পরশুরাম (রাজশেখর বসু) ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও ছোটগল্প কথা

৬৩.৪ মূলপাঠ

৬৩.৫ সারাংশ

৬৩.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

৬৩.৭ অনুশীলনী

৬৩.৮ উত্তর সংকেত

৬৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৬৩.১ উদ্দেশ্য

রাজশেখর বসুর গল্প, তাঁর গল্পকার সত্তা (পরশুরাম) — তাঁর সরস গল্প সৃজন মানস — এক গভীরতম বিস্ময়। মহাভারতের পরশুরামের মতো, তাঁর ক্ষুরধার, তীক্ষ্ণ, শাণিত লেখনী-কুঠার সমাজের সমস্ত উৎকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন করেছে, সঙ্গে হাসির কোটিং দিয়ে। তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করেন নি। তাঁর রচনা সরস, সহর্য উপস্থাপনার গুণে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

'চিকিৎসা সংকট' গল্পটি পাঠ করে আপনি ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করবেন এবং প্রয়োজনে আলোচনায় অংশ নিয়ে সে বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন।

- গল্পের প্রধানচরিত্র নন্দবাবু সহজ-সরল এবং ব্যক্তিত্বহীন হওয়ায় তাঁর বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা কিভাবে একের পর এক বিব্রত হচ্ছেন।
- গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক দেশের চিকিৎসাবিদ্যাচর্চার কৌতুককর অসংগতির সরস সমালোচনা করেছেন।
- অর্থলোভী চিকিৎসকরা কীভাবে চিকিৎসার নামে রক্তচোষার মত আচরণ করে।
- সরস সহর্য উপস্থাপনার গুণে গল্পটিতে কোন রকম ব্যক্তিগত আক্রমণ আভাসিত হয়নি।

৬৩.২ প্রস্তাবনা

রাজশেখর বসুর 'পরশুরাম' ছদ্মনামের প্রকাশিত প্রথম গল্প 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩২৯ সালে (ইং ১৯২২) মুদ্রিত হয়। তাঁর 'চিকিৎসা সংকট' গল্প শুধু বহুপঠিত নয়, বহু স্মরণীয় পংক্তির জন্য খ্যাত — ''নার্ভের জট ছাড়াতে হবে। শর্ট সার্কিট হয়েছে।'' পেট ''হ্যাঁচোড়-পাচোড়'' করা 'ছাগলাদ্য ঘ্রেত', 'হয়

zানতি পারনা, 'করে zানতি পারনা', 'উদুরি, উর্ধ্ব শ্লেযও কইতি পার', 'হাড্ডি পিলপিলান' প্রভৃতি — উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত পদ ও পদগুচ্ছ আপাত গুরুগম্ভীর অথচ হাস্যরসিক লেখকের মননশীল তীক্ষ্ণ সমাজদৃষ্টি এবং জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ। লেখকের দুর্লভ ও গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি তাঁর গল্পগুলিকে হাস্যরসের ভিয়েনে অভিনব শিল্প করে তুলেছে। তাঁর গল্প মানবচরিত্রের অসঙ্গতির দিকগুলিকে অসাধারণ মুন্সীয়ানায় তুলে ধরে নির্মল শুভ্র হাস্যরস পরিবেহন করেছে। সর্বমালিন্যমুক্ত এই হাস্যরসকে সাহিত্য সমালোচকরা বলেছেন 'হিউমার'। এই হাসিতে উচ্ছ্বসিত আবেগ দেখা যায় না, কারণ এতে করুণা ও বেদনার সূক্ষ্ম মিশ্রণ থাকে। হিউমার তখনই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব যখন স্রষ্টা জীবনের গভীর রহস্যে প্রবেশ করে মানবজীবনের দোষ-ত্রুটি, স্খলন-পতন, অসঙ্গতিক প্রতি আমাদের সতর্ক করেন। কিন্তু যে হাসি বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, বাক্‌চাতুর্যে সমৃদ্ধ, তাকে উইট্ (Wit) বলে। বৈদগ্ধসমৃদ্ধ এই হাস্যরস পরিশীলিত মনে যে আনন্দ বিধান করে তা অনেকটা বুদ্ধিগ্রাহ্য। এর রসাবেদন হৃদয়ে নয়— মননে। আর 'স্যাটায়ারের' হাস্যরস তীব্র তীক্ষ্ণ চাবুকের মতো আঘাতে অন্তর্বেদনার সৃষ্টি করে। এর নির্মম ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলি মানুষের মনকে সচকিত করে, তাঁর দোষ ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এর ওপরে হাসি নিচে জ্বালা থাকে। স্যাটায়ারিস্ট সমাজ ও সংসারকে সংশোধনের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এ ধরনের রচনা লেখেন।

রাশভারী রাজশেখর বসু পরশুরামের আড়ালে, তাঁর হিউমার ও স্যাটায়ারের বিমিশ্র হাস্যরস পরিবেশন করেছেন কতকগুলি অভিনব চরিত্রের হাত ধরে। 'চিকিৎসা সংকট' গল্পটি তিনি উপস্থাপনা করেছেন গল্পের মুখ্যচরিত্র নন্দবাবুকে কেন্দ্র করে। সুস্থ নন্দ, বন্ধুদের তাড়নায় চিকিৎসিত হতে গিয়ে চিকিৎসকদের কাছ থেকে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরছেন, এতে যথেষ্ট আতিশয্য থাকলেও নন্দবাবুর অভিজ্ঞতা যে বার্তা নিয়ে এসেছে তা অদ্যাপি বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

'চিকিৎসা সংকট' বস্তুত চিকিৎসা বিভ্রাটের গল্প। এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ, হাকিম, পরিশেষ লেডি ডাক্তার সর্বত্রই তথাকথিত রোগী ও চিকিৎসকের যে রসমূর্তি গড়ে তুলেছেন, তা শুধু অভূতপূর্ব নয়, প্রায় অকল্পনীয়। গল্পটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলেই যথার্থ রসাস্বাদন সম্ভব।

৬৩.৩ পরশুরাম (রাজশেখর বসু) ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও ছোটগল্প কথা

রাজশেখর বসুর জন্ম ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার উলা গ্রামে / পিতা চন্দ্রশেখর দ্বারাভাঙ্গা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। চন্দ্রশেখর দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। রাজশেখরের জ্যেষ্ঠ শশিশেখর, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কনিষ্ঠ গিরীন্দ্রশেখর ছিলেন খ্যাতনামা মনোবিজ্ঞানী। রাজশেখর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই.এ. ও পরে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় অনার্সসহ বি.এ. (বি-গ্রুপ) পাশ করেন (১৯০১)। এস.এস.সি. কোর্স প্রবর্তন না হওয়ায় রসায়ন-এ এম.এ. পাশ করেন ১৯০৩-এ।

রাজশেখর জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র আচার্যদ্বয়ের প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পরামর্শে রাজশেখর সেখানে রাসায়নিক (Chemist) হিসাবে যোগ দেন। দক্ষ গবেষক ও প্রশাসকের পরিচয় দিয়ে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হন। রসায়ন ও শারীরবিদ্যার মধ্যে যোগস্থাপনে তাঁর সবিশেষ ভূমিকা আছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে অবসর নিলেও, তিনি আমৃত্যু প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক ও উপদেষ্টা ছিলেন।

রাজশেখর 'পরশুরাম' নামে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় যখন সরস ব্যঙ্গাত্মক গল্প 'বিরিঞ্চিবাবা' প্রকাশ করেন (১৯২২) তখন তাঁর বয়স ৪২ বৎসর। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'গড্ডলিকা'-র প্রকাশ ১৯২৪-এ। এই বইটি পড়ে বিমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ, ১৩৩১) লেখেন, ''ইহার অসামান্যতা দেখিয়া চমক লাগিল।.... লেখাটির উপর কোনো চেনা হাতের ছাপ পড়ে নাই। নূতন মানষ বটে, সন্দেহ নাই, কিন্তু পাকা হাত।'' এই অভিনন্দন রাজশেখরকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। তাঁর কর্মজীবন ও সাহিত্যজীবন চলেছে সমান্তরাল গতিতে।

'পরশুরাম' রাজশেখর বসুর (১৮৮০-১৯৬০) ছদ্মনাম। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী, চল্লিশোর্ধে পৌঁছে প্রথম সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। শুধুমাত্র হাসির গল্প লিখেই তিনি প্রখ্যাত হয়েছেন। তাঁর হাস্যরসের মুখ্য উপজীব্য হল হিউমার ও স্যাটায়ার — পরিহাস এবং ব্যঙ্গনৈপুণ্য। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের নানা ধরনের উৎকেন্দ্রিকতা এবং ধুরন্ধর স্বার্থান্বেষণই প্রধানত তাঁর ব্যঙ্গ-পরিহাসের উপজীব্য বিষয়বস্তু। ধর্মব্যবসায়ী, চিকিৎসক, চাকুরিজীবী, ভণ্ড-প্রতারণাকারী, উগ্র-আধুনিক হতে আকাঙ্ক্ষী, গোঁড়া রক্ষণশীল, রাজনীতিবিদ্ এবং আরও বহুবিদ শ্রেণীর মানুষ তাঁর লেখাগুলির কুশীলব। কল্পিত পুরাণবৃত্তান্ত, ভূতের গল্প এবং অন্যান্য উদ্ভট অসম্ভাব্যতাও তাঁর লেখার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে, যদিও বাইরের খোলস সরিয়ে ফেললেই, তাদের অন্তর্নিহিত বাস্তব চেহারাটা উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

'গড্ডালিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'গল্পকল্প', 'ধুস্তুরীমায়া', 'কৃষ্ণকলি', 'নীলতারা', 'আনন্দীবাঈ', 'চমৎকুমারী' এই ক'টি হল তাঁর গল্পগ্রন্থ। পরশুরামের লেখার বৈশিষ্ট্য হল এখানেই যে তাঁর লেখায় বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ যা-ই থাকুক না কেন, কোনো ধরনের অসূয়াপরতার সন্ধান সেখানে মেলেনা। তাঁর সমস্ত গল্পই যে শিল্পগুণে বা রসাবেদনে একেবারে প্রথম শ্রেণীর, এমন নয়। তবে স্নিগ্ধ হাস্যরস সর্বত্রই পাঠকের মনকে পরিতৃপ্তি দেয়, এটুকু মানতেই হবে। তাঁর বহু লেখার প্রেক্ষাপট আজ অন্তর্হিত হলেও, তাদের সরসতা এবং উপভোগ্যতা পাঠক সমাজে এখনো সমান। তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দেওয়া হয় সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতি স্বরূপ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে রাজশেখরের সাহিত্যজগতে আবির্ভাব। ইতোমধ্যে সোভিয়েত বিপ্লবও ঘটে গেছে। যুদ্ধদীর্ণ য়ুরোপ, নানা বিপর্যয়কে অঙ্গীকার করে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার মধ্যে নতুন জীবনের ভাষা খুঁজছে। সাহিত্যজগৎ শ্রমজীবী মানুষের জয়যাত্রা দেখে নতুনতর জীবনের স্বপ্ন দেখছে। বাংলা সাহিত্যেও তার ঢেউ দেখতে পাই। 'ভারতী' গোষ্ঠী থেকে সরে এসে কিছু তরুণ ১৩৩০, ইং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে 'কল্লোল' ১৯২৬-এ 'কালিকমল', ১৯২৭-এ ঢাকা থেকে 'প্রগতি' পত্রিকা প্রকাশ করে। এঁরা নতুন জীবনের বার্তা নিয়ে কবিতা, গল্প-উপন্যাস রচনায় ব্রতী হলেন। সমাজ-বাস্তবতাকে বাধ্য করে রাজনীতি, অর্থনীতি সহ সমস্ত বিষয়ই স্থান পেল বাংলা সাহিত্যে। জীবনের সমস্ত বাস্তব অনুভূতিই সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। রাজশেখর এঁদের দলে যোগ দিলেন না। নিজের মত করে, নিজের কথা লিখে গেলেন প্রায় দশবছর ধরে। এ সময় মুখে স্মিত হাসি, অসাধারণ কল্পনাশক্তি, মনন বিশ্লেষণের দীপ্তির প্রতিভাসে স্বতস্ফূর্ত বেগ সঞ্চরিত হল তাঁর লেখনীতে। পরশুরাম দেশের রাজনীতির নানা টানা-পোড়েন থেকে দূরে সরে থাকলেন, বাঁধা চোখে দেখলেন দেশের স্খলন, পতন, অসংগতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, আঁকলেন তাঁর ছবি বাস্তববোধের সঙ্গে কৌতুকরসের ভিয়েন দিয়ে, আর এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

'চিকিৎসা সঙ্কট' লঘু পরিহাস এবং বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসাজীবীদের সম্পর্কে তির্যক-ব্যঙ্গভিত্তিক একটি উপভোগ্য গল্প। পরশুরাম তাঁর লেখায় নানান বর্গের পেশায় নিযুক্ত মানুষদের সম্পর্কেই এইজাতীয় ব্যঙ্গ-

পরিহাসমূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে উপস্থাপিত করেছেন। ডাক্তার, উকিল, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, ধর্মোপজীবী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, অভিনেতা — কেউই তাঁর শাণিত কলমের খোঁচার হাত থেকে রেহাই পাননি। চিকিৎসকদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অহঙ্কার, স্বার্থবুদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে তাঁর অনেকগুলি গল্পই আছে। 'চিকিৎসা সঙ্কট' তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত ও জনপ্রিয়।

৬৩.৪ মূলপাঠ ঃ চিকিৎসা সঙ্কট

সন্ধ্যা হব হব। নন্দবাবু হগ সাহেবের বাজার হইতে ট্রামে বাড়ি ফিরিতেছেন। বীডন স্ট্রীট পার হইয়া গাড়ি আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। সম্মুখে গরুর গাড়ি। আর একটু গেলেই নন্দবাবুর বাড়ির মোড়। এমন সময় দেখিলেন পাশের একটি গলি হইতে তাঁর বন্ধু বঙ্কু বাহির হইতেছেন। নন্দবাবু উৎফুল্ল হইয়া ডাকিলেন — 'দাঁড়াও হে বঙ্কু, আমি নাবছি।' নন্দর দু-বগলে দুই বাণ্ডিল, ব্যস্ত হইয়া চলন্ত গাড়ি হইতে যেমন নামিবেন অমনি কোঁচায় পা বাধিয়া নীচে পড়িয়া গেলেন।

গাড়িতে একটা শোরগোল উঠিল এবং ঘ্যাচাং করিয়া গাড়ি থামিল। জনকতক যাত্রী নামিয়া নন্দকে ধরিয়া তুললেন। যাঁরা গাড়ির মধ্যে ছিলেন তাঁরা গলা বাড়াইয়া নানাপ্রকারের সমবেদনা জানাইতে লাগিলেন। '—আহা হা বড্ড লেগেছে — থোড়া গরম দুধ পিলা দোও — দুটো পা-ই কি কাটা গেছে?' একজন সিদ্ধান্ত করিল মৃগি। আর একজন বললি ভির্মি। কেউ বলিল মাতাল, কেউ বলিল বাঙাল, কেউ বলিল পাড়াগেঁয়ে ভূত।

বাস্তবিক নন্দবাবুর মোটেই আঘাত লাগে নাই। কিন্তু কে তা শোনে। লাগে নি কি মশায় খুব লেগেছে — দু-মাসের ধাক্কা — বাড়ি গিয়ে টের পাবেন।' নন্দ বার বার করজোড়ে নিবেদন করিলেন যে প্রকৃতই কিছুমাত্র চোট লাগে নাই। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন — 'আরে মোলো, ভাল করলে মন্দ হয়। পষ্ট দেখলুম লেগেছে তবু বলে লাগে নি।'

এমন সময় বঙ্কুবাবু আসিয়া পড়ায় নন্দবাবু পরিত্রাণ পাইলেন, মনঃক্ষুন্ন যাত্রিগণসহ ট্রাম গাড়িও ছাড়িয়া গেল।

বঙ্কু বলিলেন — মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল আর কি। যা হোক, বাড়ির পথটুকু আর হেঁটে গিয়ে কাজ নেই। এই রিক্‌শ —

রিক্‌শ নন্দবাবুকে আস্তে আস্তে লইয়া গেল, বঙ্কু পিছনে হাঁটিয়া চলিলেন।

নন্দবাবুর বয়স চল্লিশ, শ্যামবর্ণ, বেঁটে গোলগাল চেহারা। তাঁহার পিতা পশ্চিমে কমিসারিয়টে চাকরি করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে একমাত্র সন্তান নন্দর জন্য কলিকাতায় একটি বড় বাড়ি, বিস্তর আসবাব এবং মস্ত একগোছা কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া যান। নন্দর বিবাহ অল্পবয়সেই হইয়াছিল, কিন্তু এক বৎসর পরেই তিনি বিপত্নীক হন এবং তারপর আর বিবাহ করেন নাই। মাতা বহুদিন মৃতা, বাড়িতে একমাত্র স্ত্রীলোক এক বৃদ্ধা পিসী। তিনি ঠাকুরসেবা লইয়া বিব্রত, সংসারের কাজ ঝি চাকররাই দেখে। নন্দবাবুর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু এ পর্যন্ত তাহা হইয়া ওঠে নাই। প্রধান কারণ — আলস্য। থিয়েটার, সিনেমা, ফুটবল ম্যাচ, রেস এবং বন্ধু-বর্গের সংসর্গ — ইহাতে নির্বিবাদে দিন কাটিয়া যায়, বিবাহের ফুরসত কোথা? তারপর ক্রমেই বয়স বাড়িয়া যাইতেছে, আর এখন না করাই ভাল। মোটের উপর নন্দ নিরীহ গোবেচারা অল্পভাষী উদ্যমহীন আরামপ্রিয় লোক।

নন্দবাবুর বাড়ির নীচে সুবৃহৎ ঘরে সান্ধ্য আড্ডা বসিয়াছে। নন্দ আজ কিছু ক্লান্ত বোধ করিতেছেন, সেজন্য

বালাপোশ গায়ে দিয়ে লম্বা হইয়া শুইয়া আছেন। বন্ধুগণের চা ও পাঁপরভাজা শেষ হইয়াছে, এখন পান সিগারেট ও গল্প চলিতেছে।

গুপীবাবু বলিতেছিলেন — 'উঁহু। শরীরের ওপর এত অযত্ন ক'রো না নন্দ। এই শীতকালে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া ভাল লক্ষণ নয়।'

নন্দ। মাথা ঠিক ঘোরে নি, কেবল কোঁচার কাপড় বেধে —

গুপী। আরো, না না। ঘুরেছিল বই কি। শরীরটা কাহিল হয়েছে। এই তো কাছাকাছি ডাক্তার তফাদার রয়েছেন। অত বড় ফিজিশয়ান আর শহরে পাবে কোথা? যাও না কাল সকালে একবার তাঁর কাছে।

বন্ধু বলিলেন —'আমার মতে একবার নেপালবাবুকে দেখালেই ভাল হয়। অমন বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথ আর দুটি নেই। মেজাজটা একটু তিরিক্ষি বটে, কিন্তু বুড়োর বিদ্যে অসাধারণ।'

যষ্ঠীবাবু মুড়িশুড়ি দিয়া এক কোণে বসিয়াছিলেন। তাঁর মাথায় বালাক্লাভা টুপি, গলায় দাড়ি এবং তার উপর কম্ফর্টার। বলিলেন — 'বাপ, এত শীতে অবেলায় কখনও ট্রামে চড়ে? শরীর অসাড় হলে আছাড় খেতেই হবে। নন্দর শরীর একটু গরম রাখা দরকার।'

নিধু বলিল — 'নন্-দা, মোটা চাল ছাড়। সেই এক বিরিঞ্চির আমলের ফরাস তাকিয়া, লক্কড় পালকি গাড়ি আর পক্ষিরাজ ঘোড়া, এতে গায়ে গত্তি লাগবে কিসে? তোমার পয়হার অভাব কি বাওআ? একটু ফুর্তি করতে শেখ।'

সাব্যস্ত হইল কাল সকালে নন্দবাবু ডাক্তার তফাদারের বাড়ি যাইবেন।

ডাক্তার তফাদার M.D. M.R.A.S., গ্রে স্ট্রীটে থাকেন। প্রকাণ্ড বাড়ি, দু-খানা মোটর, একটা ল্যাণ্ড। খুব পসার, রোগীরা ডাকিয়া সহজে পায় না। দেড় ঘণ্টা পাশের কামরায় অপেক্ষা করার পর নন্দবাবুর ডাক পড়িল। ডাক্তারসাহেবের ঘরে গিয়া দেখিলেন এখনও একটি রোগীর পরীক্ষা চলিতেছে। একজন স্থূলকায় মারোয়াড়ী নগ্নগাত্রে দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তার ফিতা দিয়া তাহার ভুঁড়ির পরিধি মাপিয়া বলিলেন —'বস্, সওয়া ইঞ্চি বঢ় গিয়া।' রোগী খুশী হইয়া বলিল — 'নবজ্, তো দেখিয়ে।' ডাক্তার রোগীর মণিবন্ধে নাড়ীর উপর একটি মোটরকারের স্পার্কিং প্লাগ ঠেকাইয়া বলিলেন — 'বহুত মজেসে চল্ রহা।' রোগী বলিল — 'জবান তো দেখিয়ে।' রোগী হাঁ করিল, ডাক্তার ঘরের অপর দিকে দাঁড়াইয়া অপেরা গ্লাস দ্বারা তাহার জিব দেখিয়া বলিলেন, — 'থোড়েসি কসর হ্যায়। কল্ ফিন আনা।'

রোগী চলিয়া গেলে তফাদার নন্দর দিকে চাহিয়া বললেন —'ওয়েল?'

নন্দ বলিলেন — 'আজ্ঞে বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। কাল হঠাৎ ট্রাম থেকে —'

তফাদার। কম্পাউন্ড ফ্রাক্চার? হাড় ভেঙ্গেছে?

নন্দবাবু আনুপূর্বিক তাঁর অবস্থার বর্ণনা করিলেন। বেদনা নাই, জ্বর হয় না, পেটের অসুখ, সর্দি, হাঁপানি নাই। ক্ষুধা কাল হইতে একটু কমিয়াছে। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন। মনে বড় আতঙ্ক।

ডাক্তার তাঁহার বুক পেট মাথা হাত পা নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন — 'জিব দেখি।' নন্দবাবু জিব বাহির করিলেন।

ডাক্তার ক্ষণকাল মুখ বাঁকাইয়া কলম ধরিলেন। প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ হইলে নন্দর দিকে চাহিয়া বলিলেন — 'আপনি এখন জিব টেনে নিতে পারেন। এই ওষুধ রোজ তিনবার খাবেন।'

নন্দ। কি রকম বুঝলেন?

তফাদার। ভেরি ব্যাড।

নন্দ সভয়ে বলিলেন — 'কি হয়েছে?'

তফাদার। আরও দিন কতক ওয়াচ না করলে ঠিক বলা যায় না। তবে সন্দেহ করছি cerebral tumour with strangulated ganglia। ট্রিফাইন করে মাথার খুলি ফুটো করে অস্ত্র করতে হবে, আর ঘাড় চিরে নার্ভের জট ছাড়াতে হবে। শর্ট-সার্কিট হয়ে গেছে।

নন্দ। বাঁচব তো?

তফাদার। দমে যাবেন না, তা হলে সারাতে পারব না। সাত দিন পরে ফের আসবেন। মাই ফ্রেণ্ড মেজর গোঁসাই-এর সঙ্গে একটা কন্‌সল্‌টেশনের ব্যবস্থা করা যাবে। ভাত-ডাল বড় একটা খাবেন না। এগ-ফ্লিপ, বোনম্যারো সুপ, চিকেন-স্টু, এইসব। বিকেলে একটু বার্গণ্ডি খেতে পারেন। বরফ-জল খুব খাবেন। হ্যাঁ, বত্রিশ টাকা। থ্যাঙ্ক ইউ।

নন্দবাবু কম্পিত পদে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যাবেলা বঙ্কুবাবু বলিলেন — আরে তখনি আমি বারণ করেছিলুম ওর কাছে যেয়ো না। ব্যাটা মেড়োর পেটে হাত বুলিয়ে খায়। এঁঃ, খুলির ওপর তুরপুর চালাবেন।'

ষষ্ঠীবাবু। আমাদের পাড়ার তারিণী কবিরাজকে দেখালে হয় না?

গুপীবাবু। না, না, যদি বাস্তবিক নন্দর মাথার ভেতর ওলট-পালট হয়ে গিয়ে থাকে তবে হাতুড়ে বদ্দির কম্ম নয়। হোমিওপ্যাথিই ভাল।

নিধু। আমার কথা তো শুনবে না বাওআ। ডাক্তারি তোমার ধাতে না সয় তো একটু কোবরেজি করতে শেখ। দরওয়ানজী দিব্বি একলোটা বানিয়েছে। বল তো একটু চেয়ে আনি।

হোমিওপ্যাথিই স্থির হইল।

পরদিন খুব ভোরে নন্দবাবু নেপাল ডাক্তারের বাড়ি আসিলেন। রোগীর ভিড় এখনও আরম্ভ হয় নাই, অল্পক্ষণ পরেই তাঁর ডাক পড়িল। একটি প্রকাণ্ড ঘরের মেঝেতে ফরাশ পাতা। চারিদিকে স্তূপাকারে বহি সাজানো। বহির দেওয়ালের মধ্যে গল্পবর্ণিত শেয়ালের মত বৃদ্ধ নেপালবাবু বসিয়া আছেন। মুখে গড়গড়াল নল, ঘরটি ধোঁয়ায় ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।

নন্দবাবু নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নেপাল ডাক্তার কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন — 'বসবার জায়গা আছে।' নন্দ বসিলেন।

নেপাল। শ্বাস উঠেছে?

নন্দ। আজ্ঞে?

নেপাল। রুগীর শেষ অবস্থা না হলে তো আমায় ডাকা হয় না, তাই জিজ্ঞেস করছি।

নন্দ সবিনয়ে জানাইলেন তিনিই রোগী।

নেপাল। অ্যালোপ্যাথ ডাকাত ব্যাটারা ছেড়ে দিলে যে বড়? তোমার হয়েছে কি?

নন্দবাবু তাঁহার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিলে।

নেপাল। তফাদার কি বলেছে?

নন্দ। বললেন আমার মাথায় টিউমার আছে।

নেপাল। তফাদারের মাথায় কি আছে জান? গোবর। আর টুপির ভিতর শিং, জুতোর ভেতর খুর, পাত্‌লুনের ভেতর ল্যাজ। খিদে হয়?

নন্দ। দু-দিন থেকে একেবারে হয় না।

নেপাল। ঘুম হয়?

নন্দ। না।

নেপাল। মাথা ধরে?

নন্দ। কাল সন্ধ্যেবেলা ধরেছিল।

নেপাল। বাঁ দিক?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

নেপাল। না ডান দিক?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

নেপাল ধমক দিয়া বলিলেন — 'ঠিক করে বল।'

নন্দ। আজ্ঞে ঠিক মধ্যিখানে।

নেপাল। পেট কামড়ায়?

নন্দ। সেদিন কামড়েছিল। নিধে কাবলী মটরভাজা এনেছিল তাই খেলে—

নেপাল। পেট কামড়ায় না মোচড় দেয় তাই বল।

নন্দ বিব্রত হইয়া বললেন — 'হাঁচোড়-পাঁচোড় করে।'

ডাক্তার কয়েকটি মোটা-মোটা বহি দেখিলেন, তারপর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বললেন — 'হু। একটা ওযুধ দিচ্ছি নিয়ে যাও। আগে শরীর থেকে আলোপ্যাথিক বিষ তাড়াতে হবে। পাঁচ বছর বয়সে আমায় খুনে ব্যাটারা দু-গ্রেন কুইনীন দিয়েছিল, এখনও বিকেলে মাথা টিপ টিপ করে। সাতদিন পরে ফের এসো। তখন আসল চিকিৎসা শুরু হবে।'

নন্দ। ব্যারামটা কি আন্দাজ করছেন?

ডাক্তার ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন — 'তা জেনে তোমার চারটে হাত বেরবে নাকি? যদি বলি তোমার পেটে ডিফারেনশ্যাল ক্যাল্‌কুলস হয়েছে, কিছু বুঝবে? ভাত খাবে না, দু-বেলা রুটি, মাছ-মাংস বারণ, শুধু মুগের ডালের যুষ, স্নান বন্ধ, গরম জল একটু খেতে পার, তামাক খাবে না, ধোঁয়া লাগলে ওযুধের গুণ নষ্ট হবে। ভাবছো আমার

আলমারির ওষুধ নষ্ট হয়ে গেছে? সে ভয় নেই, আমার তামাকে সালফার-থার্টি মেশানো থাকে। ফী কত তাও বলে দিতে হবে নাকি? দেখছো না দেওয়ালে নোটিস লটকানো রয়েছে বত্রিশ টাকা? আর ওষুধের দাম চার টাকা।'

নন্দবাবু টাকা দিয়া বিদায় লইলেন।

নিধু বলিল — 'কেন বাওআ কাঁচা পয়হা নষ্ট করছ? থাকলে পাঁচ রাত বক্সে বসে ঠিয়াটার দেখা চলত। ও নেপাল-বুড়ো মস্ত ঘুঘু, নন্-দাকে ভালমানুষ পেয়ে জেরা করে থ করে দিয়েছে। পড়ত আমার পাল্লায় বাছাধন, কত বড় হোমিওফাঁক দেকে নিতুম। এক চুমুকে তার আলমারি-সুদ্ধ ওষুধ সাব্ড়ে না দিতে পারি তো আমার নাক কেটে দিও।'

গুপী। আজ আপিসে শুনেছিলুম কে একজন বড় হাকিম ফরক্কাবাদ থেকে এখানে এসেছে। খুব নামডাক, রাজা-মহারাজারা সব চিকিৎসা করাচ্ছে। একবার দেখালে হয় না?

ষষ্ঠী। এই শীতে হাকিমী ওষুধ? বাপ, শরবত খাইয়েই মারবে। তার চেয়ে তারিণী কোবরেজ ভাল।

অতঃপর কবিরাজী চিকিৎসাই সাব্যস্ত হইল।

পরদিন সকালে নন্দবাবু তারিণী কবিরাজের বাড়ি উপস্থিত হইলেন। কবিরাজ মহাশয়ের বয়স ষাট, ক্ষীণ শরীর, দাড়ি-গোঁফ কামানো। তেল মাখিয়া আটহাতী ধুতি পরিয়া একটি চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন। এই অবস্থাতেই ইনি প্রত্যহ রোগী দেখেন। ঘরে একটি তক্তাপোশ, তাহার উপর তেলচিটে পাটি এবং কয়েকটি মলিন তাকিয়া। দেওয়ালের কোলে দুটি ঔষধের আলমারি।

নন্দবাবু নমস্কার করিয়া তক্তাপোশে বসিলে কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন — 'বাবুর কন্থে আসা হচ্ছে?' নন্দবাবু নিজের নাম ও ঠিকানা বলিলেন।

তারিণী। রুগীর ব্যামোডা কি?

নন্দবাবু জানাইলেন তিনি রোগী এবং সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিলেন।

তারিণী। মাথার খুলি ছেঁদা করে দিয়েছে নাকি?

নন্দ। আজ্ঞে না, নেপালবাবু বললেন পাথুরি, তাই আর মাথায় অস্তর করাই নি।

তারিণী। নেপাল! সে আবার কেডা?

নন্দ। জানেন না? চোরবাগানের নেপালচন্দর রায় M.B.F.T.S. — মস্ত হোমিওপ্যাথ।

তারিণী। অঃ, ন্যাপলা, তাই কও। সেডা আবার ডাগদর হ'ল কবে; বলি, পাড়ায় এমন বিচক্ষণ কোবরেজ থাকতি ছেলেছোকরার কাছে যাও কেন?

নন্দ। আজ্ঞে, বন্ধু-বান্ধবরা বললে ডাক্তারের মতটা আগে নেওয়া দরকার, যদিই অস্ত্র-চিকিৎসা করতে হয়।

তারিণী। যন্তিবাবু-রি চেন? খুলনের উকিল যন্তিবাবু?

নন্দ ঘাড় নাড়িলেন।

তারিণী। তাঁর মামার হয় উরুস্তম্ভ। সিভিল সার্জন পা কাটলে। তিন দিন অচৈতনিয। জ্ঞান হলি পর কইলেন, আমার ঠ্যাং কই? ডাক তারিণী স্যানরে। দেলাম ঠুকে এক দলা চ্যবনপ্রাশ। তারপর কি হ'ল কও দিকি?

নন্দ। আবার পা গজিয়েছে বুঝি?

'ওরে অ ক্যাব্‌লা, দেখ্ দেখ্ বিড়েলে সব্‌ড়া ছাগলাদ্য ঘ্রেত খেয়ে গেল'—বলিতে বলিতে কবিরাজ মহাশয় পাশের ঘরে ছুটিলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে বসিয়া বলিলেন — 'দ্যাও নাড়ীডা একবার দেখি। হুঃ, যা ভাবছিলাম তাই। ভারী ব্যামো হয়েছিল কখনও?'

নন্দ। অনেক দিন আগে টাইফয়েড হয়েছিল।

তারিণী। ঠিক ঠাউরেছি। পাঁচ বছর আগে?

নন্দ। প্রায় সাড়ে সাত বছর হ'ল।

তারিণী। একই কথা, পাচ দেরা সারে সাত। প্রাতিক্কালে বোমি হয়?

নন্দ। আজ্ঞে না।

তারিণী। হয়, Zানতি পার না। নিদ্রা হয়?

নন্দ। ভাল হয় না।

তারিণী। হবেই না তো। ঊধু হয়েছে কি না। দাত কনকন করে?

নন্দ। আজ্ঞে না।

তারিণী। করে Zানতি পার না। যা হোক, তুমি চিন্তা কোরো নি বাবা। আরাম হয়ে যাবানে। আমি ওযুধ দিচ্চি।

কবিরাজ মহাশয় আলমারি হইতে একটি শিশি বাহির করিলেন, এবং তাহার মধ্যস্থিত বড়ির উদ্দেশ্যে বলিলেন — 'লাফাস নে, থাম্ থাম্। আমার সব জীয়ন্ত ওযুধ, ডাক্‌লি ডাক শোনে। এই বড়ি সকাল-সন্ধ্যি একটা করি খাবা। আবার তিনদিন পরে আস্‌বা। বুজেচ?'

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

তারিণী। ছাই বুজেচ। অনুপান দিতি হবে না? ট্যাবা লেবুর রস আর মধুর সাথি মাড়ি খাবা। ভাত খাবা না। ওলসিদ্ধ, কচুসিদ্ধ এইসব খাবা। নুন ছোবা না। মাগুর মাছের ঝোল একটু চ্যানি দিয়ে রাঁধি খাতি পার। গরম জল ঠাণ্ডা করি খাবা।

নন্দ। ব্যারামটা কি?

তারিণী। যারে কয় উদুরি। উর্ধ্ব শ্লেষ্মাও কইতি পার।

নন্দবাবু কবিরাজের দর্শনী ও ঔষধের মূল্য দিয়া বিমর্যচিত্তে বিদাল লইলেন।

নিধু বলিল — 'কি দাদা, বোক্‌রেজির সাধ মিট্‌ল?

গুপী। নাঃ এ-সব বাজে চিকিৎসার কাজ নয়। কোথাও চেঞ্জে চল।

বঙ্কু। আমি বলি কি, নন্দ বে-থা করে ঘরে পরিবার আনুক। এ-রকম দামড়া হয়ে থাকা কিছু নয়।

নন্দ চিঁ চিঁ স্বরে বলিলেন — 'আর পরিবার। কোন্ দিন আছি, কোন্ দিন নেই। এই বয়সে একটা কচি বউ এনে মিথ্যে জঞ্জাল জোটানো।'

নিধু বলিল — 'নন্-দা, একটা মোটর কেন মাইরি। দু-দিন হাওয়া খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। সেভেন সিটার হড্সন; যেটের কোলে আমরা তো পাঁচজন আছি।'

ষষ্ঠী। তা যদি বলেন, তবে আমার মতে মোটরকারও যা, পরিবারও তা। ঘরে আনা সোজা; কিন্তু মেরামতী খরচ যোগাতে প্রাণান্ত। আজ টায়ার ফাটল কাল গিন্নীর অম্বল-শূল, পরশু ব্যাটারি খারাপ, তরশু ছেলেটার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর। অমন কাজ ক'রো না নন্দ! জেরবার হবে। এই শীতকালে কোথা দু-দণ্ড লেপের মধ্যে ঘুমুব মশায়, তা নয়, সারারাত প্যান প্যান ট্যাঁ ট্যাঁ।

নিধু। ষষ্ঠী খুড়ো যে রকম হিসেবী লোক, একটা মোটা-সোটা রোঁ-ওলা ভাল্লুকের মেয়ে বে করলে ভাল করতেন। লেপ-কম্বলের খরচা বাঁচত।

গুপী। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন। কাল সকালে নন্দ একবার হাকিম সাহেবের কাছে যাও। তার পর যা হয় করা যাবে।

নন্দবাবু অগত্যা রাজী হইলেন।

হাজিক-উল-মুল্ক্ বিন লোকমান নুরুল্লা গজন ফরুল্লা অল হকিম য়ুনানী লোয়ার চিৎপুর রোডে বাসা লইয়াছেন। নন্দবাবু তেতলায় উঠিলে একজন লুঙ্গিপরা ফেজ-ধারী লোক তাঁহাকে বলিল — 'আসেন বাবুমশায়। আমি হাকিম সাহেবের মীরমুন্সী। কি বেমারি বোলেন, আমি লিখে হুজুরকে ইতালা ভেজিয়ে দিব।'

নন্দ। বেমারি কি সেটা জানতেই তো আসা বাপু।

মুন্সী। তব্ ভি কুছ তো বোলেন। না-তাক্তি, বুখার, পিল্লি, চেচক, ঘেঘ, বাওআসির, রাত-অন্ধি —

নন্দ। ও-সব কিছু বুঝলুম না বাপু। আমার প্রাণটা ধড়ফড় করছে।

মুন্সী। সো হি বোলেন। দিল তড়প্না। মোহর এনেছেন?

নন্দ। মোহর?

মুন্সী। হাকিম সাহেব চাঁদি ছোন না। নজরানা দো মোহর। না থাকে আমি দিচ্ছি। পয়তাল্লিশ টাকা, আর বাট্টা দো টাকা, আর রেশমী রুমাল দো টাকা। দরবারে যেয়ে আগে হুজুরকে বন্দগি জনাব বোলবেন, তারপর রুমালের ওপর মোহর রেখে সামনে ধরবেন।

মুন্সী নন্দবাবুকে তালিম দিয়া দরবারে লইয়া গেল। একটি বৃহৎ ঘরে গালিচা পাতা, একপার্শ্বে মসনদের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া হাকিম সাহেব ফরসিতে ধূমপান করিতেছেন। বয়স পঞ্চান্ন, বাবরী চুল, গোঁফ খুব ছোট করিয়া ছাঁটা। আবক্ষলম্বিত দাড়ির গোড়ার দিক সাদা, মধ্যে লাল, ডগায় নীল। পরিধান সাটিনের চুড়িদার ইজার, কিংখাপের জোব্বা, জরির তাজ। সম্মুখে ধূপদানে মুসম্বর এবং রুমী মস্তগি জ্বলিতেছে, পাশে পিকদান, পানদান, আতরদান ইত্যাদি। চার-পাঁচজন পারিষদ হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া আছে এবং হাকিমের প্রতি কথায় 'কেরামত' বলিতেছে। ঘরের কোণে একজন ঝাঁকড়া-চুলো চাপা-দেড়ে লোক সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং এবং বিকট অঙ্গভঙ্গী করিতেছে।

নন্দবাবু অভিবাদন করিয়া মোহর নজর দিলেন। হাকিম ঈষৎ হাসিয়া আতরদান হইতে কিঞ্চিৎ তুলা লইয়া নন্দর কানে গুঁজিয়া দিলেন। মুন্সী বলিল — 'আপনি বাংলায় বাতচিত বোলেন। হামি হুজুরকে সম্‌ঝিয়ে দিব।'

নন্দবাবুর ইতিবৃত্ত শেষ হইলে হাকিম ঋষভকণ্ঠে বলিলেন — 'সর্‌-লাও!'

নন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। মুন্সী আশ্বাস দিয়া বলিল — 'ডরবেন না মশয়। জনাবকে আপনার শির দেখ্‌লান।

নন্দর মাথা টিপিয়া হাকিম বলিলেন — 'হড্ডি পিল্‌পিলায় গয়া।'

মুন্সী। শুনেছেন? মাথার হাড় বিলকুল লরম হয়ে গেছে।

হাকিম তিনরঙা দাড়িতে আঙুল চালাইয়া বলিলেন — 'সুর্মা সুর্খ্‌'।

একজন একটা লাল গুঁড়া নন্দর চোখের পল্লবে লাগাইয়া দিল। মুন্সী বুঝাইল — 'আঁখ ঠাণ্ডা থাকবে, নিদ হোবে।' হাকিম আবার বলিলেন — 'রোগন বব্বর।' মুন্সী হাঁকিল — 'এ জী বাল্‌বর, অস্তুরা লাও।

নন্দবাবু — 'হাঁ-হাঁ আরে তুম করো কি' — বলিতে বলিতে নাপিত চট্‌ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মতালুর উপর দু-ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ কামাইয়া দিল, আর একজন তাহার উপর একটা দুর্গন্ধ প্রলেপ লাগাইল। মুন্সী বলিল — 'ঘব্‌ড়ান কেন মশয়, এ হচ্চে বব্বরী সিংগির মাথার ঘি। বহুত কিম্মত। মাথার হাড্ডি সকত হোবে।'

নন্দবাবু কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব অবস্থায় রহিলেন। তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া বেগে ঘর হইতে পলায়ন করিলেন। মুন্সী পিছনে ছুটিতে ছুটিতে বলিল — 'হামার দস্তুরি? নন্দ একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া তিন লাফে নীচে নামিয়া গাড়িতে উঠিয়া কোচমানকে বলিলেন — 'হাঁকাও!'

সন্ধ্যাকালে বন্ধুগণ আসিয়া দেখিলেন বৈঠকখানার দরজা বন্ধ। চাকর বলিল, বাবুর বড় অসুখ, দেখা হইবে না। সকলে বিষন্নচিত্তে ফিরিয়া গেলেন।

সমস্ত রাত বিছানায় ছটফট করিয়া ভোর চারটায় সময় নন্দবাবু ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর বন্ধুগণের পরামর্শ শুনিবেন না, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিবেন।

বেলা আটটার সময় নন্দ বাড়ি হইতে বাহির হইলেন এবং বড় রাস্তায় ট্যাক্‌সি ধরিয়া বলিলেন — 'সিধা চলো।' সঙ্কল্প করিয়াছেন, মিটারে এক টাকা উঠিলেই ট্যাক্‌সি হইতে নামিয়া পড়িবেন, এবং কাছাকাছি যে চিকিৎসক পান তাহারই মতে চলিবেন — তা সে অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ, হাতুড়ে, অবধূত, মাদ্রাজী বা চাঁদসীর ডাক্তার যেই হউক।

বউবাজারে নামিয়া একটি গলিতে ঢুকিতেই সাইনবোর্ড নজরে পড়িল — 'ডাক্তার মিস বি. মল্লিক।' নন্দবাবু 'মিস' শব্দটি লক্ষ্য করেন নাই, নতুবা হয়তো ইতস্ততঃ করিতেন। একেবারে সোজা পরদা ঠেলিয়া একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

মিস বিপুলা মল্লিক তখন বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তু হইয়া কাঁধের উপর সেফটি-পিন আঁটিতেছিলেন। নন্দকে দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন — 'কি চাই আপনার?'

নন্দবাবু প্রথমটা অপ্রস্তুত হইলেন, তার পর মরিয়া হইয়া ভাবিলেন—দূর হ'ক, না-হয় লেডি ডাক্তারের পরামর্শই নেব। বলিলেন — 'বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।'

মিস মল্লিক। পেন আরম্ভ হয়েছে?

নন্দ। পেন তো কিছু টের পাচ্ছি না;

মিস। ফার্স্ট কনফাইমেন্ট?

নন্দ। আজ্ঞে?

মিস। প্রথম পোয়াতী?

নন্দ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন — 'আমি নিজের চিকিৎসার জন্যই এসেছি।

মিস মল্লিক আশ্চর্য হইয়া বলিলেন — 'নিজের জন্যে? ব্যাপার কি?'

সমগ্র ইতিহাস বর্ণনা শেষ হইলে মিস মল্লিক নন্দবাবুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দু-চারটি প্রশ্ন করিয়া কহিলেন —'আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

নন্দ। শ্রীনন্দদুলাল মিত্র।

মিস। বাড়িতে কে আছেন?

নন্দ জানাইলেন তিনি বহুদিন বিপত্নীক, বাড়িতে এক বৃদ্ধা পিসী ছাড়া কেউ নাই।

মিস। কাজকর্ম কি করাহয়?

নন্দ। তা কিছু করি না। পৈতৃক সম্পত্তি আছে।

মিস। মোটর-কার আছে?

নন্দ। নেই তবে কেনবার ইচ্ছে আছে।

মিস মল্লিক আরও নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া কিছুক্ষণ ঠোঁটে হাত দিয়া চিন্তা করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বামে দক্ষিণে ঘাড় নাড়িলেন।

নন্দ ব্যাকুল হইয়া বলিলে — 'দোহাই আপনার, সত্যি ক'রে বলুন আমার কি হয়েছে। টিউমার, না পাথুরি, না উদরী, না কালাজ্বর, না হাইড্রোফোবিয়া।'

মিস মল্লিক হাসিয়া বলিলেন — 'কেন আপনি ভাবছেন? ও-সব কিছুই হয়নি। আপনার শুধু একজন অভিভাবক দরকার।'

নন্দ অধিকতর কাতরকণ্ঠে বলিলেন — 'তবে কি আমি পাগল হয়েছি?'

মিস মল্লিক মুখে রুমাল দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিলেন — 'ও ডিয়ার ডিয়ার নো। পাগল হবেন কেন? আমি বলছিলুম, আপনার যত্ন নেবার জন্যে বাড়িতে উপযুক্ত লোক থাকা দরকার।

নন্দ। কেন পিসীমা তো আছেন।

মিস মল্লিক পুনরায় হাসিয়া বলিলেন — 'দি আইডিয়া! মাসীপিসীর কাজ নয়। যাক, আপাতত একটা ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে দেখবেন। বেশ মিষ্টি, এলাচের গন্ধ। এক হপ্তা পরে আবার আসবেন।

★ ★ ★

নন্দবাবু সাত দিন পর পুনরায় মিস বিপুলা মল্লিকের কাছে গেলেন। তারপর দু-দিন পরে আবার গেলেন। তার পর প্রত্যহ।

তারপর একদিন নন্দবাবু পিসীমাতাকে 'কাশীধামে রওনা করাইয়া দিয়া মস্ত বাজার করিলেন। এক ঝুড়ি গল্‌দা চিংড়ি, এক ঝুড়ি মটন, তদনুযায়ী ঘি, ময়দা, দই, সন্দেশ ইত্যাদি। বন্ধুবর্গ খুব খাইলেন। নন্দবাবু জরিপাড় সূক্ষ্ম ধুতির উপর সিল্কের পাঞ্জাবি পরিয়া সলজ্জ সস্মিতমুখে সকলকে আপ্যায়িত করিলেন।

মিসেস বিপুলা মিত্র এখন আর স্বামী ভিন্ন অপর রোগীর চিকিৎসা করেন না। তবে নন্দবাবু ভালই আছেন। মোটর-কার কেনা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, সান্ধ্য আড্ডাটি ভাঙিয়া গিয়াছে।

৬৩.৫ সারাংশ

গল্পের প্রধান চরিত্র নন্দ মিত্র যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বের মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন। ধনী বাপের একমাত্র সন্তান চল্লিশ বছর বয়সী নন্দের অনেককাল আগেই স্ত্রীবিয়োগ হলেও দ্বিতীয়বার বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি উদ্যমহীন, অলস, আরামপ্রিয়, আড্ডাবাজ, এবং নিঝঞ্ঝাটে থাকতে চাওয়া একটি মানুষের সহজাত স্বভাবধর্মেই। এহেন নন্দ মিত্র একদিন তাঁর প্রিয় বন্ধু বঙ্কুকে দেখে উৎসাহের আতিশয্যে তাড়াতাড়ি ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে কোনোভাবে আছাড় খেয়ে রাস্তার ওপর সটান পড়ে যাবার পর থেকে গল্পের মুখপাত হয়। তাঁর আড্ডাধারী বন্ধুরা সিদ্ধান্ত করেন যে, অবশ্যই তিনি ভিতরে-ভিতরে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, নইলে ঐভাবে আকস্মিক ভূপতিত হওয়ার আর কিছু উপলক্ষ নেই।

এর পরিণামেই, নন্দবাবু একের পর এক চিকিৎসকের কাছে যান এবং তাঁদের ধূর্ততা, মূঢ়তা এবং অসূয়াপরতার ধাক্কায় অর্থনাশ করে উত্তরোত্তর বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে আসেন। অ্যালোপ্যাত ডাঃ তফাদারের মতে নন্দর মাথায় 'সেরেব্রাল টিউমার' এবং 'স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড গ্যাংগ্লিয়া' হয়েছে এবং ''ট্রিফাইন করে মাথার খুলি ফুটো করে অস্ত্র করতে হবে, আর ঘাড় চিরে নার্ভের জট ছাড়াতে হবে। শর্ট-সার্কিট হয়ে গেছে''। এরপরেও মেজর গোসাঁইয়ের সঙ্গে ''একটা কনসালটেশনের'' প্রস্তাব রেখে তিনি বত্রিশটি টাকা ফী হিসেবে পকেটস্থ করলেন।

পরবর্তী চিকিৎসক হোমিওপ্যাথ নেপালচন্দ্র রায় নন্দবাবুকে অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের কাছে প্রথমে যাবার কারণে প্রবল তিরস্কার করে তাঁকে জানালেন যে, পেটে ''ডিফারেনশ্যাল ক্যালকুলস'' হবার কারণেই ঐ সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। তিনিও বত্রিশ টাকা ফী এবং চার টাকা ওষুধের দাম বাবদ আদায় করে তাকে রেহাই দিলেন।

এরপর ক্রমান্বয়ে কবিরাজ তারিণী সেন এবং হেকিম হাজিক-উল-মুল্‌ক্‌ বিন লোকমান নুরুল্লা গজন ফরুল্লা অল হকিম য়ুনানীয় পাল্লায় পড়ে যথাবিধি গুণাগার দিয়ে এবং নাজেহাল হয়ে নন্দ প্রায় পালিয়ে বাঁচেন। কবিরাজের হাস্যকর বাকচাতুরী এবং ডাক্তারদের প্রতি বিদ্বেষ এবং হেকিম সাহেব এবং তাঁর মুন্সীর লোকঠকানো ব্যবসার তাৎপর্য অনুধাবন করে নন্দবাবু তাঁদেরও পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। মাঝখান থেকে হেকিমের সহকারীরা তাঁর মাথার চাঁদির ক্রমহ্রাসমান কেশ সমচতুষ্কোণে চেঁছে সেখানে দুর্গন্ধ ''বব্বরী সিংগির মাথার ঘি'' মাখিয়ে দেয় এই কারণে যে, তাঁর না-কি মাথার হাড় নরম হয়ে গেছে (''হড্ডি পিল্‌পিলায় গয়া'')!

মরীয়া হয়ে নন্দ মিত্র ঠিক করলেন যে, ট্যাক্সি চেপে কিছুদূর যাবার পর প্রথম যে চিকিৎসকের চেম্বার নজরে পড়বে (তা তিনি যে-বর্গের হোন না কেন!), তাঁর কাছেই সে চিকিৎসা করাবে, আর কোথাও যাবে না। ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতেই স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মিস বিপুলা মল্লিকের সঙ্গে নন্দবাবুর যোগাযোগ ঘটে গেল। নন্দর সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি অচিরেই বুঝলেন যে, এই 'বিচিত্র' রোগীটির কিছুই হয়নি, ''শুধু একজন অভিভাবক দরকার।'' এবং ঘটনা পরম্পরায় দুজনের ঘনিষ্ঠতা, প্রণয় এবং অবশেষে পরিণয়।.... নন্দবাবুর বৈঠকী আড্ডাধারী বন্ধুর দল এবং তাঁর রোগের বাতিক দুইই এর ফলে বিদুরিত হল।

৬৩.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

(স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে,) এই গল্পের মধ্যে যে-বিদ্রূপ বা পরিহাস অভিব্যক্তি লাভ করেছে, তার উদ্দিষ্ট কোনো ধরনের সামাজিক বা রাজনৈতিক অনাচার নয়। সাধারণভাবে চিকিৎসকদের অদক্ষতা কিংবা অর্থগৃধ্নু তাও এখানে পরশুরামের ব্যঙ্গের বিষয় কি-না সেটাও নির্ণয় করা দুরূহ। তবে, অ্যালোপ্যাথ-হোমিওপ্যাথ-কবিরাজ-হেকিম — সবধরনের চিকিৎসকদেরই একজন করে প্রতিভূকে তিনি এখানে ব্যঙ্গের তুরপুনে এফোঁড়-ওফোঁড় করেছেন।

মানুষের রোগের বাতিকও তাঁর পরিহাসের উপজীব্য এ গল্পে। তাছাড়া, অযাচিত মন্ত্রণা দেবার সহজাত প্রবণতা কিংবা সব কিছু থেকেই নিজের / নিজেদের আখের গুছোনোর ব্যাপারটাও পরশুরামের নজর এড়িয়ে যায়নি এখানে। সেভাবে দেখা হলে, এই অতি সাধারণ বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা গল্পের মধ্যেও বিচার-বিশ্লেষণের কিছু অবকাশ থেকে যায় বৈকি! চরিত্রচিত্রণ যে পুরোদস্তুরভাবে করেছেন পরশুরাম, এমন নয়। তবে প্রতিটি চরিত্রেরই কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন ঠিক সেই নৈপুণ্যে, যেমনভাবে একজন কার্টুনিস্ট কলমের কয়েকটি আঁচড়েই কারুর স্বভাব অথবা / এবং চরিত্রের ব্যঙ্গ করার যোগ্য একটি বা কয়েকটি দিককে স্বল্প আয়াসেই তীক্ষ্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন।

প্রথমত, নন্দ মিত্রের কথাই যদি বলি, তাহলে দেখা যাবে যে বিগত শতাব্দীর বিশ-তিরিশ দশকের গড়পড়তা স্বচ্ছল বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের প্রতিভূপ্রতিম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে এমন কিছু নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আছে, যা নিঃসন্দেহেই হাসাহাসি করার মতো ব্যাপার। যেমন, পুনর্বিবাহে তিনি অনিচ্ছুক নন, কিন্তু আলসেমির কারণে সেই বিষয়ে উদ্যোগী হবার মতন মানসিকতা তাঁর নেই। প্রায় প্রৌঢ় বয়সে পৌঁছেও পিসির অঞ্চলব্যজনে তাঁর নিশ্চিন্তি ঠিক ঐ কারণেই। এবং তাঁর অবচেতন-অসহায়ত্বের বোধেরও উৎস সেটিই, যা মহিলা হবার কারণে ডাক্তার বিপুলা অতি সহজেই বুঝে নিয়েছিলেন মেয়েদের সহজাত কিছু বিশেষ ধরনের অনুভব শক্তির মাধ্যমে। ঐ অসহায়ত্বের অবলীন বোধটা নন্দবাবুকে সর্বদাই ঘিরে রাখত বলেই, যে যা বলছে সেটাই মেনে নিয়ে তৎক্ষণাৎ তদনুযায়ী নিজেকে প্রবৃত্ত করেছেন। অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ, হেকিম — সব কিসিমের চিকিৎসকের দুয়ারে গিয়ে ধর্না দেওয়ার হেতু এটাই। আবার আত্মনির্ভরশীলতা বোধ স্তিমিত থাকার ফলে, তিনি বেশ কিছুটা পরিমাণেই কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম। একবারই মাত্র নন্দবাবু মরীয়া হয়ে নিজের করণীয় নিজেই স্থির করার জন্য উদ্যম নেওয়ায় পরিণামে মঙ্গলই হয়েছিল, তাঁর আসল ব্যাধিটা ধরা পড়ে গিয়েছিল (''একজন অভিভাবক দরকার'') বিপুলার চোখে; এবং স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞা এই ভদ্রমহিলাই তাঁর প্রথম এবং শেষ পুরুষ রোগীর ক্ষেত্রে মনোরোগবিশেষজ্ঞা হিসেবে প্রতীত হয়ে বস্তুতপক্ষে তাঁর যথাযথ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বিধান নির্দেশ করতে

পেরেছিলেন! এবং বিপুলার 'রোগনির্ণয়' যে কতখানি অভ্রান্ত, তার প্রমাণ মেলে পিসিমার কাশীযাত্রা এবং বৈঠকখানা ঘরের আড্ডাটি উঠে যাবার মধ্যে। বিপুলা এসে অধিষ্ঠিতা হবার পরে, স্বভাবতই মানসিকভাবে 'নাবালক'-বৎ নন্দবাবুর দেখ্‌ভাল করার জন্য বৃদ্ধা পিসি এবং শলা-পরামর্শ দেবার জন্য আড্ডার বন্ধুদের আর কোনো প্রয়োজন রইল না তাঁর জীবনে। স্থায়ীভাবে তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক সংকটেরও সুরাহা হল এই বাবদে।

ডাঃ বিপুলা মল্লিককে প্রকৃতপক্ষে একবারই মাত্র ভালভাবে চিত্রিত করেছেন পরশুরাম এবং তারমধ্যেই তিনি সামান্য দু-চারটি আঁচড়েই ভদ্রমহিলার ভাবরূপটিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। তিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সম্মানজনক এবং দায়িত্বশীল পদে আসীন হওয়া সত্ত্বেও নিজের ঐ অবস্থানটা তাঁর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, মনের গহনে তাঁরও যে আর পাঁচজন মেয়ের মতোই ঘর-গৃহস্থালি করার আকাঙ্ক্ষাই প্রবলতর ছিল, সামান্য দু-চারটি কথাতেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। যেমন ঃ নন্দবাবুর বাড়ির অবস্থা এবং পারিবারিক খবরাখবর নেবার জন্য তাঁর উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন, মায় মোটর-কার আছে কি-না জানতে চাওয়ার ব্যাপারটি ইত্যাদি, ইত্যাদি। ''ও ডিয়ার ডিয়ার'' বলে প্রথম আলাপেই ''মুখে রুমাল দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া'' ওঠা প্রভৃতি ব্যাপারগুলিও তাঁর বয়স, অবস্থান, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সঙ্গে একটুও মানানসই নয়। এবং নন্দকে বিয়ে করার পর একদিকে যেমন তিনি সর্বজনের জন্য ডাক্তারী করা ছেড়ে দিয়ে স্বামী ভিন্ন অন্য রোগীর 'চিকিৎসা' করেন না, অন্যদিকে তেমনই বৃদ্ধা পিসিশাশুড়িকে কাশীবাসিনী করে আর স্বামীর এতকালের বন্ধুদের বিদায় দিয়ে মোটরগাড়ি কিনে জাঁদরেল এবং ও দজ্জাল গিন্নিগিরি করে তিনি স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর চরিত্রের এই সব তির্যক্ প্রবণতাগুলি পরশুরাম অত্যন্ত সুদক্ষভাবেই রূপায়িত করেছেন সন্দেহ নেই।

চিকিৎসক চারজনের মধ্যে অ্যালোপ্যাথটি নিতান্তই চালিয়াৎ। হোমিওপ্যাথ ভদ্রলোক এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভোগেন — কবিরাজটিও অনেকটা তাই। এজন্যে তাঁর দুজনেই অন্য ডাক্তারকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে নিজেদের অবদমিত ক্ষোভ, হতাশাকে প্রশমিত করতে চান। এঁরা দুজনও যথেষ্টই মিথ্যাবাদী —এঁদের মধ্যে কবিরাজের চালিয়াতী নেহাৎই বোকার মতো ঃ পা-কাটা-যাওয়া রোগীকে ''এক দলা চ্যবনপ্রাশ'' ঠুকে (!) দিয়ে তিনি চিকিৎসা করেছেন এবং নন্দবাবুর মতো নিরীহ, গোবেচারী মানুষও সে-হেন চিকিৎসার তাৎপর্য সম্পর্কে সন্দিহার হয়ে উঠেছেন যেখানে, সেখানে তাঁর মূর্খতাই অতি প্রকটমাত্রায় প্রকাশিত হতে দেখি। তাঁর বিচিত্র উচ্চারণও (''zানতি পার না'') অবশ্য (একটু মোটা দাগের হলেও) রসিকতার সূচক নিঃসন্দেহে।

হেকিম সাহেবের তুলনায় বরং তাঁর 'কমিশন-লাব-সদা-সচেতন' ঐ মুন্সিটি বেশি জীবন্ত এই গল্পের মধ্যে। চিকিৎসক হিসেবে হেকিমটিও যে নির্ভেজাল একটি ভণ্ড — তাতে অবশ্য সংশয়ের অবসর নেই। ডঃ তফাদারের ডায়াগোনোসিস (!) "cerebral tumour with strangulated ganglia" এবং হেকিমের ''হড্‌ডি পিল্‌পিলায় গয়া'' নামে পৃথক প্রকরণে সমতুল্য ধাপ্পাবাজি হিসেবে গ্রাহ্য। এরই পাশাপাশি কবিরাজের নিদান ''যারে কয় উদুরি, ঊর্দ্ধ শ্লেষ্মাও কইতি পার'' এবং হোমিওপ্যাথ নেপালচন্দ্র রায়ের রোগনির্ণয় ''পেটে ডিফারেনশ্যাল ক্যালকুলাস হয়েছে'' ও মুর্খতা এবং / অথবা ভণ্ডামিতে কিছু কম যায় না। তফাদারের চিকিৎসা-বিধান ট্রিফাইন করে মাথার খুলি ফুটো করে অস্ত্র করতে হবে, আর ঘাড় চিরে নার্ভের জট ছাড়াতে হবে'' এবং হেকিমের বিহিত ও কার্যকৃত চিকিৎসা নন্দর মাথার তালু সমচতুষ্কোণে চেঁছে ''বব্বরী সিংগির মাথার ঘি'' লাগানো এবং তার চোখে লাল সুর্মা গুঁড়ো মাখানো (যথাক্রমে, ''রোগন বব্বর'' এবং ''সুর্মা সুর্খ''!) যতটা উদ্‌ভট তার চেয়ে মূঢ়তার (হয়ত, শয়তানিরও) দ্যোতক। আর হোমিওপ্যাথ নেপালবাবুর 'সালফার থার্টি' মেশানো তামাক টানা এবং হস্তধৃত শিশির

ভিতরে থাকা ওষুধের বড়ির উদ্দেশে কবিরাজ তারিণী সেনের ''লাফাস নে থাম্ থাম্'' বলে তাদের মাহাত্ম্য ঘোষণা করাও অবশ্যই চিকিৎসার ভেক ধারণ ছাড়া আর কিছু নয়।

নন্দবাবুর বন্ধুদের চরিত্রগুলিও যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। স্বচ্ছল, নির্ঝঞ্ঝাট এবং অলস, আরামপ্রিয় বন্ধুর মাথায় হাত বুলিয়ে নিজেদের ধান্দা গুছোনো — এমন অভিযোগ তাঁদের সম্পর্কে করলে বোধহয় কিছুটা অবিচারই করা হবে। তবে, নন্দর বৈঠকখানার আড্ডাটি যে তাঁদের সবার কাছেই পরম লোভনীয় —সেকথা বলাই বাহুল্য। এঁদের প্রত্যেকেরই চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে নিজস্ব কিছু পছন্দ-অপছন্দ রয়েছে। গুপীবাবু অ্যালোপ্যাথিপন্থী, বঙ্কুবাবু হোমিওপ্যাথিতে আস্থাশীল, ষষ্ঠীবাবু কবিরাজির পক্ষপাতী, গুপীবাবুর আবার হেকিমিতেও আপত্তি নেই। এঁদের মধ্যে ষষ্ঠী হলেন বয়স্ক মানুষ — অন্যরা তাঁর সঙ্গে রঙ্গরসিকতা করলেও 'খুড়ো' সম্বোধন করেন। নিধুবাবু একটু হালকা স্বভাবের, ফুর্তিবাজ এবং ফাজিল গোছের। ষষ্ঠী কিঞ্চিৎ হিশেবী ধরনের। বঙ্কুর কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি আছে — তিনিই নন্দর আসল ওষুধটি কী, তা আন্দাজ করেছেন ঃ ''আমি বলি কি, নন্দ বে-থা করে ঘরে পরিবার আনুক। এ-রকম দামড়া হয়ে থাকা কিছু নয়।'' এই কথার সূত্রেই ষষ্ঠীর হিসেবী বুদ্ধির পরিচয় মেলে ঃ সংসার করার ঝামেলার কথা স্মরণ করান তিনি। আবার তাঁরই হিসেবিপনার সূত্রে বাচাল নিধু টিপ্পনী কেটেছে ঃ ''খুড়ো যে রকম হিসেবীলোক একটি মোটাসোটা রোঁ-ওলা ভাল্লুকের মেয়ে বে করলে ভাল করতেন। লেপ-কম্বলের খরচা বাঁচত''।

এই বন্ধুরা অবশ্য সকলেই নন্দবাবুর হিতৈষী। তাঁর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে এঁদের কিঞ্চিৎ স্বার্থ থাকতেও পারে (''নন্-দা একটা মোটর কেন মাইরি। দু-দিন হাওয়া খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। সেভেন সিটার হড্‌সন; যেটের কোলে আমরা তো পাঁচজন আছি!'') — অন্তত সান্ধ্য আড্ডাটির লোভ তো তাঁদের ছিলই। তবু, এঁদের সদিচ্ছার সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, একথা বলতেই হয়।

ছোট-ছোট স্কেচ করে পথচারীদের যে-ছবিগুলি পরশুরাম এঁকেছেন, কিংবা হেকিম সাহেবের ধড়িবাজ মুন্সিটিকে তিনি যেমন দেখিয়েছেন, তাও বলার মতো। নন্দবাবু ট্রাম থেকে হুড়মুড়িয়ে নামতে গিয়ে কোঁচায় পা-বেধে পড়ে যাবার পর তাঁকে সাহায্য করতে আসা এবং না-আসা সহযাত্রী ও পথচারীদের যে বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত করেছেন পরশুরাম, তাতে লোকচরিত্র এবং ভিড়-জমানো লোকেদের মানসিক বৈশিষ্ট্য (ইংরেজি করে বললে, 'মব্ সাইকী') সম্পর্কে তাঁর যে অগাধ জ্ঞান ছিল, সেকথাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অযাচিতবাবে উপদেশ দেওয়া, চট্‌জলদি গুজব বানানো, অহেতুক ভয় দেখানো, সহানুভূতির ছদ্মবেশে মজা দেখা, অকারণ ব্যঙ্গ করা, মিথ্যা বলা ইত্যাদি নানা ধরনের মানসিকতা কীভাবে একটা সামান্য ব্যাপারকে অবলম্বন করেও আত্মপ্রকাশ করে, তার সুকুশল পরিচয় মাত্র দুটি ছোট-ছোট অনুচ্ছেদের মাধ্যমেই তিনি দিয়েছেন এই গল্পে।

এই বিশেষ দক্ষতা অবশ্য পরশুরামের অধিকাংশ গল্পেই দেখা যায়। কিন্তু এ-সত্ত্বেও বলতে হয় যে, 'চিকিৎসা সংকট', একটি উপভোগ্য মজার গল্প হলেও, এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্পসুলভ তেমন কোনও গুণ নেই। বরং একটু ছকে-বাঁধা হিউমার (মাঝে মাঝেই যা মোটা দাগে আঁকা) থাকা, ঘটনার সূক্ষ্ম মোচড়ে কাহিনীর গতিপথ না-নির্ণীত হওয়া, চিকিৎসকদের চরিত্রে মূঢ়তা-এবং-শয়তানীর সমন্বয় ঘটাতে সবর্দা সফল না-হওয়া ইত্যাদি ত্রুটি তো এরমধ্যে আছেই। অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ, হেকিম, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ নানান্ বর্গীয় চিকিৎসকদের এই কাহিনীকে হাজির করেছেন পরশুরাম — কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই টাইপ-চরিত্র (বিপুলাও এক অর্থে তাই-ই), ফলে অনেকাংশেই কৃত্রিম বলে মনে হয়।

তবু এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও নিছক পরিবেশনার গুণেই গল্পটির রসমর্জি পাঠককে তৃপ্ত করে। চিকিৎসকদের নিয়ে, ব্যঙ্গকাহিনী হিসেবে এই গল্প বার্নাড শ্য-এর 'ডক্টর'স ডিলেমা' নাটকে-র মতো সূক্ষ্ম এবং পরিশীলিত সৃষ্টি না-হলেও এর নির্ভেজাল হাস্যরস সম্পর্কে সংশয় নেই অবশ্যই।

৬৩.৭ অনুশীলনী

ক) বিস্তৃত আলোচনামূলক ঃ

১) নন্দ মিত্রের 'অসুখ' এবং তাঁর 'নিরাময়'-এর বিবরণ বিস্তারিতভাবে লিখুন।

২) ''.....নিবিড়ভাবে মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণ এবং সুগভীর পরিহাসবোধ — এ-দুয়ের সমাহারে পরশুরামের 'চিকিৎসা সঙ্কট' গল্পটি গড়ে উঠেছে।'' — এই মন্তব্যের তাৎপর্য কতখানি, বিচার করে দেখান।

৩) 'চিকিৎসা সঙ্কট' গল্পের উপজীব্য যে-হাস্যরস, তার মধ্যে আনুপাতিকভাবে বেশি কোন্‌টি — হিউমার, না স্যাটায়ার? বিশ্লেষণ করে দেখান।

খ) সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক ঃ

১) ডাক্তার তফাদার কীভাবে রোগী দেখতেন?

২) ডাক্তার তফাদারের মতে নন্দবাবুর কী অসুখ হয়েছিল এবং তিনি তার কী চিকিৎসা বিহিত করেছিলেন?

৩) নেপাল ডাক্তারবাবুর রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসা পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত পরিচিত দিন।

৪) তারিণী কবিরাজের চিকিৎসা পদ্ধতির সংক্ষেপে পরিচয় দিন।

৫) হাকিম সাহেবের রোগনির্ণয় ও নিরাময়বিধান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৬) বিপুলা মল্লিক নন্দ মিত্রের কীভাবে চিকিৎসা করেছিলেন?

৭) হাকিম সাহেবের ডিসপেন্সারির সংপ্তি বর্ণনা দিন।

গ) সুনির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক ঃ

১) হাকিম সাহেবের পুরো নামটি কী?

২) যষ্ঠিবাবু কে?

৩) ডাক্তার তফদারের বাড়ি কোথায় ছিল?

৪) নেপাল ডাক্তারবাবু কোথায় থাকতেন?

৫) হাকিম সাহেবের মুন্সী নন্দবাবুর কী-কী অসুখ হয়েছে বলে প্রথমে ভেবেছিলেন?

৬) নিধু, ষষ্ঠীখুড়োর জন্য কী রকম পাত্রী বাঞ্ছনীয় ছিল বলে মনে করেছিলেন?

৭) নন্দবাবু মিস মল্লিকের কাছে তাঁর কী-কী অসুখ হওয়া সম্ভব বলে প্রশ্ন করেছিলেন?

৮) নন্দ বিপুলার বিয়ের ভোজের মেনু কী ছিল?

৯) হাকিম সাহেবের মতে নন্দ মিত্রের কী ব্যামো হয়েছিল?

১০) নন্দ কোথা থেকে বাড়ি ফিরতে গিয়ে ট্রাম থেকে পড়ে যান?

৬৩.৮ উত্তর সংকেত

ক) ১) মূলপাঠ অনুসরণে সংক্ষেপে উত্তর তৈরী করুন

২) 'প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ'—এর প্রথমাংশ অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

৩) প্রস্তাবনা (৬২.২) এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার (৬২.৬) শেষ দুই অনুচ্ছেদ পাঠ করে উত্তর করুন।

খ) ১) ফিতা দিয়ে রোগীর ভূড়ি মাপেন, মণিবন্ধে মোটর গাড়ীর স্পার্কিং প্লাগ ঠেকিয়ে নাড়ীর গতি দেখেন, আর অপেরাগ্লাস দিয়ে গলা দেখেন।

২) ডাক্তার তপাদারের সন্দেহ নন্দবাবুর Cerebral tumour with Stangulated ganglia হয়েছে। নার্ভের জট পাকিয়ে গেছে শর্ট সার্কিট হয়েছে। ট্রিফাইন করে মাথার খুলি ফুটো করে অস্ত্র করতে হবে, আর ঘাড় চিরে নার্ভের জট ছাড়াতে হবে।

৩) হোমিওপ্যাথী ডাক্তার নেপালবাবু রোগ নির্ণয়ের জন্য রুগীকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ খিদে, ঘুম হয় কিনা? মাথা ধরে কি? ধরলে ডান না বাঁ কোন দিকে? পেট কামড়ায় না মোচড় দেয়। — ইত্যাদি।

৪) মূলপাঠের পঞ্চম পরিচ্ছেদ অবলম্বনে তারিণী কবিরাজের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে লিখুন।

৫) গল্পের সপ্তম পরিচ্ছেদে য়ুনানী হকিম হাজিক-উল-মুলক .... এর চিকিৎসা পদ্ধতির বর্ণনা আছে। সেটি ভাল করে পড়ে উত্তর করুন।

৬) গল্পের অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিপুলা মল্লিক প্রসঙ্গ অনুসরণে উত্তর করুন।

৭) মুন্সী হাকিমের যে দরবারে নিয়ে গিয়েছিলেন সেটি-ই তাঁর ডিস্পেনসরী। সপ্তম পরিচ্ছেদে এর বর্ণনা আছে। ঐ বর্ণনার সাহায্য নিয়ে উত্তর করুন।

গ) ১) হাজিক-উল-মুলক্ বিন-লোকমান নুরুল্লা গজন ফরুল্লা অল হকিম য়ুনানী।

২) খুলনার উকিল যষ্ঠিবাবু। এই যষ্ঠিবাবুর মামার চিকিৎসা করেছিলেন তারিণী কবিরাজ।

৩) ডাক্তার তফদারের গ্রে স্ট্রীট-এ থাকেন।

৪) নেপাল ডাক্তার চারদিকে সাজান স্তূপাকার বই-এর মধ্যে মেঝেতে যেখানে ফরাসপাতা সেখানে গল্প বর্ণিত শেয়ালের মত বসে থাকতেন।

৫) হাকিম সাহেবের মুন্সী নন্দবাবুর কাছে জানতে চেয়েছেন যে তার 'না-তাক্তি, বুখার, পিল্লি, চেচক, ঘেঘ,

বাওআসির, রাত-অন্ধি প্রভৃতি কোনটি হয়েছে? নন্দর কথা মত শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় 'দিল তড়প্ না' হয়েছে।

৬) নিধু, ষষ্ঠীখুড়োর জন্য একটি মোটা সোটা রোঁ-ওলা ভাল্লুকের মেয়ে পাত্রী হিসেবে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছিল।

৭) নন্দবাবু ব্যাকুল হয়ে জানতে চেয়েছিলেন যে তাঁর টিউমার, না পাথুরি, না উদুরী, না কালাজ্বর, না হাইড্রোফোবিয়া কোনটি হয়েছে? না কি তিনি পাগল হয়ে গেছেন?

৮) নন্দ বিপুলার বিয়ের ভোজের মেনুতে ছিল, গলদা চিংড়ি, মটন, ময়দার লুচি, দই, সন্দেশ ইত্যাদি।

৯) হাকিম সাহেবের মতে নন্দ মিত্রের মাথার 'হড্ডি পিলপিলায় গয়া'.

১০) নন্দবাবু হগ সাহেবের বাজার থেকে ট্রামে বাড়ী ফিরতে গিয়ে পড়ে যান।

৬৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১) পরশুরাম (রাজশেখ বসু) — *গড্ডলিকা*

২) ড. জ্যোৎস্না গুপ্ত — *পরশুরামের গল্প ঃ মন ও শিল্প*

৩) ড. ভূদেব চৌধুরী — *বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার*

৪) ড. বীরেন্দ্র দত্ত — *বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*

৫) ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু — *বাংলা সাহিত্যের নানারূপ*

একক ৬৪ ❑ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পুঁইমাচা

গঠন

৬৪.১ উদ্দেশ্য

৬৪.২ প্রস্তাবনা

৬৪.৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

৬৪.৪ মূলপাঠ ঃ পুঁইমাচা

৬৪.৫ সারাংশ

৬৪.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

৬৪.৭ অনুশীলনী

৬৪.৮ উত্তরমালা

৬৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৬৪.১ উদ্দেশ্য

'পুঁইমাচা' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বেই প্রকাশিত হয় — ১৩৩১ বঙ্গাব্দে। এ সময়েই 'কল্লোল' পত্রিকার আবির্ভা (১৩৩০)। কল্লোলের উত্তাল, উচ্চ কণ্ঠ যোদ্ধবেশ বাংলা সাহিত্যের জগতকে যখন হতচকিত করে দিয়েছে, সেই সময় বিভূতিভূষণ মনে হয়, অনেকটা সচেতনভাবেই নীরব প্রতিবাদী ভঙ্গীতে তাঁর নিজের কথা বলতে শুরু করেছেন। কল্লোলের লেখকরা যখন স্বাতন্ত্র্যবিলাসী হতে ব্যাকুল, উৎসুক, বিদ্রোহের নামে প্রতিক্রিয়া প্রকাশে কিছুটা উদ্ধত, বিভূতিভূষণ তখন এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের বর্মে নিজেকে ঢেকে রেখে নীরবে পল্লীবাসী, সহায় সম্বলহীন মানুষের দুঃখ দারিদ্র্যের জীবনকথা বলে চলেছেন। পুঁইমাচার ক্ষেন্তি, সহায়হরি চাটুজ্জে, অন্নপূর্ণা চরিত্রকে বাংলার গ্রাম থেকে আলাদা করে দেখা যায় না।

এই গ্রামবাংলাকে আশ্রয় করেই বারবার এসেছে বাংলার প্রকৃতি — পল্লীগ্রামের নানা গাছপাল, পাখ-পাখালি, তাঁর নানা পালা-পার্বন। এমনকি লোকচার ও লোক সংস্কার। তিনি গ্রামজীবনের 'সাগা' (Saga) রচনা করেছেন। শহুরে মধ্যবিত্তের পেছনে ফেলে আসা সেই গ্রামের চরিত্রচিত্রশালায় 'নস্টালজিয়া' অনুভব করেছেন। ফলে তিনি বাঙালি পাঠকের হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিয়েছেন।

পুঁইমাচা গল্পটি পাঠ করে আপনিও তাই ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করবেন —

১) গল্পের নায়িকা ক্ষেন্তির লাগানো পুঁই গাছ-এর মাচা গল্পের শেষ পরিণতিকে নূতন মাত্রা এনে দিয়েছে।

২) গ্রাম বাংলা ও তার দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ ও পরিবার জীবনের লেখক একটি জীবন্ত ছবি এ গল্পে এঁকেছেন।

৩) গল্পের পরিবেশ বর্ণনায় প্রকৃতির এমন একটি শান্ত, সরল, সহজ-সুন্দর লাবণ্যময় রূপ তুলে ধরা হয়েছে, যাতে গল্পের রসকেন্দ্রটি ব্যঞ্জনায় লেখকের প্রকৃতি-ভাবনাকেই প্রকাশ করেছে।

৪) গল্পের শেষ পরিণতি থেকে প্রকৃতি-প্রেমিক লেখকের রোমান্টিক কবিপ্রাণতার পরিচয় পাবেন।

৫) ‘পুঁইমাচা’র রচনারীতি ও ভাষা বৈশিষ্ট্য তার নায়িকা ক্ষেন্তির মত নিরলঙ্কার। আর স্বভাবে সহজ ও সরল অথচ অনুভব-সংবেদনাময় ও গভীর। এ ভাষা বিষাদঘন মুহূর্ত রচনার পক্ষে যথেষ্ট বলবান— এ উপলব্ধিও ঘটবে।

৬৪.২ প্রস্তাবনা

‘পুঁইমাচা’ গল্পটি ‘প্রবাসী’ পত্রিকার ১৩৩১ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাস রচনার সূত্রপাত বৈশাখ, ১৩৩২। এদিক থেকে ‘পুঁইমাচা’ ও ‘পথের পাঁচালী’ সমসাময়িক কালের রচনা। এই দুটি রচনাতেই গ্রাম বাংলার দুঃখ দুর্দশা, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত পারিবারিক জীবনের কথা অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। যে জীবনকাহিনী এতে তুলে ধরা হয়েছে, তা যেমন অনাড়ম্বর, শান্ত, তেমনি তার ভাষ্যও অনলঙ্কৃত ও জীবনানুগ — যেন সহজ জীবনের সহজতর ভাষ্য রচনা বিশেষ। গল্প ও উপন্যাসের জীবনচর্যা ও জীবন ভাবনার এই সাদৃশ্য — গ্রাম-প্রকৃতি-মানুষ, তাঁদের চলাফেরা, সংসার প্রতিপালন, সন্তান স্নেহ সবকিছুতেই যেন অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এদিকটার প্রতি লক্ষ করে ডঃ সুকুমার সেন মনে করেছেন পুঁইমাচা গল্পটিতে পথের পাঁচালীর বীজ আছে। অপর এক সৃষ্টিশীল লেখক-সমালোচকের বিশ্বাস কোনো সৃষ্টির পূর্বে লেখকের মনের গভীরে প্রত্যক্ষে বা অগোচরে একটি ছক তৈরী হতে থাকে, তারই প্রতিফলন সমকালীন গল্পে-উপন্যাসে অনেক সময় প্রচ্ছন্নভাবে ফুটে ওঠে। ‘পুঁইমাচা’ ও ‘পথের পাঁচালী’তে এমনটি ঘটে থাকবে। পল্লীর শান্ত নিস্তরঙ্গ পরিবেশে দারিদ্র্যদীর্ণ পরিবার জীবন — ক্ষেন্তী, সহায়হরি চাটুজ্যে ও অন্নপূর্ণা যথাস্থানে দুর্গা, হরিহর ও সর্বজয়ার পূর্বগ। দুটি রচনার প্রকৃতিগত সৌন্দর্য থাকলেও উপস্থাপনার স্বাতন্ত্র্যের কারণে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। ‘পুঁইমাচা’য় পাওয়া যায় প্রকৃতির পটভূমিতে উপস্থাপিত মানুষের জীবনমৃত্যুর রহস্যঘন কতকগুলি খণ্ডচিত্র। কিন্তু প্রকৃতি সেখানে যেন অনেকটা নিরাসক্ত ও নির্মম।

এই গল্পটি পাঠক মনোযোগ দিয়ে পড়লে লক্ষ করবেন আকস্মিক কোনো ঘটনার চমকে এটি শেষ হয়নি। এটি চরিত্রপ্রধান গল্পও নয়। গল্পের শেষ অনুচ্ছেদটিকে লেখকের কবিপ্রাণতা ও প্রকৃতিপ্রেমের চরম উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। পৌষ-পার্বণের দিন পিঠে গড়ার শেষে জ্যোৎস্নার আলোয় উঠানের সেই জায়গায় দুই মেয়ে ও মায়ের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল যেখানে ‘‘লোভী মেয়েটির ..... নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে .... বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে .... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।’’ প্রতীক হিসেবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে লেখক এখানে তাঁর প্রকৃতি দর্শনকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গল্পের প্রাণকেন্দ্রে ক্ষেন্তি আর তাঁর পুঁই মাচার সঙ্গে প্রকৃতি একাকার হয়ে গেছে। এখানেই গল্পের ‘স্নিগ্ধ’ সৌন্দর্য। ‘পুঁইমাচা’ গল্পটি নিবিড়ভাবে পাঠ করলে আপনি এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারবেন।

৬৪.৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম বুধবার, ২৯ শে ভাদ্র, ১৩০০ বঙ্গাব্দে (ইং ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪) মাতুলালয় — কাঁচড়াপাড়া-হালিশহরের নিকটবর্তী মুরারীপুর গ্রামে। মৃত্যু ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। তাঁর বাবা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদি নিবাস বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা বনগ্রাম সংলগ্ন ব্যারাকপুর গ্রাম। মায়ের নাম মৃণালিনী দেবী। মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কথকতা ও পৌরোহিত্য বৃত্তিতে সংসার প্রতিপালন করতেন।

বিভূতিভূষণের শৈশব-কৈশোর অত্যন্ত দারিদ্র্য, অভাব-অনটনে অতিবাহিত হয়। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বনগ্রাম হাইস্কুল থেকে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯১৬-তে কলকাতার রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এ. এবং ১৯১৮-তে ডিস্টিংশন সহ বি. এ. পাশ করেন। এম.এ ও আইন পড়বার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু সংসারের চাপে পড়া অসমাপ্ত রেখে প্রথম জাঙ্গীপাড়া স্কুলে, পরে হরিনাভী স্কুলে (সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগণা) শিক্ষকতা করেন (১৯২০-১৯২২)। হরিনাভী ছেড়ে তিনি অল্প কিছুদিনের জন্য কেশোরাম পোদ্দারের গোরক্ষিণী সভার প্রচারকের কাজ করেন। খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে গৃহ শিক্ষক, খেলাৎ ঘোষের আপ্ত-সহায়ক, তাঁর এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হয়ে ভাগলপুর সার্কেলের কাজে চলে যান। অতঃপর তিনি খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করলেও, জীবনের শেষ পর্বে নিজগ্রামে ব্যারাকপুরের নিকটবর্তী গোপাল নগর হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। অবসর জীবনের অধিকাংশ সময় ঘাটশিলায় তিনি থাকতেন।

শৈশব থেকেই তিনি পল্লীপ্রকৃতির রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ ছিলেন। হরিনাভিতে থাকাকালে গল্প লেখায় প্রবল আগ্রহ জন্মে। ১৯২২-এ তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'উপেক্ষিতা' 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে ভাগলপুর বাসকালে তিনি 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসটি লেখেন। সেটি প্রথম 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিকভাবে বের হয়। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ (১৩৩৬) ঘটে। পল্লীপ্রকৃতি, সেখানকার মানুষ ও সমাজজীবন তাঁর এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। তার অপর উপন্যাস 'আরণ্যক' (১৩৪৫) ও 'ইছামতী' (১৩৫৬) উল্লেখযোগ্য। 'আরণ্যক' বিহারের আরণ্যক প্রতিবেশে দরিদ্র আদিবাসী জনসমাজের সহজ সুন্দর অনাবিল জীবন প্রধান প্রতিপাদ্য। অতি পরিচিত পল্লীজীবন থেকে অনেক দূরের এই জগতটিকে তিনি শান্ত, নির্লিপ্তভাবে অন্যতম ভিন্নতর রূপকে তাঁর এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন অলঙ্কার বর্জিত আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় ভাষায়।

বাইরের পৃথিবী যখন — বিশ শতকের তৃতীয় দশকে — ভরে উঠেছে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রেরণায় বিহ্বল নূতনতর সমাজ গড়বার চেতনায়, তরুণতর শিল্পীরা সেসময় জীবনকে কখনও দেখছেন মার্ক্সীয় সাম্যবাদের দৃষ্টিতে; কখনও বা ফ্রয়েডীয় যৌন-সমস্যার প্রেক্ষিতে। তাঁদের জীবন দৃষ্টিতে কখনও প্রবল প্রখর বাস্তবতা, কখনও বা আশাহত আশাবাদীর স্বপ্নভঙ্গের বেদন। এ সময়ের সাহিত্য বুদ্ধি ও হৃদয়ের মধ্যে কোন ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি। ফলে, জীবন দৃষ্টিতে সমগ্রতা ধরা পরেনি। পক্ষান্তরে, বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাস যুগ ও সমাজ সম্পর্কে অনেকটা নির্লিপ্ত, উদাসীন, শান্ত, সহজ, কোমল ও মধুর। তাঁর গ্রাম, জনপদ, আকাশ, অরণ্য-পাহাড় স্নিগ্ধ শ্যাম সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। এভাবেই তিনি শুধু প্রকৃতির অন্তর্লোকে প্রবেশ নয়, অবগাহন করে জীবন ও জগতের মহান সত্যকে অনুভব করতে চেয়েছেন। দেশ-কালের খণ্ডিত রূপের মধ্যে — অখণ্ডজীবন সত্য খোঁজেন নি। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যা কিছু শাশ্বত তাকে পেতে হলে খুজতে হবে সুন্দর পরিপূর্ণ আনন্দ ভরা সৌম্য জীবনে। সাধারণভাবে 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক' ও 'ইছামতী' এই উপন্যাস চতুষ্টয়কে নির্ভর করেই তাঁর পরিচিতি ব্যাপ্ত হলেও, ছোটগল্প রচনাতেও বিভূতিভূষণের দক্ষতা বড় কম নয়। গ্রামের মানুষ এবং প্রকৃতি, সেখানেও তাঁর লেখার মুখ্য উপাদান। দরিদ্র গ্রামবাংলার স্বল্পবিত্ত ভদ্রগৃহস্থই তাঁর লেখার মূল কুশীলব। আর বাংলার গ্রামীণ প্রকৃতি — তাঁর জন্মস্থান বিশেষত, তাঁকে এমনভাবেই আবৃত্ত করে রেখেছিল যে, সামাজিক এবং পারিবারিক কাহিনী গড়ে তোলবার সময়েও তার প্রকৃতিতন্ময় ভাবটা সর্বব্যাপ্ত হয়ে থাকত। আর সে জন্যই কিন্তু জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যময় ভাবনাটা তাঁর গল্প-উপন্যাসের মানুষদের সচেতন রেখেছে, কিন্তু বেদনার বা ক্রোধের, হাহাকার অথবা বিস্ফোরণ কোনো সময়ে ঘটেনি তাদের মধ্যে। এই বিষয়ে প্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধভাবে হয়ত তার সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের কিছুটাও তুলনা করা যায়।

‘মেঘমল্লার’, ‘মৌরীফুল’, ‘যাত্রাবদল’, ‘জন্ম ও মৃত্যু’, ‘কিন্নর দল’, ‘বেণীগির ফুলবাড়ি’, ‘নবাগত’, ‘তালনবমী’, ‘উপল খণ্ড’, ‘বিধু মাষ্টার’, ‘ক্ষণভঙ্গুর’, ‘অসাধারণ’, ‘মুখোশ ও মুখশ্রী’, ‘আচার্য কৃপালনী কলোনি’, ‘ কুশল পাহাড়ী’, ‘অনুসন্ধান’, ‘ছায়াছবি’, ‘সুলোচনা’, ‘প্রেমের গল্প’, ‘অলৌকিক’ এবং ‘বাক্সবদল’ — মোট এই ক’টি তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থ। এছাড়া ‘শ্রেষ্ঠগল্প’, ‘বাছাই গল্প’ — ইত্যাদি নামেও গল্প সংকলন আছে।

উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে ‘পুঁইমাচা’ গল্পটি পড়তে হবে।

৬৪.৪ মূলপাঠ ঃ পুঁইমাচা

সহায়হরি চাটুজ্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন — একটা বড় বাটি কি ঘটী যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার কাটি পুরিয়া দুই আঙুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমানো তেলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতেছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটি বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেনই না, এমন কি বিশেষ কোনো কথাও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিলেন — কি হয়েছে, বসে রইলে যে? দাও না একটা ঘটী? আঃ, ক্ষেন্তি-টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

অন্নপূর্ণ তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন — তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার?

স্ত্রী অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল — ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরীয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আমতা আমতা করিয়া কহিলেন — কেন .... কি আবার .... কি ....

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বাপেক্ষাও শান্ত সুরে বলিলেন — দেখ, রঙ্গ কোরো না বলিছ — ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোরো। তুমি কিছু জান না, কি খোঁজ রাখ না? অত বড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধ’রে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি ক’রে তা বলতে পার? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জান?

সহায়হরি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন — কেন? কি গুজব?

— গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ি। কেবল বাগ্‌দী দুলে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না। — সমাজে থাকতে হলে সেই রকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ব্ববৎ সুরেই পুনর্ব্বার বলিয়া উঠিলেন —একঘরে করবে গো, তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্ব্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হলো না — ও নাকি উচ্ছুগণ্ড করা মেয়ে —গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ বলবে না — যাও ভালোই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ী বাগদী-বাড়ী উঠে ব’সে দিন কাটাও।

সহায়হতির তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন — এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন, এবার বাকি আছেন কালীময় ঠাকুর! — ওঃ!

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন — কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশি কিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা, না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমার একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কি? — আর সত্যিই তো, এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠল। হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন — হলো যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে ব'লে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই?... পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন — না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে?

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষণ কমিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কী দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন — কিন্তু খিড়কী দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন — এ সব কি রে! ক্ষেন্তি মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ওঃ! এ যে.....

চোদ্দ-পনের বছরের একটি মেয়ে আর-দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ী ঢুকিল। তাহার হাতে এক বোঝা পুঁই শাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হলদে, হলদে চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁই-গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল, মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে। ছোট মেয়ে দু'টির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই-তিন পাকা পুঁই-পাতা জড়ানো কোনো দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো কৃষ্ণ ও অগোছালো — বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দু'টো ডাগর ডাগর ও শান্ত। সরু সরু কাঁচের চুড়িগুলা দু'পয়সা ডজনের একটি সেপটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকানো। পিনটির বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনীর হাত হইতে পুঁই পাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল — চিংড়ি মাছ, বাবা। গয়া বুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম দিতে চায় না, বলে — তোমার বাবার কাছে আর-দিনকার দরুণ দু'টো পয়সা বাকি আছে, আমি বললাম — দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার দু'টো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে — আর এই পুঁই শাকগুলো ঘাটের ধারে রায় কাকা দিয়ে বললে, নিয়ে যা — কেমন মোটা মোটা ....

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতেই অতযন্ত ঝাঁজের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন — নিয়ে যা! আহা, কি অমর্ত্তই তোমাকে তারা দিয়েছে। পাকা পুঁইডাঁটা, কাঠ হয়ে গিয়েছে, দু'দিন পরে ফেলে দিত ... নিয়ে যা, আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন — ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট ক'রে কাটতে হলে না। যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে ....ধাড়ী মেয়ে, ব'লে দিয়েছি না তোমায় বাড়ীর বাইরে কোথাও পা দিও না? লজ্জা করে না এ-পাড়া সে-পাড়া ক'রে বেড়াতে। বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে? খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না? .... কোথায় শাক, কোথায় বেগুন; আর একজন বেড়াচ্ছেন — কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ ..... ফেল্ বলছি ওসব ..... ফেল্।

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আগলা করিয়া দিল, পুঁই শাখের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন — যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কীর পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো ..... ফের যদি বাড়ীর বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি তো ....

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কী অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাঁটা এদিকে ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল। .... সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে গেলেন — তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে ব'লে ... তুমি আবার .... বরং .....

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মা'র মুখের দিকে চাইল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন — না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না — মেয়েমানুষের আবার অত নোলা কিসের! একপাড়া থেকে আর একপাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁইশাক ভিক্ষে ক'রে! যা, যা .... তুই যা, দূর ক'রে বনে দিয়ে আয় ....

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার চোখ দু'টা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাদের জিনিস হোক, পুঁই শাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুরবেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না — নিঃশব্দে খিড়কী দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল-গত অরন্ধনের পূর্ব্বদিন বাড়ীতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল — মা, অর্দ্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্দ্ধেক সব মিলে তোমাদের ....

বাড়ীতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কী দোরের আশেপাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন — বাকিগুলা কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপিচুপিই পুঁইশাখের তরকারী রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু-এক বার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁইশাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁইশাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন — কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীমায়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকাল বেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত সুরে বলিলেন — সে-সব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধর, কেষ্ট মুখুয্যে....স্বভাব নৈলে পাত্র দেব না, স্বভাব নৈলে পাত্র দেব না ক'রে কি কাণ্ডটাই করলে — অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধরে পড়ে মেয়ের বিয়ে দেয়, তবে রক্ষে। তারা কি স্বভাব? রাম বল, ছ-সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রিয়! পরে সুর নরম করিয়া বলিলেন — তা সমাজের সে-সব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন দিন চ'লে যাচ্ছে। বেশি দূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের ....

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন —এই শ্রাবণে তেরোয় ....

— আহা-হা, তেরোয় আর যোলোয় তফাৎ কিসের শুনি? তেরোয় আর যোলের তফাৎটা কিসের? আর সে তেরোই হোক, চাই যোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি? ও তো একরকম উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে। আশীর্ব্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাত পাকের যা বাকি, এই তো? ....সমাজে ব'সে এ-সব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব এ তুমি মনে ভেবো না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল....পাত্তর পাত্তর, রাজপুত্তুর না হলে পাত্তর মেলে না? গরীব মানুষ, দিতে-থুতে পারবে না ব'লেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক ক'রে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানলে। জজ মেজেষ্টার না হলে কি মানুষ হয় না? দিব্যি বাড়ী বাগান পুকুর, শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যস্ — রাজার হাল! দুই ভায়ের অভাব কি?....

ইতিহাসটা হইতেছে এই যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথা ব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেকদিনের সুদ পর্য্যন্ত বাকি — শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্ট পক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হোক পাত্রপক্ষ আশীর্ব্বাদ করিয়া যাওয়ার দিন কতক পরে সহায়হরি টের পান পাত্রটি কয়েক মাস পূর্ব্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকারবধূর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এ রকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন।

দিন দুই পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবী লেবু গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল — বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল....

সহায়হরি একবার বাড়ীর পাশে ঘাটের পথের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন — যা শীগ্‌গির শাবলখানা নিয়ে আয় দিকি। কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড ভারী একটা লোহার শাবল দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল — তৎপরে পিতা-পুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল — ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল ইহারা কাহারো ঘরে সিঁধ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সব কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার যোগাড় করিতেছেন — মুখুয্যে বাড়ীর ছোট খুকী দুর্গা আসিয়া বলিল — খুড়ীমা, মা ব'লে দিলে খুড়ীমাকে গিয়ে বল্, মা ছোঁবে না তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার ক'রে দিয়ে আসবে?

মুখুয্যে বাড়ী ও-পাড়ায় — যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভাঁট, রাংচিতা, বনচালতা গাছের ঘন বন। শীতের সকালে এক প্রকার লতা-পাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজঝোলা হলদে পাখী আমড়া গাছের এ-ডাল হইতে ও-ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইলে বলিলঢ— খুড়ীমা, খুড়ীমা, ঐ যে কেমন পাখীটা। — পাখী দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণ খুপ্ খুপ্ করিয়া আওয়াজ হইতেছিল। ... কে যেন কি খুঁড়িতেছে ... দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা খানিক দূর যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ্ খুপ্ শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন — এখনও নাইতে যাসনি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল — এই যে যাই মা, এক্ষুনি যাব আর আসব।

ক্ষেন্তির স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো-ষোল সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন — ওই ও-পাড়ার ময়শা চৌকিদার রোজই বলে — কর্ত্তা-ঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আস না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু ক'রে রেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং ....

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন — বরোজপোতার বনের মধ্যে ব'সে খানিক আগে কি করছিলে শুনি?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন — আমি। না...আমি কখন্? .... কক্ষনো না, এই তো আমি...। সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বের মতনই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন — চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বোলো না। আমি সব জানি। মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে গিয়েছে আর কি...দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও-পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কি সব খুপ্ খুপ্ শব্দ...তখন আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, যেই আবার খানিকদূর গেলাম আবার দেখি শব্দ....তোমার তো ইহকালও নেই পরকালও নেই, চুরি করতে, ডাকাতি করতে, যা করতে ইচ্ছে হয় কর কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে?

সহায়হির হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উথাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন, কিন্তু স্ত্রী চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশি কথাও যোগাইল না, বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোন পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।....

আধ ঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া, বাড়ী ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলু দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন — ক্ষেন্তি, এদিকে একবার আয় তো, শুনে যা.....

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল — সে ইতস্তত করিতে করিতে মার নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন — এই মেটে আলুটা দু'জনে মিলে তুলে এনেছিস, না?

ক্ষেন্তি মার মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মার মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বাড়ীর সম্মুখস্থ বাঁশঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া লইল; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন — কথা বলছিস নে যে বড়? এই মেটে আলু তুই এসেনছিস কি না?

ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মায়ে মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, উত্তর দিল — হ্যাঁ।

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন — পাজী, আজ তোমার পিঠে আমি আস্ত কাটের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছে মেটে আলু চুরি করতে। সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন্ কালে, সেই একগলা বিজন বন, যার মধ্যে দিন দুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে? যদি গোসাঁইরা চৌকিদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব, তা ব'লে পরের জিনেসে হাত? এ মেয়ে আমি কি করব মা?

দু-তিন দিন পরে একদিন বৈকালে, ধূলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল — মা মা, দেখবে এস...

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন ভাঙ্গা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলো পাথরকুচি ও কণ্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল, ক্ষেন্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তরকারির আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যসম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্ত্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থিবন্ধ হইয়া ফাঁকি হইয়া যাওয়া আসামীর মতন ঊর্দ্ধমুখে একখণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাতত তাঁর বড় মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন — দূর পাগলী, এখন পুঁই ডাঁটার চারা পোঁতে কখনো? বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে ম'রে যাবে?

ক্ষেন্তি বলিল — কেন, আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন — দেখ, হয়তো বেঁচে যেতেও পারে। আজকাল রাতে খুব শিশির হয়।

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন, তাঁহার দুই ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে। .... একটা ভাঙা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখুয্যে বাড়ী হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বলিলেন — হ্যাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায়ে দিতে তোর কি হয়? দেখ দিকি, এই শীত?

— আচ্ছা দিচ্ছি বাবা - কই শীত, তেমন তো....

— হ্যাঁ, দে মা, এক্ষুনি দে — অসুখ-বিসুখ পাঁচ রকম হতে পারে বুঝলি নে?

— সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখে ভালো করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এমন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে?...

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিত রূপ। বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জ্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেন। ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিফু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুন জামাটি তাহার গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি রাখিতেন না। জামার বর্ত্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না — ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙ্গা টিনের তোরঙ্গের মধ্যেই উহা থাকিত।

পৌষ সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতে ছিলেন —একটা ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনীর নীচে একটা কলার পাত পাড়িয়া এক থাল নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে, বনে-বাদাড়ে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড়চোপড় শাস্ত্রসম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্ত্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে রাধী হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল — মা, ঐ একটু....

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু রাধীর প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজমেয়ে পুঁটি অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া মার সামনে পাতিয়া বলিল — মা, আময় একটু ...

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন — দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি ঐ নারকেল মালাটা, ওতে তোর জন্য একটু রাখি। ক্ষেন্তি ক্ষিপ্র হস্তে নারিকেলের উপরের মালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশি করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজমেয়ে পুঁটি বলিল — জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরী করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল — এ-বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ও-বেলা ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও-পাড়ার তিনুর বাবাকে। ও-বেলা তো পায়েস, ঝোল-পুলি, মুগতক্তি এইসব হয়েছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল — হ্যাঁ মা, ক্ষীর নৈলে নাকি পাটিসাপটা হয় না? খেঁদী বলছিল, ক্ষীরের পূর না হলে কি আর পাটিসাপটা হয়? আমি বললাম কেন, আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাঁই দিয়েই করে, সে তো কেমন লাগে।

অন্নপূর্ণা বেগুণের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল — খেঁদীর ওই সব কথা। খেঁদীর মা তো ভারী পিঠে করে কিনা! ক্ষীরের পূর দিয়ে ঘিরে ভাজলেই কি আর পিঠে হলো? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ী দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়ীমা দু'খানা পাটিসাপটা খেতে দিলে, ওমা কেমন একটা ধরা-ধরা গন্ধ....আর পিঠেতে কখনো কোনো গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপটায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়।

বেপরোয়া ভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মার চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল — মা, নারকেলের কোরা একটু নেব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন — নে, কিন্তু এখানে ব'সে খাস নে। মুখ থেকে পড়বে না কি হবে, যা ঐদিকে যা।

ক্ষেন্তি নারকেলের মালায় এক থারা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণ স্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন — ওরে, তোরা সব এক এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি, গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি, জল-দেওয়া ভাত আছে ও-বেলার, বার করে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণা এ প্রস্তাব যে মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল — মা, বড়দি পিঠেই খাক। ভালোবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব।

খানকয়েক খাইবার পরেই মেজো মেয়ে পুঁটি খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্টি খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে। সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো-উনিশখানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন — ক্ষেন্তি, আর নিবি? ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্তবাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসিভরা চোখে মার দিকে চাহিয়া বলিল — বেশ খেতে হয়েছে মা। ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়া নাও, ওতেই কিন্তু.....। সে পুনরায় খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তী, চুলী তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন — ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজ কর্ম্মে বকো, মারে, গলা দাও, টু শব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি...

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশি কোনোমতেই হইবে না। তবুও প্রথমে এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়ী, সিলেট চুন ও ইটের ব্যবসায়ে দু'পয়সা নাকি করিয়াছে — এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘটনা কিনা!

জামাইয়ের বয়স একটু বেশি, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাচ্ছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয় এই জন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন — চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ীর বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পাল্কী একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রং-এর মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর আঁচলখানা পাল্কীর বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।.... তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ এবং একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?...

যাইবার সময়ে ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল — মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো... বাবাকে পাঠিয়ে দিও .... দু'টো মাস তো....

ও-পাড়ার ঠানদিদি বলিলেন — তোর বাবা তোর বাড়ী যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক — তবে তো...

ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমি সুরে বলিল — না, যাবে না বৈ কি!... দেখো তো কেমন না যান্।....

ফাল্গুন-চৈত্র মাসের বৈকালবেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ত্ব তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু হু করিত .... তাঁর অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়ীতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে — মা, বলব একটা কথা? ঐ কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি ....

এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন —ও তুমি ধ'রে রাখ, ও রকম হবেই দাদা। আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভাল কি আর জুটবে?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি করিবার জন্য ময়দা চটকাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন — নাঃ, সব তো আর ... তা ছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব। ... তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি?

সহায়হরি হুঁ কাটায় পাঁচ-ছ'টি টান দিয়া কাসিতে কাসিতে বলিলেন — বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপারে কি দাঁড়াল বুঝলে? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে, ও টাকা আগে দাও, তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

— একেবারে চামার.....

—তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। পূজোর তত্ত্ব কম ক'রেও ত্রিশটে টাকার কম হবে না ভেবে দেখলাম কিনা? মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে.... ছোট লোকের মেয়ের মতন চাল, হাভাতে ঘরের মত খায়... আরও কত কি। পৌষ মাসে দেখতে গেলাম, মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে?...

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে মিনিট কতক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দু'জনের কোনো কথা শুনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন — তারপর?

আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে অবস্থা করেছে। শাশুড়ীটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনেশুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এ রকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষ মাসের দিনে মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে। পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন — বলি আমরা ছোটলোক কি বড়লোক, তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকি নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুয্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে — আজই না হয় আমি....। প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কস্বরে হা হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন।

বিষ্ণু সরকার সমর্থনসূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বারকতক ঘাড় নাড়িলেন।

— তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হলো। এমন চামার — বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পূজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল — তারই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে....

— দেখতে পাওনি?

— নাঃ! এমনি চামার — গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে। ...যাক, তা চল যাওয়া যাক, বেলা গেল।.... চার কি ঠিক করলে? .... পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধে হবে না।....

তারপর কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্ব্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনও জ্ঞানে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরুচাক্‌লি পিঠের জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারী করিতেছেন। পুঁটি ও রাধী উনুনের পাশে বসিয়া আগুণ পোহাইতেছে।

রাধী বলিতেছে — আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন ক'রে ফেললে কেন' পুঁটি বলিল — আচ্ছা মা, ওতে একটু নুন দিলে হয় না?

— ওমা দেখ মা, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলছে, এক্ষুনি ধরে উঠবে....

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন — স'রে এসে বোস মা, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না? এই দিকে আয়।

গোলা তৈয়ারী হইয়া গেল .... খোলা আগুণে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন... দেখিতে দেখিতে মিঠে আঁচে পিঠে টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল।.....

পুঁটি বলিল — মা, দাও, প্রথম পিঠেখানা কানাচে ষাঁড়া ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন — একা যাস নে, রাধীকে নিয়ে যা।

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ীর পিছনে ষাঁড়া-গাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচা লতার থোলো থোলো সদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে।....

পুঁটি ও রাধী খিড়কী দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস্ খস্ শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটি পিঠেখানা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জ্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কী-দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।....

পুঁটি ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন — দিলি?

পুঁটি বলিল — হ্যাঁ মা, তুমি আর বছর যেখান থেকে নেবুর চালা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম...

তারপর সে রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ... রাতও তখন খুব বেশি। .... জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ীর পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠঠোকরা পাখী ঠক্-র্-র্-র্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে ... দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্ক ভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল — দিদি বড় ভালোবাসত.....

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপন-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল.... সেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে ... বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সম ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে ... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্দ্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।

৬৪.৫ সারাংশ

‘পুঁইমাচা’ অত্যন্ত সাদামাটাভাবে লেখা একটি গল্প — যা বিভূতিভূষণের একান্ত নিজস্ব স্টাইল বা শৈলী। এই কাহিনির বিষয়বস্তু খুব ব্যাপক কিছু নয়। দরিদ্র গ্রাম্য গৃহস্থ পরিবারের খাদ্যলোভী এক কিশোরীর জীবনের কয়েকটি টুকরো টুকরো ছবি আর বিয়ের পরে তার অকাল বিয়োগের করুণ স্মৃতিচারণা — এই হল গল্পের বিষয়বস্তু। গরিব গৃহস্থ সহায়হরি চাটুয্যে এবং অন্নপূর্ণার তিন মেয়ের মধ্যে ক্ষেন্তিই বড়। সারাদিন এথা-ওথা ঘুরে বেড়ায়, খাবারদাবার কী পাওয়া যায় তারই খোঁজে। পনেরো বছর বয়স হলেও (সেকালীন বাঙালি গ্রাম্য সমাজের প্রথাকে বজায় না রেখে) এখনও তার বিয়ে হয়নি। সম্বন্ধ হয়ে, আশীর্বাদ হবার পর একটা বিয়ে ভেঙে গেছে পাত্রের চরিত্রদোষের খবর আসায়। এ নিয়ে গাঁয়ে ঘোঁট পাকায় কর্মহীন, ছিদ্রান্বেষী মাতব্বরেরা। পিতা এবং কন্যা এতে নির্বিকার থাকলেও মায়ের দুশ্চিন্তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলে।

গল্পের শুরু হয়েছে, সহায়হরি প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে গাছকাটা-খেজুর রস সংগ্রহের জন্য উৎসাহ সহকারে যাবার উদ্যোগ করার জন্য স্ত্রীর কাছে ভর্ৎসিত হবার পটভূমিকায়। ঠিক সেই সময়েই ক্ষেন্তির আবির্ভাব আরেক প্রতিবেশী বাগানের জঞ্জাল হিসেবে ফেলে দেওয়া একরাশ পাকা পুঁইডাটা এবং ধার করে চেয়ে আনা একমুঠো কুচো চিংড়ি নিয়ে, সঙ্গে ছোট চোনা পুঁটি। ক্রুদ্ধা মায়ের তিরস্কারে দুই কন্যা খিড়কির পুকুরের ধারে পুঁইডাটার বোঝা ফেলে দিয়ে এলে, সমস্যাটা তখনকার মতো মিটল।

অন্নপূর্ণা মেয়েকে যতই তিরস্কার করুন, হাজার হোক মাতৃহৃদয় — দুপুরবেলায় সবার অগোচরে ‘পাঁদাড়ে-ফেলা’ ঐ পুঁইশাকেরই খানিকটা আবার উদ্ধার করে এনে, রান্না করে যথা সময়ে স্বামী-কন্যার পাতে সেই চচ্চড়ি

পরিবেশন করলে ক্ষেন্তির মুখে হাসি ফুটে ওঠে।... এইভাবেই দুঃখের ভাত সুখ করে খেয়ে দিন কাটে চাটুয্যে পরিবারের। কখনো বাবাতে-মেয়েতে লুকিয়ে অন্যের পোড়ো বাগানের জংলা জমির তলা থেকে বিশসেরী মেটে আলু তুলে এনে অন্নপূর্ণার কাছে ভর্ৎসিত হয়। কখনো বা, পৌষ-পার্বনের দিনে, দুঃখের সংসারে হাসি ফোটে পিঠে, পাটিসাপ্‌টা তৈরি হলে। এরই মধ্যে ভাঙা পাঁচিলের ধারে ফেলে দেওয়া সেই পুঁইশাকের ডাঁটা থেকে একটি শীর্ণ পুঁইচারা জন্মালে তিন মেয়ের আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

পরের বৈশাখে ক্ষেন্তির পাত্র জোটে। তার বর বছর চল্লিশ বয়সের দোজবরে হলেও পাত্র হিসেবে পাঁচজনের বিচারে ভাল বলেই গণ্য হয়, ''ব্যবসায়ে দু'পয়সা নাকি'' করেছে সে। কিন্তু বরপণের আড়াইশো টাকা বকেয়া পড়ে থাকায় ক্ষেন্তির সমাদর মেলেনি শ্বশুরবাড়িতে, বাপের বাড়িতেও তার আসা হয়নি আর। সহায়হরি মেয়েকে দেখতে গিয়ে কুটুমবাড়িতে অসম্মানিতও হন তাঁর দারিদ্র্যের কারণে।

বছরখানেকের মধ্যেই বসন্তরোগে ক্ষেন্তির জীবনাবসান ঘটল। নির্মম শ্বশুরকুলের লোকেরা তার দূর সম্পর্কের এক পিসির বাড়িতে রোগাক্রান্ত অসহায় মেয়েটাকে ফেলে রেখে যায়, সহায়হরিকে কোনও খবর-টবর না দিয়েই। গায়ের সোনা গয়নাগুলোও খুলে রেখে দেয় ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

আবার ঘুরে আসে পৌষপার্বণের তিথি। বড় মেয়ের বিয়োগব্যথা বুকে জমিয়ে রেখেই অন্নপূর্ণা এবারও পিঠে গড়তে বসেন দুই মেয়েকে নিয়ে। তিনজনেরই মন হু-হু করে ক্ষেন্তির কথা ভেবে। তারপর উঠোনের এক কোণে নজর গিয়ে পড়ে, যেখানে ক্ষেন্তির হাতে পোঁতা সেই পুঁইচারাটি এতদিনে মাচা জুড়ে বেড়ে উঠেছে... ''বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশিরে'' পরিপুষ্ট হয়ে, মাচা থেকে ঝুলে পড়ে কচি সবুজ পুঁই ডগাগুলি দুলছে, ''সুপুষ্ট, নধর প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর' হয়ে। সেটি শুধু ক্ষেন্তির স্মৃতির সংকেতবাহী নয়, যেন তারই প্রতিরূপ হয়ে উদ্‌ভাসিত হয়েছে।

৬৪.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

॥ ১ ॥

'পুঁইমাচা' গল্পের ক্ষেন্তির মধ্যে অনেক সমালোচকই 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের দুর্গার প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছেন। এখালে বলা ভালো যে, 'পথের পাঁচালী' প্রথমে যখন লেখা হয়, তখন দুর্গার চরিত্র সেখানে ছিল না। আকস্মিকভাবে দুর্গার মতন একটি কিশোরী মেয়েকে প্রত্যক্ষ করে, বিভূতিভূষণ তাকেই দুর্গার প্রত্নপ্রতিমা (বা আর্কিটাইপ; কোনও সৃস্টির প্রথম কাঠামো) হিসেবে গ্রহণ করে চরিত্রটিকে গড়ে তোলেন। ক্ষেন্তি এবং দুর্গা উভয়েই ঠিক একই রকমের অভাবী গৃহস্থ পরিবারের ছন্নছাড়া, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো ধরনের মেয়ে। খাদ্যে তাদের আসক্তি অপরিমিত; স্বভাবটি নম্র মায়ের স্নেহ, শাসনকে তারা মান্য করে এবং অল্প বয়সেই জীবনাবসান ঘটে। প্রকৃতির পরিবেশের সঙ্গে দুর্গার মতোই ক্ষেন্তিও ওতপ্রোতভাবেই যেন জড়িয়ে থাকে। ১৩৩১ সালের মাঘ মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'পুঁইমাচা' প্রকাশিত হয়; এর কিছু দিন আগে থেকে 'পথের পাঁচালী' লেখা শুরু করেন বিভূতিভূষণ। পরবর্তী সময়ে দুর্গর চরিত্রটি 'পথের পাঁচালী'তে সন্নিবিষ্ট করার আগে, 'পুঁইমাচা' গল্পের মধ্যে তার একটা পূর্ব-প্রতিভাস ক্ষেন্তির চরিত্রে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, এমন সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে না।

গ্রামের মানুষ এবং তাঁদের নিত্যদিনের শোক সুখ, অভাব-আনন্দ, হীনতা - মহত্ত্ব — বিভূতিভূষণের লেখার এই হল অন্যতম প্রধান উপজীব্য। 'পুঁইমাচা'-ও এই সীমানারই অন্তর্বর্তী। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটি নিবিড় — নৈকট্যও তাঁর উপন্যাস এবং গল্পের আরেকটি বিশিষ্ট উপকরণ। 'পুঁইমাচা'-য় সেটিও প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু 'পুঁইমাচা' গল্পের একটা অনন্যতা রয়েছে — যা ঐ প্রকৃতি তন্ময়তার মধ্যেও ভিন্নতর এক মাত্রাবিন্যাস করেছে। গল্পের শেষে যে বর্ণনা দিয়েছেন বিভূতিভূষণ ঐ পুঁইমাচাটির — সেটি এখানে স্মরণযোগ্য ঃ ''সেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে...বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে ... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্দ্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর। '' এরই পাশাপাশি গ্রাম্য সমাজের ছবিটাও নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে 'পুঁইমাচা' গল্পে। ক্ষেন্তির বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙে যাবার পরিপ্রেক্ষিতে স্বার্থান্বেষী এবং কুচক্রী 'গাঁওবুড়ো'-দের নিখুঁতভাবেই তুলে ধরেছেন বিভূতিভূষণ। অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্নতা, অশিক্ষা এবং কূপমণ্ডুকতা — এই তিনে মিলে প্রায় 'ত্র্যহস্পর্শ' যোগ ঘটেছে সেখানে। ক্ষেন্তির বিয়ের আশীর্বাদ হবার পরেও পাত্রের দুশ্চরিত্রতার খবর পেয়ে সহায়হরি যে, আর এগোলেন না ঐ সম্বন্ধের সূত্রে — এতে কিন্তু আবার তার ব্যক্তিত্বেরও একটা হদিশ মেলে, মূল্যবোধেরও। এর ফলে গ্রাম্য মোড়লদের বৈঠকে তাঁকে তিরস্কৃতও হতে হয়, যদিও তার পিছনে ছিল কালীময় মজুমদার প্রমুখের ব্যক্তিগত কিছু স্বার্থহানি হবার কারণজাত আক্রোশই (ঐ লম্পট পাত্রটির বাবার কাছে তিনি ঋণ করে রেখেছিলেন, ক্ষেন্তির সঙ্গে সে-হেন অপাত্রের বিয়ের ব্যবস্থা করে, তিনি কিছুটা সুবিধে পেতেই সচেষ্ট ছিলেন, এই আর কি!) আবার এই গ্রাম্য সমাজেই দীনদরিদ্র গয়া বুড়ির মতো নারীকেও দেখা যায়, যিনি কোনও দিন দাম শোধ হবে না জেনেও ছেলেমানুষ ক্ষেন্তিকে এক মুঠো কুচো চিংড়ি দেন তার তরিবৎ করে পুঁইশাক খাওয়ার সাধ মেটাতে। পাড়াপড়শির মধ্যে ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব বিবাদ যাইই থাক — একজনের সুখে-দুঃখে আরেকজন পাশে এসে দাঁড়ায়ও সর্বদা। এই সমাজকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন বলেই বিভূতিভূষণ এমনভাবে তার চিত্রায়ণ করতে সমর্থ হয়েছেন, শুধু এই গল্পেই নয়, তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মেই।

প্রধান চরিত্র তিনটির মধ্যে সহায়হরি এবং অন্নাপূর্ণার মানসিক প্রবণতার কিছুটা পরিচয় উপরের আলোচনা থেকে পাওয়া গেছে। সহায়হরি দরিদ্র, কিন্তু আত্মসম্মানহীন নন। লুকিয়ে পরের বাগান থেকে মেটে আলু চুরি করতে কিংবা স্বচ্ছল প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে খেজুর রস চেয়ে আনতে যেমন তিনি কুণ্ঠাহীন, ঠিক তেমনই আবার পিতৃস্নেহে এবং চরিত্রগত মূল্যবোধের জন্য তিনি শ্রদ্ধার্হ। ক্ষেন্তির প্রথম সম্বন্ধটি ভেঙে দেবার ক্ষেত্রে তাঁর এই দুটি প্রবণতাই একত্রে মিলে গিয়ে ঐ সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যেও মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিতে ক্ষমতা জুগিয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গত তিরস্কারের সামনে আমতা-আমতা করলেও, সমাজপতিদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করার মতো মনোবল তাঁর ছিল। আবার দারিদ্র্যের কারণে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে অপমানিত হলেও কোনও প্রতিবাদের ভাষা তাঁর মুখে জোগায় না। জামাইবাড়ির লোকেদের হৃদয়হীনতা ও স্বার্থপরতায় আদরিণী কন্যার মৃত্যু ঘটলে তিনি মর্মান্তিক বেদনা পান ঠিকই, কিন্তু তার অল্পদিন পরেই আবার বন্ধুর সঙ্গে মাছ ধরতে যাবার তোড়জোড়ও করতে দেখা যায় সহায়হরিকে। আসলে এই মানুষটি নানা ধরনের বৈপরীত্যের সমাহারে তৈরি। তাই এঁকে পছন্দ বা অপছন্দ কিছুই করা যায় না। আবার পার্শ্বচরিত্র হিসেবে তাঁকে উপেক্ষা করাও অসম্ভব। নীতিবোধ কখনো দুর্বল; কখনো প্রবল; কোনো সময়ে ব্যক্তিত্বহীনতায় গ্রস্ত, কখনো বা ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বলপ্রভ; কখনো দুঃখে-আনন্দে সচকিত — কখনো নিরাসক্ত, নির্বেদনে স্বস্থ। ফলত, এইসব বহুমাত্রিক বৈপরীত্য তাঁর চরিত্রটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

অন্নপূর্ণা চরিত্রটি পক্ষান্তরে একমাত্রিক। শুধু ক্ষেন্তিই দুর্গার পূর্বপ্রতিমা (বা, আর্কিটাইপ) নয়, অন্নপূর্ণাকেও সর্বজয়ার প্রতিকল্প বলে স্বচ্ছন্দেই মনে করা যায়। দরিদ্রের সংসারে যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সেখানে পাঁচটি প্রাণীর উদরান্নের জোগাড় করা যে কী দুঃসাধ্য দায়িত্ব তা হয়ত শুধু তিনিই জানেন। দারিদ্র্যের কারণে স্বামী-কন্যার ঐ খাদ্যলোলুপ স্বভাবের প্রতি তিনি বিরক্ত। অথচ মাতৃস্নেহের স্বাভাবিক অনুভবও তাঁর চরিত্রের মধ্যে সুনিবিড়। পরের বাগানের 'ফেলে দেওয়া জঞ্জাল' কুড়িয়ে আনার জন্য কিংবা মেটে আলু চুরি করার জন্য তিনি যেমন ক্রুদ্ধ হন, তেমনই আবার রাগ করে ফেলে দেওয়া পুঁই ডাঁটারই চচ্চড়ি রেঁধে লোভাতুর কন্যার পাতে তুলে দিয়ে তিনি তৃপ্তি পান। মেয়ের স্বভাবের মধ্যে ঐ খাদ্যলোলুপতাটুকু ছাড়া আর কোনো বিচ্যুতিই যে নেই, তা আর তাঁর চেয়ে বেশি কে বোঝে— ''ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজে-কর্মে বকো, মারো, গাল দাও টুঁ শব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথাটি কখনো কেউ শোনেনি''। ঠিক এই কারণেই শঙ্কিতবক্ষে তিনি মেয়ে শ্বশুরঘর করতে পাঠাবার সময়ে ভেবেছেন ''ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?''

পরের বছরের পৌষ-পার্বনের দিনে সন্ধ্যার পরে ছোট দুই কন্যাকে নিয়ে পিঠে গড়তে বসে তাই তাঁর চিন্তার মধ্যে সর্বব্যাপ্ত হয়ে ওঠে মৃতা জ্যেষ্ঠা দুহিতার বেদনাময় স্মৃতি। তার নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটির মাচাভরা বিস্তৃতি দেখে যেন সেই তৃণগুল্মের সতেজ, সবুজ ভাবটুকুর মধ্যেই প্রয়াতা কন্যার কৈশোর-লাবণ্যকে অনুভব করেন অন্নপূর্ণা। সেই খাদ্যলোলুপ, শান্ত স্বভাবের, ভীরু, অগোছালো কন্যাটির বিয়োগের পরেও যেন তিনি তাকে, তার স্মৃতিমেদুর অলক্ষ্য অস্তিত্বকে খুঁজে পান সেখানে। বাস্তবে-কল্পনায় এভাবে মেশামিশি হবে তাঁর স্নেহকরুণ মাতৃহৃদয় উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে।

ক্ষেন্তির চরিত্রটি অবশ্যই অভিনব নয়। বারংবার দুর্গার কথা তার প্রসঙ্গে মনে পড়বেই। তার খাদ্যলোভ স্বভাবগত ঠিকই, কিন্তু মূল উৎসটা দারিদ্র্যই। ঠিক একই কথা 'পথের পাঁচালী'-র মধ্যে অনেকবারই বলেছেন বিভূতিভূষণ — এখানেও সেটি নানান ব্যঞ্জনায় তিনি ব্যক্ত করেছেন। তাই ক্ষেন্তির এই দোষটি তাকে সামান্য মেটে আলুর মতো তুচ্ছ বস্তু চুরি করতেও প্ররোচনা দিয়েছে। (অবশ্য সেই অপকর্মে সে ছিল তার বাবার সহকারিনী মাত্র!) ক্ষেন্তির শান্ত, অগোছালো, লাজুক এবং ভীরু স্বভাবটির মধ্যেই লুকিয়ে ছিল তার ট্র্যাজেডির রন্ধ্রপথ। বরপণ ইত্যাদি সব সামাজিক অনাচার, অপহ্নব সেই ট্র্যাজেডির উৎস হলেও, নিজের স্নিগ্ধ স্বভাবটির জন্যই সে প্রতিবাদ করতে শেখেনি এবং শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার, অবিচারের শিকার হয়েছে তার ফলে। খাদ্যলোলুপতা ক্ষেন্তির জীবনের একমাত্র ত্রুটি, কিন্তু সেটাও বিভূতিভূষণের লেখার গুণে ক্ষমার যোগ্য হয়ে উঠেছে। ফলে, সরল এবং শান্ত এই গ্রাম্য কিশোরীটিও বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমার মতোই পণপ্রথার শিকার হয়ে উঠেছে।

'পুঁইমাচা' গল্পের মধ্যে কাহিনীগত বৈশিষ্ট্য সেভাবে কিছু অবশ্য নেই। দারিদ্র্য এবং সামাজিক ও পারিবারিক অবিচার নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অজস্র গল্প রচিত হয়েছে। এই গল্পের উল্লেখযোগ্যতা অন্যত্র। প্রকৃতি ও মানুষে নিবিড় একটি সম্পর্ক বিভূতিভূষণের লেখায় বহু-বহুবারই দেখতে পেয়েছি আমরা। কিন্তু কাহিনীর পরিণামে সতেজ, লাবণ্যময় পুঁই মাচাটির বাস্তব অস্তিত্বের সঙ্গে কিশোরী ক্ষেন্তির স্মৃতিময় রূপটি মিশে একাকার হয়ে গিয়ে যে বিচিত্র রসানুভূতির সঞ্জনন ঘটেছে, তা কিন্তু বাস্তবিকই তুলনাবিরল। এই স্বতন্ত্র অনুভবের কারণেই এই গল্প এত সাধারণভাবে শুরু এবং বিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও, পরিণামে এমন শিল্পঋদ্ধি অর্জন করেছে। 'পুঁইমাচা' নামটির অন্তর্গূঢ় তাৎপর্যও সেখানেই নির্হিত।

৬৪.৭ অনুশীলনী

☐ বিস্তৃত আলোচনামূলক ☐

১) ‘পুঁইমাচ’ গল্পটি নামকরণ কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করে দেখান।

২) ক্ষেন্তি এবং অন্নপূর্ণা, যথাক্রমে দুর্গা এবং সর্বজয়ার পূর্বপ্রতিমা কিনা আলোচনা করুন।

৩) ‘‘মানুস এবং প্রকৃতি বিভূতিভূষণের লেখায় খুব ঘনিষ্ঠ এক তন্ময়-সম্পর্কে নিবিড় হয়ে থাকে; কিন্তু ‘পুঁইমাচা’ গল্পে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যেমন মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।’’ — এই মন্তব্যের যাথার্থ্য আলোচনা করুন।

৪) বাংলার পল্লীসমাজের কুচক্রী পটভূমি একদিকে, অন্যদিকে সহজ সরল প্রতিবেশী বৎসল প্রেক্ষিত — এ-দুটিই এ-গল্পে কেমন করে সহাবস্থান করেছে আলোচনা করুন।

৫) ‘‘ক্ষেন্তি এবং অন্নপূর্ণা বিভূতিভূষণের লেখায় টাইপ-চরিত্র হলেও, সহায়হরি কিন্তু তা নন।’’ — একথা কতদূর মান্য আলোচনা করুন।

৬) এই কাহিনী ট্র্যাজেডি হলেও — এর মধ্যে একটি সমাহিতভাব অনুভূব হয় কী ভাবে, আলোচনা করুন।

☐ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক ☐

১) ক্ষেন্তির প্রথমবারে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছিল কী কারণে?

২) ফেলে দেবার পরেও অন্নপূর্ণা পুঁইডাটা তুলে এনে চচ্চড়ি রেঁধেছিলেন কেন?

৩) মেটে আলু তুলে আনা নিয়ে সহায়হরি এবং অন্নপূর্ণার মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছিল?

৪) পৌষ-সংক্রান্তির সন্ধ্যায় চাটুয্যেবাড়িতে পাটিসাপটা তৈরি করা নিয়ে যে কথাবার্তা হয়, তার তাৎপর্য কী?

৫) ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ে অন্নপূর্ণা কেন চিন্তিত হয়েছিলেন?

৬) পুঁইমাচাটি অন্নপূর্ণা এবং তাঁর ছোট দুই মেয়ের কাছে কীভাবে প্রতিভাত হয়েছিল?

☐ সুনির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক ☐

১) সহায়হরি কার কাছে থেকে রস আনতে যেতে চাইছিলেন?

২) ক্ষেন্তিকে পুঁই ডাঁটা কে দিয়েছিলেন?

৩) ক্ষেন্তি কার কাছ থেকে চিংড়ি মাছ পেয়েছিল?

৪) কার ‘‘বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়’’?

৫) কোন্ গাঁয়ের কার ছেলের সঙ্গে ক্ষেন্তির বিয়ের সম্বন্ধ হয়েও ভেঙে গিয়েছিল?

৬) মুখুজ্জে বাড়ির ছোট খুকীর নাম কী?

৭) মেটে আলু কোথায় পোঁতা ছিল?

৮) চৌকিদারের নাম কী?

৯) ক্ষেন্তির জামা কত টাকায় কেনা হয়েছিল?

১০) ক্ষেন্তির বর কিসের ব্যবসা করতেন?

১১) সহায়হরির ‘‘বিখ্যাত’ পূর্বপুরুষের নাম কী?

১২) ক্ষেন্তির বরপণ কত বাকি ছিল?

১৩) সহায়হরি কার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবার উদ্যোগ করছিলেন?

১৪) ক্ষেন্তির মৃত্যু কোথায় হয়েছিল?

১৫) ‘ষাঁড়া ষষ্ঠী’ কোথায় অধিষ্ঠান করেন?

১৬) পুঁটি ও রাধী কোথায় পিঠে ছুঁড়ে দিয়েছিল?

১৭) ষাঁড়া ষষ্ঠীর উদ্দেশে পিঠে ফেলার সময় কে পালিয়ে গিয়েছিল?

১৮) পৌসপার্বণের রাত্রে কোন্ পাখি ডাকছিল?

৬৪.৮ উত্তরমালা

বিস্তৃত আলোচনামূলক

১) প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্পের শেষ অনুচ্ছেদ অনুসরণে উত্তর করুন।

২) প্রাসঙ্গিক আলোচনা ইত্যাদির (৬৪.৬) প্রথম অনুচ্ছেদ ভালো করে পড়ে উত্তর করুন।

৩) প্রস্তাবনা এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার শেষাংশ বার বার পড়ে উত্তর তৈরী করুন।

৪) গল্পটি ভালো করে পড়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণের সাহায্যে উত্তর দিন।

৫) ট্রাজেডির সংজ্ঞা ও ভাব-রস বিশ্লেষণ করে আলোচ্য গল্পের রসপরিণতি প্রাসঙ্গিক আলোচনা অবলম্বনে বুঝিয়ে দিয়ে উত্তর লিখুন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক

১) শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলের সঙ্গে ক্ষেন্তির বিয়ের প্রথম সম্বন্ধ হয়েছিল। ক্ষেন্তির বাবা টের পান পাত্রটি স্বগ্রামে কি একটা করবার ফলে জনৈক কুম্ভকার বধুর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহারে শয্যাগত ছিল। এরকর পাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে সম্মত ছিলেন না বলে সহায়হরি সম্বন্ধ ভেঙে দেন।

২) ক্ষেন্তির আনা পুঁই-ডাটা ফেলে দেবার পর অন্নপূর্ণার রাঁধতে রাঁধতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি মনে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এও মনে পড়ে যে অরন্ধনের পূর্বদিন পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করে

বলেছিল— ''মা, অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্দ্ধেক সব মিলে তোমাদের।'' তিনি নিজেই স্নেহের টানে উঠান ও খিড়কী থেকে ডাঁটা কুড়িয়ে এনে কুঁচো চিংড়ি দিয়ে চুপি চুপি তরকারি রেঁধেছিলেন।

৩) সহায়হরি পনেরো-যোল সের ভারী মেটে আলু ঘাড়ে করে নিয়ে এসে, স্ত্রীকে দেখে কৈফিয়ত হিসেবে বলেন, ময়শা চৌকিদার তাঁকে দিয়েছে। অন্নপূর্ণা বরোজপোতার বন থেকে চুরি করে আনার অভিযোগ করেন। সহায়হরি অস্বীকার করতে সচেষ্ট দেখে, তিনি অনুযোগ করে বলেন যে তার ইহকাল-পরকাল তো গেছেই, চুরি-ডাকাতি করতে ইচ্ছে হয় করুন। কিন্তু মেয়েকে সঙ্গে নেওয়া কেন।

৪) পৌষ-সংক্রান্তির দিন পাটি-সাপটা তৈরী করার যে বর্ণনা আছে, তার বর্ণনা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করুন।

৫) ক্ষেন্তির শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় অন্নপূর্ণা অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ এবং অধিকমাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাবার সময় তার বুক উদ্বেল হয়ে উঠেছিল এই ভেবে যে ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিকমত বুঝবে।

৬) পৌষ সংক্রান্তির জ্যোৎস্না আলোকিত রাতে অন্নপূর্ণা ও তাঁর দুই মেয়ের পিঠে গড়া প্রায় শেষ। দুই মেয়ের খাওয়ার জন্য যখন তিনি কলার পাতা ছিঁড়ছেন, পুঁটি তখন অন্যমনস্ক ভাবে হঠাৎ বলে ওঠে — ''দিদি বড় ভাল বাসত।'' এরপর তিনজনই কেমন যেন আচ্চৰন হয়ে পড়ে। লোভী মেয়েটির স্মৃতি তাদের আচ্ছন্ন করে নজর পড়ে ক্ষেন্তির হাতে সাধের পুঁই গাছটি — মাচাটি জুড়ে রয়েছে গাছটি — সে যেন পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় জড়িয়ে রয়েছে। সে বেড়ে উঠেছে — বর্ষার জল আর কার্তিক মাসের শিশিরে। তার কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে ধরেনি। মাচার বাইরে দুলছে, সুপুষ্ট নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।

সুনির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক

প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন। মূলপাঠ ভাল করে পরে একটি বাক্য উত্তর করুন।

৬৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্য — *শ্রেষ্ঠ গল্প*

২) ড. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী — *বিভূতিভূষণ ঃ মন ও শিল্প*

৩) ড. বীরেন্দ্র দত্ত — *বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*

৪) ড. ভূদের চৌধুরী — *বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার*

৫) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — *বাংলা গল্প বিচিত্রা*

৬) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — *সাহিত্য ও সাহিত্যিক*

একক ৬৫ ❑ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তারিণী মাঝি

গঠন

৬৫.১ উদ্দেশ্য

৬৫.২ প্রস্তাবনা

৬৫.৩ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

৬৫.৪ মূলপাঠ ঃ তারিণী মাঝি

৬৫.৫ সারাংশ

৬৫.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

৬৫.৭ অনুশীলনী

৬৫.৮ উত্তরমালা

৬৫.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৬৫.১ উদ্দেশ্য

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমকালীন কথা সাহিত্যের ইতিহাসে একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি গল্প ও উপনযাস দুটি ধারারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। 'কল্লোল' পত্রিকায় ছোট গল্প লিখেই তাঁর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে তিনি বাংলা উপন্যাসে গ্রাম বাংলাকে নিয়ে রচিত এপিকধর্মী উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। তথাপি রাঢ়ের গ্রামীণ প্রতিবেশে রচিত ছোটগল্পগুলি শিল্প সৌন্দর্যের বিচারে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি রূপে গণ্য।

'তারিণী মাঝি' এমনই একটি গল্প। প্রসঙ্গে ও প্রকরণে তারাশংকরের এই গল্পটিকে অনেকটা আদিম মহাকাব্যধর্মী বলা যায়। এখানে তারিণী চরিত্রে যে আদিম জৈব-প্রবৃত্তির (elemental passion) পরিচয় পাওয়া যায়, তা মানুষের মৌলিক বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সহজাত উপাদান। এই প্রবৃত্তির হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই। অমোঘ নিয়তির অনিবার্য পরিণামের মত একে এড়িয়ে যাবার শক্তিও নেই। প্রেম আর আত্মরক্ষার দ্বন্দ্বে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি প্রেমনির্ভরতাকেও পরাভূত করে। এ গলেপর এটিই ট্রাজেডি।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গল্পটি পড়ে আপনি বুঝতে পারবেন —

১) 'তারিণী মাজি' চরিত্রপ্রধান গল্প।

২) গল্পটি বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদী তীরবর্তী রাঢ় অঞ্চলের পটভূমিকায় রচিত।

৩) ময়ূরাক্ষী নদী এই গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র তারিণী মাঝি ও তার স্ত্রী সুখীর সঙ্গে সমান গুরুব পেয়েছে। ময়ূরাক্ষীর জীবন্ত, দুর্দান্ত স্বভাবের বর্ণনা তাকে এখানে অনেকটা সজীব ও স্বতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৪) এই গল্পে দেখানো হয়েছে প্রেম ও প্রাণশক্তির মূলগত ভেদ আছে।

৫) গল্পটির আপনি লক্ষ করবেন মানুষের প্রেম ও প্রাণশক্তির দ্বন্দ্বে, প্রাণের দাবিই প্রধান। মানুষের আদিম অসংস্কৃত জৈব প্রবৃত্তিই একান্তভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এই বাঁচার তাগিদে অপরকে পাশবিকভাবে হত্যা করলেও সে পরাঙ্‌মুখ হয় না।

৬) গল্পটিতে আপনি বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদী-তীরবর্তী গ্রামাঞ্চলের বিশেষ ভাষা-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাবেন। গল্পের ভাষার নিরাসক্ত, নির্মম ও অমোঘ রূপের মধ্যে লেখকের ভাষা গঠনে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা একান্তভাবেই চরিত্রানুসারী।

৬৫.২ প্রস্তাবনা

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম সার্থক গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'কল্লোল' পত্রিকায়। 'তারিণী মাঝি' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প — প্রকাশ ১৩৩৫-এর পূজা সংখ্যা 'আনন্দবাজার'-এ। রচনাটি তারাশংকরের জীবন ভাবনা ও শিল্প কর্মের উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি বস্তুতঃ জীবনের স্বভাবধর্মকে বুঝতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাঢ়ের পরিচিত প্রতিবেশে লালিত নিরক্ষর, অমার্জিত, আদিম জৈব কামনা-বাসনা ভরপুর মানব মানবীকে আশ্রয় করেছেন। তাই তাঁর কাহিনিবৃত্ত নিটোল, বাহুল্য বর্জিত, পরিমিত ও সংযত; চরিত্রগুলি রাঢ়ের শুষ্ক রাঙামাটির মত অনেক সময় আদি অসংস্কৃত, জৈবপ্রকৃতির অনুসারী —ভালোমন্দের বিচার রহিত। গল্পকার তারাশংকরের এটি নিজস্ব ক্ষেত্র। বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে অভিনব ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

উপরোক্ত প্রেক্ষিতে জৈবিক তাড়না ও মানবিক বোধ এই দুয়ের দ্বন্দ্বে যে বিশাল জনসমাজকে তারাশংকর প্রত্যক্ষ করেছিলেন — তারই জীবন্ত প্রতিমূর্তি 'তারিণী মাঝি'।

গল্পটি পাঠ করার পর প্রাসঙ্গিক আলোচনার সাহায্যে আপনি গল্পের প্রকৃত মর্মবস্তু যথাযথ অনুধাবন করতে পারবেন।

৬৫.৩ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩.৭.১৮৯৮ — ১৪.৯.১৯৭১) জন্মেছিলেন বীরভূমের লাভপুরে গ্রামের একটি মধ্যবর্গীয় ভূস্বামী পরিবারে। তাঁর পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার, আয় ছিল সামান্যই। তিনি ছিলেন এই শ্রেণীর এক অন্তিম প্রতিনিধি।

গ্রামীণ পরিবেশে তারাশংকর তাঁর শৈশব-কৈশোরের পাঠ সাঙ্গ করে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই.এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেওয়ায় ১৯২১-এর তিনি অন্তরীণ হন। আবার ১৯৩০-এ সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়ায় কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে বেরিয়ে জীবিকার প্রয়োজনে কিছুদিন কয়লার ব্যবসা, পরে কানপুরে চাকরী নিয়ে যান। এ সব কাজে মন বসেনি। পরিশেষে সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে দেশসেবার ব্রত নেন। আমৃত্যু সাহিত্যই ছিল তাঁর অবলম্বন। দক্ষিণ পূর্ব বীরভূমের আঞ্চলিক প্রতিবেশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠা জীবন ছিল তাঁর সিদ্ধকাম সৃষ্টির প্রেরণা। তাই গ্রাম বাংলার বিশেষত রাঢ়ভূমির মানুষ এবং প্রকৃতি তাঁর লেখায় ব্যাপকভাবে স্থান অধিকার করে রেখেছে। সমাজ ও পরিবার —এই দুটি প্রেক্ষিতই তাঁর কাহিনীগুচ্ছের উপকরণ; কিন্তু মানুষের মনের অন্তর্গূঢ় আলোছায়াময় অসংখ্য স্তরকেও তিনি অন্বেষণ করে

কাহিনির ভাবরূপকে গড়ে তুলেছেন। নিজের সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেও সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি পৌঁছনোর সুযোগ তাঁর হয়েছিল।

ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার — দুই পরিচয়েই তিনি প্রথিতযশা। তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাসের সংখ্যা প্রচুর। উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', 'নাগিনীকন্যার কাহিনী', 'আরোগ্য নিকেতন', 'কবি', 'অভিযান', 'রাইকমল', 'রাধা', 'বিচারক', 'অরণ্যবহ্নি'— ইত্যাদির। আর তাঁর ছোটগল্পের মোট সংখ্যা ১৯০টি। এগুলির মধ্যে সুপরিচিত ও বহু-আলোচিত অনেক ক'টিই; যেমন ঃ 'রসকলি', 'মালা-চন্দন', 'জলসাঘর', 'বন্দিনী কমলা', 'রায়বাড়ি', 'নারী ও নাগিনী', 'বেদেনী', 'ডাইনী', 'অগ্রদানী', 'তারিণী মাঝি', 'না', 'জটায়ু', 'কালাপাহাড়', 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার',—ইত্যাদি। মোট ৩৫টি গ্রন্থে এগুলি বিধৃত আছে। 'রসকলি', 'জলসাঘর', 'শিলাসন', 'পৌষলক্ষ্মী', 'হারানো সুর', 'দীপার প্রেম' ইত্যাদি এদের মধ্যে উল্লেখ্য।

তারাশঙ্করের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে এক-অর্থে চলমান ইতিহাসের ছবি যেমন বিম্বিত হয়েছে, তেমনই আবার মানুষের মনের বহুবিচিত্র আকর্ষণ-বিকর্ষণও তার মধ্যে রূপান্বিত হয়েছে। ফলত, জীবনের প্রেক্ষাপট এবং অন্তর্লোক — দুইই তাঁর লেখার মধ্যে বিপুল প্রতীতি নিয়ে উপস্থিত আছে। এই বিশাল ব্যপ্তির জন্যই তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে অত্যন্ত উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে।

তারাশঙ্কর 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের জন্য 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিও দেওয়া হয়। তিনি বিধানসভার সদস্য, লোকসভার মনোনীত সদস্যও ছিলেন।

৬৫.৪ মূলপাঠ ঃ তারিণী মাঝি

তারিণী মাঝির অভ্যাস মাথা হেঁট করিয়া চলা। অস্বাভাবিক দীর্ঘ তারিণী ঘরের দরজায়, গাছের ডালে, সাধারণ চালাঘরে বহুবার মাথায় বহু ঘা খাইয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছে। কিন্তু নদীতে যখন সে খেয়া দেয়, তখন সে খাড়া সোজা। তালগাছের ডোঙার উপর দাঁড়াইয়া সুদীর্ঘ লগির খোঁচা মারিয়া যাত্রী-বোঝাই ডোঙাকে ওপার হইতে এপারে লইয়া আসিয়া সে থামে।

আষাঢ় মাস। অম্বুবাচী উপলক্ষে ফেরত যাত্রীর ভিড়ে ময়ূরাক্ষীর গণুটিয়ার ঘাটে যেন হাট বসিয়া গিয়াছিল। পথশ্রমকাতর যাত্রীদলের সকলেই আগে পার হইয়া যাইতে চায়।

তারিণী তামাক খাইতে খাইতে হাঁক মারিয়া উঠিল, আর লয় গো ঠাকরুণরা, আর লয়। গঙ্গাচান করে পুণ্যির বোঝায় ভারী হয়ে আইছ সব।

একজন বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, আর একটি নোক বাবা, এই ছেলেটি। ওদিক হইতে একজন ডাকিয়া উঠিল, ওলো ও সাবি, উঠে আয় লো, উঠে আয়। দোশমনের হাড়ের দাঁত মেলে আর হাসতে হবে না।

সাবি ওরফে সাবিত্রী তরুণী, সে তাহাদের পাশের গ্রামের কয়টি তরুণীর সহিত রহস্যালাপের কৌতুকে হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সে বলিল, তোরা যা, আসছে খেপে আমরা সব একসঙ্গে যাব।

তারিণী বলিয়া উঠিল, না বাপু, তুমি এই খেপেই চাপ। তোমরা সব একসঙ্গে চাপলে ডোঙা ডুববেই। মুখরা সাবি বলিয়া উঠিল, ডোবে তো তোর ওই বুড়িদের খেপেই ডুববে মাঝি। কেউ দশ বার, কেউ বিশ বার গঙ্গাচান করেছে ওরা। আমাদের সবে এই একবার।

তারিণী জোড়হাত করিয়া বলিল, আজ্ঞে মা, একবারেই যে আপনারা গাঙের ঢেউ মাথায় করে আইছেন সব। যাত্রীর দল কলরব করিয়া হাসিয়া উঠিল। মাঝি লগি হাতে ডোঙার মাথায় লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার সহকারী কালাচাঁদ পারের পয়সা সংগ্রহ করিতেছিল। সে হাঁকিয়া বলিল, পারের কড়ি ফাঁকি দাও নাই তো কেউ, দেখ, এখনও দেখ। — বলিয়া সে ডোঙাখানা ঠেলিয়া দিয়া ডোঙায় উঠিয়া পড়িল। লগির খোঁচা মারিয়া তারিণী বলিল, হরি হরি বল সব — হরিবোল। যাত্রীদল সমস্বরে হরিবোল দিয়া উঠিল — হরিবোল। দুই তীরের বনভূমিতে সে কলরোল প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছিল। নিম্নে খরস্রোতা ময়ূরাক্ষী নিম্নস্বরে ক্রুর হাস্য করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তারিণী এবার হাসিয়া বলিল, আমার নাম করলেও পার, আমিই তো পার করছি।

এক বৃদ্ধা বলিল, তা তো বটেই বাবা। তারিণী নইলে কে তরাবে বল?

একটা ঝাঁকি দিয়া লগিটা টানিয়া তুলিয়া তারিণী বিরক্তভরে বলিয়া উঠিল, এই শালা কেলে — এঁটে ধর্ দাঁড়, হ্যাঁ — সেঙাত, আমার ভাত খায় না গো! টান দেখছিস্ না?

সত্য কথা, ময়ূরাক্ষীর এই খরস্রোতই বিশেষত্ব। বারো মাসের মধ্যে সাত-আট মাস ময়ূরাক্ষী মরুভূমি, এক মাইল দেড় মাইল প্রশস্ত বালুকারাশি ধু-ধু করে। কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে সে রাক্ষসীর মত ভয়ঙ্করী। দুই পার্শ্বে চার-পাঁচ মাইল গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ জলস্রোতে পরিব্যপ্ত করিয়া বিপুল স্রোতে সে তখন ছুটিয়া চলে। আবার কখনও কখনও আসে 'হড়পা' বান, ছয়-সাত হাত উচ্চ জলস্রোত সম্মুখের বাড়ি-ঘর ক্ষেত-খামার গ্রামের পর গ্রাম নিঃশেষে ধুইয়া-মুছিয়া দিয়া সমস্ত দেশটাকে প্লাবিত করিয়া দিয়া যায়। কিন্তু সে সচরাচর হয় না। বিশ বৎসর পূর্বে একবার হইয়াছিল।

মাথার উপর রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। একজন পুরুষ যাত্রী ছাতা খুলিয়া বসিল।

তারিণী বলিল, পাল খাটিও না ঠাকুর, পাল খাটিও না। তুমিই উড়ে যাবা।

লোকটা ছাতা বন্ধ করিয়া দিল। সহসা নদীর উপরের দিকে একটা কলরব ধ্বনিত হইয়া উঠিল — আর্ত কলরব।

ডোঙার যাত্রী সব সচকিত হইয়া পড়িল। তারিণী ধীরভাবে লগি চালাইয়া বলিল, এই, সব হুঁশ করে! তোমাদের কিছু হয় নাই। ডোঙা ডুবেছে ওলকুড়োর ঘাটে। এই বুড়ি মা, কাঁপছ কেনে, ধর ধর ঠাকুর, বুড়িকে ধর। ভয় কি? এই দেখ আমরা আর-ঘাটে এসে গেইছি।

নদীও শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

তারিণী বলিল, কেলে!

কী?

নদীবক্ষের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তারিণী বলিল, লগি ধর্ দেখি।

কালাচাঁদ উঠিয়া পড়িল। তাহার হাতে লগি দিতে দিতে তারিণী বলিল, হুই — দেখ — হুই — হুই ডুবিল। বলিতে বলিতে সে খরস্রোতা নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ডোঙার উপর কয়েকটি বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিল, ও বাবা তারিণী, আমাদের কি হবে বাবা।

কালাচাঁদ বলিয়া উঠিল, এই বুড়িয়া পেছু ডাকে দেখ দেখি। মরবি মরবি, তোরা মরবি।

পিঙ্গলবর্ণ জলস্রোতের মধ্যে শ্বেতবর্ণের কি একটা মধ্যে মধ্যে ডুবিতেছিল, আবার কিছুদূর গিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই তারিণী ক্ষিপ্তগতিতে স্রোতের মুখে সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছিল। সে চলার মধ্যে যেন কত স্বচ্ছন্দ গতি। বস্তুটার নিকটেই সে আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেটা ডুবিল। সঙ্গে সঙ্গে তারিণীও ডুবিল। দেখিতে দেখিতে সে কিছুদূরে গিয়া ভাসিয়া উঠিল। এক হাতে তাহার ঘন কালো রঙের কি রহিয়াছে। তারপর সে ঈষৎ বাঁকিয়া স্রোতের মুখেই সাঁতার কাটিয়া ভাসিয়া চলিল।

দুই তীরের জনতা, আশঙ্কাবিমিশ্র ঔৎসুক্যের সহিত একাগ্রদৃষ্টিতে তারিণীকে লক্ষ্য করিতেছিল। এক তীরের জনতা দেখিতে দেখিতে উচ্চরোলে চীৎকার করিয়া উঠিল, হরিবোল।

অন্য তীরের জনতা চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিতেছিল, উঠেছে? উঠেছে?

কালাচাঁদ তখন ডোঙা লইয়া ছুটিয়াছিল।

তারিণীর ভাগ্য ভাল। জলমগ্ন ব্যক্তিটি স্থানীয় বর্ধিষ্ণু ঘরেরই একটি বধূ। ওলকুড়ার ঘাটে ডোঙা ডুবে নাই, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনারতা বধূটি ডোঙার কিনারায় ভর দিয়া সরিয়া বসিতে গিয়া এই বিপদ ঘটাইয়া বসিয়াছিল। অবগুণ্ঠনের জন্যই হাতটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সে টলিয়া জলে পড়িয়া গিয়াছিল। মেয়েটি খানিকটা জল খাইয়াছিল কিন্তু তেমন বেশি কিছু নয় — অল্প শুশ্রূষাতেই তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল।

নিতান্ত কচি মেয়ে — তের চৌদ্দ বৎসরের বেশি বয়স নয়; দেখিতে বেশ সুশ্রী, দেহে অলঙ্কারও কয়খানা রহিয়াছে — কানে মাকড়ি, নাকে টানাদেওয়া নথ, হাতে রুলি; গলায় হার। সে তখনও হাঁপাইতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই মেয়েটির স্বামী ও শ্বশুর আসিয়া পৌঁছিলেন।

তারিণী প্রণাম করিয়া বলিল, ‘পেনাম ঘোষমশাই।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

তারিণী কহিল, আর সান কেড়ো না মা, দম লাও দম লাও। সেই যে বলে — লাজে মা কুঁকড়ি, বেপদের ধুকুড়ি।

ঘোষমহাশয় বলিলেন, কী চাই তো তারিণী, বল?

তারিণী মাথা চুলকাইয়া সারা হইল, কী তাহার চাই, সে ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে বলিল, এক হাঁড়ি মদের দাম — আট আনা।

জনতার মধ্য হইতে সেই সাবি মেয়েটি বলিয়া উঠিল, আ মরণ আমার! দামী কিছু চেয়ে নে রে বাপু।

তারিণী যেন এতক্ষণ খেয়াল হইল, সে হেঁটমাথাতেই সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, ফাঁদি লত একখানা ঘোষ-মশাই।

জনতার মধ্যে হইতে সাবিই আবার বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ বাবা তারিণী, বউমা বুঝি খুব নাক নেড়ে কথা কয়?

প্রফুল্লচিত্তে জনতার হাস্যধ্বনিতে খেয়াঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল।

বধুটি ঘোমটা খুলে নাই, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তাহার গৌরবর্ণ কচি হাতখানি বাহির হইয়া আসিল — রাঙা করতলের উপরে সোনার নথখানি রৌদ্রাভায় ঝকঝক করিতেছে।

ঘোষমহাশয় বলিলেন, দশহরার সময় পার্বণী রইল তোর কাপড় আর চাদর, বুঝলি তারিণী? আর এই নে পাঁচ টাকা।

তারিণী কৃতজ্ঞতায় নত হইয়া প্রণাম করিল, আজ্ঞে হুজুর চাদরের বদলে যদি শাড়ি —

হাসিয়া ঘোষমহাশয় বলিলেন, তাই হবে রে, তাই হবে।

সাবি বলিল, তোর বউকে একবার দেখতাম তারিণী।

তারিণী বলিল, নেহাত কালো কুচ্ছিত মা।

তারিণী সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরিল আকণ্ঠ মদ গিলিয়া। এখানে পা ফেলিতে পা পড়িতেছিল ওখানে। সে বিরক্ত হইয়া কালাচাঁদকে বলিল, রাস্তায় এত নেলা কে কাটলে রে কেলে? শুধুই নেলা — শুধুই — অ্যা —অ্যাই — একটো —

কালাচাঁদও নেশায় বিভোর, সে শুধু বলিল, হুঁ।

তারিণী বলিল, জলাম্পয় — সব জলাম্পয় হয়ে যায়, সাঁতরে বাড়ি চলে যাই। শালা খাল নাই, নেলা নাই, সমান স — ব সমান।

টলিতে টলিতেই সে শূন্যের বায়ুমণ্ডলে হাত ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া সাঁতারের অভিনয় করিয়া চলিয়াছিল।

গ্রামের প্রান্তেই বাড়ি। বাড়ির দরজায় একটা আলো জ্বালিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সুখী — তারিণীর স্ত্রী।

তারিণী গান ধরিয়া দিল, লো — তুন হয়েছে দেশে ফাঁদি লতে আমদানি —

সুখী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, খুব হয়েছে, এখন এস। ভাত কটা জুড়িয়ে কড়কড়ে হিম হয়ে গেল।

হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কোমরের কাপড় খুঁজিতে খুঁজিতে তারিণী বলিল, আগে তোকে লত পরাতে হবে। লত কই — কই কোথা গেল শালার লত?

সুখী বলিল, কোন্ দিন ওই করতে গিয়ে আমার মাথা খাবে তুমি। এবার আমি গলায় দড়ি দোব কিন্তু।

তারিণী ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কেনে, কি করলাম আমি।

সুখী দৃষ্টিতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, এই পাথার বান, আর তুমি —

তারিণীর অট্টহাসিতে বর্ষার রাত্রির সজল অন্ধকার ত্রস্ত হইয়া উঠিল। হাসি থামাইয়া সে সুখীর দিকে চাহিয়া বলিল, মায়ের বুকে ভয় থাকে? বল তু বল্ বলে যা বলছি। পেটের ভাত ওই ময়ূরাক্ষীর দৌলতে। জবাব দে কথার — অ্যাই।

সুখী তাহার সহিত আর বাক্যব্যয় না করিয়া ভাত বাড়িতে চলিয়া গেল।

তারিণী ডাকিল, সুখী, অ্যাই সুখী, অ্যাই!

সুখী কোন উত্তর দিল না। তারিণী টলিতে টলিতে উঠিয়া ঘরের দিকে চলিল। পিছন হইতে ভাত বাড়িতে ব্যস্ত সুখীকে ধরিয়া বলিল, চল, এখুনি তোকে যেতে হবে।

সুখী বলিল, ছাড়, কাপড় ছাড়।

তারিণী বলিল, আলবত যেতে হবে। হাজার বার — তিনশো বার।

সুখী কাপড়টা টানিয়া বলিল, কাপড় ছাড় — যাব, চল। তারিনী খুশি হইয়া কাপড় ছাড়িয়া দিল। সুখী ভাতের থালাটা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তারিণী বলিতেছিল, চল্ তোকে পিঠে নিয়ে ঝাপ দোব গনুটের ঘাটে, উঠব পাঁচথুপীর ঘাটে।

সুখী বলিল, তাই যাব, ভাত খেয়ে লাও দেকিন।

বাহির হইয়া আসিতে গিয়া দরজার চৌকাঠে কপালে আঘাত খাইয়া তারিণীর আস্ফালনটা একটু কমিয়া আসিল।

ভাত খাইতে খাইতে সে আবার আরম্ভ করিল, তুলি নাই সেবার এক জোড়া গোরু? পনের টাকা — পাঁচ টাকা কম এক কুড়ি, শালা মদন গোপ ঠকিয়ে নিলে? তোর হাতের শাঁখা-বাঁধা কী করে হল? বল্ কে — তোর কোন্ নানা দিলে?

সুখী ঘরের মধ্যে আমানি ছাঁকিতেছিল, ঠাণ্ডা জিনিস নেশার পক্ষে ভাল। তারিণী বলিল, শালা মদনা — লিলি ঠকিয়ে — লে। সুখীর শাঁখাবাঁধা তো হয়েছে, ব্যস্ আমাকে দিস আর না দিস! পড়ে শালা একদিন ময়ূরাক্ষীর বাণে — শালাকে গোটা কতক চোবল দিয়ে তবে তুলি।

সম্মুখে আমানির বাটি ধরিয়া দিয়া সুখী তারিণীর কাপড়ের খুঁট খুলিতে আরম্ভ করিল, বাহির হইল নথখানি আর তিনটি টাকা।

সুখী প্রশ্ন করিল, আর দু টাকা কই?

তারিণী বলিল, কেলে, ওই কেলে, দিয়ে দিলাম কেলেকে — যা লিয়ে যা।

সুখী এ কথায় বাদ-প্রতিবাদ করিল না, সে তাহার অভ্যাস নয়। তারিণী আবার বকিতে শুরু করিল, সেবার সেই তোর যখন অসুখ হল, ডাক পার হয় না, পুলিস সাহেব ঘাটে বসে ভাপাইছে হুঁ হুঁ বাবা — সেই বকশিশে তোর কানের ফুল। যা তু যা, এখুনি ডাক্ লদীর পার থেকে, এই, উঠে আয় হারামজাদা লদী। উঠে আসবে, যা যা।

সুখী বলিল, দাঁড়াও আয়নাটা লিয়ে আসি, লতটা পরি; তারিণী খুশি হইয়া নীরব হইল। সুখী আয়না সম্মুখে রাখিয়া নথ পরিতে বসিল। সে হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, ভাত খাওয়া তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নথ পরা শেষ হইতেই সে উচ্ছিষ্ট হাতেই আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, দেখি দেখি।

সুখীর মুখে পুলকের আবেগ ফুটিয়া উঠিল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখখানি তাহার রাঙা হইয়া উঠিল।

তারিণী সাবি-ঠাকরুণকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। সুখী তন্বী, সুখী, সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুখীর জন্য তারিণীর সুখের সীমা নাই।

তারিণী মত্ত অবস্থাতে বলিলেও মিথ্যা বলে নাই। ওই ময়ূরাক্ষীর প্রসাদেই তারিণীর অন্নবস্ত্রের অভাব হয় না। দশহারার দিন ময়ূরাক্ষীর পূজাও সে করিয়া থাকে। এবার তেরো শো বিয়াল্লিশ সালে দশহারার দিন তারিণী নিয়মমত পূজা-অর্চ্চনা করিতেছিল। তাহার পরনে নূতন কাপড়, সুখীর পরনেও নূতন শাড়ি — ঘোষ মহাশয়ের দেওয়া পার্বণী। জলহীন ময়ূরাক্ষীর বালুকাময় গর্ভ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছিল। তখনও পর্যন্ত বৃষ্টি নামে নাই। ভোগপুরের কেষ্ট দাস নদীর ঘাটে নামিয়া একবার দাঁড়াইল। সমস্ত দেখিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, ভাল করে পূজো কর্ তারিণী, জল-টল হোক, বান-টান আসুক, বান না এলে চাষ হবে কি করে?

ময়ূরাক্ষীর পলিতে দেশে সোনা ফলে।

তারিণী হাসিয়া বলিল, তাই বল বাপু। লোকে বলে কি জান দাস, বলে, শালা বানের লেগে পূজো দেয়। এই মায়ের কিপাতেই এ মুলুকের লক্ষ্মী। ধর্ ধর্ কেলে, ওরে, পাঁঠা পালাল ধর্।

বলির পাঁঠাটা নদীগর্ভে উত্তপ্ত বালুকার উপর আর থাকিতে চাহিতেছিল না।

পূজা অর্চনা সুশৃঙ্খলেই হইয়া গেল। তারিণী মদ খাইয়া নদীর ঘাটে বসিয়া কালাচাঁদকে বলিতেছিল, হড়হড় — কলকল — বান, লে কেনে তু দশদিন বাদ।

কালাচাঁদ বলিল, এবার মাইরি তু কিন্তুক ভাষা জিনিস ধরতে পাবি না। এবার কিন্তুক আমি ধরব, হ্যাঁ।

তারিণী মত্ত হাসি হাসিয়া বলিল, বড় ঘুরণ-চাকে তিলেটি বুটবুটি, বুক — বুক — বুক, বাস্ — কালাচাঁদ ফরসা।

কালাচাঁদ অপমানে আগুন হইয়া উঠিল, কি বললি শালা?

তারিণী খাড়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সুখী মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সব মিটাইয়া দিল। সে বলিল, ছোট বানের সময় — হুই পাকুরগাছ পর্যন্ত বানে দেওর ধরবে, আর পাকুরগাছ ছাড়লেই তুমি।

কালাচাঁদ সুখীর পায়ের ধুলো লইয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল, বউ লইলেই বলে কে?

পরদিন হইতে ডোঙা মেরামত আরম্ভ হইল, দুইজনে হাতুড়ি নেয়ান লইয়া সকাল হইতে সন্ধ্য পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ডোঙাখানাকে প্রায় নুতন করিয়া ফেলিল।

কিন্তু সে ডোঙায় আবার ফাল ধরিল রৌদ্রের টানে। সমস্ত আষাঢ়ের মধ্যে বান হইল না। বান দূরের কথা, নদীর বালি ঢাকিয়া জলও হইল না। বৃষ্টি অতি সামান্য — দুই চারি পশলা। সমস্ত দেশটার মধ্যে একটা মৃদু কাতর ক্রন্দন যেন সাড়া দিয়া উঠিল। প্রত্যাসন্ন বিপদের জন্য দেশ যেন মৃদুস্বরে কাঁদিতেছিল। কিংবা হয়তো বহুদূরের যে হাহাকার আসিতেছে, বায়ুস্তরবাহিত তাহারই অগ্রধ্বনি এ। তারিণীর দিন আর চলে না। সরকারী কর্মচারীদের বাইসিক্ল ঘাড়ে করিয়া নদী পার করিয়া দুই-চারিটা পয়সা মেলে, তাহাতেই সে মদ খায়। সরকারী কর্মচারীদের এ সময়ে আসা-যাওয়ার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে — তাঁহারা আসেন দেশে সত্যই অভাব আছে কি না, তাহারই তদন্তে। আরও কিছু মেলে — সে তাঁহাদের ফেলিয়া-দেওয়া সিগারেটের কুটি।

শ্রাবণের প্রথমেই প্রথম বন্যা আসিল। তারিণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বন্যার প্রথম দিন বিপুল আনন্দে সে তালগাছের মত উঁচু পাহাড়ের উপর হইতে ঝাঁপ দিয়া নদীর বুকে পড়িয়া বন্যার জল আরও উচ্ছল ও চঞ্চল করিয়া তুলিল।

কিন্তু তিন দিনের দিন নদীতে আবার হাঁটু-জল হইয়া গেল। গাছে বাঁধা ডোঙাটা তরঙ্গাঘাতে মৃদু দোল খাইতেছিল। তাহারই উপর তারিণী ও কালাচাঁদ বসিয়া ছিল — যদি কেহ ভদ্র যাত্রী আসে তাহারই প্রতিক্ষায়, সে হাঁটিয়া পার হইবে না। এ অবস্থায় তাহারা দুইজন মিলিয়া ডোঙাটা ঠেলিয়া লইয়া যায়।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। তারিণী বলিল, ই কি হল বল্ দেখি কেলে?

চিন্তাকুলভাবে কালাচাঁদ বলিল, তাই তো।

তারিণী আবার বলিল, এমন তো কখনও দেখি নাই।

সেই পূর্বের মতই কালাচাঁদ উত্তর দিল, তাই তো।

আকাশের দিকে চাহিয়া তারিণী বলিল, আকাশ দেখ কেনে — ফরস লী-ল পচি দিকেও তো ডাকে না।

কালাচাঁদ এবার উত্তর দিল, তাই তো।

ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় কসাইয়া দিয়া তারিণী বলিল, তাই তো! 'তাই তো' বলতেই যেন আমি ওকে বলছি। তাই তো! তাই তো! তাই তো!

কালাচাঁদ একান্ত অপ্রতিভেত মত তারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কালাচাঁদের সে দৃস্টি তারিণী সহ্য করিতে পারিল না, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল। কিছুক্ষণ পর অকস্মাৎ যেন সচেতনের মত নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া সে বলিয়া উঠিল, বাতাস ঘুরেছে লয় কেলে, পচি বইছে, না? বলিতে বলিতে সে লাফ দিয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া শুষ্ক বালি একমুঠো ঝুরঝুর করিয়া মাটিতে ফেলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বায়প্রবাহ অতি ক্ষীণ, পশ্চিমের কি না ঠিক বুঝা গেল না। তবুও সে বলিল, হুঁ পচি থেকে ঠেলা বইছে — একটুকুন। আয় কেলে, মদ খাব, আয়। দু আনা পয়সা আছে আজ। বার করে লিয়েছি আজ সুখীর খুঁট খুলে।

সস্নেহ নিমন্ত্রণে কালাচাঁদ খুশি হইয়া উঠিয়াছিল। সে তারিণীর সঙ্গ ধরিয়া বলিল, তোমার বউয়ের হাতে টাকা আছে দাদা। বাড়ি গেলে তোমার ভাত ঠিক পাবেই। মলাম আমরাই।

তারিণী বলল, সুখী বড় ভাল রে কেলে, বড় ভাল। উ না থাকলে আমার।

'হাড়ির ললাট ডোমের দুগগতি' হয় ভাই। সেবার সেই ভাইয়ের বিয়েতে —

বাধা দিয়ে কালাচাঁদ বলিল, দাঁড়াও দাদা, একটা তাল পড়ে রইছে, কুড়িয়ে লি।

সে ছুটিয়া পাশের মাঠে নামিয়া পড়িল।

একদল লোক গ্রামের ধারে গাছতলায় বসিয়াছিল, তারিণী প্রশ্ন করিল, কোথা যাবা যে তোমরা, বাড়ি কোথা?

একজন উত্তর দিল, বীরচন্দ্রপুর বাড়ি ভাই আমাদের, খাটতে যাব আমরা বদ্ধমান।

কালাচাঁদ প্রশ্ন করিল, বদ্ধমানে কি জল হইছে নাকি?

জল হয় নাই, ক্যানেল আছে কিনা

দেখিতে দেখিতে দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। দুর্ভিক্ষ যেন দেশের মাটির তলেই আত্মগোপন করিয়া ছিল, মাটির ফাটলের মধ্য দিয়া পথ পাইয়া সে ভয়াল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল। গৃহস্থ আপনার ভাণ্ডার বন্ধ করিল; জনমজুরের মধ্যে উপবাস শুরু হইল। দলে দলে লোক দেশ ছাড়িতে আরম্ভ করিল।

সেদিন সকালে উঠিয়া তারিণী ঘাটে আসিয়া দেখিল কালাচাঁদ আসে নাই। প্রহর গড়াইয়া গেল, কালাচাঁদ তবুও আসিল না। তারিণী উঠিয়া কালাচাঁদের বাড়ি গিয়া ডাকিল, কেলে।

কেহ উত্তর দিল না। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরদ্বার শূন্য খাঁ খাঁ করিতেছে, কেহ কোথাও নাই। পাশের বাড়িতে গিয়া দেখিল, সে বাড়িও শূন্য। শুধু সে বাড়িই নয়, কালাচাঁদের পাড়াটাই জনশূন্য। পাশের চাষাপাড়ায় গিয়া শুনিল, কালাচাঁদের পাড়ার সকলেই কাল রাত্রে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

হারু মোড়ল বলিল, বললাম আমি তারিণী, যাস না সব, যাস না। তা শুনলে না, বলে, বড়নোকের গাঁয়ে ভিখ করব।

তারিণী বুকের ভিতরটা কেমন করিতেছিল; সে ওই জনশূন্য পল্লীটার দিকে চাহিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

হারু আবার বলিল, দেশে বড়নোক কি আছে? সব তলা-ফাঁক। তাদের আবার বড় বেপদ। পেটে না খেলেও মুখে কবুল দিতে পারে না। এই তো কি বলে — গাঁয়ের নাম, ওই যে — পলাশডাঙ্গা, পলাশডাঙ্গার ভদ্দরনোক একজন, গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। শুধু অভাবে মরেছে।

তারিণী শিহরিয়া উঠিল।

পরদিন ঘাটে এক বীভৎস কাণ্ড! মাঠের পাশেই এক বৃদ্ধার মৃতদেহে পড়িয়া ছিল। কতকটা তার শৃগাল-কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইয়াছে। তারিণী চিনিল, একটি মুচি পরিবারের বৃদ্ধ মাতা এ হতভাগিনী। গত অপরাহ্নে চলচ্ছক্তিহীনা বৃদ্ধার মৃত্যু-কামনা বারবার তাহারা করিতেছিল। বৃদ্ধার জন্যই ঘাটের পাশে গত রাত্রে তাহারা আশ্রয় লইয়াছিল। রাত্রে ঘুমন্তবৃদ্ধাকে ফেলিয়া তাহারা পালাইয়াছে।

সে আর সেখানে দাঁড়াইল না। বরাবর বাড়ি আসিয়া সুখীকে বলিল, লে সুখী, খান চারেক কাপড় আর গয়না কটা পেট-আঁচলে বেঁধে লে। আর ই গাঁয়ে থাকব না, শহর দিকে যাব। দিন খাটুনি তো মিলবে।

জিনিসপত্র বাঁধিবার সময় তারিণী দেখিল, হাতের শাঁখা ছাড়া কোন গহনাই সুখীর নাই। তারিণী চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল, আর?

সুখী ম্লান হাসিয়া বলিল, এতদিন চলল কিসে বল?

তারিণী গ্রাম ছাড়িল।

দিন তিনেক পথ চলিবার পর সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামের প্রান্তে তাহারা রাত্রির জন্য বিশ্রাম লইয়াছিল। গোটা দুই পাকা তাল লইয়া দুইজনে রাত্রির আহার সারিয়া লইতেছিল। তারিণী চট করিয়া উঠিয়া খোলা জায়গায় গিয়া দাঁড়াইল। থাকিতে থাকিতে বলিল, দেখি সুখী, গামছাখানা। গামছাখানা লইয়া হাতে ঝুলাইয়া সেটাকে সে লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিল।

ভোরবেলায় সুখীর ঘুম ভাঙিয়া গেল, দেখিল, তারিণী ঠায় জাগিয়া বসিয়া আছে। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, ঘুমোও নাই তুমি?

হাসিয়া তারিণী বলিল, না ঘুম এল না।

সুখী তাহাকে তিরস্কার আরম্ভ করিল, ব্যামো-স্যামো হলে কী করব বল দেখি আমি? ই মানুষের বাইরে বেরুনো কেনে বাপ, ছি-ছি-ছি!

বাসা ভেসে যাবে। ইদিকে বাতাস কেমন বইছে, দেখেছিস? ঝাড়া পশ্চিম থেকে।

আকাশের দিকে চাহিয়া সুখী বলিল, আকাশ তো ফটফটে— চকচক করছে।

তারিণী চাহিয়া ছিল অন্য দিকে, সে বলিল, মেঘ আসতে কতক্ষণ? ওই দেখ্, কাকে কুটো তুলছে — বাসার ভামা-ফুটো সারবে। আজ এইখানেই থাক্ সুখী, আর যাব না; দেখি মেঘের গতিক।

খেয়া-মাঝির পর্যবেক্ষণ ভুল হয় নাই। অপরাহ্নের দিকে আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল, পশ্চিমের বাতাস ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিল।

তারিণী বলিল, ওঠ্ সুখী, ফিরব।

সুখী বলিল, এই অবেলায়?

তারিণী বলিল, ভয় কি তোর, আমি সঙ্গে রইছি। লে, মাথালি তু মাথায় দে। টিপটিপ জল ভারি খারাপ।

সুখী বলিল, আর তুমি, তোমার শরীল বুঝি পাথরের?

তারিণী হাসিয়া বলিল, ওরে, ই আমার জলের শরীর, রোদে টান ধরে জল পেলেই ফোলে। চল্, দে, পুঁটুলি আমাকে দে।

ধীরে ধীরে বাদল বাড়িতেছিল। উতলা বাতাসের সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ রিমিঝিমি বৃষ্টি হইয়া যায়, তারপর থাকে। কিছুক্ষণ পর আবার বাতাস প্রবল হয় সঙ্গে সঙ্গে নামে বৃষ্টি।

যে পথ গিয়াছিল তাহারা তিন দিনে, ফিরিবার সময় সেই পথ অতিক্রম করিল দুই দিনে। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়াই তারিণী বলিল, দাঁড়া লদীর ঘাট দেখে আসি। ফিরিয়া আসিয়া পুলকিত চিত্তে তারিণী বলিল, লদী কানায় কানায়, সুখী।

প্রভাবে উঠিয়াই তারিণী ঘাটে যাইবার জন্য সাজিল। আকাশ তখন দুরন্ত দুর্যোগে আচ্ছন্ন, ঝড়ের মত বাতাস সঙ্গে সঙ্গে ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি।

দ্বিপ্রহের তারিণী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কামার বাড়ি চললাম আমি।

সুখী ব্যস্তভাবে বলিল, খেয়ে যাও কিছু।

চিন্তিত মুখে ব্যস্ত তারিণী বলিল, না, ডোঙার একটা বড় গজাল খুলে গেইছে। সে না হ'লে — উহুঁ, অল্প বান হ'ল না হয় হ'ত, লদী একেবারে পাথার হয়ে উঠেছে, দেখলে আয়।

সুখীকে না দেখাইয়া ছাড়িল না। পালদের পুকুরের উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া সুখী দেখিল, ময়ূরাক্ষীর পরিপূর্ণ রূপ। বিস্তৃতি যেন পারাপারহীন। রাঙা জলের মাথায় রাশি রাশি পুঞ্জিত ফেনা ভাসা ফুলের মত দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তারিণী বলিল, ডাক শুনছিল — সোঁ-সোঁ? বান আরও বাড়বে। তু বাড়ি যা, আমি চললাম। লইলে কাল আর ডাক পার করতে পারব না।

সুখী অসন্তুষ্ট চিত্তে বলিল, এই জল ঝড় —

তারিণী সে কতা কানেই তুলিল না। দুরন্ত দুর্যোগের মধ্যেই সে বাহির হইয়া গেল।

যখন সে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দ্রুতপদে সে আসিতেছিল। কি একটা 'ডুগডুগ' শব্দ শোনা যায় না? হাঁ ডুগডুগিই বটে। এ শব্দের অর্থ তো সে জানে আসন্ন বিপদ। নদীর ধারে গ্রামে গ্রামে এই সুরে ডুগডুগি যখন বাজে, তখনই বন্যার ভয় আসন্ন বুঝিতে হয়।

তারিণীর গ্রামের ও-পারে ময়ূরাক্ষী, এ-পাশে ছোট একটা কাঁতার অর্থাৎ ছোট্ট শাখা নদী। একটা বাঁশের পুল দিয়া গ্রামে প্রবেশের পথ। তারিণী সড়ক পথ ধরিয়া আসিয়াও বাঁশের পুল খুঁজিয়া পাইল না। তবে পথ ভুল হইল নাকি? অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ পর ঠাহর করিল, যে পুলের মুখ এখন অন্তত এক শত বিঘা জমির পরে। ঠিক বন্যার জলের ধারেই সে দাঁড়াইয়া ছিল, আঙুলের ডগায় ছিল জলের সীমা। দেখতে দেখতে গোড়ালি পর্যন্ত জলে ডুবিয়া গেল। সে কান পাতিয়া রহিল, কিন্তু বাতাস ও জলের শব্দ ছাড়া কিছু শোনা যায় না, আর একটা গর্জনের মত গোঁ-গোঁ শব্দ। দেখিতে দেখিতে সর্বাঙ্গ তাহার পোকায় ছাইয়া গেল। লাফ দিয়া মাটির পোকা পালাইয়া যাইতে চাহিতেছে।

তারিণী জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

ক্ষিপ্রগতিতে মাঠের জল অতিক্রম করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া সে চমকিয়া উঠিল। গ্রামের মধ্যেও বন্যা প্রবেশ করিয়াছে। এক কোমর জলে পথঘাট ঘরদ্বার সব ভরিয়া গিয়াছে। পথের উপর দাঁড়াইয়া গ্রামের নরনারী আর্ত চীৎকার করিয়া এ উহাকে ডাকিতেছে। গরু ছাগল ভেড়া কুকুর সে কি ভয়ার্ত চীৎকার। কিন্তু সে সমস্ত শব্দ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল ময়ূরাক্ষীর গর্জন, বাতাসের অট্টহাস্য আর বর্ষণের শব্দ; লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল অট্টহাস্য ও চিৎকারে যেমন করিয়া ভয়ার্ত গৃহসেথর ক্রন্দন ঢাকিয়া দেয়, ঠিক তেমনই ভাবে।

গভীর অন্ধকারে পথও বেশ চেনা যায় না

জলের মধ্যে কি একটা বস্তুর উপর তারিণীর পা পড়িল, জীব বলিয়াই বোধ হয়। হেঁট হইয়া তারিণী সেটাকে তুলিয়া দেখিল, ছাগলের ছানা একটা, শেষ হইয়া গিয়াছে। সেটাকে ফেলিয়া দিয়া কোনরূপে সে বাড়ির দরজায় আসিয়া ডাকিল, সুখী — সুখী!

ঘরের মধ্য হইতে সাড়া আসিল — অপরিমেয় আশ্বস্ত কণ্ঠস্বরে সুখী সাড়া দিলে, এই যে, ঘরে আমি।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তারিণী দেখিল, ঘরের উঠানে এক কোমর জল। দাওয়ার উপর এক হাঁটু জলে চালের বাঁশ ধরিয়া সুখী দাঁড়াইয়া আছে।

তারিণী তাহার হাত টানিয়া ধরিয়া বলিল, বেরিয়ে আয়, এখন কি ঘরে থাকে, ঘর চাপা প'ড়ে মরবি যে।

সুখী বলিল, তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। কোথা খুঁজে বেড়াবে বল দেখি?

পথে নামিয়া তারিণী দাঁড়াইল, বলিল, কি করি বল দেখি সুখী?

সুখী বলিল, এইখানেই দাঁড়াও। সবার যা দশা হবে, আমাদেরও তাই হবে।

তারিণী বলিল, বান যদি আরও বাড়ে সুখী? গোঁ-গোঁ ডাক শুনছিস না?

সুখী বলিল, আর কি বান বাড়ে গো? আর বান বাড়লে দেশের কি থাকবে? ছিষ্টি কি আর লষ্ট করবে ভগবান?

তারিণী এ আশ্বাস গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

একটা হুড়মুড় শব্দের সঙ্গে বন্যার জল ছটকাইয়া দুলিয়া উঠিল। তারিণী বলিল, আমাদেরই ঘর পড়ল সুখী। চল, আর লয়, জল কোমরের ওপর উঠিল, তোর তো এক ছাতি হয়েছে তা হ'লে।

অন্ধকারে কোথায় বা কাহার কণ্ঠস্বর বোঝা গেল না, কিন্তু নারীকণ্ঠের কাতর ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল, ওগো খোকা প'ড়ে গেইছে বুক থেকে। খোকা রে!

তারিণী বলিল, এইখানেই থাকবি, সুখী, ডাকলে সাড়া দিস।

সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। শুধু তাহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল, কে? কোথা? কার ছেলে প'ড়ে গেল, সাড়া দাও ওই!

ওদিক হইতে সাড়া আসিল, এই যি।

তারিণী আবার হাঁকিল, ওই!

কিছুক্ষণ ধরিয়া কণ্ঠস্বরে সঙ্কেতের আদান-প্রদান চলিয়া সে শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পরই তারিণী ডাকিল, সুখী।

সুখী সাড়া দিল, অ্যাঁ?

শব্দ লক্ষ্য করিয়া তারিণী আসিয়া, বলিল, আমার কোমর ধর্ সুখী গতিক ভাল নয়।

সুখী আর প্রতিবাদ করিল না। তারিণীর কোমরের কাপড় ধরিয়া বলিল, কা'র ছেলে বটে? পেলে?

তারিণী বলিল, পেয়েছি, ভূপতে ভল্লার ছেলে।

সন্তর্পণে জল ভাঙিয়া তাহারা চলিয়াছিল। জল ক্রমশ যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। তারিণী বলিল, আমার পিঠে চাপ সুখী। কিন্তু এ কোন্ দিকে এলাম সুখী, ই — ই —

কথা শেষ হইবার পূর্বেই অথই জলে দুইজনে ডুবিয়া গেল। পরক্ষণেই কিন্তু তারিণী ভাসিয়া উঠিয়া বলিল, লদীতেই বা পড়লাম সুখী। পিঠ ছেড়ে আমার কোমরের কাপড় ধ'রে ভেসে থাক।

স্রোতের টানে তখন তাহারা ভাসিয়া চলিয়াছে। গাঢ় গভীর অন্ধকার, কানের পাশ দিয়া বাতাস চলিয়াছে — হু-হু শব্দে, তাঁহারই সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে ময়ূরাক্ষীর বানের হুড়মুড় শব্দ। চোখে মুখে বৃষ্টির ছাঁট আসিয়া বিঁধিতেছিল তীরের

মত। কুটার মত তাহারা চলিয়াছে — কতক্ষণ, তাহার অনুমান হয় না, মনে হয়, কতদিন কত মাস তাহার হিসাব নাই — নিকাশ নাই। শরীরও ক্রমশ যেন আড়ষ্ট হইয়া আসিতছিল। মাঝে মাঝে ময়ূরাক্ষীর তরঙ্গ শ্বাসরোধ করিয়া দেয়। কিন্তু সুখীর হাতের মুঠি কেমন হইয়া আসে যে! সে যে ক্রমশ ভারী হইয়া উঠিয়াছে। তারিণী ডাকিল, সুখী — সুখী?

উন্মত্তার মত সুখী উত্তর দিল, অ্যাঁ?

ভয় কি তোর, আমি —

পর মুহূর্তে তারিণী অনুভব করিল, অতল, জলের তলে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ডুবিয়া চলিয়াছে। ঘূর্ণিতে পড়িয়াছে তাহারা। সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত করিয়া সে জল ঠেলিবার চেষ্টা করিল। কিছুক্ষণেই মনে হইল, তাহারা জলের উপরে উঠিয়াছে। কিন্তু সম্মুখের বিপদ তারিণী জানে, এইখানে আবার ডুবিতে হইবে। সে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু এ কি, সুখী যে নাগপাশের মত জড়ায়িা ধরিতেছে? সে ডাকিল, সুখী — সুখী!

ঘুরিতে ঘুরিতে আবার জলতলে চলিয়াছে। সুখীর কঠিন বন্ধনে তারিণীর দেহও যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড যেন ফাটিয়া গেল। তারিণী সুখীর দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল। বাতাস — বাতাস! যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পরমুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে কি তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ। হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়া চলিয়াচিল, সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল। আঃ, আঃ — বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটি।

৬৫.৫ সারাংশ

'তারিণী মাঝি' গল্পের গল্পাংশ সামান্য। গল্পের নায়ক তারিণী অস্বাভাবিক দীর্ঘদেহী। তার স্ত্রী সুখী। তারা নিঃসন্তান। তারিণী ময়ূরাক্ষী নদী সংলগ্ন গুনটিয়ার ঘাটে খেয়া পারাপার করে। তার এই কাজে একমাত্র সঙ্গী কালাচাঁদ। ডোঙায় লোকপারাপার করা শুধু তার জীবিকা নয়, এটি তার যেন নেশা। কিন্তু বর্ষার দিনের উত্তাল, ভয়াল ময়ূরাক্ষীর বুকে বেশি যাত্রী এক সঙ্গে নিয়ে যাওয়ায় বিপদ আছে অনেক। ময়ূরাক্ষী ভয়াল ভয়ঙ্কর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপরেই তারিণীর মাঝি-জীবনের ভাগ্য নির্ভর করে।

নদী হিসেবে ময়ূরাক্ষীর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। রাঢ় অঞ্চলের অন্যান্য নদীর মতো সে আট মাস থাকে মরুভূমির মতো শুকনো। কিন্তু বর্ষা এলেই সে হয় 'রাক্ষসীর মত ভয়ংকরী।' তখন যে কোনো দিন, যে কোনো মুহূর্তে অসম্ভব প্লাবনে দুকূল অতিক্রম করে চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম, বাড়ি, ধনসম্পদ, লোকজন ভাসিয়ে দিতে পারে। জীবন হানি ঘটাতে পারে অসংখ্য মানুষের। গল্পের উপসংহারে দেখব এই ময়ূরাক্ষী আর তারিণী বুঝি-বা একই জীবন বৈশিষ্ট্যে আত্মীয়। ময়ূরাক্ষী নদী জীবিকার সূত্রে তারিণীর জীবন ধারণে সাহায্য করে। তারিণীর আছে সুখীর মতো স্ত্রী — নামেও স্বভাবে যে যথার্থই সুখজ। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসায় একটুকুও খাদ নেই। সমস্ত রকম ছোট-বড়, সুখ-দুঃখ বিপদের দিনে তারা পরস্পরের প্রেমে, আকর্ষণে একান্তভাবে আপন হয়ে থাকে। ময়ূরাক্ষীর বুকে কারও বিপদ ঘটলে, জলে ডুবে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটলে, তারিণী নির্দ্বিধায় তাঁকে বাঁচায়। কেউ খুশী হয়ে যা দেন,

তাতেই সে খুশি। টাকা, পয়সা, অলংকার, খাদ্যবস্তু, কাপড়-চোপড় উপহার পেলে সে সব দিয়ে খুশি করে স্ত্রী সুখীকে। এভাবে সে নিজের সুখের জীবন ভরিয়ে রাখে।

কিন্তু ময়ূরাক্ষীর জীবন সব সময় সমান তালে চলে না। এক সময় দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কারণে তারিণীর পেশা বন্ধ হয়ে যায়। তারিণীর কষ্টের শেষ থাকে না। খাদ্যের অভাবের সঙ্গে আশপাশের গ্রাম মড়ক লাগে। গ্রাম ছেড়ে সব পালাতে থাকে। শেষে তারিণী আর সুখীও গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ময়ূরাক্ষীর মাঝি, তারিণী। সে হাওয়ার গতিক বোঝে। বুঝতে পারে বর্ষা আসন্ন। সুখীকে নিয়ে যে ঘরে ফেরার স্বপ্ন দেখে। সত্যিই যখন আবার বর্ষার মেঘ এল ও তা থেকে ঘনবর্ষণ হল, তারা বাড়ি ফেরাই স্থির করল এবং পরিশেষে ফিরে আসে। ক্রমশ আকাশের অবিরাম বর্ষণ আর নদীর জল দুকূল ছাপিয়ে প্লাবিত করে। বাড়ি ঘরদোর গরু বাছুর মানুষ বন্যায় বিধ্বস্ত ও ডুবে যায়। তারিণী আর সুখীও তাদের ভাঙা ঘর-বাড়ি ছেড়ে নদীর বুকে প্রতিকূল অবস্থায় ভাসতে থাকে। শেষে উভয়েই অবধারিত জীবন-সংশয়ের কালে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। সুখী তাকে আঁকড়ে থাকে। তারিণী এই সংকটে, বাঁচবার একান্ত আকাঙ্ক্ষায়, নিজেকে বাঁচাবার জন্য তাকে জড়িয়ে থাকা, তার একান্ত ভালবাসার, একমাত্র আপনজন — স্ত্রী সুখীর বজ্রমুষ্ঠি থেকে মুক্তি পাবার জন্য তার গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে, নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। আলো আর মাটির আশ্রয়ে তারিণী বুক ভরে শ্বাস নেয়। গল্প এখানেই শেষ হয়েছে।

৬৫.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' গল্পের একটি কাহিনি আছে, কিন্তু তার গল্পাংশ কম। গল্পটি গড়ে উঠেছে দুটি চরিত্রকে আশ্রয় করে — তারিণী আর সুখী। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি চরিত্র ময়ূরাক্ষী নদী। ময়ূরাক্ষী লেখকের বর্ণনার গুণে ও তাঁর প্রকৃতি দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে শিল্পীর প্রয়াসে নদীটিও একটি জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। গল্পের কাহিনীবৃত্ত ছোট। উপস্থাপনা সংযত। গল্প পূর্বাপর শিল্পের শাসনে নির্মেদ ও সংহত। গল্পের শুরু তারিণীর কথায় — সহজ স্বাভাবিক যাত্রী পারাপারের ঘটনা দিয়ে। শেষ হয়েছে অস্বাভাবিক পরিবেশে, তারিণীর নিতান্ত আত্মরক্ষার চিত্র রচনায়। কাহিনি, ঘটনা ও চরিত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে গল্পাংশে রক্তমাংষ জুগিয়েছে।

॥ ২ ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে মাঝে মাঝেই দেখা গেছে যে, মানুষের অন্তরের মধ্যে সুপ্ত হয়ে থাকা কোনো একটা আদিম প্রবৃত্তি সহসাই কালসর্পের মতো ফণা তুলে কাহিনির ট্রাজিক পরিণামকে সূচিত করে। 'তারিণী মাজি' এই জাতীয় গল্পগুলির মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রেখেছে। অনেক সময়ই অবশ্য তাঁর গল্প উপন্যাসের প্রধান কোনো চরিত্রের মধ্যে ঐ ধরনের জৈবিক বৃত্তির সন্ধান পূর্বাপরই মেলে; সেই সব ক্ষেত্রে নিয়তির চূড়ান্ত আঘাতটি কাহিনীর পরিশেষে বজ্রের মতো আছড়ে পড়লেও, তার প্রস্তুতিটা অনেক আগে থেকেই অনুভব করা যায়, হয়ত বা নিজেরও অগোচর-অবচেতনের মধ্যে। এই ধরনের কাহিনী হল 'অগ্রদানী', কিংবা 'আখড়াইয়ের দীঘি', অথবা 'বেদেনী'। আর 'তারিণী মাঝি'-র সঙ্গে পংক্তিভুক্ত হতে পারে 'দেবতার ব্যাধি'-র মতো গল্প।

'তারিণী মাঝি' গল্পের বিষয়-উপকরণের সঙ্গে বীরভূমের নিসর্গপ্রকৃতি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এটা অবশ্য তারাশঙ্করের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের মধ্যেই দেখি। কিন্তু 'তারিণী মাঝি' গল্পের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি একটু ভিন্নতর মাত্রিক। গণুঘাটের খেয়ানৌকোর মাঝি তারিণী এবং তার স্ত্রী সুখীর মতোই প্রবল বন্যায় হিংস্র হয়ে

ওঠা ময়ূরাক্ষী নদীও এই কাহিনীর অন্যতম একটি প্রধান চরিত্র। বস্তুতপক্ষে, তারিণী, সুখী এবং ময়ূরাক্ষী — এই তিনটি চরিত্রই বলা যেতে পারে সমান গুরুত্বপূণল। মানুষের মনের অবচেতনে তলিয়ে থাকা যে-সব প্রবণতা আকস্মিকভাবে জেগে ওঠে পারিপার্শ্বিকের অপ্রতিরোধ্য প্ররোচনায়, তাদেরই একটি — আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি — এই কাহিনীর ট্র্যাজেডির মূল উপলক্ষ। ঐ পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশের প্ররোচনা এখানে এসেছে ময়ূরাক্ষীর বিধ্বংসী বানের মূর্তিতে, কাহিনীর ভিলেন হয়ে।

গণুঘাটের খেয়ামাঝি তারিণী; তার সহকারী হল কালাচাঁদ। ময়ূরাক্ষীর বুকে এপার-ওপার করে তারা নৌকা বোঝাই যাত্রী নিয়ে। তাদের দেওয়া 'পারের কড়িতে'-ই তারিণীর গ্রাসাচ্ছাদন। এর ওপরে কখনো -কখনো জোটে ডুবন্ত মানুসজন, গরুমহিষকে বাঁচানোর বকশিস্ ঃ টাকা, কাপড়, কখনো টুকিটাকি গয়নাগাঁটিও। পুত্রবধূকে জলে ডোবা থেকে রক্ষা করার পুরস্কার স্বরূপ কোনো বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ হয়তো দেন টাকা; বরাত থাকে পরবর্তী দশহরার সময় ধুতি-চাদরের। সলজ্জভাবে তারিণী চাদরের বদলে হয়ত চেয়ে নেয় বক্ষয়ের জন্য নতুন শাড়ি। তারিণীর হাতে হয়তো জলে-পড়ে যাওয়া কিশোরী বধূটি তুলে দেয় নিজের নাকেরই সোনার নথটুকু। একখানা 'ফাঁদি লত্''-ও ঘোষ মশায়ের কাছে চেয়েছিল তারিণী তার সুখীর জন্যে।

এইসব ছোটখাট ঘটনাগুলিই তারিণী-সুখীর দাম্পত্য সুখের নির্দেশিকা। সন্তানহীনতার বেদনা আছে তাদের, কিন্তু সেটা গ্রাস করে ফেলেনি তাদের। মদ খায়, কালাচাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করে, আবার সুখীর শাসন মেনে খুশিও থাকে তারিণী। এইভাবেই দিন কাটে তাদের।

রাঢ়বাংলার প্রবল খরায় কোনও একবার দেশজুড়ে হাহাকার পড়ে। ময়ূরাক্ষীর বুকে চড়া পড়ে মাইলের পর মাইল। খেতখামারে ফসল নেই। গরিবগুর্বোর ঘরে খাবার নেই। গ্রামের পর গ্রাম জনহীন হয়ে পড়ছে — স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে মানুষ চলছে শহর অভিমুখে, কাজের সন্ধানে। একদিন নিরুপায় হয়ে তারিণীও বেরিয়ে পড়ে সুখীর হাত ধরে ঃ ''দিন-খাটুনি তো মিলবে।''

কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই নদীতে প্রবল বান আসার সঙ্কেত পায় ময়ূরাক্ষীর 'সন্তান' অভিজ্ঞ খেয়ার মাঝি তারিণী। তিনদিনের পেরিয়ে-আসা পর নবোদ্যমে ফিরে আসে সে বউকে নিয়ে। আসন্ন বর্ষায় টইটম্বুর হয়ে নদী আবার তাকে ফিরিয়ে দেবে জীবিকা, মনের নিশ্চিন্ততা, জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ! প্রবল বৃষ্টিতে ভাসল একসময়ে বিস্তীর্ণ লালমাটির দেশ।

অবশেষে বানও এক সময়ে এল — তার ''বিস্তৃতি যেন পারাপারহীন।'' নদীর বুকে ডুগডুগি বেজে উঠে আসন্ন বিপদের ইশারা দিলে গেল। গ্রামের মধ্যেও বান ঢোকে — ভাসতে থাকে বাড়ির চালা, গরুর-বাছুর, মানুষ। বন্যার প্রবল শব্দ, ঝড়বাদলের প্রবল ঝাপ্‌টা আর মানুষ ও পশুর ভয়ার্ত চেঁচামেচিতে যেন বিশ্বজগৎ ভরে যায়।

মায়ের বুক থেকে খসে-পড়া ভূপতি ভল্লার সন্তানকে এর মধ্যেই উদ্ধার করে তারিণী। কিন্তু জল ক্রমশই বাড়তে থাকে; সুখীকে পিঠে নিয়ে সাঁতার দিতে শুরু করে সে — জীবনের সহজাত আত্মরক্ষার আকুতিতে। কিন্তু অথই জলের সঙ্গে পাল্লা দেবার সামর্থ্য কমে আসে বহু বচরের ময়ূরাক্ষী — অভিজ্ঞ তারিণী মাঝিরও। 'তারিণী 'অনুভব করিল, অতল জলের তলে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ডুবিয়া চলিয়াছে। ঘূর্ণিতে পড়িয়াছে তাহারা। সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত করিয়া সে জল ঠেলিবার চেষ্টা করিল। কিছুক্ষণেই মনে হইল, তাহারা জলের উপরে উঠিয়াছে।' কিন্তু সম্মুখের বিপদ তারিণী জানে, এইখানে আবার ডুবতে হবে। ঘুরতে ঘুরতে আবার জলতলে চলেছে। সুখী, —তারিণীর প্রাণের চেয়ে প্রিয় ছিল যে সুখী, তার নিরুপায়, অসহায় হাতদুটোর নাগপাশের মতো বলে মনে হচ্ছে

জীবনের বৃহত্তম বন্যার মধ্যে বিপন্ন হওয়া তারিণী মাঝির। একটা সময়ে, প্রাণাধিকা সুখীর ঐ ভয়ার্ত বন্ধনই তার কাছে প্রতীত হল অনিবার্য মৃত্যুফাঁস রূপে! মুহূর্তের মধ্যে প্রেমকে, হৃদয়াবেগকে নিশ্চিহ্ন করে ''দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল!'' .... সুখীর মৃতদেহ তলিয়ে গেল একটু পরেই — জলের উপর ভেসে উঠে বুক ভরে বাসাত টেনে তারিণী পেতে চাইল — ''আলো ও মাটি।''

এই হল এ-কাহিনির পরিপূর্ণ অভিজ্ঞান — যদিও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু বিক্ষিপ্ত নয়। দুটি মানুষের নিবিড় আত্মিক বন্ধনও যে জীবনার্তির কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়, সেই নির্মম নিষ্ঠুর সত্যটিকে এইভাবেই উদ্‌ঘাটিত করেছেন তারাশঙ্কর।

॥ ৩ ॥

মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের মনের গহনে লুকিয়ে থাকা কয়েকটি মৌল ঈপ্সার কথা হামেশাই বলে থাকেন। ক্ষুধা, যৌনবাসনা এবং আত্মরক্ষার সহজাত তাড়না — এই তিনটিই হল সেই সব মৌল ঈপ্সার (Basic urge) মধ্যে প্রবল। এদের মধ্যে আবার প্রবলতম কোন্‌টি তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের ঐকমত্য ঘটতে দেখা যায় না বিশেষ। তারাশঙ্করের এই কাহিনী হয়তো বা সেই বিতর্কের একটা সুষ্ঠু সমাধানের পথ নির্দেশ দিতে পারে।

অধ্যাপক ফ্রয়েড এবং তাঁর চিন্তানুসায়ী মনোবিদ্‌রা বলে থাকেন যৌনবাসনাই হল মানুষের জীবনে প্রবলতম অভীপ্সা। পরিশীলিত হয়ে সেটাই প্রেমে রূপান্তর লাভ করে এবং জীবনের সমস্ত কিছুই পরিচালিত হয় তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রণোদনায়। প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে প্রেম যেখানে অনুপস্থিত, সেখানেও অলক্ষ্যসঞ্চিত যৌন-অভীপ্সাই নিয়ন্ত্রণ করে সব কিছু — এমনই সিদ্ধান্ত ফ্রয়েডপন্থীদের।

কিন্তু ক্ষুধা এবং আত্মরক্ষার তাড়নাই (বহুক্ষেত্রেই এই দুই ঈপ্সা আবার পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হয়ে থাকে) সম্ভবত প্রবলতর — কামনা (বা প্রেম) তাদের তুলনায় শেষ বিচারে পিছিয়ে পড়ে। যে সুখী ছিল তার ধ্যানজ্ঞান, যার আনন্দবিধানের জন্য সে মানুষের পরিহাস-বিদ্রূপও গায়ে মাখেনি, রাত-দুপুরে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরেও সে যে সুখীর গায়ে হাত না তুলে (যা তার সমতুল্য আর পাঁচটা কঠিন - শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে ছিল একান্তই স্বাভাবিক) তাকে নিয়ে গান গেয়ে, গয়না পরিয়ে আহ্লাদ করেছে — নিজের প্রাণটুককে রক্ষা করার সহজাত প্রবণতার পথে যখন নদীর ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে সেই সুখীই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল, তখন নিজেকে বাঁচানোর জৈবিক প্রণোদনায় তারিণী তাকেও 'দুই হাতে সুখীর গলা পেষণ করিয়া' হত্যা করে নিজের নিরাপত্তা সন্ধানে প্রয়াসী হয়েছে। অন্ধ আত্মরক্ষার তাড়নাই তার কাছে তখন সর্বব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রেম-নারী-সংসার-গৃহ-দাম্পত্য — সমস্ত কিছু সেই ভয়াল মৃত্যুর বিভীষিকার সামনে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অবশিষ্ট থেকেছে শুধুমাত্র ব্যাকুল জীবনাতিটুকুই। সুখীর সঙ্গে সঙ্গে তার অন্যান্য সমস্ত মানবিক বৃত্তি এবং আকাঙ্ক্ষাগুলিও তলিয়ে গেছে বানভাসি ময়ূরাক্ষীর বুকে মৃত্যুফাঁদস্বরূপ জলের অতলস্পর্শী ঘূর্ণির গহ্বরে।

অথচ, এই মানুষটির স্বাভাবিক প্রবণতাই ছিল বিপন্ন মানুষকে (এমন কি অবলা পশুকেও) জল থেকে তুলে আনার — প্রায়শই সেটা বিনা লোভেই। ঘোষবাড়ির কিশোরী বউটিকে উদ্ধার করে প্রাণ বাঁচানোর পরে পুরস্কার হিসেবে প্রথমে সে চেয়েছিল মাত্র আট আনা পয়সা — এক বোতল দেশি মদের দাম — তারপরে সাবি প্রমুখের তাগিদে তার হুঁস হয়েছে দামী কিছু চাওয়া যেতে পারে বলে। পাঁচ টাকা বকশিস পেয়ে, তার থেকে দু-টাকার সে অকাতরে দান করে দিতে পারে 'কেলে'-কে — সে ঐ উদ্ধারের কাজে আদৌ কোনো সহায়তা না করলেও! সুখীকে

মেরে ফেলবার সামান্য কিছু আগেই সে তো ঐ বিপর্যয়ী প্লাবনকে অগ্রাহ্য করেই জলে পড়ে যাওয়া শিশুকে নিজের প্রাণের মায়া না রেখে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিয়েছে তার মায়ের কোলে। সেখানে তো পুরস্কার-পার্বণীর কোনো দূরতম হাতছানিও ছিল না।

॥ ৪ ॥

প্রকৃতির দুই রূপ ঃ হনাত, সমাতি এবং প্রলয়ঙ্করী। ময়ূরাক্ষী যখন স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলে, তখন মানুষের মধ্যেও সেই ধীরতোয়া শান্ত ভাবটিই দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর। তখন তারিণীও খেয়াযাত্রীদের নিয়ে পরিহাস করে, মায় কালাচাঁদও। যাত্রীরাও করে। সেই রঙ্গ-রসিকতা, হাসি-গল্প ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিত পাল্টেযায়, যখন প্রবল খরায় সমস্ত এলাকাটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃতির নির্মম নিষ্ঠুরতা মানুষের পেটের ভাত, মাথার ছাদ এবং মুখের হাসি সবই কেড়ে নেয় তখন। এরপরে প্রকৃতি যখন ভয়ালতর রূপ ধরে বিধ্বংসী বন্যায়, তখনও মানুষের মানবীয় বৃত্তিগুলি প্রারম্ভিক ভাবে সচেতন থাকে (ভূপতে ভল্লার ছেলেকে তারিণীর নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বাঁচানো যার প্রমাণ), কিন্তু তারপরেই সংকট যত বাড়ে মানুষ আর সব ভুলে যায় — তর সমস্ত অস্তিত্ববোধ টিকে থাকে আদিম এবং হিংস্র মানসিক প্রবৃত্তির কাঠামোর ওপরে ভিত্তি করে, আত্মরক্ষার জন্য সে তখন পশুর মতো নৃশংস (সুখীর হত্যা যার নির্দশন)।

প্রকৃতি এবং মানুষের এই বিচিত্র পারস্পরিকতাকেও এই কাহিণীর মাধ্যমে সুনিপুণভাবে প্রতিবেদিত করেছেন তারাশঙ্কর। বীরভূমের মানুষ এবং প্রকৃতি — দুইই ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। প্রাকৃতিক বিপর্যয় — খরা, বন্যা ইত্যাদিকে যেমন তিনি আপন অভিজ্ঞতার তুলিতে চিত্রায়িত করেছেন, ঠিক একইভাবে ময়ূরাক্ষী পারের গ্রামীণ মানুষগুলিকেও বাস্তব করে তুলেছেন।

‘তারিণী মাঝি’ গল্পের এই বাস্তবধর্মিতারও একটি বিশেষ মাত্রা আছে। জীবনের নির্মম রূপটিকে এই কাহিনীতে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তাকে রিয়ালিজম বলার চেয়ে ন্যাচারালিজ্‌ম বলাই হয়ত বেশি বাঞ্ছনীয়। রূঢ় বাস্তবকে কোনো পেলব আস্তরণে না-মুড়ে, মানুষের মনের আদিম জান্তবতাকে যেভাবে এই গল্পে উন্মোচিত করা হয়েছে তাকে সাহিত্য-সমালোচনার পরিভাষায় ন্যাচারালিশ্‌টিকই বলতে হয়। তবে এভাবে সীমানাবদ্ধ করে একটি সৃষ্টির কুলপ্রতীক নির্দেশ অবশ্য সাম্প্রতিককালে বিশেষ আর করা হয় না। আসলে কাহিনীর এই আচম্বিত পরিণামের ফলশ্রুতিতে ‘তারিণী মাঝি’ একটি বন্দেজী ছোটগল্প বলে যেমন পরিগণ্য হয়, তেমনই আবার এই পরিণামেরই প্রেক্ষিতে এটিকে গ্রিক ট্রাজেডি-সুলভ ‘হ্যামার্তিয়া’ জনিত নিয়তি নির্দেশের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিও হয়ত বা বলা যায়।

॥ ৫ ॥

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এই গল্পটি সম্বন্ধে। তিনি লিখছেন ঃ ‘‘স্বয়ং লেখক বহুকাল পরে গল্পটিকে আবার স্মরণ করেছিলেন। প্রবন্ধে স্মরণ নয়, কাহিনীতে স্মরণ — একরকম রি-মেক। বার্ধক্যে ‘বিচারক’ নামে একটি ছোট উপন্যাস লিখতে গিয়ে তিনি নিজের পরিণত যৌবনকালকে তার ভাবনা-চিন্তা-বিশ্বাসকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন। অর্থাৎ এই তারিণী মাঝি লেখককে ভিতরে ভিতরে ভুগিয়েছিল অনেক বছর। অথবা তারিণী শুধুই উপলক্ষ্য। ওঁর অনেক গল্পই এই যন্ত্রণার উৎস হয়ে উঠেছিল। নিজের সৃষ্টি যখন তাড়া করে সে বড় কঠিন পলায়ন — নিজের কাছ থেকে বলেই না।’’ (তারাশঙ্কর ঃ অনুসন্ধান ’৯৮ / ১৯৯৮; পৃঃ ১২৮)

ক্ষেত্রবাবু যে মনোকূটের ইঙ্গিত করেছেন, তার বিস্তার গভীরপ্রসারী। 'বিচারক' উপন্যাসের নায়ক তাঁর প্রথমা স্ত্রীর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব — অন্ততপক্ষে নিজের মনের গভীরে অস্বীকার করতে পারেননি। পরবর্তী সমস্ত জীবনের প্রতিটি চেতন-মুহূর্তে তাঁকে সেই দায়িত্বচ্যুতিজনিত অপরাধবোধ যেন এক অনির্দেশ্য প্রেতচ্ছায়ার মতো অনুসরণ করে বেড়িয়েছে। তারিণী একান্তভাবেই জৈবিক এক প্রবৃত্তির অমোঘতার বশে প্রিয়তমা পত্নীকে হত্যা করে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে — আসন্ন মৃত্যুঘূর্ণির ভয়াল নাগপাশবন্ধন থেকে রেহাই পেয়ে সে খুঁজেছে বাতাস, আলো, মাটি। গল্পে তো ঐখানেই শেষ; পরবর্তী সময়ে তারিণী তার ঐ আচম্বিত অপরাধের গ্লানিতে জর্জর হয়েছে কি-না, গল্পকার তা আর জানাননি; জানালে গল্প আর 'ছোটগল্প' থাকত না, হয়ে উঠত উপন্যাস। কিন্তু ঔপন্যাসিক ঠিক সেইটিই করেছেন। ফলত, সে জিজ্ঞাসা অমীমাংসিত থেকে গেছে এই গল্পে, তাকেই সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যাখ্যান করেছেন তারাশঙ্কর তাঁর ঐ উপন্যাসে। গল্পে যা ছিল আংশিক, উপন্যাসে সেটাই হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ। একটু পার্থকয অবশ্য আছে ও-দুয়ের মধ্যে — প্রেমের প্রতিমা হওয়া সত্ত্বেও জীবনসঙ্গিনী সুখীকে তারিণী হত্যা করেছে এক লহমার মধ্যে, নিজেকে বাঁচাবার তাগিদে। আর 'বিচারক'-এর নায়ক তাঁর প্রেমহীন জীবনসঙ্গিনীকে উদ্ধার করেননি আগুণের মৃত্যুফাঁদ থেকে— হয়তো এভাবেই তিনি রেহাই পেতে চেয়েছেন জীবনের নিষ্করুণ অপ্রেম থেকে, অবচেতন বিতৃষ্ণার প্ররোচনায়। তারিণীর কাছে যা ছিল চেতনালুপ্ত সহজাত এক জৈবিক অভীপ্সা, 'বিচারক'-এর হাকিম সাহেবের কাছে সেটাই ছিল অবচেতন (না-কি, চেতন?) একটি গূঢ় কুটিল মনোকূট। তাই গল্প এবং উপন্যাস — দুয়ের মধ্যে সমধর্মিতা যতটাই থাকুক, বৈষম্যও কিছু কম নয়।

আসলে তারিণীর সত্তার অন্তর্গত বিচিত্র বৈপরীত্যের টুকরো-টুকরো ইঙ্গিত দিয়ে তার পরিপূর্ণ রূপটিকে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করেছেন গল্পকার। সে পত্নীপ্রাণ, ধর্মনিষ্ঠ, বন্ধুবৎসল, পরোপকারী, অকুতোভয়, পরিশ্রমী, এবং নেশাখোর, অহঙ্কারী, কটুভাষী; আবার পরিহাসপ্রিয়, বিনয়ী উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন, সেই সঙ্গেই দায়িত্বশীল, সরল, সৎ ও নির্লোভ। এত ধরনের বৈপরীত্য-সাদৃশ্যের সমাহারেও তার চরিত্রটি কিন্তু দুজ্ঞেয় হয়ে ওঠেনি। তাই কাহিনীর শেষ পরিণামে যখন তার প্রেম ও দায়িত্ববোধকে সে আক্ষরিক অর্থেই গলা টিপে মেরে আত্মরক্ষার আদিমতম প্রবৃত্তিকে উদ্‌ঘাটিত করল আজীবনের সুপ্তি-আচ্ছন্নতাকে এক লহমায় ঝেড়ে ফেলে — তখন সেই আচম্বিত পরিণতি পাঠকের মনকেও বিমূঢ় করে তোলে। এরই মধ্যে গল্পটির শিল্প-পরিণাম আত্মপ্রকাশ। করেছে। তারিণীর অবচেতনের ঐ আদিম হিংস্রতাকে উচ্চকিত করেছে বন্যায় উন্মত্ত হয়ে ওঠা ময়ূরাক্ষী নদীও। আর সমস্ত বিবাহিত জীবনভোর যে তাকে লতার মতো অবলম্বন করে বেঁচে থেকেছে নির্ভয় নিশ্চিন্ততায়, সেই সুখী — তার বউ — অতলজলের মধ্যে হারিয়ে গেল, তলিয়ে গেল ঐ চিরাভ্যস্ত নির্ভরতারই পরিণামে। কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে তাই 'তারিণী' এবং 'সুখী' নামদুটি যেন নির্মম পরিহাসের প্রবল নির্ঘোষে ধ্বনিত হয়ে গল্পের ট্রাজিক পরিণতির মধ্যে সৃষ্টি করল একটি অকল্পনীয় বৈপরীত্যের মাত্রা।

৬৫.৭ অনুশীলনী

□ বিস্তৃত আলোচনামূলক □

১) যে-সুখী, তারিণীর কাছে পৃথিবীতে একান্ততম প্রিয়জন ছিল, নিজের বাঁচবার তাগিদে তাকেই সে হত্যা করে বসল — এই কাহিনি পরিণাম কতখানি স্বাভাবিক ও সম্ভাব্য বলে মনে হয়?

২) ‘‘তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মানুষের মনোগহনের আলো-আঁধারিতে সন্ধিৎসু অভিযাত্রিক।’’ — ‘তারিণী মাঝি’ গল্পটির বিশ্লেষণ করে এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা কতটা, বিচার কর।

৩) রাঢ়-বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে তারাশঙ্করের যে গভীর পরিচয় ছিল, ‘তারিণী মাঝি’ গল্পে তা কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে দেখাও।

৪) ‘বিচারক’ উপন্যাস এবং ‘তারিণী মাঝি’ গল্প — দু’য়ের কাহিনি-কাঠামো মোটামুটি একই ছাঁচের হলেও, ভাবপরিণামে দুটি পৃথক হয়েছে কেন এবং কীভাবে, বল।

□ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক □

১) ময়ূরাক্ষীতে আসন্ন বন্যার সংকেত কীভাবে পাওয়া গিয়েছিল?

২) ময়ূরাক্ষীর বন্যার ফলে পারিপার্শ্বিক এলাকার চেহারা কেমন হয়?

৩) তারিণী-সুখীর দাম্পত্যজীবন কীভাবে কাটত?

৪) ‘‘ময়ূরাক্ষীর প্রসাদে’’ কীভাবে তারিণীর অন্নবস্ত্রের অভাব হয় না?

□ নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক □

১) ঘোষবাড়ির বধূটি জলে পড়ে গিয়েছিল কবে?

২) ‘তারিণী মাঝি’ গল্পের ঘটনাকাল কোন্ বছরের?

৩) বৃদ্ধা যাত্রিণীটি সাবিত্রীকে কীভাবে হাসতে বারণ করেছিলেন?

৪) যে বানের জলে ডুবে সুখীর মৃত্যু হয়, সেই বানের নাম কী?

৫) কত বছর আগে শেষবারের মতো সেই বান এসেছিল ময়ূরাক্ষীতে?

৬) তারিণী ‘‘ফাঁদি লত’’ বখশিস পাবার পর সাবি তাকে কী শুধিয়েছিল?

৭) তারিণীর খেয়া নৌকা কোথা থেকে কোথায়-কোথায় পাড়ি দিত?

৮) মদন গোপ তারিণীকে কেন বখশিস দিয়েছিলেন?

৯) কেষ্ট দাসের বাড়ি কোথায় ছিল?

১০) সুখীর কানের ফুল কীভাবে হয়েছিল?

১১) বর্ধমানে যারা মজুর খাটতে যাচ্ছিল, তারা কোন্ গাঁয়ের লোক?

১২) তারিণী কার ছেলেকে বন্যার জল থেকে বাঁচিয়েছিলেন?

৬৫.৮ উত্তরমালা

বিস্তৃত আলোচনামূলক

১) মূলপাঠ এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার দ্বিতীয় অংশের শেষাংশ ও তৃতীয় অংশের প্রথমার্থ অবলম্বনে উত্তর তৈরী করুন।

২) মূলপাঠ এবং আলোচনা পঞ্চম অংশের সাহায্যে উত্তর দিন।

৩) মূলপাঠ এবং আলোচনা চতুর্থ অংশের সহায়তায় উত্তর করুণ

৪) আলোচনার শেষাংশ অবলম্বনে উত্তর দিন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক

১) গল্পের শেষাংশ যেখানে খেয়ামাঝি তারিণী লক্ষ্য করেছে পশ্চিমা বাতাস বওয়া, কাকের কুটো সংগ্রহ, টিপ্‌টিপ জল প্রভৃতি। এ থেকে সংকেত পাওয়া গিয়েছিল। — এর সাহায্যে উত্তর করুন।

২) গল্পের শেষাংশে বন্যার জল প্রবল বেগে প্রবেশের যে বর্ণনা আছে তার সাহায্যে উত্তর তৈরী করুন।

৩) মূলপাঠ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনার সাহায্যে উত্তর দিন।

৪) মূলপাঠ-এ গল্পের প্রথমাংশে তারিণী-সুখীর সংলাপে এ পরিচয় আছে। এই অংশের সাহায্যে উত্তর প্রস্তুত করুন।

নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক

সংকেত নিষ্প্রয়োজন / মূলপাঠের সাহায্যে একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য রচনা করে উত্তর দিন।

৬৫.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় — *শ্রেষ্ঠ গল্প (সম্পাঃ জগদীশ ভট্টাচার্য)*

২) ড. সুবোধ সেনগুপ্ত (প্রথম সম্পাদক) — *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*

৩) ড. ভূদের চৌধুরী — *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*

৪) ড. ক্ষেত্র গুপ্ত — *তারাশংকর অনুসন্ধান* ’৯৮

৫) ড. বীরেন্দ্র দত্ত — *বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*

৬) ড. সত্যজিৎ চৌধুরী (সম্পাঃ) — *তারাশংকর ঃ শততম বর্ষাপন*

৭) ড. পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পাঃ) — *তারাশংকর ঃ আলোকিত দিগ্বলয়*

একক ৬৬ ❑ বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) ঃ গণেশ জননী

গঠন

৬৬.১ উদ্দেশ্য

৬৬.২ প্রস্তাবনা

৬৬.৩ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

৬৬.৪ মূলপাঠ ঃ গণেশ জননী

৬৬.৫ সারাংশ

৬৬.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

৬৬.৭ অনুশীলনী

৬৬.৮ উত্তরমালা

৬৬.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৬৬.১ উদ্দেশ্য

বনফুল (বলাইচাঁদ মুখ্যোপাধ্যায়) বাংলা ব্যঙ্গ কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক রচয়িতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তিনি এমন কতকগুলি উপন্যাস ও ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে উপহার দিয়েছেন— যা বাংলা কথাসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি গল্পের বিষয় ও চরিত্রগুলি আবিষ্কার করেছেন তাঁর আশপাশ থেকে। তাদের আচার আচরণ, কথাবার্তা, জীবনবোধকে তিনি তীক্ষ্ণ মননশীলতায় বিশ্লেষণ করেছেন এবং একান্তভাবেই শিল্পীর নিস্পৃহ মন নিয়ে তাঁর কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন। তাঁর নিত্যনূতন সৃষ্টি একাধারে বিস্ময় ও প্রগাঢ় রহস্য গ্রন্থি উন্মোচন করেছে। যার উৎস তাঁর শিল্পীসত্তার গভীরে। এজন্য তাঁর কোনো চরিত্রই একটি অপরটির অনুবর্তন করেনি। বনফুল কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক এই চতুরঙ্গ সাধনায় যেমন সফল, তেমনি বহু বিচিত্র রস পরিবেশনেও তাঁর তুলনা মেলা ভার। স্রষ্টা হিসাবে বনফুল বিচিত্রচারী। তাঁর গল্পের উপাদান ও উপস্থাপনাতেও অভিনবত্ব আছে। তাঁর রচনায় যেমন অভাবনীয় বিষয়ের অবতারণা থাকে, তেমনি বাক্‌সংক্ষিপ্তির পরিচয় থাকে। তাঁর রচনাশৈলী ও ভাবানুসঙ্গে এমন এক অনির্বচনীয়তা থাকে, যা গল্পকে রচনাতীত এক রহস্যঘন জগতে নিয়ে যায়।

লেখকের 'গণেশ জননী' গল্পে এরকমই এক অভাবনীয় বিষয়-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। একটু সংবেদনশীল মন নিয়ে গল্পটি পড়লে গৃহীদম্পতির জন্য একটি সূক্ষ্ম রচনাতীত অনির্দেশ্য অন্তরকে স্পর্শ করে। 'গণেশ জননী' গল্পটি ভালো করে পড়লে আপনি অবশ্যই কয়েকটি বিষয় লক্ষ করতে পারবেন—

১) গল্পটি স্বল্পায়তন ও নির্মেদ, অনেকটা রেখাচিত্রের মত।

২) গল্পটিতে সরকারি পশু চিকিৎসকের জীবনযাপনের গ্লানিকর বর্ণনা থেকে তার প্রতি সামাজিক অবিচারের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩) পশু-মানুষের বিচিত্র স্নেহ-মমতার দাবী-অভিমানের সম্পর্ক দেখতে পাওয়ার বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন।

৪) পশু চিকিৎসক হিসেবে চিকিৎসা করতে গিয়ে লেখক যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তার দ্বারা অভিভূত হয়ে ব্যক্তি জীবনের অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও ফিজ্ না নিয়ে যথার্থ ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন।

৫) বনফুল গল্পটিতে উপহার পাওয়া শিশু হাতিকে অবলম্বন করে নিঃসন্তান একটি গৃহস্থ পরিবারের যে বিচিত্র বাৎসল্য উৎসারিত ও অভাবিত মাতৃমূর্তি এঁকেছেন। এটি বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনা গুণে অনন্য শিল্পরূপ পেয়েছে।

৬) গৃহস্থ পরিবার ও চিকিৎসক চরিত্র বনফুলের বিরল সৃষ্টি।

৭) গল্পটি পাঠ করলেই আপনি বুঝতে পারবেন বিষয় ও চরিত্র ভাবনায় 'গণেশ জননী' অসামান্য একটি ছোটগল্প হয়ে উঠেছে।

৬৬.২ প্রস্তাবনা

বনফুল বাংলা কথা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক। তাঁর গল্পের সরস উপস্থাপনা তাঁকে স্মরণীয় করেছে। ব্যঙ্গ কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক চারটি ধারাতেই তাঁর সৃষ্টিশীল লেখনি অক্লান্ত। জগতজীবন সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা সীমাহীন। নতুন নতুন বিষয় ও আঙ্গিকে ছোটগল্পের শিল্প সৃষ্টিতে তাঁর তুলনা নেই। তাঁর কোনো গল্পেই বিষয়বস্তু ও গঠনের পুনরাবৃত্তি হয়নি। অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করলেও ছোটগল্পেই তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ। তাঁর ছোটগল্পের চরিত্রচিত্রশালায় অন্তহীন বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সমালোচক বনফুলের সৃষ্টির মূল্যায়ণে বলেছেন, তাঁর পরিকল্পনার মৌলিকতা, আখ্যানবস্তুর বিচিত্র উদ্ভাবনীশক্তি তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানব চরিত্রের অসামান্য রহস্যের উন্মোচন করে বিস্ময়-চমক সৃষ্টি করেছেন।

'গণেশ জননী' গল্পে শিশু হাতিটি উপহার হিসেবে পাওয়ায় নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রীর জীবনে বাৎসল্যের যে অভাবনীয় উৎসার ঘটেছে, তা অভিনব। সচ্ছল সংসারে সন্তানের অভাব যে বেদনা সৃষ্টি করেছিল, তাঁদের নিঃসঙ্গ অপূর্ণতার বেদনালোকে শিশু হাতিটি যেন পূর্ণতার প্রত্যাশা জাগিয়েছে। নিঃসন্তান একটি নারী নিজেকে, তাঁর মাতৃসত্তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন 'গণেশ'-কে অবলম্বন করে। আত্মজার মধ্যে যে আনন্দ-বাসনা মাতৃস্নেহরূপে জুড়িয়ে থাকে লেখক সেই রস-সৌন্দর্যকে এই গল্পে তুলে ধরেছেন।

বনফুলের গল্পে সবচেয়ে যেটা লক্ষণীয় তা হোল তাঁর একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপপ্রদান। ছোট ছোট গল্প কয়েকটি অনুচ্ছেদে সাজানো। শেষে থাকে একটি উন্মোচক পংক্তি। তিনি সাধারণত যা দেখেন, প্রত্যক্ষে যে অভিজ্ঞতা আছে, তাকে তাঁর নিজের মত করে সোজাসুজি বলিষ্ঠ অথচ সরল ভাষায় বলেন। তাই তাঁর গল্পে অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর নেই।

এবার 'গণেশ জননী' পড়লে আপনার এ সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধি ঘটবে।

৬৬.৩ বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্পের কথা

ভাগলপুরের বিশিষ্ট চিকিৎসক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় 'বনফুল' ছদ্মনামে লেখক হিসেবে সমধিক খ্যাত। পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে ১৩০৬ সালে ৪ঠা শ্রাবণ, ইংরাজী ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা মৃণালিনী দেবী ও বাবা ডাক্তার সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়। সত্যচরণের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার শিয়াখালা গ্রামে। জীবিকার প্রয়োজনে তিনি মণিহারী গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। বলাইচাঁদ প্রথমে সাহেবগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, পরে হাজারীবাগ সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে আই-এস.সি পাশ করে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। পরে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে স্থানান্তরিত হয়ে ১৯২৭-এ ডাক্তারি পাশ করেন। তিনি প্যাথলজিষ্ট হিসেবে ৪০ বছর কাজ করে অবসর নিয়ে ১৯৬৮ থেকে কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

স্কুলে পড়বার সময়েই তাঁর প্রথম কবিতা 'মালঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে 'প্রবাসী', 'ভারতী'তে বনফুল ছদ্মনামে অনেক কবিতা ও ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন। পরে 'বিচিত্রা', 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতিতে তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটক, রসরচনা ও ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশিত হয়। বনফুল চিকিৎসক হবার সূত্রেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের অজস্র মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। 'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'হাটে বাজারে', 'অগ্নীশ্বর' প্রভৃতি বহু বিখ্যাত উপন্যাসের (মোট সংখ্যা ৬০টির উপরে) লেখক হওয়া সত্ত্বেও বনফুলের প্রথম পরিচয় এক অনন্য ছোটগল্পকার হিসেবেই। খুব স্বল্পায়তন গল্প — কোনো কোনো সমালোচক যেগুলির নাম দিয়েছে 'গল্পিকা' — অথচ তার মধ্যেই জীবনের সূক্ষ্ম, জটিল ও বিচিত্র সব অনুভূতির সংকেত নিপুণ এক শিল্পীর দক্ষতায় তিনি ব্যঞ্জিত করেছেন অসংখ্যবার। ছোটগল্পের মধ্যে যে স্কেচধর্মিতার কথা বলা হয়ে থাকে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বনফুলের লেখা এই গল্পিকাগুলির কথা অবশ্যই বলা যেতে পারে। কবিতা এবং নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর খ্যাত সুপ্রচুর।

বনফুলের লেখা ছোটগল্পের বইয়ের সংখযা মোট ২৮টি। এদের মধ্যে 'বাহুল্য', 'তন্ত্রী', 'উর্মিমালা', 'অনুগামিনী', 'ছিটমহল', 'এক ঝাঁক খঞ্জন', 'অদ্বিতীয়া', 'বহুবর্ণ' প্রভৃতি বিশেষভাবে পরিচিত। এছাড়া 'পশ্চাৎপট' তার আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ। তাঁর গল্পে যেমন একটা মজলিশী ভঙ্গী দেখা যায়, তেমনই আবার অচিন্তিতপূর্ব কিছু আকস্মিকতায় কাহিনী তির্যকভাবে মোড় ঘোরে। আবার আপাতভাবে বর্ণনাত্মক একটা ভঙ্গী বজায় রেখেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মনোবিশ্লেষণও করেছেন। বস্তুতপক্ষে, বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহেই অন্যতম প্রধান পুরুষ।

বনফুল তাঁর সাহিত্যকৃতির জন্য ভারতসরকার থেকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন। তিনি রবীন্দ্র পুরষ্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক, ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট উপাধি লাভ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

৬৬.৪ মূলপাঠ ঃ গণেশ জননী

আমি পশু চিকিৎসা করি। যে দেশে অসুস্থ মানুষেরই ভাল করিয়া চিকিৎসা হয় না সে দেশে পশু চিকিৎসা করিয়া কি প্রকারে আমার জীবিকা নির্বাহ হয় এ প্রশ্ন যাঁহাদের মনে জাগিয়েতেছে তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত জানাইতেছি যে,

আমি সরকারী পশু-চিকিৎসা বিভাগে চাকুরি করি। কমিশনার সাহেবের ঘোড়া, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুকুর, পুলিশ সাহেবের গাভী প্রভৃতির স্বাস্থ্য-তদারক করিয়া ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া 'পাশ' করিয়া আমার অন্ন সংস্থান হয়। মনুষ্য-চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মতো নির্ভরযোগ্য 'প্র্যাকটিস' আমাদের নেই। এই পরাধীন দারিদ্র দেশে থাকিবার কথাও নয়। তবু মাঝে মাঝে দু একটা 'কল' জোটে। সেদিন এমনি একটি অপ্রত্যাশিত 'কল' জুটিল। একটি জরুরি তার পাইলাম। 'আমার হস্তী অসুস্থ — অবিলম্বে চলিয়া আসুন।' উল্লসিত হইলাম। মোটা টাকা পাওয়া যাইবে। যেখানে যাইতে হইবে তাহা ট্রেনযোগে সাত-আট ঘণ্টার পথ। এতদূর যাইতে হইবে, হাতীর অসুখ .... খুব কম করিয়া ধরিলেও দুইশত টাকা 'ফি' পাওয়া যাইবে। বাক্সপ্যাঁটরা বাঁধিয়া সানন্দে বাহির হইয়া পড়িলাম। সামনেই পুজা ... বিরাট পরিবার ... ভগবান জুটাইয়া দিয়াছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো গেল। মফস্বল জায়গা, ছোট গ্রাম। স্টেশনটি ছোট। বেশি যাত্রী নাই। সেকেন্ড ক্লাসে আমিই একমাত্র লোক। স্টাইল জাহির করিবার নিমিত্ত সেকেন্ড ক্লাস টিকিট করিয়াছিলাম। যিনি আমাকে স্টেশন হইতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন তিনি তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া হাতল ঘুরাইয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া সসম্ভ্রমে আমাকে প্রশ্ন করিলেন — ''আপনি কি ভেটেরেনারি সার্জন?''

''হ্যাঁ।''

''আসুন, আসুন, আমি আপনাকেই নিতে এসেছি।''

তাড়াতাড়ি আমার সুটকেসটা ভদ্রলোক তুলিয়া লইলেন। গোমস্তার মতো চেহারা। পায়ে মলিন ক্যাম্বিসের জুতা, গায়েও মলিন জামা কাপড়, একমুখ খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা গোঁপ-দাড়ি, পাঁচ-সাত দিন কামানো হয় নাই। আমি ভাবিলাম, যে জমিদারের হাতী ইনি বোধ হয় তাঁহারই কর্মচারী। ... স্টেশন হইতে বাহির হইলাম। আশা করিতেছিলাম মোটর বা ওই জাতীয় কিছু একটা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু দেখিলাম সে সব কিছুই নাই। ভদ্রলোক সাইকেল চড়িয়া আসিয়াছিলেন। সাইকেলটি স্টেশনের বাহিরে দেওয়ালে ঠেসানো ছিল। তিনি আমার জন্য একটা ছ্যাকড়া গাড়ি ঠিক করিয়া দিয়া সাইকেলে আরোহণ করিলেন। খানিকক্ষণ পরে ছ্যাকড়া গাড়ি একটি বাড়ির সম্মুখে থামিল। গাড়ির জানালা হইতে মুখ বাড়াইলাম। স্বল্পালোকে যে বাড়িটি চোখে পড়িল তাহা কোন বড়লোকের বাড়ি বলিয়া মনে হইল না। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি। এ বাড়ির মালিকের হাতী পুষিবার কথা নয়। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিব কিনা ভাবিতেছিলাম এমন সময় একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। সাইকেল যোগে তিনি আগেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। সাগ্রহে আহ্বান করিলেন, ''আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু আসুন — এই ঘরে — হ্যাঁ — '' তাঁহার বাহিরের ঘরটিতে গিয়া বসিলাম।

একটি চৌকি, একটি দড়ির ছেঁড়া খাটিয়া, এক নড়বড়ে টেবিল, গোট দুই ক্যালেণ্ডারের ছবি — ইহাই সে ঘরটিতে সাজসজ্জা। ভদ্রলোক আমার সুটকেসটি ঘরের এক কোণে নামাইয়া আমার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া বলিলেন — ''এক মিনিট বসুন, আমি একবার বাড়ির ভিতর থেকে আসি। দেখি, চা হ'ল কি না।''

''আমার রুগী কোথায়?''

''এইখানেই আছে। আমারই হাতী....''

ভদ্রলোক ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি বিস্মিত হইলাম। লোকটা রসিকতা করিতেছে না কি!

মিনিট খানেক পরেই তিনি হাতল ভাঙা ‘কাপে’ এক কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিলেন।

“আগে চা-টা খেয়ে নিন, তারপর রুগী দেখবেন।”

“হয়েছে কি?”

“বিশেষ কিছু নয়, খাওয়া বন্ধ হয়েছে।”

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, “আমার দিক থেকে অবশ্য সুবিধে, হাতীর খোরাক যোগাতে হচ্ছে না, কিন্তু গিন্নিও খাওয়া দাওয়া বন্ধ করেছে, তাই মুশকিলে পড়ে গেছি—” ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

“হাতী পুষেছেন কি শখ করে?”

প্রশ্নটা না করিয়া পারিলাম না।

“আরে না মশাই। জুটে গেছল, গরীব গেরস্ত মানুষ, হাতী পোষবার শখ হতে যাবে কেন—”

চায়ের খালি পেয়ালাটা পাশে নামাইয়া রাখিয়া বলিলাম, “কি রকম?”

“সে কি আজকের কথা! আমার কিছু ক্ষেত খামার আছে বুঝলেন, আপনাদের আশীর্বাদে চাকরি করে খেতে হয় না। বছর দশেক আগে একদিন অনেক রাত্রে মাঠ থেকে ফিরছি হঠাৎ নজরে পড়ল একটা লোক মুখ গুঁজড়ে মাঠের মাঝখানে পড়ে আছে... ঝুঁকে দেখলাম একেবারে অজ্ঞান। লোকজন ডেকে কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে এলাম। সেবা-শুশ্রুষা করাতে তার জ্ঞান হল। পরিচয় হতে জানতে পারলাম সে একজন কচ্ছি। ব্যবসাদার। ঘোড়া ছুটিয়ে মাঠামাঠি আসছিল, ঘোড়াটা তাকে ফেলে পালিয়েছে। পর দিনই তার লোকজন এসে পড়ল, ঘোড়াটিও পাওয়া গেল। আমাদের অনেক ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল সে। কয়েকদিন পরে দেখি একটা লোক ছোট্ট একটি হাতীর বাচ্চা নিয়ে এসে হাজির — সেই কচ্ছি ভদ্রলোক পাঠিয়েছেন। তিনি নাকি হাতীর ব্যবসা করেন। একটি চিঠিও লিখেছেন — আপনারা আমাদের প্রাণদান করেছেন, বিনিময়ে আপনাদের কি আর দিতে পারি, সামান্য উপহার পাঠালাম, গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব। হাতীর বাচ্চাটি দেখতে চমৎকার — তখন ছোট্ট ছিল — দুষ্টু দুষ্টু চোখ, ছোট্ট শুঁড়, খুব ভাল লাগল তখন। গিন্নি তো একেবারে আনন্দে আত্মহারা। বললে — ও আমার গণেশ এসেছে। বলেই একবাটি দুধ তার সামনে এগিয়ে দিলেন। বাস্, সেই থেকেই গণেশ থেকে গেল। আমাদের ছেলেপিলেও হয়নি, ওই গণেশই আমাদের সব।”

ভদ্রলোক চুপ করলেন। আমি সবিস্ময়ে শুনিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম — “আপনার এইটুকু বাসায় ওকে রাখেন কোথা?”

“উঠোনের দিকে জায়গা আছে অনেকখানি। তাছাড়া সব বাড়িটাই তো ওর — দরজা দেখছেন না — সব কেটে কেটে বড় করতে হয়েছে যাতে ও যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে পারে — আমরাই সসঙ্কোচে একধারে বাস করি”।

ভদ্রলোক অকৃত্রিম আনন্দে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

''গণেশের পান থেকে চুন খসবার জো নেই, তাহলেই গিন্নি তুলকালাম করবে। একশ বিঘে জমি আছে মশাই — যা কিছু হয় সব ওরই পেটে যায় — একটা হাতীর খোরাক, বুঝছেন না? পূজোর সময় ওর সাজ করিয়ে দিতে হয় — এবার গিন্নি একটা রূপোর ঘণ্টা করিয়ে দিয়েছে — স্যাকরার ধার শোধ করতে পারিনি এখনও ....

ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হাতী পোষার নানাবিধ অসুবিধার কথা সাড়ম্বরে বর্ণনা করিয়া গৃহিনীর ঘাড়ে তিনি দোষ চাপাইতেছেন বটে, কিন্তু গনেশকে লইয়া তিনি যে সত্যই বিব্রত তাহা তাঁহার হাসিমুখে দেখিয়া মনে হইল না।

''খুব পোষ মেনেছে?''

''পোষ মেনেছে মানে! গিন্নি যখন নাইতে যায়, বালতি-গামছা শুঁড়ে করে নিয়ে দোলাতে দোলাতে গণেশ পিছু পিছু যায়। গরমের দিনে রান্নাঘরে বসে গিন্নী যখন রাঁধে ও শুঁড়ে করে পাখা ধরে হাওয়া করে।''

''রান্নাঘরে ও ঢুকতে পারে?''

'আরে মশাই আমাদের ঘর কি আর মানুষের ঘর আছে, হাতীর ঘর হয়ে গেছে। এই বাইরের ঘরটিই যা ছোট, এ ছাড়া আর দুটি ঘর আছে — এক রান্না ভাঁড়ার আর একটি শোবার — দুটোই বিরাট 'হল' — মানে 'হল' করতে হয়েছে ওর জন্যে .... বাইরের ঘরের দরজাই দেখুন না ... এই দিক দিয়ে উনি বেড়াতে বেরোন ... কেটে বড় করতে হয়েছে ....''

''আপনাদের সব কথা বোঝে?''

''সমস্ত। মানুষ একেবারে। মান-অভিমান পর্যন্ত করে। এই যে খাওয়া বন্ধ করেছে, আমার বিশ্বাস সেটা অভিমানে।''

''কেন, কিছু হয়েছিল না কি?''

''বাগান থেকে ল্যাংড়া আম এসেছিল মশাই... মালী দিয়ে গিয়েছিল ... আমি বাড়ি ছিলাম না, গিন্নিও পাড়ায় কোথায় বেরিয়েছিল ... এসে দেখেন একটি আরও নেই। সব গণেশ খেয়েছে। তাই গিন্নি একটি চাপড় মেরে বলেছিলেন — রাক্ষস, সব খেয়ে বসে আছ, একটি রাখতে পার নি আমাদের জন্যে। সেই যে ফোঁস করে গুম মেরে বসেছে, তারপর থেকে আর জলস্পর্শ করেনি। এরকম মাঝে মাঝে করেও। একটু বকলে ঝকলেই খাওয়া বন্ধ করে করে দেয় .... কিন্তু এরকম একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা খাওয়া বন্ধ আর কখনও করে নি ... তাছাড়া অতগুলো আম খেয়েছে তো — ভয় হয়ে গেছে আমাদের.....'

ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল।

''চলুন দেখি গিয়ে।''

ভিতরে গিয়া দেখি একটি বিরাট 'হলে' প্রকাণ্ড শতরঞ্চির উপর গণেশ গুম হইয়া বসিয়া আছে। একটি ক্ষীণকায়া মহিলা তাহার শুঁড়ে মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে খাইবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতেছেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড একটি 'বাথ টব' কি একটা জলীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং তাহার পাশে লেবুর খোসার স্তূপ।

“খাও লক্ষ্মী তো — লেবু দিয়ে কেমন সুন্দর বার্লি করে এনেছি। চোখেই দেখ না একটু — ”

গণেশ কুলার মত কান দুটি নাড়িয়া ফোঁস করিয়া শব্দ করিল।

মহিলা আমার দিকে তাকাইয়া সজলকণ্ঠে বলিলেন, “ওর নিশ্চয় কোন অসুখ করেছে — ওকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন আপনি।”

দেখিলাম। রোগের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। গণেশ সম্পূর্ণ সুস্থ। ব্যাপারটা অভিমানই।

ফিরিবার সময় কর্তা বলিলেন — “আপনার দক্ষিণা কত দিতে হবে ডাক্তারবাবু—

‘অপরের কাছে হলে দু’শ টাকা নিতাম কিন্তু আপনার কাছে কিছু নেব না।”

‘না, না, তা কি হয়! এত কষ্ট করে এসেছেন—”

“না, আমি নেব না—”

কিছুতেই লইতে রাজী হইলাম না। তখন তিনি বারান্দায় গিয়া দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন — তাহলে আর টাকার দরকার হবে না পোদ্দার। গয়নাগুলো তুমি ফেরত দিয়ে যাও।”

বুঝিলাম গণেশজননী নিজের গহনা বন্ধক দিয়া আমার ‘ফি’ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

৬৬.৫ সারাংশ

যদি ‘গণেশ জননী’-র গল্পের প্লট হিসেবে কিছু খুঁজতে চান কেউ, তাহলে সম্ভবত তাঁকে হতাশই হতে হবে। কারণ অত্যন্ত সামান্য এর কথা-পরিসর; পরিণামও সেভাবে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। একটু মজা, একটু সমবেদনা — এক উৎকেন্দ্রিক অথচ স্নেহবৎসল নিঃসন্তান প্রৌঢ় দম্পতির জন্য কোথায় যেন একটা অনির্দেশ্য মৃদু বেদনার অনুভব — এই হল এর ভাববস্তু। একটি হাতি — যার নাম ঐ দপ্ততি রেখেছেন গণেশ — সে হল এই কাহিনীর, কেন্দ্রীয় চরিত্র। আর আছে এক সরকারি পশুচিকিৎসক। মোট এই চারজনকে নিয়ে এ গল্পের বিন্যাস। কমিশনারের ঘোড়া, ম্যাজিস্ট্রেটের কুকুর, পুলিশসুপারের গাই গরু ইত্যাদির চিকিৎসা করে এবং ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া ‘পাশ’ করে ডাক্তারবাবুর (যিনি এ গল্পের কথক) কোনোমতে দিন চলে। এরই মধ্যে, একদিন একটি টেলিগ্রামের মাধ্যমে একটি অসুসথ হাতি(র) চিকিৎসা করার ডাক পেলেন তিনি। উল্লসিত হয়ে (কেননা, নিশ্চয়ই কোনো জমিদারের হাতি! অতএব, ভাল ‘ফীজ্’ মিলবে — আশা এইটাই) ‘সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট’-ই কেটে ফেললেন ডাক্তারবাবু এবং যথাস্থানে গিয়ে জানতে পারলেন যে, ঐ হাতি আদৌ কোনো ধনী জমিদারের নয়, এক মধ্যবিত্ত কৃসি সম্পত্তিজীবী দম্পতির সন্তাবৎ পালিত পোষ্য মাত্র।

বছর কতক আগে অসুস্থ এক গুজরাটি ব্যবসায়ীকে মাঠ থেকে তুলে এনে সেবাশুশ্রূষা করে বাঁচানোর জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি ঐ প্রৌঢ় দম্পতিকে একটা বাচ্চা হাতি উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। নিঃসন্তান ভদ্রমহিলার কাছে অচিরেই সে হয়ে গেল ‘তাঁর’ গণেশ। এখন গণেশ বড় হয়েছে — তার চলাফেরার সুবিধে করার জন্য বসতবাড়ির সব দেয়াল কেটে দরজাগুলো বড় মাপে বানাতে হয়েছে। দেওয়াল ভেঙে বড় হলঘরও করে দিতে হয়েছে তাকে। গণেশ এখন তার ‘মা’ যখন নদীতে নাইতে যান, শুঁড়ে করে বালতি গামছা নিয়ে যায়;

তিনি যখন গরমের দিনে রাঁধতে বসেন, তখন রান্নাঘরের দুয়ারে পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুঁড়ে পাখা ধরে তাঁকে হাওয়া করে সে। স্বামী-স্ত্রীর দিবারাত্রির ধ্যানজ্ঞান ঐ হাতি 'গণেশ'। তাকে আদর করলে সে খুশি হয়; বকলে তার অভিমান হয় — রাগ করে খাওয়াদাওয়া অবধি বন্ধ করে দেয় সে। এই রকমই একটি ঘটনার সূত্রে এই ডাক্তারবাবুর কাছে টেলিগ্রাম গিয়েছিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির বাগান থেকে একঝুড়ি ল্যাংড়া আম এসেছিল। দিয়ে গিয়েছিল বাগানের মালী। ওঁরা কর্তাগিন্নি তখন কেউই বাড়িতে ছিলেন না। সেই অবসরে শ্রীমান গণেশ সবগুলি আমই উদরস্থ করে বসে। 'গণেশ জননী' বাড়ি ফিরে এজন্য একটু সস্নেহ শাসন করেছিলেন তাকে — 'রাক্ষস্ সব খেয়ে বসে আছ, একটিও রাখতে পারনি আমাদের জন্যে''—এই বলে আলতো একটি চাপড়ও বুঝি মেয়েছিলেন তিনি। সেই অভিমানে 'গণশঅ' খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে গুম হয়ে বসে আছে। 'গনেশ জননী' অবশ্য ধরেই নিয়েছেন খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করার কারণ এটাই যে, সে দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এর জেরে এবং তাঁরই নির্বন্ধে ডাক্তারবাবুকে 'কল' দেওয়া এভাবে।

ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝলেন যে, গণেশের কিছুই হয়নি — রাগ করেই তার এই অনশন ব্রত। ডাক্তার বাবুকে 'ফীজ্' দিতে এলেন কর্তা কিন্তু টাকা তিনি কিছুতেই নিলেন না — কারণ, মানুষ এবং পশুর মধ্যে এমন বিচিত্র স্নেহ-মমতা-দাবি-অভিমানের সম্পর্ক দেখতে পাওয়ার আশ্চর্য অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে সম্ভবত প্রত্যাশিত দুশো মুদ্রার চেয়ে ঢের বেশি দামী বলেই প্রতীত হয়েছিল। যাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তাঁর কানে এল কর্তা মৃদুকণ্ঠে কোনো এক পোদ্দারকে জানাচ্ছেন যে, টাকার আর দরকার হবে না — সে যেন গয়নাগুলো ফেরৎ দিয়ে যায়।.... অর্থাৎ গণেশের মা নিজের গায়ের গয়না বন্ধক দিয়ে তার চিকিৎসার জন্য টাকার জোগাড় করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

৬৬.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

মানুষ এবং পশুর মধ্যে নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক রূপকথা উপকথার মধ্যে হামেশাই দেখা যায়। পরিশীলিত সাহিত্যে অবশ্য এমন পরিপ্রেক্ষিত বিরল বললেই চলে। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' এই বিশেষ ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী' কিংবা 'কালাপাহাড়' এবং নারায়ণ সান্যালের 'গজমুক্তা' উপন্যাসটির কথাও এই সূত্রে বলা যায় স্বচ্ছন্দেই। শরৎচন্দ্রেরই 'রামের সুমতি' কিংবা তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' ও এই সূত্রের অনায়াসেই উল্লেখিত হতে পারে। 'মহেশ'-এ চাষের বলদটির সঙ্গে গফুর জোলার মমতামেদুর সম্পর্ক, 'নারী ও নাগিনী'-তে উদয়নাগিনীর সঙ্গে খোঁড়া শেখের কল্পিত দাম্পত্য (!), 'কালাপাহাড়'-এ পোষা ষাঁড়টির সম্পর্কে প্রবল স্নেহান্ধতা, 'গজমুক্তা'-য় জমিদারের পোষা হস্তিনীর সঙ্গে একটা ভাবাবেগের সম্বন্ধ, 'জলসাঘর'-এর জমিদারের ঘোড়ার প্রতি এবং 'রামের সুমতি'-তে একজোড়া কাতলা মাছের সম্পর্কে প্রায় আত্মীয়বন্ধন গড়ে ওঠা এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী' (ভাদ্র, ১৩২০) গল্পটির উল্লেখ আরও প্রাসঙ্গিক। প্রভাতকুমারের জয়রাম মোক্তার তাঁর একান্ত প্রাণপ্রিয় হাতি আদরিণীর সঙ্গে যেমন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। বনফুলের 'গণেশ জননীর' গৃহকর্তা ও গৃহিনী তেমনি একান্ত স্নেহের টানেই একাত্মতা অনুভব করেছেন। উভয় লেখকই মানবহৃদয়ের সঙ্গে মানবেতর প্রাণীর রাখীবন্ধন ঘটিয়েছেন।

জয়রাম বৃত্তিতে ব্যবহারজীবী হলেও তিনি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ধ্যানধারণা নিয়ে জন্মেছেন। গণেশ জননীর প্রধান দুটি চরিত্র ও কৃষি নির্ভর সমাজেরই মানুষ। সংসারের দৈনন্দিনতার অন্তরালে নিয়ত প্রবাহমান প্রাণ-ধর্মের এক রহস্য লোক যেমন আবিষ্কার করেছিলেন প্রভাতকুমার, তেমনি বনফুল 'গণেশ জননী'র সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেই হৃদয়-রসেরই সন্ধান দিয়েছেন। আদরিণী-জয়রাম কাহিনী প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার বলেছেন 'গল্পটির প্রায় চৌদ্দ আনা কথা সত্য। গল্পের এত সত্য ঘটনা আর কখনও আমি লিপিবদ্ধ করি নাই।' আর যাঁরা বনফুলের 'আমার কথা' পড়েছেন, তাঁরা জানেন তাঁর গল্প-উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্র পরিকল্পনার একটি বাস্তব থাকে। দুজনের গল্পের বিষয়বস্তু ও রসপরিণতি সাম্য, স্বভাবতই স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য।

মানুষ ও পশুর এই আত্মীয়বন্ধনই যদি গণেশ-জননীর একমাত্র উপকরণ হতো, তাহলে কিন্তু এর শিল্প এবং ভাবগত মূল্য এত বেশি হতো না। এই বিষয়টি কাহিনীর মুখ্য উপাদান ঠিকই, কিন্তু এর পাশাপাশি বেশ কিছু আর্থ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। সেগুলিই বরং আগে বিচার্য ঃ

একজন কৃতবিদ্য পশুচিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও গল্পের কথক নিতান্তই দারিদ্রের মধ্য দিন কাটান, এমন দেশের অবস্থা। তিনি সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ঐ দৈন্যদশার কোনো সুরাহা হয় না। কোনো এক জমিদারের বাড়ি থেকে চিকিৎসার জন্য 'কল' এসেছে ভেবে তিনি মোটা 'ফীজ' পাবার আশায় একেবারে সেকেন্ড ক্লাসেরই টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসেছেন (হয়ত জীবনে এই প্রথমবারের মতো!)—পকেটের তদানীন্তন অবস্থার বিচার না করেই।

আরো দুয়েকটি কথা এখানে বলার আছে। একজন গৃহস্থ, তার একশ বিঘে জমি আছে, ফলের বাগান আছে, তাঁকে চাকরীবাকরী করতে হয় না — তবুও তাঁকে স্যাকরার কাছে স্ত্রীর গয়না বন্ধক দিয়ে টাকার জোগাড় করতে হয়। অবশ্যই হাতির খোরাক জোটাতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু তাঁর আর কোনো সাংসারিক দায়দায়িত্বও নেই। সুতরাং এর থেকে এটাই বোঝা যায় যে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এমনই যে, সাধারণ বিচারে যাঁকে স্বচ্ছল গৃহস্থ বলে মনে হয়। তাঁর হাতেও সামান্য দুশোটা টাকা থাকে না, সেটা জোগাড় করতে তাঁকে গয়না বন্ধক দিতে হয়। ডাক্তারবাবু, কর্তা এবং গৃহিনী এঁদের প্রত্যেকের চরিত্রের মধ্যেই কিছু কিছু বিচিত্র বৈশিষ্ট্য আছে। যে ডাক্তারবাবু মোটামুটিভাবে অভাবের মধ্যেই দিনাতিপাত করেন, তিনিও কিন্তু সেধে দেওয়া দুশো টাকা, যা তাঁর বৈধ প্রাপ্যও বটে, হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। এক বিচিত্র 'মাতৃস্নেহ' দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছে বলেই সেই স্বার্থত্যাগ। দারিদ্র্যের দ্বারা বিব্রত হয়েও তিনি যে অর্থলোভী নন — এটা বিশেষ উল্লেখনীয়।

কর্তা গণশার 'পেটুকপনা' এবং নানাবিধ 'উৎপাত' নিয়ে মুখে যতই নিন্দা করুন না কেন — সেটা তাঁর মুখেরই কথা, মনের কথা নয়। তাঁর স্ত্রী প্রত্যক্ষতই নিঃসন্তান হবার দুঃখকে ভুলতে চেয়েছেন 'গণেশ' নামে ঐ হস্তিশাবকটিকে পুত্রবৎ গণ্য করে। আর তিনিও অন্তরের গভীরে সেই একই আবেগের ভাগীদার, মুখে সেটা বলেন না শুধু! যা কিছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আছে, আর সবই 'গণেশায় নমঃ' বলে উজাড় করে দিতে তাঁর একটুও বাধে না, একবারও মনে হয় না সব সম্বলটুকু খোয়ালে, বৃদ্ধ বয়সে দিন চলবে কীভাবে।

গৃহিনী ঠাকুরানী — যাঁকে 'গণেশ জননী' নাম দিয়েছেন বনফুল — তিনি তো টিপিক্যাল বাঙালি ঘরের মা, সন্তানকে মৃদু শাসন করার পরেই যেমন তার সম্ভাব্য 'অসুস্থতা' সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে সাধ্যসাধনা করেন প্রিয়

খাবারটি মুখের সামনে ধরে — এক্ষেত্রেও তার ব্যক্তিক্রম ঘটেনি। অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসার জন্য ব্যাকুল হয়ে নিজের গায়ের গয়নাগাঁটি বন্ধক দিয়ে 'আসল' মা যেমন টাকার জোগাড় করতে চেষ্টা করেন। এই হাতি-খোকার পালিকা মানবী-মাতাও ঠিক তেমনটিই করেছেন; একটুও পার্থক্য নেই কোথাও।

'গণেশ জননী' গল্পের শিল্প সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে এর মধ্যে যে-বিচিত্র ঐ বাৎসল্য, যে-অভাবিতপূর্ব মাতৃমূর্তি দেখা যায়, তার গভীরে। এক বাথটবভর্তি লেবু-বার্লির জল করে ঐ মানবী-মা তাঁর পালিত হাতি খোকনটির (যাকে তিনি 'অসুস্থ' বলে আশঙ্কা করছেন নিতান্ত অমূলকভাবেই!) সামনে ধরে সাধ্যসাধনা করছেন, যাতে সে সেই পথ্যটুকু খেয়ে একটু চাঙ্গা বোধ করে। এমন দৃশ্য তো কোটিকে গুটিক মেলে। এই দুর্লভ দৃশ্য দেখার নজরানা হিসেবে ডাক্তারবাবু তাঁর প্রাপ্য দুশোটি টাকা সাগ্রহে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, সেটা হয়ত বেশি কিছু নয়। এমন একটি মমত্বমেদুর দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী হবার বিরলপ্রাপ্য সুযোগ মিললে নিঃসন্দেহেই এর চেয়ে ঢের বেশি স্বার্থত্যাগ করা যায় অকাতরে।

স্কেচ-ধর্মী গল্প রচনাতে বনফুলের যে কৃতিত্বের কথা কিছু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে তার সুন্দর নিদর্শন মিলেছে। বস্তুতপক্ষে এর মধ্যে সেই অর্থে গল্পের উপাদান প্রায় কিছুই না-থাকা সত্ত্বেও, কাহিনিটি অত্যন্ত মনোরম লাগে পাঠকের কাছে। আসলে এর মধ্যে বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ে যে-আকুতি চিত্রায়িত হয়েছে, সেটাই এই রচনার চালিকাশক্তি।

৬৬.৭ অনুশীলনী

☐ বিস্তৃত আলোচনামূলক ☐

১) মানুষ ও পশুর মধ্যে যে নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক 'গণেশ জননী' গল্পে চিত্রায়িত হয়েছে, তার মূল্যায়ন করুন।

২) 'গণেশ জননী' গল্পটির ভাবসৌন্দর্য কোথায় নিহিত রয়েছে বিশ্লেষণ করে দেখান।

৩) আর্থ-সামাজিক গণ্ডীবন্ধনকেও মানবীয় হৃদয়াবেগ অতিক্রক করে যেতে পারে। 'গণেশ জননী' গল্পটি অবলম্বন করে এই বক্তব্যের যাথার্থ যাচাই করুন।

☐ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক ☐

১) গল্পের কথক কীভাবে তাঁর জীবিকা নির্বাহ করতেন?

২) গণেশ কী করে তার পালিকা 'মা'-এর কাছে এসেছিল?

৩) গণেশ তার পালিকা 'মা'-এর কেমন করে 'সেবা' করত?

৪) গণেশ রাগ করেছিল কি জন্যে?

৫) গণেশের চিকিৎসার খরচ কেমনভাবে জোগাড় করা হয়েছিল?

□ **নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক** □

১) বাগান থেকে কোন্ জাতের আম এসেছিল?

২) ডাক্তারবাবু ট্রেনের টিকিট কেটেছিলেন কোন্ ক্লাসের?

৩) ডাক্তারবাবুর বাড়ি যেখানে, সেখান থেকে গণেশ যেখানে থাকে, সেটা কতদূরে ছিল?

৪) যে ব্যবসায়ী গণেশকে উপহার পাঠিয়েছিলেন, তিনি কোথাকার মানুষ?

৫) গণেশের বয়স কত?

৬) ডাক্তারবাবুকে কিসে চা দেওয়া হয়েছিল?

৭) 'গণেশ'-এর বাড়ির বাইরের ঘরে কী কী ছিল?

৮) পূজোর সময় গণেশকে কী উপহার দেওয়া হয়েছিল?

৯) গণেশ কতক্ষণ 'অনশন ধর্মঘট' করেছিল?

১০) গণেশের চিকিৎসার বাবদে ফী হিসেবে কতটাকা ধার্য ছিল?

৬৬.৮ উত্তরমালা

বিস্তৃত আলোচনামূলক

সংকেত নিষ্প্রোয়োজন, মূলপাঠ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা অনুসরণে উত্তর করুন

□ **সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক** □

১) গল্পের কথক সরকারী পশু চিকিৎসক। তিনি কমিশনার সাহেবের ঘোড়া, ম্যাজিস্ট্রেটের কুকুর, পুলিশ সাহেবের গাভীর স্বাস্থ্য তদারক ও ছ্যাকড়া গাড়ীর 'ঘোড়া' পাশ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এছাড়া কচিৎ কদাচিৎ দু-একটি 'কল' জোটে।

২) গণেশের গৃহকর্তা বছর দশের আগে রাতে ফেরার সময় মাঠে একজনকে মুখ গুজে পড়ে আছে দেখে, তাকে বাড়ীতে নিয়ে এসে সেবা শুশ্রূষা করে সারিয়ে তোলেন। লোকটি কচ্ছি। হাতির ব্যবসাদার। তিনি কৃতজ্ঞতা বশে গৃহকর্তাকে ছোট হাতি, গৃহকর্ত্রী নাম রাখেন গণেশ,-কে উপহার দেন। এভাবে গণেশ তার পালিতা মা-র কাছে এসেছিল।

৩) গণেশ তার পালিতা মা নাইতে গেলে বালতি গামছা শুঁড়ে নিয়ে তার পিছু পিছু যেত। গরমের দিনে রান্না ঘরে মা-কে শুঁড়ে করে পাখা ধরে হাওয়া করত।

৪) বাগানের সবকটা ল্যাংড়া আম গণেশ খেয়ে ফেলায় গিন্নি একটি চাপড় মেরে বলেছিলেন, রাক্ষস, সবখেয়ে বসে আছে, একটিও রাখতে পারনি আমাদের জন্য। সেই থেকে রাঘ করে সে গুম মেরে বসেছিল।

৫) গণেশের চিকিৎসার জন্য গণেশ-জননী তার গহনা বন্ধক দিয়ে চিকিৎসকের 'ফি' সংগ্রহ করেছিল।

নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক

সংকেত নিষ্প্রয়োজন / মূলপাঠ ভাল করে পড়লে উত্তর করতে পারবেন।

৬৬.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১) বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) — *শ্রেষ্ঠ গল্প*

২) ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — *বাংলা উপন্যাসের ধারা*

৩) ড. ভূদের চৌধুরী — *বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার*

৪) ড. পবিত্র সরকার (সম্পা) — *বনফুল ঃ শতবর্ষের আলোয়*

একক ৬৭ ❑ সুবোধ ঘোষ ঃ সুন্দরম্

গঠন

৬৭.১ উদ্দেশ্য

৬৭.২ প্রস্তাবনা

৬৭.৩ সুবোধ ঘোষ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

৬৭.৪ মূলপাঠ ঃ সুন্দরম্

৬৭.৫ সারাংশ

৬৭.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

৬৭.৭ অনুশীলনী

৬৭.৮ উত্তরমালা

৬৭.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৬৭.১ উদ্দেশ্য

বাংলা কথা সাহিত্যে সুবোধ ঘোষের আভির্ভাব চল্লিশের দশকে। দেশের আকাশ-বাতাসে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালোছায়া। — রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতিতে প্রবল আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের উঠানেও এসে সে প্রবল আঘাতে আঘাতে সমস্ত কিছুকে ভাঙচুর করছে। এর প্রভাব থেকে বাংলা সাহিত্যের দূরে থাকা সম্ভব ছিল না। সুবোধ ঘোসের রচনাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এতদিন তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবারের পাতার গল্প নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করলেও নিজে কোন গল্প লেখেন নি। তাঁর গল্প লেখার সূচনা স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্যের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় 'অনামী সংঘের' সাহিত্যিক আড্ডার বন্ধুদের প্রেরণায় 'অযান্ত্রিক' ও 'ফসিল' দুই স্মরণীয় রচনায়। বন্ধুদের দ্বারা তো বটেই 'আনন্দবাজার বার্ষিকী' ও 'অগ্রণী' পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের দ্বারা বিপুল অভিনন্দিত হয়েছে। ছোটগল্প গ্রন্থ 'ফসিল' (১৯৪০)-এর পরে সংকলিত হয়। এই 'ফসিল'-এরই অন্যতম রচনা — 'সুন্দরম্' এ পর্বেই রচিত।

'সুন্দরম্' গল্পটি পাঠ করে আপনি সুবোধ ঘোষের গল্প রচনার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণের সঙ্গে তাঁর মানবচরিত্র অধ্যয়নের অসামান্য কৃতির পরিচয় পাবেন। সেগুলি হোল —

১) গল্পটিতে আপনি লেখকের সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাবেন।

২) বুঝতে পারবেন চরিত্রপ্রধান এই গল্পটি লেখক মনোবৈজ্ঞানিকের গভীর দৃষ্টি নিয়ে লিখেছেন।

৩) গল্পের নাম 'সুন্দরম'। লেখক সম্ভবত সৌন্দর্যতত্ত্বের অভিনব ব্যাখ্যা দেবার জন্যই এ নামকরণ করেছেন।

৪) পুত্রের বিবাহের যোগ্য পাত্রী সন্ধানকালে নারীর প্রতি যে নির্মম অবমাননা প্রকাশ পেয়েছে, তার একটি বাস্তবসম্মত চিত্র এ গল্পে তুলে ধরা হয়েছে।

৫) মধ্যবর্গীয় কৈলাস ডাক্তারের পরিবার এবং অবরবর্গীয় তুলসী-যদু-নিমাই শ্রেণী বিভাজিত সমাজে এদের স্বতন্ত্র অবস্থান। আর্থ-সামাজিক ভিত্তিও স্বতন্ত্র। শেষোক্ত শ্রেণীর প্রতিভূ যদুর গল্পের শেষ বাক্যটি যে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তা বুঝতে পারবেন।

৬) সুকুমার চরিত্রের অস্বাভাবিক আচরণ — আশৈশব নিরামিষ ভোজন, ব্রহ্মচর্য পালন ও সংযম অভ্যাস অনেকটা বাতিকে পরিণত হয়েছিল। এ হেন স্খলন-পতন অপ্রত্যাশিত হলেও অনেকটা নিয়মিত মতই অনিবার্য ছিল। গল্পের শেষ পরিণতি, এক দিক থেকে ট্র্যাজিক হলেও কতটা বাস্তব তা বুঝতে পারবেন।

৬৭.২ প্রস্তাবনা

মহৎ প্রতিভার আশ্রয়ে পুষ্ট তরুণ প্রজন্ম নতুনতর কিছু করার একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁদের ভাবনা চিন্তা অনেকটা বিপন্ন বোধ করে। ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল নয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে তরুণ লেখকদের মনে যে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা এবং বিদ্রোহী মনোভাব দানা বেধেছিল, তা থেকে মুক্তির আকাঙ্খা — তাঁদের সে সময়ের গল্প উপন্যাসে স্পষ্টত পাওয়া যায়। এ সময়ের বিপন্ন, বিরক্ত লেখকরা বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্রে বিশ্বসাহিত্য সংস্কৃতি প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি ও প্রতিক্রিয়ার বর্ণনায় কিছুটা প্রভাবিত হলেও বস্তুত সোভিয়েত বিপ্লবের শুরু ও সাফল্যে তাঁরা যেন নিশ্চিত আশ্রয় পেয়েছিলেন। নতুনতর ভিন্নতর সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলেন। কল্লোলের লেখকদের রচনায় তারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ও সমকালীন মন্বন্তর, গণ-আন্দোলন চল্লিশেক দশকের কথাসাহিত্যিকদের নতুনতর পথের দিশা নিয়ে আসে। সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই সূচনা পর্বে। বাংলার নতুন প্রজন্ম এ সময় নতুন যুগের নতুনতর ধ্যান ধ্যারণায় ছিল উদ্বেল। তাঁরা ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউটের ছত্রছায়ায় নতুনতর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বাতাবরণ তৈরী করছেন। সুবোধ ঘোষের গল্প 'ফসিল' অবলম্বনে 'অঞ্জনগড়' নাটক অভিনীত হচ্ছে। জার্মানীর ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বিশ্বের নানা দেশের লেখক-শিল্পীরা একত্রিত হয়ে সাম্যবাদের আদর্শ প্রচারের সঙ্কল্প নিচ্ছেন। শহরের সর্বত্র বিভিন্ন সভা-সমিতি গড়ে শিল্পী সাহিত্যিকরা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সঙ্কট উত্তরণের স্বপ্ন দেখছিলেন। ফসিল সেই স্বপ্নের 'ফসল'। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ হাত ধরাধরি করে সমাজের ধারক সর্বহারা শ্রমিক ও কৃষককে নিষ্পেষণ করে। তেমনি এক ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সর্বহারা শ্রেণীর দ্বন্দ্বের পরিচয় তুলে ধরে রাজনৈতিক সামাজিক ইতিহাসের ছবি তুলে ধরেছেন লেখক সুবোধ ঘোষ এই গল্পে। 'সুন্দরম' গল্পে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনস্তত্ত্বের অতি গূঢ় কিছু বিশ্লেষণ।

সুবোধ ঘোষের লেখায় বিশিষ্ট উপকরণ হল মনোবিকলন। সেটা কেবলমাত্র সমাজের শিক্ষিত মধ্যবর্গীয় মানুষদের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যতর স্তরের মানুষেরও মনের গভীরে তিনি প্রবেহ করেছেন তাঁর সুবিপুল অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গেই। ন্যায় ও অন্যায়, নীতি ও নীতিভ্রংশতা, সঙ্গত ও অসঙ্গতর সীমারেখা যে বহু সময়েই নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না, এই সুকঠিন সত্যটিকে তিনি বহুভাবে উদঘাটিত করেছেন তাঁর বিভিন্ন গল্পে। আর্থ-সামাজিক ইতিহাসকে সুবোধবাবু অন্বেষণ করেছেন। দার্শনিকের মতো নিরাসক্ত অথচ স্থিতপ্রজ্ঞভাবে। দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষের সাহচর্য তিনি প্রথম বয়সে পেয়েছিলেন। হয়তো সেটাই তাঁর এই স্থিতধী দ্রষ্টা রূপে শিল্পীসৃষ্টির অন্তরীক্ষে ছিল।

'সুন্দরম' সুবোধ ঘোষের লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত ছোটগল্পগুলির অন্যতম। শুধু এইটুকু বললে হয়ত এর প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দেওয়া যাবে না, কারণ যদি কেউ এটিকে বাংলাসাহিত্যের সেরা গল্পগুলির বর্গভুক্ত করেন, তাহলে তাঁর সঙ্গে দ্বিমত হওয়া খুব কঠিন। জীবনের নির্মম কিছু সত্য-উপলব্ধি এবং সামাজিক-অপহৃতকে অবলম্বন করে এই গল্প তৈরি করা হলেও, এর মাধ্যমে যে রূঢ় ব্যঙ্গকে উন্মোচিত করা হয়েছে, তার শিল্পগত মূল্যও কিন্তু খুব কম নয়। কীভাবে এই জটিল সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধগুলির অবক্ষয় ঘটে, তারও এক সুতীব্র উদঘাটন হয়েছে এই গল্পে। গল্পটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই বর্তমান আলোচনার যাথার্থ ও গল্পের রসাস্বাদন করতে পারবেন।

৬৭.৩ সুবোধ ঘোষ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

সুবোধ ঘোষের জন্ম বিহারের হাজারিবাগে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর (মৃত্যু ১০ই মার্চ, ১৯৮০) তাঁর বাবা সতীশচন্দ্র ও মা কনকলতা। তাঁদের আদি নিবাস অধুনা বাঙলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের 'বহর' গ্রামে। সতীশচন্দ্র কর্মব্যাপদেশে বিহার প্রবাসী হন। তিনি সরকারী জেলের অধঃস্তন কর্মচারী ছিলেন। সুবোধ ঘোষ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক বিশিষ্ট দার্শনিক পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঘোষের সান্নিধ্য ও তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি হাজারিবাগ জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে হাজারি বাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। সহাধ্যায়ী বন্ধুর বাবা নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে নৃতত্ত্বে আগ্রহ জন্মে। কিন্তু পরিবারের আর্থিক অনটনে পনের বছর বয়সেই জীবিকার সন্ধানে পথে নামতে বাধ্য হন। এ সময় তিনি ছ'মাস মেয়াদি প্রথম চাকরি — হাজারিবাগের দেহাতি কুলিবস্তিতে কলেরার মড়ক লাগায় মিউনিসিপ্যালিটি কর্মী হিসেবে টীকা দেওয়ার কাজ পান। এরপর তিনি বিহারের বিখ্যাত লাল মোটর কোম্পানির বাসের নাইট সার্ভিসে কণ্ডাকটর হিসেবে হাজারিবাগ থেকে ছোটনাগপুরের মালভূমিতে যাতায়াত করতেন। এই অভিজ্ঞতা থেকেই পরবর্তীকালে 'অযান্ত্রিক' গল্প লেখেন। পরে কিছুদিন তিনি সার্কাস পার্টিতেও কায়িকশ্রমের কাজ করেছেন। 'অঙ্গদ' গল্পে সে অভিজ্ঞতার ছাপ আছে। মাঝে 'হজ' যাত্রীদের টীকা দেওয়ার কাজ নিয়ে বোম্বাই এবং এডেন গিয়েছিলেন। কখনো বাড়ী থেকে উধাও হয়ে সন্ন্যাসী'র বেশে অজ্ঞাতবাস বা জিপসী দলের সঙ্গে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গিয়েছেন। অভ্রখানির সেটারকিপার ও সুপারভাইজারিও করেছেন একসময়। আবার স্বাধীন ব্যাবসার বাসনা নিয়ে কেক-পাউরুটি-ঘি-মাঘন সরবরাহের ব্যাবসাও করেছেন। এই সব বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে সুবোধ ঘোষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত।

অন্তহীন এই চলার পথে ঘুরতে ঘুরতে ঘোষ পরিবারের আকস্মিক ভাবে যোগাযোগ ঘটে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে। তাঁরই প্রবর্তনায় সুবোধ ঘোষ শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেসে প্রুফরীডারের কাজ পান। ছ'মাস পর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবাসরীয় বিভাগে স্থানান্তরিত হন। সে ১৯৪০-এর ১লা জানুয়ারীর কথা। ঐ একই দিনে কাজে যোগ দিয়েছিলেন সাগরময় ঘোষ। আর তখন থেকেই দুজনের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব।

সুবোধ ঘোষ প্রথম লেখেন 'প্রস্তর যুগের চিত্র কথা' (৪ঠা মে, ১৯৪০)। পরে ভবানীপাঠক ছদ্মনামে লিখেছেন 'ছোটনাগপুরের আদিবাসী' (৩০শে নভেম্বর, ১৯৪০)। তাঁর প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' ও পরে 'ফসিল' প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর জয়যাত্রার শুরু। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয়, ফিচার, কলাম প্রভৃতি লেখার পাশাপাশি গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৮০টি।

তাঁর 'তিলাঞ্জলি', 'ত্রিযামা', 'সুজাতা', 'জিয়া ভরলি' প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাস খ্যাতিলাভ করেছে। তবে ছোটগল্পকার হিসেবেই সুবোধবাবুর ব্যাপকতর প্রতিষ্ঠা। ১৫৭টি গল্প লিখেছেন তিনি সারাজীবনে। 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', 'জতুগৃহ', 'থিরবিজুরী', 'মনভ্রমণ' প্রভৃতি তিরিশটি গল্পগ্রন্থ এবং কতিপয় প্রবন্ধ গ্রন্থ তিনি লিখেছেন।

৬৭.৪ মূলপাঠ ঃ সুন্দরম্

সমস্যাটা হলো সুকুমারের বিয়ে। কি এমন সমস্যা! শুধু একটি মনোমত পাত্রী ঠিক করে শুভলগ্নে শাস্ত্রীয় মতে উদ্বাহ কার্য সমাধা করে দেওয়া; মানুষের একটা জৈব সংস্কারকে সংসারে পত্তন করে দেওয়া। এই তো।

কিন্তু বাধা আছে — সুকুমারের ব্রহ্মচর্য। বার বছর বয়স থেকে নিরামিষ ফোটা তিলক ধরেছে সে। আজও পায়ে সেধে তাকে মুসুরির ডাল খাওয়ান যায় না। সাহিত্য কাব্য তার কাছে অস্পৃশ্য। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া জীবনে সে পড়েছে ক'খানি যোগশাস্ত্রের দীপিকা। বাগানের নির্জন পুকুরঘাটে গভীর রাতে একাগ্র প্রাণায়ামে কতবার শিউরে উঠেছে তার সুষুম্না। প্রতি কুম্ভকে রেচকে সুকুমার অনুভব করেছে এক অদ্ভুত আত্মিক শক্তির তড়িৎস্পর্শ, শ্বাসে প্রশ্বাসে রক্তে ও স্নায়ুতে।

সুকুমার চোখ বুজলেই দেখতে পায় তার অন্তরের নিভলত কন্দরে সমাসীন এক বিবাগী পুরুষ। আবিষ্ট অবস্থায় কানে আসে, কে যেন বলছে — মুক্তি দে, মক্তি দে। জপ ছেড়ে চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পায়, কার এক গৈরিক উত্তরীয় ক্ষণিকের দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল বাতাসে।

সুকুমার বন্ধুদের অনেকবার জানিয়েছে — বাস্, এই এগজামিনটা পর্যন্ত, তার পর আর নয়। হিমালয়ের ডাক এসে গেছে আমার।

সুকুমারের বাবা কৈলাসডাক্তার বলতেন — প্রোটিনের অভাব। পেটে দুটো ভালো জিনিস পড়ুক, গায়ে মাংস লাগুক, এসব ব্যামো দু'দিনেই কেটে যাবে। কত পাকামি দেখলাম।

কিন্তু মা, পিসিমা, ছোটবোন রাণু আর ঝি, তাদের মন প্রবোধ মানে না।

সকলে মিলে চেপে ধরলো কৈলাসডাক্তারকে — যত শীগগির পার পাত্রী ঠিক করে ফেল আর দেরী নয়।

ঝিয়ের কোঁদল তো লেগেই আছে — ছি ছি, সংসারে থেকেও ছেলের বনবাস। ছোটজাতের ছোটঘরেও কেউ এমন কসাইপনা করে না বাপু।

সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হলো। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখবেন। ভগ্নীপতি কানাইবাবু, সুকুমারের মতিগতির চার্জ নিলেন। যেমন করে পারেন কানাইবাবু সুকুমারকে সংসারমুখো করবেন।

পাশের খবর বেরিয়েছে। কানাইবাবু সুকুমারকে দিয়ে জোর করে দরখাস্তে সই করালেন। নাও, সই কর। মুন্সেফী চাকরি ঠাট্টার নয়। সংসারে থেকেও সাধনা হয়। ঐ যাকে বলে, পাঁকাল মাছের মত থাকবে। জনকরাজা যেমন ছিলেন।

বাড়ির বিষন্ন আবহাওয়া ক্রমে উৎফুল্ল হয়ে আসছে। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখে এসেছেন। এখন সমস্যা সুকুমারকে কোন মতে পাত্রী দেখাতে নিয়ে যাওয়া। কানাইবাবু সকলকে আশ্বস্ত করলেন — কিছু ভাবনার নেই; সব ঠিক হো যায়েগা।

সংসারের ওপর সুকুমারের এই নির্লেপ, এখনও কেটে যায়নি ঠিকই! তবু একটু চাঞ্চল্য, আচারে আচরণে রক্তমাংসের মানুষের মেজাজ এক-আধটুকু দেখা দিয়েছে যেন।

তবু একবার পড়ার ঘরে কানাইবাবুর সঙ্গে সুকুমারের একটা বচসা শোনা গেল। বাড়ির সবারই বুক দুরদুর করে উঠলো। ব্যাপার কি?

কানাইবাবুর কথার ফাঁদে পড়ে সুকুমারকে উপন্যাস পড়তে হয়েছে, জীবনে এই প্রথম। নাভিমূলে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে, অগুরু পুড়িয়ে ঘরের বাতাস পবিত্র করে নিয়ে অতি সাবধানে পড়তে হয়েছে। বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম, কি হল বলা তো যায় না।

কিন্তু উপন্যাস না নরক। যতসব নীচ রিপুসেবার বর্ণনা। সমস্ত রাত ঘুম হয়নি, এখনও গা ঘিন ঘিন করছে।

সুকুমার বলে — আপনাকে এবার ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিলাম কানাইবাবু।

মানে অপমানে সম্পূর্ণ উদাসীন কানাইবাবু বললেন — আজ সন্ধ্যেয় সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাব তোমায়। যেতেই হবে ভাই, তোমার আজ্ঞাচক্রের দিব্যি। তা চাড়া ভাল ছবি, ধ্রুবের তপস্যা। মনটাও তোমার একটু পবিত্র হবে।

কানাইবাবুর এক্সপেরিমেন্ট বোধহয় সার্থক হয়ে উঠলো। ক'দিন পরেই দেখা গেল, সুকুমার কাব্য পড়ছে, কোন এক আখড়ায় গিয়ে মাথুর শুনে এসেছে, ঘন ঘন সিনেমার যাচ্ছে। এদিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পত্রও চলে এসেছে।

কিন্তু অনাসক্তির ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনি। আজকাল সুকুমারের অতীন্দ্রিয় আবেশ হয়। জ্যোৎস্না রাতে বাগানে একা বসে বসে নেবুফুলের সুগন্ধে মনটা অকারণে উড়ে চলে যায় — ধুলিধুসর সংসারে বন্ধন ছেড়ে যেন আকাশের নীলিমার সাঁতার দিয়ে বেড়ায়! একটা বিষন্ন সুখকর বেদনা। কিসের অভাব। কাকে যেন চাই। কে সেই না-পাওয়া? দীর্ঘশ্বাস চাপতে গিয়ে লজ্জা পায় সুকুমার।

রাত করে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরবার পথে কানাইবাবু সুকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন — নাচটা কেমন লাগলো?

সুকুমার সহসা উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে বললো — কানাইবাবু?

— কি?

— মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

— নিশ্চয়। কালই চল বারাসাত। যাদব ঘোষের মেয়ে বনলতা। তোমার মেজদি যেতে লিখেছে। আর বাবা তো আগেই দেখে এসেছেন।

উকীলের মুহুরী যাদব ঘোষ। বংশ ভাল আর মেয়ে বনলতা দেখতে ভালই। যাদব ঘোষ অল্প পণে সৎপাত্র খুঁজছেন।

মেজদি একটি বছর পনের বয়সের মেয়েকে হাত ধরে সামনে টেনে নিয়ে এলেন। — ভাল করে দেখে নে সুকু, মনে যেন শেএস কোন খুঁতখুঁত না থাকে।

যাত্রাদলের রাজকুমারীর মত মেয়েটাকে যতদূর সম্ভব জবরজং করে সাজানো হয়েছে। বিরাট একটা ঝকমকে বেনারসী শাড়ী আর পুরু সাটিনের জ্যাকেট। পাড়ার মেয়েদের কাছ থেকে বার করা চুড়ি রুলি বালা ও অনন্ত, কনুই পর্যন্ত বোঝাই করা দুটি হাত। ঘামে চুপসে গেছে কপালের টিপ, পাউডারের মোটা খড়ির স্রোত গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে গলার ওপর। মেয়েটি দম বন্ধ করে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যেন যজ্ঞের পশুর মত এসে দাঁড়ালো।

বনলতার শক্ত খোঁপাটা চট করে খুলে, চুলের গোছা দুহাতে তুলে ধরে মেজদি বললেন — দেখে নে সুকু। গাঁয়ের মেয়ে হলে হবে কি? তেলচিটে ঘাড় নয়, যা তোমাদের কত কলেজের মেয়ের দেখেছি। রামোঃ।

মেজদি যেন ফিজিয়লজি পড়াচ্ছেন। বনলতার থুতনিটা ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখালেন। চোখ মেলে তাকাতে বললেন — ট্যারা কানা নয়। পায়চারি করালেন — খোঁড়া নয়। সুকুমারের মুখের সামনে বনলতার হাতটা টেনে নিয়ে আঙুলগুলি ঘেঁটে ঘেঁটে দেখালেন — দেখছিস তো, নিন্দে করার জো নেই।

দেখার পালা শেষ হলো। বাড়ি ফিরে কানাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন — কি যোগীবর, পছন্দ তো?

সুকুমার চুপ করে বসে রইল। মুখের চেহারা প্রসন্ন নয়। কানাইবাবু বুঝলেন, এক্ষেত্রে মৌনং অসম্মতি লক্ষণং।

— সিনেমায় বনানী দেবীর নাচ দেখে দেখে চোখ পাকিয়েছ ভায়া, এ সব মেয়ে কি পছন্দ হয়। — কানাইবাবু মনের বিরক্তি মনে চেপে রাখলেন।

পিসিমা — ছেলের আপত্তি তো হবেই। হা-ঘরের মেয়ে এনে হবে কি? মুহুরী-টুহুরীর সঙ্গে কুটুম্বিতা চলবে না।

সুন্দরী মেয়ে চাই। এইটেই বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। কৈলাসডাক্তার পাত্রী দেখেছেন আর বিপদের কথা এই যে, তাঁর চোখে অসুন্দর তো কেউ নয়। তাই কৈলাসডাক্তার কাউকে সুন্দরী বলে সার্টিফিকেট দিলেই চলবে না। এ বিষয়ে তাঁর রুচি সম্বন্ধে সকলের যথেষ্ট সংশয় আছে। প্রথম ছেলে, জীবনসঙ্গিনী নিয়ে ঘর করতে হবে যাকে, তারই মতটা গ্রাহ্য। তারপর আর সকলের।

কৈলাসবাবু নিজে কুরূপ। কুৎসা করা যাদের আনন্দ তারা আড়ালে বলে 'কালো জিভ' ডাক্তার। ভদ্রলোকের জিভটাও নাকি কালো। যৌবনে এ গঞ্জনা কৈলাসডাক্তারকে মর্মপীড়া দিয়েছে অনেক। আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে এসে সেই পীড়িত মর্মের কোন অভিমান আর নেই।

বাংলোর বারান্দায় সোফায় বসে নির্দিষ্ট মনে কৈলাসডাক্তার এই কথাই ভাবছিলেন। এই রূপতত্ত্ব তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। আজ পঁচিশ বছর ধরে যে ঝানু সার্জন ময়নাঘরে মানুষের বুক চিরে দেখে এসেছে, তাকে আর বোঝাতে হবে না, কা'কে সোনার দেহ বলে। মানুষের অন্তরঙ্গ রূপ-এর পরিচয় কৈলাসডাক্তারের মত আর কে জানে! কিন্তু তাঁর এই ভিন-জগতের সুন্দরম্, তাকে কদর দেবার মত দ্বিতীয় মানুষ কৈ? দুঃখ এইটুকু।

হঠাৎ শেকল-বাঁধা হাউণ্ডটার বিকট চিৎকার আর লাফঝাঁপ। ফটক ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকলো মানুষের ব্যঙ্গমূর্তি কয়েকটি প্রাণী। যদু ডোম আর নিতাই সহিস দৌড়ে এল লাঠি নিয়ে।

যদু ও নিতাইয়ের গলাধাক্কা গ্রাহ্য না করে ফটকের ওপর জুত করে বসলো একটা ভিখারী পরিবার। নোংরা চটের পোটলা, ছেঁড়া মাদুর, উনুন, হাঁড়ি ক্যানেস্তারা, পিঁপড়ে ও মাছি নিয়ে একটা কদর্য জগতের অংশ। সোরগোল শুনে সবাই বেরিয়ে এল।

কৈলাসবাবু বললেন — কে রে এরা যদু? চাইছে কি?

— এ ব্যাটার নাম হাবু বোষ্টম, তাঁতীদের ছেলে। কুষ্ঠ হয়ে ভিক্ষে ধরেছে।

কুষ্ঠী হাবু তার পট্টিবাঁধা হাত দুটো তুলে বললো — কৃপা করো বাবা!

— এই বুড়ীটা কে?

— এ মাগীর নাম হামিদা। জাতে পশ্চিমা বেদিয়া, বসন্তে কানা হবার পর দলছাড়া হয়েছে। ও এখন হাবুরই বৌ।

হামিদা কোলের ভেতর থেকে নেকড়ার জড়ানো ক'মাসের একটা ছেলেকে দু'হাতে তুলে ধরে নকল কান্নায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে বললো — বাচ্চাকা জান হুজুর! এক পিয়ালী দুধ হুজুর! এক মুঠঠি দানা হুজুর!

— আর এই ধিঙ্গি ছুঁড়িটা কে? পিসিমা প্রশ্ন করলেন।

— ওর নাম তুলসী। হাবু আর হামিদার মেয়ে।

— আপন মেয়ে?

— হ্যাঁ পিসিমা। যদু উত্তর দিল।

তুলসী একটা কলাই-করা থালা হাতে চুপ করে বসে আছে। পরিধানে খাটো একটা নোংরা পর্দার কাপড়, বুকের ওপর থেকে গেরো দিয়ে ঝোলানো। আভরণের মধ্যে একটা কৌড়ির তাবিজ।

দেখবার মত চেহারা এই তুলসীর। বছর চৌদ্দ বয়স, তবু সর্বাঙ্গে একটা রূপ পরিপুষ্টি। ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মত কালি-মাড়া শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক। মাথার বেঢপ খুলিটা যেন একটা চোট লেগে টেরে বেঁকে গেছে। বড় বড় দাঁত, যেন একটা জন্তুর হিংসে ফুটে রয়েছে। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙেচুরে গেছে, ছন্নছাড়া বিক্ষোভে। এ মুখের দিকে তাকিয়ে দাতাকর্ণও দান ভুলে যাবে, গা শিরশির করবে। কিন্তু যদু বললো — তুলসীর ভিক্ষের রোজগারই নাকি এদের পেটভাতের একমাত্র নির্ভর।

হাবু ঠিক ভিক্ষে করতে আসেনি। মিউনিসিপ্যালটিটি এদের বস্তি ভেঙে দিয়েছে। নতুন আফিমের গুদাম হবে সেখানে। শহরের এলাকায় এদের থাকবার আর হুকুম নেই।

হাবু কান্নাকাটি করলো — একটা সার্টিফিকেট দিন বাবা। মুচিপাড়ার ভাগাড়ের পেছনে থাকবো। দীননাথের দিব্যি, হাটবাজারে ঘেঁষবো না কখনো। তুলসীই ভিক্ষে খাটবে, ওর তো আর রাগ বালাই নেই।

পিসিমা বললেন — যেতে বল, যেতে বল। গা ঘিন্ ঘিন্ করে। কিছু দিয়ে বিদেয় করে দে রাণু।

রাণু বললো — আমার ছেঁড়া ফ্লানেলের ব্লাউজটা দিয়ে দিই। এই শীতে তবু ছেলেটা বাঁচবে।

— হ্যাঁ দিয়ে দে। থাকে তো একটা ছেঁড়া শাড়িও দিয়ে দে। বয়স হয়েছে মেয়েটার, লজ্জা রাখতে হবে তো।

কৈলাসডাক্তার বললেন — আচ্ছা যা তোরা। সার্টিফিকেট দেব, কিন্তু খবরদার হাটবাজারে আসিস না।

হাবু তার সংসারপত্র নিয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেলে তুলসীর কথাটাই আলোচনা হলো আর একবার। কৈলাসবাবু হেসে বললেন — দেখলে তো সুন্দরী তুলসীকে। ওরই বিয়ে হয়ে যাবে, জানো?

ঝি উত্তর দিল — বিয়ে হবে না কেন? সবই হবে। তবে সেটা আর বিয়ে নয়।

কৈলাসবাবু একটি পাত্রী দেখে এসেছেন। নন্দ দত্তের বোন দেবপ্রিয়া। মেয়েটি ভালই, তবে সুকুমার একবার দেখে আসুক।

দেখানো হল দেবপ্রিয়াকে। মেদের প্রাচুর্যে বয়স ঠিক ঠাহর হয় না। চওড়া কপাল, ছোট চিবুক গোল গোল চোখ। গায়ের রঙ মেটে, কিন্তু সুমসৃণ। ভারি ভুরু দুটোতে যেন তিব্বতী উপত্যকার ধূর্ত একটা ছায়া, প্রচ্ছন্ন এক মঙ্গোলিনীকে ইশারায় ধরিয়ে দিচ্ছে। ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। সে বোধহয় জানে, তার এই অপ্রাকৃত পৃথুলতা লোক হাসাবার মতই। দেবপ্রিয়ার গলা মিষ্টি, গান গায় ভাল।

সুকুমার হ্যাঁ না কিছুই বলে না। বলা তার স্বভাব নয়। বোঝা গেল, এ মেয়ে তার পছন্দ নয়।

পিসিমাও বললেন — হবেই না তো পছন্দ। শুধু গলা দিয়েই তো আর সংসার করা যায় না। তা ছাড়া নন্দরা বংশেও খাটো।

কৈলাসডাক্তার দুশ্চিন্তায় পড়লেন। সমস্যা ক্রমেই ঘোরালো হচ্ছে। এ মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। নানা নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে একে একে। শুধু সুন্দরী হলেই চলবে না। বংশ, বিত্ত,শিক্ষা ও রুচি দেখতে হবে।

মাঝে পড়ে পুরুত ভটচায্যি আরও খানিকটা ইন্ধন জুগিয়ে গেছেন। সমস্যাটা ক্রমেই তেতে উঠেছে। ভটচায্যি বাড়ির সকলকে বুঝিয়ে গেলেন — নিতান্ত আধ্যাত্মিক এই বিয়ে জিনিসটা। কুলনারীর গুণ-লক্ষণ মিলিয়ে পাত্রী নির্বাচন করতে হবে। গৃহিণী সচিব সখি প্রিয়শিষ্যা, সব যাচাই করে দেখতে হবে। সারাজীবনের ধর্মসাধনার অংশভাগিনী, এ ঠাট্টার ব্যাপার নয়। ধরে বেঁধে একটা নিয়ে এলেই চলবে না। ওসব যাবনিক অনাচার চলবে না।

হ্যাঁ, তবে সুন্দরী হওয়া চাই-ই। কারণ সৌন্দর্য একটা দেবসুলভ গুণ।

এবার যতদূর সম্ভব সাবধানে, খুব ভেবেচিন্তে, কৈলাসডাক্তার এক পাত্রী দেখে এলেন। অনাদি সরকারের মেয়ে অনুপমা সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী।

অনুপমার বয়স একটু বেশি। রোগা বা অতি তন্বী দুই-ই বলা যায়। মুখশ্রী আছে কি না আছে তা বিতর্কের বিষয়। তবে চালচলনে সুরুচির আবেদন আছে নিশ্চয়। রূপে যেটুকু ঘাটতি তা পুষিয়ে গেছে সুশিক্ষার হ্লাদিনী গুণে।

প্রতিবাদ করলো রাণু। — না, ম্যাচ হবে না। যা ঝিরকুট চেহারা মেয়ের।

ঋসি বালকের মত কাঁচা মন সুকুমারে। হাঁ-না বলা তার ধাতে সম্ভব নয়। কিংবা অতিরিক্ত লজ্জা, তাও হতে পারে। তবে তার আচরণেই বোঝ গেল, এ বিয়েতে সে রাজী নয়।

পিসিমা বললেন — ভালই হল। জানি তো, কী কিপটে এই অনাদি চাষা। বিনা খরচে কাজ সারতে চায়। পাত্র যেন পথে গড়াচ্ছে।

দৈবজ্ঞ মশায় এসে পিসিমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন — পাত্রীর রাশি আর গণ খুব ভাল করে মিলিয়ে দেখবেন পিসিমা। ওসব কোন তুচ্ছ করার জিনিস নয়।

— সবই গ্রহের কৃপা। দৈবজ্ঞী সুকুমারের কোষ্ঠী বিচার করে বাড়ির সকলকে বড় রকম একটা প্রেরণা দিয়ে চলে গেলন। — যা দেখছি তা তো বড়ই ভাল মনে হচ্ছে। পাতকী রিষ্টি আর নেই, এবার কেতুর দশা চলেছে। এই বছরের মধ্যে ইষ্টলাভ। সুন্দরা রামা, রাজপদং, ধনসুখং। আর, অর কত বলবো।

— এই ছুঁড়ি ওখানে কি করছিস? কৈলাসবাবু ধমকে উঠলেন। সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনের বারান্দায় ফুলগাছের টবের কাছে বসে আছে তুলসী। হাতে কলাই-করা থালাটা।

যদু কেত্থেকে এসে একসঙ্গে হুমকি দিল। — ওঠ্ এখান থেকে হারামজাদি। কেমন ঘাপটি মেরে বসে আছে চুরির ফিকিরে।

কৈলাসডাক্তার বললেন — যাক্, গালমন্দ করিস নে। খিড়কির দোরে গিয়ে বসতে বল।

সামনে কানাইবাবুকে পেয়ে কৈলাসডাক্তার বললেন — কি কানাই? এবার আমাকে বিড়ম্বনা থেকে একটু রেহাই দেবে কি না? সুন্দরী পাত্রী জুটলো তোমাদের?

— আজ্ঞে না। চেষ্টার তো ত্রুটি করছি না।

— চেষ্টা করেও কিছু হবে না। তোমাদের সুন্দরের তো মাথামুণ্ড কিছু নেই।

— কি রকম?

—কি রকম আবার? চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত। এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে, শাশ্বত কালি দিয়ে?

একটু চুপ করে থেকে কৈলাসডাক্তার বললেন — পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি। ধন্যি বাবা কাশীরাম। একবার ভাব তো কানাই, কোনো ভদ্রলোকের যদি নাক থেকে কান পর্যন্ত ইয়া দুটো চোখ ছড়িয়ে থাকে, কী চীজ হবে সেটা।

কানাইবাবু বললেন — যা বলছেন। কত যে বাজে সংস্কারের সাত-পাঁচ রয়েছে লোকের। তবে মানুষের রূপের একটা স্ট্যান্ডার্ড অবশ্য আছে। অ্যানথ্রপলজিস্টরা যেমন বলেন ....।

— অ্যানথ্রপলজিস্ট না চামড়াওয়ালা। কৈলাসবাবু চড়া মেজাজে বললেন — আসুক একবার আমার সঙ্গে ময়নাঘরে। দুটো লাশের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। চিনে বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন নেগ্রিটো আর কে প্রোটো-অস্ট্রাল। দেখি ওদের বংশবিদ্যের মুরোদ। মেলা বকো না আমার কাছে।

কানাইবাবু সবে পড়ার পথ দেখলেন।

— জান কানাই, আমাকে আড়ালে সবাই কালোজিভ বলে ডাকে। বর্বর আর গাছে ফলে? একটা বাজে টাবু ছাড়বার শক্তি নেই, সভ্যতার গর্ব করে! আধুনিক হয়েছে! যত সব ফাজিলের দল!

কৈলাসডাক্তার ক্ষুব্ধ লাল চোখ দুটিকে শান্ত করে চুরুট ধরালেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যদাসের বাড়িতে ভাল একটি পাত্রী দেখে খুশি মনে কৈলাসডাক্তার ফিরলেন। ফটকে পা দিয়েই দেখলেন, সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনে বসে যদু আর নিতাই তুলসীর সঙ্গে হাসি-মস্কর করছে।

— এই রাস্কেল সব। কি হচ্ছে ওখানে?

তুলসী ওর থালা হাতে নিয়ে আর দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল। যদু নিতাই আমতা আমতা করে কিছু একটা গুছিয়ে বলতে বৃথা চেষ্টা করে চুপ করে রইল। কৈলাসবাবু সুকুমারকে ডেকে বললেন — ঘরের দোর খোলা রাখ কেন? সেই ভিখিরি ছুঁড়িটা কদিন থেকে ঘুরঘুর করছে এদিকে। খুব নজর রাখবে, কখন কি চুরি করে সবের পড়ে, বলা যায় না।

সুকুমারের মাকে ডেকে কৈলাসবাবু জানালেন — সত্যদাসের মেয়ে মমতাকে দেখে এলাম। একরকম পাকা কথাই দিয়ে এসেছি। এবার সুকুমার আর তোমরা দেখে এস। আমায় আর নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিও না।

যথারীতি মমতাকে দেখে আসা হলো। মমতার রূপে অসাধারণত্ব আছে, সন্দেহ নেই। যেন একটি অমাবস্যা কুমারী, ঘুটঘুটে কালো। সমস্ত-অবয়বে একটা সুপেশল কাঠিন্য। মণিবন্ধ ও কনুইয়ের মজবুত হাড় আর হাতপায়ের রোমঘন পারুষ্য পুরুষকে লজ্জা দেয়। চওড়া করোটির ওপর অতিকুঞ্চিত স্থূলতন্তু চুলের ভার, নীলগিরির চূড়ার ওপর মেঘস্তবকের দৃশ্যটা মনে পড়িয়ে দেয়। মূর্তির শিল্পীর অবশ্য খুশি হয়ে বলবেন, এ যেন এক দৃঢ়া দ্রাবিড়া নায়িকার মূর্তি। মমতার প্রখর দৃষ্টির সামনে সুকুমারই সঙ্কুচিত হল। বরমালা-কাঙাল অবলার দৃস্টি এ নয়; বরং এক অকুতোলজ্জা স্বয়ংবরার জিজ্ঞাসা যেন জ্বলজ্বল করছে মমতার দুই চোখে।

সত্যবাবু গুরপনার পরিচয় দিলেন — বড় পরিশ্রমী মেয়ে, কারণ স্বাস্থ্য খুব ভাল। ছাত্রীজীবনে প্রতিবছর স্পোর্টে প্রাইজ পেয়ে এসেছে।

মেয়ে দেখে এসে সুকমার মুখভার করে শুয়ে রইল। রাণু বললো — এ নিশ্চয় রাক্ষসগণ।

পিসিমাও একটু বিমর্ষ হয়ে বললেন — হ্যাঁ, সেই তো কথা। বড় হট্টাকট্টা চেহারা। নইলে ভাল বরপণ দিচ্ছিল, দানসামগ্রীও।

তবু কৈলাসডাক্তার তোড়জোড় করছেন। মমতারই সঙ্গে বিয়ে একরকম ঠিক। এবার একটু শক্ত হয়েছেন তিনি। দশজনের দশ কথার চক্রে আর ভূত সাজতে পারবেন না।

কিন্তু যা কখনও হয়নি, তাই হল। সুকুমারের প্রকাশ্য বিদ্রোহ। সুকুমার এবার মুখ খুলেছে। রাণুকে ডেকে নিয়ে জানিয়ে দিয়েছে — সত্যদাসের সঙ্গে বড় গলাগলি দেখছি, বাবার! ওখানে যদি বিয়ে ঠিক হয়, তবে একটু আগেভাগে আমায় জানাবি। আমি যুদ্ধে সার্ভিস নিচ্ছি।

কথাটা শুনে পিসিমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সুকুমারের মা রান্না ছেড়ে বৈঠকখানায় গিয়ে কৈলাসবাবুর সঙ্গে একপ্রস্থ বাকযুদ্ধ সেরে এলেন। কিন্তু ফল হল না কিছুই। কৈলাসবাবু এবার অটল।

সুকুমারের মা কেঁদে ফেললেন — ঐ হৃদকুচ্চিত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে! তোমার ছেলে ঐ মেয়ের ছায়া মাড়াবে ভেবেছ? এমন বিয়ে না দিয়ে ছেলের হাতে চিমটে দিয়ে বিদেয় করে দাও না।

কৈলাসবাবুর অটলতার ব্যতিক্রম হল না কিছুই। তিনি শুধু একটা দিন স্থির করার চেষ্টায় রইলেন।

সুকুমার মারমূর্তি হয়ে রাণুকে বললো — সেই দৈবজ্ঞীটা এবার এলে আমায় খবর দিবি তো।

— কোন্ দৈবজ্ঞী?

— ঐ যে বেটা সুন্দরী রামাটামা বলে গিয়েছিল। জিভ উপড়ে ফেলবো ওর।

আড়ালে দাঁড়িয়ে কৈলাসডাক্তার শুনলেন এ বার্তালাপ। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠলো তাঁর। সুকুমারের মাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন — কি পেয়েছ।

শঙ্কিত চোখে কৈলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে সুকুমারের মা বললেন — কি হয়েছে?

— ছেলের বিয়ে দিতে চাও?

— কেন দেব না?

— সৎপাত্রী চাও, না সুন্দরী পাত্রী চাও?

সুকুমারের মা ভেবে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন — সুন্দরী পাত্রী।

— বেশ তবে লিখে দাও আমাকে, সুন্দরী কাকে বলে। তন্বী শ্যামা পক্কবিম্বাধর, আরও যা আছে সব লিখে দাও। আমি সেই ফর্দ মিলিয়ে পাত্রী দেখবো।

এই বিদঘুটে প্রস্তাবে সুকুমারের মা'র মেজাজও ধৈর্য হারাবার উপক্রম করলো। তবু মনের ঝাঁজ চেপে নিয়ে বললেন — তার চেয়ে ভাল, তোমায় পাত্রী দেখতে হবে না, আমরা দেখছি।

— ধন্যবাদ। খুব ভাল কথা। এবার তা হলে আমি দায়মুক্ত।

— হ্যাঁ।

কৈলাসডাক্তার এখন অনেকটা সুস্থির হয়েছে। হাসপাতালে যান আসেন। রুগী নিয়ে, ময়নাঘরের লাশ নিয়ে দিন কেটে যায়। যেমন আগে কাটতো।

বাগানের দিকে একটা হট্টগোল। কৈলাসডাক্তার এগিয়ে গিয়ে দেখেন, যদুডোম আর নিতাই তুলসীকে ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে টেনে বাগানের ফটক দিয়ে বার করে দিচ্ছে।

— কি ব্যাপার নিতাই?

— বড় পাজি এ ছুঁড়িটা, হুজুর। পয়সা দেয়নি বলে দাদাবাবুর ঘরে ঢিল ছুঁড়ছিল। আর, এই দেখুন আমার হাত কামড়ে দিয়েছে।

কৈলাসডাক্তার বললেন — বড় বাড় বেড়েছে ছুঁড়ির। ভিখিরীর জাত, দয়া করলেই কুকুরে মত মাথায় চড়ে। কেবলই দেখছি মাস তিন চার থেকে শুধু এদিকেই নজর। এবার এলে পুলিশে ধরিয়ে দিবি।

তুলসী ফটকের বাইরে গিয়েও মত্ত বাতুলীর মত আরও কয়েকটা ইটপাটকেল ছুঁড়ে চলে গেল। কৈলাসডাক্তার বললেন — সব সময় ফটকে তালা বন্ধ রাখবে।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা। অনেক রাতে রুগী দেখে বাড়ি ফিরতেই কৈলাসডাক্তার দেখলেন, ফটক খুলে অন্ধকারে

চোরের মত পা টিপে-টিপে সরে পড়ছে তুলসী। কৈলাসবাবুকে দেখে আরও জোরে দৌড়ে পালিয়ে গেল। কৈলাসডাক্তার হাঁক দিতেই যদু ও নিতাই হাজির হল লাঠি হাতে।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কৈলাসডাক্তার বললেন — এ কি? ফটক খোলা, বারান্দায় আলো জ্বলছে, সুকুমারের ঘরে আলো, আমার বৈঠকখানা খোলা; তোমরা সব জেগেও রয়েছ, অথচ ছুঁড়িটা বেমালুম চুরি করে সরে পড়লো।

কৈলাসডাক্তার সমস্ত ঘর তন্নতন্ন করে দেখলেন। — আমার ঘরটা সব তছতছ করেছে কে? টেবিল থেকে নতুন বেলেডোনার শিশিটাই বা গেল কোথায়?

অনেকক্ষণ বকাবকি করে শান্ত হলেন কৈলাসডাক্তার। কিছু চুরি হয়নি বলেই মনে হল।

পরের দিন। দিনটা আজ ভাল নয়। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে আছে। কানাইবাবু এসে কৈলাসডাক্তারকে জানালেন — সুন্দরী পাত্রী পাওয়া গেছে। জগৎ ঘোষের মেয়ে। সুকুমার এবং আর সবারও পছন্দ হয়েছে। বংশের শিক্ষায় ও গুণে কোন ত্রুটি নেই।

কৈলাস ডাক্তার বললেন — বুঝলাম, তোমরা কল্পতরুর সন্ধান পেয়েছ, সুখবর।

— আপনাকে আজ রাত্রে আশীর্বাদ করতে যেতে হবে।

— তা, যাব।

যদুডোম এসে তখুনি খবর দিলে, তিনটে লাল এসেছে ময়না তদন্তের জন্য। কৈলাসডাক্তার বললেন — চল রে যদু। এখনি সেরে রাখি। রাত্রে আমার নানা কাজ রয়েছে।

ময়না ঘরে এসে কৈলাসডাক্তার বললেন — বড় মেঘলা করেছে রে। পেট্রোমাক্স বাতি দুটো জ্বেলে দে।

যন্ত্রপাতিগুলো গামলায় সাজিয়ে আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে কৈলাসডাক্তার বললেন — রাত হবে নাকি রে যদু?

— আজ্ঞে না। দুটো আগুনে পোড়া লাশ, পচে পাঁক হয়ে গেছে। ও তো জানা কেস, আমি চিরে ফেড়ে দেব। বাকি একটা শুধু ....।

— নে কোনটা দিবি, দে! কৈলাসডাক্তার করাত হাতে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন।

লাশের ঢাকাটা খুলে ফেলতেই কৈলাসডাক্তার চমকে উঠলেন — অ্যাঁ, এ কে রে যদু?

যদু ততক্ষণে আলগোছে সরে পড়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৈলাসডাক্তারের প্রশ্নে ফিরে এসে বললো — হ্যাঁ হজুর, তুলসীই, সেই ভিখিরী মেয়েটা।

কৈলাসডাক্তার বোকার মত যদুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। যদু চটপট হাত চালিয়ে তুলসীর নোংরা শাড়ীটা আর গায়ের ছেঁড়া কোটটা খুলে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। আবার বাইরে যাবার চেষ্টা করতেই কৈলাসডাক্তার বললেন — যাচ্ছিস কোথায়? স্পিরিট দিয়ে লাশটা মোছ ভাল করে। ইউক্যালিপটাসের তেলের বোতলটা দে। কিছু কর্পূর পুড়তে দে, আরও একটা বাতি জ্বাল।

— ওয়ান মোর আনফর্চুনেট।

কথাটার মধ্যে যেন একটু বেদনার আভাস ছিল। তুলসীর লাশে হাত দিলেন কৈলাসডাক্তার।

করাতের দু'পোঁচে খুলিটা দুভাগ করা হল। কৈলাসডাক্তারের হাতের ছুরি ফোঁস ফোস করে সনিশ্বাসে নেচে কেটে চললো লাশের উপর। গলাটা চিরে দেওয়া হল। সাঁড়াশি দিয়ে পটপট করে পাঁজরাগুলো উল্টে দিলেন কৈলাসডাক্তার।

যেন ঘুমে ঢলে রয়েছে তুলসীর চোখের পাতা। চিমটে দিয়ে ফাঁক করে কৈলাসডাক্তার দেখলেন, নিশ্চল দুটি কণীনিকার যেন নিদারুণ কোন অভিমানে নিষ্প্রভ হয়ে আছে। শুকিয়ে কুঁচিয়ে গেছে চোখের শ্বেতপটল। সুজলা অশ্রুশীলা নাড়ীগুলো অতিস্রাবে বিষণ্ণ।

— ইস, মরার সময় মেয়েটা কেঁদেছে খুব। কৈলাসডাক্তার বললেন।

যদু বললো — হ্যাঁ হুজুর, কাঁদবেই তো। সুইসাইড কিনা। করে ফেলে তো ঝোঁকের মাথায়। তারপর খাবি খায়, কাঁদে আর মরে।

— গলা টিপে মারেনি তো কেউ? কৈলাসডাক্তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। কৈ কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। গুচ্ছ গুচ্ছ অম্লান স্বররজ্জু, শ্বাসবহা নালিটাও তেমনি প্রফুল্ল। অজস্র লালায় পিচ্ছিল সুপুষ্ট গ্রসনিকা।

— এত লালা! মরবার আগে মেয়েটা খেয়েছে খুব পেট ভরে।

— হ্যাঁ হুজুর, ভিখিরি তো খেয়েই মরে।

দেহতত্ত্বের পাকা জহুরী কৈলাসডাক্তার। তাঁকে অবাক করেছে আজ কুৎসিতা এই তুলসী। কত রূপসী কুলবধুর, কত রূপাজীবা নটীর লাশ পার হয়েছে তাঁর হাত দিয়ে। তিনি দেখেছেন তাদের অন্তরঙ্গ রূপ, ফিকে ফ্যাকাশে ঘেয়ো। তুলসী হার মানিয়েছে সকলকে। অদ্ভুত।

বাতিটা কাছে এগিয়ে নিয়ে কৈলাসডাক্তার তাকিয়ে রইলেন — প্রবাল পুষ্পের মালঞ্চের মত বরাঙ্গের এই প্রকট রূপ, অছদ্ম মানুষের রূপ। এই নবনীতপিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সুসূক্ষ্ম কৈশির জাল।

কৈলাসডাক্তার তেমনই বিমুগ্ধ হয়ে দেখলেন — থরে বিথরে সাজানো সারি সারি রক্তিম পর্শুকা। বরফের কুচির মত অল্প অল্প মেদের ছিটে। মজ্জাস্থি ঘিরে নেমে গেছে প্রাণদা নীলার প্রবাহিকা।

কৈলাসডাক্তার বাতিটাকে আরও কাছে এগিয়ে নিয়ে আর দুচোখ অপলক করে দেখতে থাকেন — খণ্ডস্ফটিকের মত পীতাভ ছোট বড় কত গ্রন্থির বীথিকা। প্রশান্ত মুকুটধমনী। সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বুদ্বুদ। গ্রন্থিক্ষীরে নিষিক্ত অতি অভিরাম এই অংশপেশীর স্তবক আর তরুণাস্থির সজ্জা ঝাঁপিখোলা রত্নমালার মত আলোয় ঝলমল করে উঠলো।

আবিষ্ট হয়ে গেছেন কৈলাসডাক্তার। কুৎসিতা তুলসীর এই রূপের পরিচয় কে রাখে? তবুও এ তিমিরদৃষ্টি হয়তো ঘুচে যাবে একদিন। আগামী কালের কোন প্রেমিক বুঝবে এ রূপের মর্যাদা। নতুন অনুরাগের তাজমহল হয়তো গড়ে উঠবে সেদিন। যাক্

কৈলাসডাক্তার আবার হাতের কাজে মন দিলেন। যদু বললো — এ সবে কোন জখম নেই হুজুর। পেটটা দেখুন।

ছুরির ফলার এক আঘাতে দুভাগ করা হল পাকস্থলী। এইবার কৈলাসডাক্তার দেখলেন, কোথায় মৃত্যুর কামড়। ক্লোমরসে মাথা একটা অজীর্ণ পিণ্ড — সন্দেহ পাউরুটি আর ... আর বেলেডোনা।

— মার্ডার।

হাতের ছুরি খসে পড়লো মেঝের ওপর। সে শব্দে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কৈলাসডাক্তার।

উত্তেজনায় বুড়ো কৈলাসডাক্তারের ঘাড়ের রগ ফুলে উঠলো দপ দপ করে। পোখরাজের দানার মত বড় বড় ঘামের ফোঁটা কপাল থেকে ঝরে পড়লো মেঝের ওপর।

হঠাৎ ছটফট করে টেবিলের কাছে আবার এগিয়ে এলেন কৈলাসডাক্তার। ছোঁ মরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদ করলেন। নিকেলের চিমটের সুচিক্কন বাহুপুটে চেপে নিয়ে, স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে তুলে ধরলেন, পরিশুল্কে ঢাকা সুডৌল সুকোমল একটি পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্বর, মানব জাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট ও কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে একটি শিশু এশিয়া।

আবেগে কৈলাসডাক্তারের ঠোটটা কাঁপছিল থরথর করে। যদু এসে ডাকালো — হুজুর।

ডেকে সাড়া না পেয়ে যদু বাইরে গিয়ে তিনিই সহিসের পাশে বসলো।

নিতাই জিজ্ঞেস করে — এত দেরী কেন রে যদু?

— শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।

৬৭.৫ সারাংশ

একটি মধ্যবিত্ত বাড়ির এক অদ্ভুত স্বভাবের ছেলে সুকুমার। বাবা কৈলাসবাবু মফঃসল শহরের সরকারি ডাক্তার। বাড়ির অন্য সকলে গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের লোকজন যেমন হয়, তেমনই। ব্যতিক্রম শুধু সুকুমার। আকৈশোর ব্রহ্মচর্য এবং সংযম তার বাতিকে পরিণত হয়েছে। তার বাবার মতে সেটা আসলে নিরামিষভোজী সুকুমারের শরীরে প্রোটিন পদার্থের ঘাটতিজনিত কারণে। এ হেন সুকুমার পড়াশুনো শেষ করে চাকরি পাওয়ার পথে। হবু-মুন্সেফ সায়েবের জন্য পাত্রী খোঁজ শুরু হয় কাজেকাজেই। আপাদমস্তক ব্রহ্মচর্যের বর্ম-আঁটা সুকুমারকে সংসারদুরস্ত জ্ঞানগম্যি দেবার জন্য তার জামাইবাবু কানাই তাকে নভেল পড়ান, সিনেমায় নিয়ে যান জোর করে। প্রথম প্রথম সুকুমার রাগ-বিরক্তি দেখালেও অচিরেই নমনীয় হয়ে আসে এবং বাড়ির লোকে প্রবল উদ্যমে পাত্রী দেখতে ও সুকুমারকে দেখাতে থাকেন।

॥ ২ ॥

মূল সমস্যার সূত্রপাত এইখানে। পিসিমা, মা, বোন, দিদি, জামাইবাবু মায় বাড়ির পুরনো পরিচারিকা অবধি প্রত্যেকেই নিজস্ব নানান মাপকাঠিতে সম্ভাব্য পাত্রীদের দোষগুণ নির্ণয় করে সম্বন্ধ নির্দিষ্ট করতে চান। সঙ্গে মদত জোগান কুলপুরোহিত, এমনকি এক দৈবজ্ঞ পণ্ডিতও। এঁদের বহুবিচিত্র চাহিদা এবং নানাবিধ মানদণ্ডে বিচারের

ফলে পাত্রের পিতা হিসেবে কৈলাসবাবু একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েন। কারুর বক্তব্য সুন্দরী বউ আসা দরকার, কেউ চান বংশগৌরবসম্পন্না কনে, কারুর অভিপ্রায় ভাল মতো পাওনা কারুর আর কিছু। কেবলমাত্র সুকুমারেরই মন বোঝা দায়, সে যে কী চায়, তা বোঝা দুরূহ। ফলে পুতুলসাজানো পনের বছর বয়সী বনলতা মুহুরীর মেয়ে বলে নাকচ হয়ে পিসিমার কাছে; সুকুমারও মুখবার করে থাকে, অর্থাৎ অপছন্দ। দেবপ্রিয়া ভাল গান গায় বটে, কিন্তু সে হল মেদস্বিনী পৃথুলা এবং মঙ্গোলীয় ছাঁদের মুখচোক। সুতরাং সেও নাকচ। অনুপমা শিক্ষিতা এবং সুশ্রী, কিন্তু অতযন্ত রোগাটে চেহারার মেয়ে, তার ওপরে বাপের কৃপণতার অখ্যাতি আছে। অতএব প্রথম কারণে সুকুমারের, দ্বিতীয় কারণে পিসিমার আপত্তি। সুতরাং বাতিল সেও। মমতা স্বাস্থ্যবতী, কিন্তু পুরুষালি অপেলব চেহারা, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা। অবশ্য স্পোর্টসে প্রাইজ পাওয়া মেয়ে। কিন্তু সেটা তাকে পাশমার্কা পাওয়ালো না পিসিমা, মা, রাণু, সুকুমার — কারুর কাছেই।

কৈলাসবাবুর গায়ের রংও হাকুচ কালো — মন্দ লোকে নষ্টামি করে তাঁকে ''জিভ কালো ডাক্তার'' বলেও উল্লেখ করে। তিনি আদৌ বুঝতে পারেন না বাড়ির লোকের কাছে সৌন্দর্যের বিচারটা ঠিক কীভাবে হয়। ফলে স্ত্রীর সঙ্গে বিতণ্ডা এবং পাত্রীনির্বাচনের দায়িত্ব থেকে তাঁর অব্যাহতি লাভ। ওদিকে সুকুমার ছোট বোন রাণুর মারফতে প্রায়ই ভয় দেখায় যুদ্ধের চাকরী নিয়ে চলে যাবে (এই গল্প দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন)।

॥ ৩ ॥

এরই পাশাপাশি, আর একটি কিশোরী মেয়েও বারবার এসে উপস্থিত হয় কাহিনীর মধ্যে। তার নাম তুলসী — কুষ্ঠরোগী হাবু আর বেদেনী হামিদার মেয়ে।

ভিখারিনী কিশোরীটিকে কুদর্শনা বললে খুব কমই বলা হয় তার চেহারার সম্পর্কেঃ ''বছর চৌদ্দ বয়স, তবু সর্বাঙ্গে একটা রূঢ় পরিপুষ্টি। ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মতো কালি-মাড়া শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক। মাথার বেঢপ খুলিটা যেন একটা চোট লেগে টেরে-বেঁকে গেছে। বড় বড় দাঁত, যেন একটা জন্তুর হিংসে ফুটে রয়েছে। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙে চুরে গেছে, ছন্নছাড়া বিক্ষোভে।''

এই তুলসী প্রথমবার কৈলাসবাবুর বাড়ি আসে বাপ-মায়ের সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট চাইতে, যাতে ওরা মুচিপাড়ার ভাগাড়ের পিছনে থাকতে পারে। এরপর থেকে মাঝে মধ্যেই তুলসীকে দেখা যায় — কৈলাসডাক্তারেরও নজরে পড়ে বাড়ির আশেপাশে যে ঘোরাঘুরি করে, বসে থাকে বাগানে। একদিন তাকে দেখা গেল ক্ষিপ্ত মূর্তিতে ঢিল ছুঁড়তে — যদু ডোম এবং নিতাই সহিস ঠেকাতে গেলে তাদের হাতে কামড়েও দেয় সে। এর আগে একবার অবশ্য কৈলাসবাবুর নজরে পড়েছিল ঐ নিতাই এবং যদু তুলসীর সঙ্গে বসে-বসে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছে। আজকে একেবারে অন্য মূর্তি। এরও পরে এক সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ফিরে কৈলাসডাক্তার দেখলেন চোরের মতো পা টিপে টিপে অন্ধকারে ফটক খুলে সরে পড়ছে তুলসী। তাঁর রোগী দেখার জন্য বৈঠকখানা ঘর, সুকুমারের পড়ার ঘর সব খোলা পড়ে রয়েছে। তাঁর ঘরটা তছনছ হয়ে রয়েছে, হারিয়েছে নতুন কোন বেলেডোনার শিশিটা। বিশেষ কিছু চুরি টুরি হয়নি অবশ্য।

এইসব তুলসী-কাণ্ডের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলতে থাকে সুকুমারের বিয়ের তোড়জোড়। স্ত্রীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে নিয়ে ঝগড়া করে কৈলাসডাক্তার অবশয রেহাই পেয়েছেন পাত্রী বাছাইয়ের জটিল দায়িত্ব থেকে। কারণ, বাড়ির সকলের সঙ্গে সুন্দরের সংজ্ঞা নিয়ে তাঁর প্রবল মতানৈক্য! চুল কালো হলে সুন্দর, আর চামড়া কালো হলে

নয় — এই ব্যাসকূট কৈলাসবাবু বুজে উঠতে পারেন না। অবশেষে তাঁকে বাদ দিয়েই অন্যরা সুন্দরী সুপাত্রীর সন্ধান জোটান, মায়, আশীর্বাদেরও তারিখ ঠিক হয়ে যায়।

যে রাত্রে কন্য আশীর্বাদের বন্দোবস্ত হয়, ঠিক সেদিন সন্ধ্যাতেই সরকারী ডাক্তার কৈলাসবাবুর ডাক পড়ে শহরের মর্গ থেকে — তিনটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ময়নাতদন্তের জন্য। সেখানেই আচমকা, অবিশ্বাস্যভাবে তুলসীর মৃতদেশের সম্মুখীন হলেন তিনি কৈলাস ঃ স্তম্ভিতপ্রায় বিমূঢ়তার মধ্যে কৈলাসবাবু আবিষ্কার করেন তুলসীর কুৎসিৎ-দর্শন বহিরঙ্গের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য, এবং তার পাকস্থলীর মধ্যে পাউরুটি -সন্দেশ-বেলেডোনার দলা; .... এবং একটি প্রস্তুয়মান মানব-ভ্রূণ। অপলক দৃষ্টিতে কৈলাস তাকিয়ে থাকেন সেদিকে। মর্গের দরজার পাল্লার ওপর থেকে সরকারি ডোম যদু এবং ডাক্তারের টমটম গাড়ির সহিস নিতাই নিজেদের মধ্যে সবিদ্রুপ-রসিকতায় মেতে ওঠে ঃ ''শালার বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।''

৬৭.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

এই গল্পের বিশ্লেষণ করতে হলে অনিবার্য ভাবেই সেটি দ্বিমাত্রিক হয়ে পড়বে। একদিকে রয়েছে এর সামাজিক দিক, অন্যদিকে মনস্তাত্ত্বিক একটি প্রেক্ষিত। সমাজ-মনস্তত্ত্ব এবং ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব-এ দুইয়েরই অন্বেষণ এই কাহিনীর মধ্যে করতে হয়। সুকুমারের জন্য বিয়ের পাত্রী খোঁজার আপাত-হাস্যকর পরিস্থিতির আড়ালে যে নির্মম সামাজিক মানসিকতাটা লুকিয়ে রয়েছে, তাকে আমাদের সামনে অনাচ্ছাদিত করে দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ বারবারই। বংশকৌলীন্য, কাঞ্চনকৌলীন্য ইত্যাদি তো আছেই; তারই সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারবাবুর বোন, স্ত্রী, কন্যা মায় প্রাচীনা পরিচারিকা পর্যন্ত (পুরোহিত-দৈবজ্ঞদের কথা যদি ছেড়েও দেওয়া হয়) যেভাবে আরো নানান চাহিদার ফর্দ বাড়িয়ে গেছেন ক্রমান্বয়ে, তাতে তাঁরা যে ঠিক কী চান — সেটা বুঝে ওঠা নেহাৎই কঠিন। রূপ-লাবণ্য নিয়েও তাঁদের যে-বহুবিধ খুঁতখুঁতুনি, সেটাও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

আসলে, আমাদের সামাজিক কাঠামোয় মেয়েদের যে এক ধরনের 'বিড়ম্বনা' (অথবা, অর্থনীতির পরিভাষায় বললে — 'ভোগ্যপণ্য', ওরফে 'কমোডিটি') বলেই গণ্য করা হয় প্রায় সর্বক্ষেত্রেই, এই গল্প তার পক্ষে একটি তাৎপর্যময় দলিল হয়ে আছে। এইজন্য কনের তথাকথিত সৌন্দর্য, তার পিতার অর্থ-সামর্থ্য এবং জাঁক করে বলার মতো পারিবারিক পরিচয়কে এত বড় করে দেখা হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, মেয়েদের এই অবমাননার (না-কি, অবমূল্যায়নের) মূল হোত্রী কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে খোদ মেয়েরাই। এই গল্পের পিসিমা-প্রমুখ পার্শ্বচরিত্রগুলি তারই প্রমাণস্বরূপ।

সমাজ-মানসিকতার এই কদর্য দিকটি যেমন এ গল্পে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে একদিকে, অন্যদিকে তেমনই আবার এক জাতীয় শ্রেণীশোষণও এর মধ্যে রূপায়িত। মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রে যে সবসময়েই একটা টানাপোড়েন বা স্ব-বিরোধী প্রবণতা থাকে, তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ এখানে স্বয়ং কৈলাসডাক্তার। তিনি সৌন্দর্যের অলীক মানদণ্ড হাতে নিয়ে বিচার করেন না, ফর্দ মিলিয়ে যে রূপ লাবণ্যের হিসেব হয় না, তা তিনি স্পষ্টই বলেন এবং এই সব নিয়ে বাড়ির আর সকলের সঙ্গে তাঁর বিরোধটাও বেড়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে।

এরই অনুষঙ্গে 'সুন্দর' কী — সেই অত্যন্ত জটিল প্রশ্নটি অনিবার্য হয়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে 'সুন্দর' কথাটি একান্তভাবেই আপেক্ষিক, কেননা, একের চোখে যা সুন্দর, অন্যের চোখে তা আদৌ সুন্দর না হতেও পারে। ঠিক

একই রকমের মতপার্থক্য 'অসুন্দর' বা কুৎসিৎ সম্পর্কেও ঘটতে পারে। এই সত্যটিকেই এই গল্পের আর্থ-সামাজিক শ্রেণীবিভাজনের প্রেক্ষিতে সংঘটিত একটি গুরুতর নৈতিক অপহ্নবের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ব্যক্ত করেছেন। সুন্দর কী; সৌন্দর্য কাকে বলে? কৈলাস ডাক্তার নানাভাবে সে প্রশ্ন কাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে তুলে ধরেছেন। যেমন—

ক — ''চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত — এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে শাশ্বত কালি দিয়ে?''

খ — (কানাইবাবু অ্যানথ্রপলজিস্টদের মত উদ্ধৃত করার চেষ্টা করে মানুষের রূপের স্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে অভিমত দেবার প্রয়াস পেলে, তার জবাবে) ''আসুক একবার আমার সঙ্গে ময়নাঘরে। দুটো লাশের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। চিনে বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন নেগ্রিটো আর প্রোটো-অস্ট্রাল। দেখি ওদের বংশবিদ্যের মুরোদ।''

গ. — ''প্রবালপুষ্পের মালঞ্চের মত বরাঙ্গের এই প্রকট রূপ, অছদ্ম মানুষের রূপ। এই নবনীতপিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সূক্ষ্ম কৈশিক জাল। ... কুৎসিতা তুলসীর এই রূপের পরিচয় কে রাখে?'

মানুষের রূপের বহিরঙ্গ যেটা সেটা সাজসজ্জা, রং-পালিশে আপাত-মনোহারী করে তোলা যায়। কিন্তু বহিরঙ্গে চূড়ান্ত কুৎসিত তুলসীর ব্যবচ্ছিন্ন মৃতদেহের অন্তর্লোকে যে সুস্বাস্থ্য এবং পবিত্র রূপটি লুকিয়ে আছে মানুষের আসল সৌন্দর্য সেখানেই, কৈলাসডাক্তারের এই অনুভবটুকুকে লেখকও প্রচ্ছন্ন সমর্থক জ্ঞাপন করেছেন। রূপাজীবা নটী কিংবা রূপসী কূলবধুর মৃতদেহেরও ময়নাতদন্ত করেছেন কৈলাস; তাদের কারুরই ব্যবচ্ছিন্ন শবের অভ্যন্তরে 'কুদর্শনা' এই তুলসীর মতো 'ভিন্নতর' সৌন্দর্যের সন্ধান তিনি পাননি। তাই, এই প্রেক্ষিতে সৌন্দর্য কাকে বলে — সে বিষয়ে এক বিচিত্র অভিজ্ঞানকে খুঁজে পেয়েছেন কৈলাস; এবং অবশ্যই লেখকও।

এই অনুষঙ্গেই 'সুন্দরম' শব্দটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও বিচার্য। এই গল্পের নাম 'সুন্দর' হলে সেই তাৎপর্য অণ্বেষণের কোনো প্রয়োজন ঘটত না। কিন্তু নাম যেহেতু 'সুন্দরম' — তাই সেই শব্দের ব্যঞ্জনা কী, 'সুন্দর' শব্দের প্রচলিত ব্যাখ্যানের মাধ্যমে সেটা অনুভব করা সম্ভব নয়।

''সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম''—ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পরম্পরায় এই কথাটি বহু-প্রচলিত, বহুল-প্রচারিত। যা 'সত্য', তাই মঙ্গলময় (অর্থা, 'শিব') এবং সেটিই হল সুন্দর। সত্য, শুভ এবং সুন্দরের এই অভিন্নতার ধারণাকে এখানে তির্যক বিদ্রূপে খানখান্ করে ভেঙে দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ। এই সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে 'সত্য' মানেই যে — 'সত্য' মাত্রেই যে, মঙ্গলসূচক নয়, সুন্দরও নয় — পরোক্ষ ইঙ্গিতে সেই নির্মম কথাটিই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন গল্পের এমন শিরোনামের মাধ্যমে। তুলসীর প্রতি যে ভয়ঙ্কর এক অন্যায় করা হয়েছে, কাহিনীর শেষ পর্বে তো তা দিবালোকের মতোই সুস্বচ্ছ। কিন্তু সেই 'সত্য' (কঠিন নিশ্চয়!) মঙ্গলপ্রদ কিংবা সুন্দর নয়। 'সুন্দরম নামের এমন তির্যক প্রয়োগের সাহায্যে তিনি সেটিই মর্মান্তিক শ্লেষের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। যে তিক্ত বিদ্রূপ যদু ডোমের কণ্ঠে ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠেছে গল্পের শেষ পংক্তিতে— ঠিক তারই সমধর্মী একটি ধিক্কার যেন এই

‘সুন্দরম’ শব্দের মাধ্যমে সুবোধবাবুর কলমে ঝড়ে পড়েছে হয়তো ‘সুন্দরম!’’ কিংবা ‘সুন্দরম?’ এই চেহারায় এ গল্পের নামকরণটা করলে তাঁর অভীষ্ট শ্লেষের ব্যঞ্জনাটুকু সোচ্চারভাবে ফুটে উঠত। কিন্তু তা না করে, তিনি ওটুকু পাঠকের অনুভবশক্তির ওপর ভরসা রেখে সাদামাটা ভাবেই শুধু ‘সুন্দরম’ লিখে ছেড়ে দিয়েছেন।

গল্পের মধ্যে আরও একটি গভীর ব্যঞ্জনাবহ সংকেত অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছেন সুবোধ ঘোষ। তুলসীর গর্ভস্থ ভ্রূণটিকে একটি অপ্রত্যাশিত বিশেষণে মণ্ডিত করেছেন তিনি ঃ (শিশু) এশিয়া। এই আপাত অসংলগ্ন শব্দটি ব্যবহার করে তিনি আর এক ব্যঞ্জনায় শোষণ ও প্রতারণার বিরুদ্ধে বাঙ্‌ময় হয়েছেন। ধর্ষিতা এবং প্রতারিতা ভিখারিণী কিশোরী তুলসীর ভ্রূণদেহী সন্তানকে ‘‘এশিয়া’’ বলে অভিহিত করে, সাম্রাজ্যবাদের কাছে লাঞ্ছিত এশিয়ার মানুষের সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। গভীর তাৎপর্যময় এই শব্দটি এখানে কাহিনীকে একটা অন্যতর মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে সন্দেহ নেই।

[প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সম্প্রতিকালে সুবোধ ঘোষের গল্পসমগ্র গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ‘‘এশিয়া’’ শব্দটি পরিবর্তিত হয়েছে ‘‘আশা’’ রূপে। এই রূপান্তরণ কেন এবং কীভাবে, তার কিছু ব্যাখ্যানেই। এটা সুবোধবাবুর অনুমোদিত কি-না, সেটিও অনুল্লেখিত। এর ফলে গল্পের একটি বিশিষ্ট ভাবমাত্রার ব্যঞ্জনা পরিবর্তিত হয়েছে অবশ্যই। ‘আশা’ কেবলমাত্র তুলসীর অবোধ-ভাবনার প্রেক্ষিতেই ব্যঞ্জনাময়। কিন্তু ‘এশিয়া’-র ভাবগত সংকেত সুদূরবিস্তারী।]

এই গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সুকুমার নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার (আপাত) ব্রহ্মচর্যের ভড়ং করা তারপরে দু-চারটে নভেল পড়ে এবং সিনেমা দেখেই জীবনের ভোগ-সুখ ইত্যাদিতে আগ্রহী হওয়া, রূপসী পত্নী না-জুটলে যুদ্ধে সার্ভিস নেবার ভয় দেখানো বাড়ির লোককে এবং রূপ-গুণ-বংশকৌলীন্য-বিত্তস্বাচ্ছল্য ইত্যাদির জন্য তাঁদের বাছাবাছির বিলম্ব সইতে না-পেরে কুৎসিতা ভিখারিণী কিশোরী (যে, কুষ্ঠরোগীর কন্যাও বটে) তুলসীকে প্রলুব্ধ করে তার সর্বনাশ করা এবং পরিশেষে কেলেংকারি ঢাকতে তাকে গর্ভবতী অবস্থায় খুন করা — ইত্যাদি ঘটনা পরম্পরার মধ্যে সুকুমারের চরিত্রের ভণ্ড, কামুক এবং হিংস্র রূপগুলি ঝিলিক দিয়ে যায়। সুবোধবাবুর অসামান্য শিল্পকৃতিত্ব এইখানেই যে, গল্পের শেষ পংক্তিতে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত সুকুমারের এই মুখোসটা খসে পড়ে না। একটা বিচিত্র উৎকণ্ঠা কাহিনীর শেষ পর্যন্ত তিনি টানটান করে রেখেছেন — বিশেষত তুলসীর অপঘাতে মৃত্যু এবং তার গর্ভে মৃত ভ্রূণ দেখার পর থেকে। অথচ এই কাহিনী শুরু হয়েছিল বেশ একটা হালকা পরিহাস বিজল্পিত ভঙ্গীতেই — বিশেষত সুকুমারের ব্রহ্মচর্য পালনের হাস্যকর ভড়ঙের বর্ণনার অনুষঙ্গে।

বারবার পাত্রী দেখানোর যে সব পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এই গল্পের মধ্যে ক্রমান্বয়ে করা হয়েছে, সেখানেও এই ধরনের ব্যঙ্গ মনস্কতার ইঙ্গিত মেলে। আবার তারই পাশাপাশি সুকুমারের পিসি, মা, বোন, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ প্রমুখের কথাবার্তার মাধ্যমে, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে বিবাহযোগ্যা মেয়েদের ঠিক কথখানি অবমাননা সইতে হয় এবং ছেলের বিয়ে উপলক্ষে কেমনভাবে অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যার মালিকানা অর্জনের লোলুপ অপচেষ্টা চলে, তারও নিখুঁত এবং তীব্র প্রতিবেদন করেছেন গল্পকার। আর সেই সূত্রেই এইসব পার্শ্বচরিত্রগুলির ছোট-ছোট স্কেচ এঁকে গেছেন তিনি। এইভাবেই মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রের মধ্যে যেসব হীনতা, লোভ এবং দৈন্য লুকিয়ে থাকে, তাদের অনাবৃত করে দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ।

মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রের আরেকটি দিকের প্রতিনিধি হলেন কৈলাস ডাক্তার। তিনি উদারচেতা, স্পষ্টবক্তা এবং সংস্কারবিমুক্ত মানুষ। পরোপকারী, দয়ালু এবং সংবেদনশীল এক জনহিতব্রতী চিকিৎসক। সুকুমারের ব্রহ্মচর্যের নামে আধ্যাত্মিক ভাবালুতার ভণ্ডামি, বাড়ির সকলের হীনতা-দীনতা-লোলুপতা এবং নারীর রূপ-সম্পর্কে অনির্দেশ্য কিছু বিচারপদ্ধতির অসারতা — এই সমস্ত কিছু ব্যাপার সম্পর্কে তাঁর সোচ্চার প্রতিবাদ, নিশ্চয়ই তাঁকে তাঁর ছেলের বিপ্রতীপ মেরুতে প্রতিষ্ঠিত করে। বস্তুত, মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রের মধ্যে যে একটি প্রতিবাদী প্রগতিশীল মানসিকতা ক্রিয়াশীল থাকে, সেটারই প্রমাণ হিসেবে কৈলাসবাবুকে গ্রহণ করলে ভুল হবে না।

আর্ত-সামাজিকভাবে অবরবর্গীয় — সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় সাব-অল্টার্ন-বলে যে-চরিত্রগুলি এই কাহিনীতে গণ্য, তাদেরমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই তুলসী। অবশ্য এই গল্পের কোথাও তার মুখে একটি শব্দও শোনানি আমাদেরকে লেখক, যদিচ পরিণামে তার মাধ্যমেই তারসপ্তকে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে লেখকের অভীপ্সিত বক্তব্য। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, যৌবনতৃষ্ণা এবং বোধবুদ্ধির ক্ষীণতা — এই সব কিছু একসঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে তার 'প্রলয়ের পথ দিল অবারিত করে।'' তুলসীর জীবনের যে করুণ এবং ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি, তার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী অবশ্যই সুকুমার, পরিণাম বোধহীন, নাবালিকা তুলসীর দায় সেখানে অনেক লঘু। তবে, সুকুমার এখানে একক নয়; তুলসীর এই মর্মান্তিক পরিণতির অন্তরালে ডাক্তারবাবুর বাড়ির সকলের দায়িত্বও কিছু কম নয়। তাঁদের খুঁতখুঁতানি এবং মাত্রাছাড়া 'লাভের' আকাঙ্খার ফলে সুকুমারের বিয়েটা পেছিয়েছে যতই, ততই ভিতরে-ভিতরে সুকুমারও অধৈর্য হয়ে উঠেছে। অবশ্য সুকুমারের 'রূপ-তৃষ্ণা'-ও তার বিয়ের ফুল ফোটার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে।

এইখানেই মানবচরিত্রের এক বিচিত্র এবং অব্যাখ্যাত রহস্য লুকিয়ে আছে। বনলতা, দেবপ্রিয়া, মমতা প্রমুখ মেয়েরা তার পছন্দ হয়নি তার এবং তার বাড়ির লোকের বিচারে 'সুন্দরী' নয় বলে। অথচ সর্বজনীন নিরিকেই কুরূপা বলে গণ্য তুলসীকে উপলক্ষ করে তার কাছে প্রত্যাশিত সুশালীন নৈতিকতা এবং সংযমবোধ চুরমার হয়ে গেল — যার মর্মন্তুদ পরিণাম তুলসীর গর্ভবতী হওয়া এবং (বিষাক্ত) সুখাদ্যের প্রলোভনে অপঘাতে মরা।

তুলসী হতদরিদ্র এবং একান্তই অসহায় একটি পরিবারের কন্যা হওয়ার ফলে সুকুমারের পক্ষে তাকে এভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল যে, তাতে সংশয় নেই। ফলত, সুন্দর-অসুন্দর নিয়ে সুকুমারের যে-বাছবিছার দেখা গেছে, সেটা যে নেহাৎই ঠুনকো এবং ভিত্তিহীন তাও এর থেকে প্রতীয়মান হয়েছে।

তুলসীকে লালসার শিকার বানিয়ে, তারপর সমস্ত ঝামেলা এড়ানোর সহজ পন্থা হিসেবে সুকুমার তাকে বেলেডোনা খাইয়ে হত্যা করে — এটাকে শ্রেণিগত চরিত্রলক্ষণ বললে হয়ত একটু বেশিই বলা হবে। তবে খুন করার ব্যাপারটুকু ছাড়া বাকিটার মধ্যে মধ্যবিত্তের ধূর্ততা প্রতিভাত হয়েছে যে, সেটা অবশ্য বলাই যায়। মনোবিজ্ঞানীরা 'কপ্রোফিলিয়া' বলে এক ধরনের বিকারের কথা বলেন, যার ফলে যৌনাবদমন-জনিত কাররে হতকুৎসিতের প্রতিও এক সময়ে আকর্ষণ জন্মাতে পারে। সুকুমারও তেমন মনোবিকারগ্রস্ত হওয়া অসম্ভব নয়।

অবরবর্গীয় অন্য চরিত্রদুটির মধ্যে নিতাই সহিসকে মোটামুটিভাবে অপ্রাসঙ্গিক বলেই গণ্য করা যায়। কিন্তু যদু ডোম সম্পর্কে সেকথা বলা যায় না। কাহিনীর সমাপ্তির মুহূর্তে তার অনুচ্চ কণ্ঠে যেন স্বংয় মহাকাল তাঁর ক্রুদ্ধ

বিদ্রুপ এবং ঘৃণা উদ্‌জীবিত করে দিয়েছেন ঃ ''শালার বুড়ো নাতির মুখ দেখছে রে।'' শেষ বিচারে সে, নিতাই এবং তুলসী যে একই শ্রেণী সীমানার অন্তর্গত এটা মনের গভীরে যদু ডোমের অনুভব না করার কথা নয়। সেই অনুভূতি, রূপান্তরিত হয়েছে তুলসীর প্রতি আর্থ-সামাজিক শ্রেণীতে প্রবল এক সহানুভূতিতে। তাই কৈলাসডাক্তার যত ভাল লোকই হোক না কেন, শেষ বিচারে তিনিও তো সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই মানুষ—যারা চিরকালই যদু-তুলসীদের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখিয়ে আসছে একদিকে; অন্যদিকে নির্মমভাবে শোষণও করে আসছে। যদুর এই তীব্র ঝাঁঝের বিদ্রুপ তাই কেবলমাত্র আঁশটে রসিকতা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আকণ্ঠ ঘৃণা এবং প্রতিবাদেরও দ্যোতক বলেই বুঝে নিতে হবে। মুখে সবসময় ''হুজুর'' বলে কৈলাসকে সম্বোধন করে বিনয় এবং সম্ভ্রম দেখানোর ভাণ করে সে ঠিকই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই নম্রতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক অতলান্ত ঘৃণা এবং আক্রোশ। সেটা 'ব্যক্তি' কৈলাসের প্রতি নয়, তিনি যে আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্গত, তার প্রতি। 'ব্যক্তি' কৈলাসকে (সম্ভবত) যদু-নিতাইদের অপছন্দ করার কোনো প্রত্যক্ষ হেতু নেই, কিন্তু সে-মুহূর্তে তাদের মনে পড়ে তিনি 'সুকুমারের বাবা'—তখনই মনের গহনে তাঁর সম্পর্কেও একটা সুস্পষ্ট বিরূপতা সঞ্জাত হয়। সুকুমার যেহেতু এখানে প্রতিভাত হচ্ছে, তাদের কাছাকাছি থাকা আর্থ-সামাজিক স্তরভুক্ত একটি নিরপরাধ কিশোরীর ধর্ষক এবং হত্যাকারী রূপে, তখন সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিই তাদের এক ধরনের অসহায় কিন্তু অপরিমিত পাঁচটি তীব্র আক্রোশ বিষিয়ে দেয় সমস্ত মানসিকতাটাকে; আর সেটারই প্রকাশ ঘটেছে যদূর ঐ শ্লেষতিক্ত টিপ্পনীর প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে। মাত্র পাঁচটি শব্দে গঠিত একটি বাক্যের মাধ্যমে এমন একটা প্রচণ্ড শ্রেণিবিরোধের মানসকিতাকে উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়াটা নিঃসন্দেহে লেখকের অসাধারণ দক্ষতার দ্যোতনা বহন করে।

এই আলোচনা সাঙ্গ করার আগে আরো একটি বিষয় নিয়ে কিছু কথা বলা বাঞ্ছনীয়। তুলসীর ময়নাতদন্তের যে-অন্বিষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ, তার মধ্যে একই সঙ্গে ভাষাকুশলী এক শিল্পীর দক্ষতা এবং শারীরবিদ্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন মানুষের পাণ্ডিত্য সুসমন্বিত হয়ে উঠেছে। ডাক্তারী শাস্ত্রে প্রচলিত লাতিন নামগুলির বদলে চরক-সুশ্রুতের প্রাচীর গ্রন্থে প্রাপ্য সংস্কৃত শারীরবিদ্যাকেন্দ্রিক শব্দাবলীর এই সুষ্ঠ প্রয়োগ — মৃতদেহের ময়নাতদন্তের মতো একটা বীভৎস রকমের অস্বস্তিকর ব্যাপারকেও শিল্পরসে মণ্ডিত করতে পেরেছে। পাঠকের কাছে সেটা অবশ্যই অতিরিক্ত একটা পাওনা।

৬৭.৭ অনুশীলনী

☐ বিস্তৃত আলোচনামূলক ☐

১) 'সুন্দরম' শিরোনামটি গল্পের পক্ষে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ বলুন।

২) সুন্দরের সংজ্ঞা কৈলাস ডাক্তারবাবুর উপলব্ধিতে কীভাবে প্রতিভাসিত হয়েছে, আলোচনা করুন।

৩) 'সুন্দরম' গল্পে সমাজ-মন এবং ব্যক্তিমন কীভাবে দুয়েরই বিকলন করেছেন সুবোধ ঘোষ, আলোচনা করুন।

৪) সুকুমার ছেলেটি শয়তান, না মনোবিকারগ্রস্থ — বুঝিয়ে বলুন।

৫) তুলসীর জীবনের ট্র্যাজেডির জন্য সুকুমারদের পরিবার এবং সুকুমার স্বয়ং, কার দায়িত্ব বেশি, কার কম, আলোচনা করুন।

৬) 'সুন্দরম' গল্পের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক কূটেষণা প্রবলতর শক্তি হিসেবে প্রতীত হলেও, আর্থ-সামাজিক বিভেদের শ্রেণীচেতনাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় — আলোচনা করুন।

৭) কৈলাস ডাক্তার এবং তাঁর ছেলে সুকুমার, মানুষ হিসেবে দুটি পরস্পর-বিপ্রতীপ অবস্থানে আছেন একই পরিবেশে, একই পরিবারের পরস্পরার মধ্যে থেকেও এই বৈপরীত্য কেন, বুঝিয়ে বলুন।

৮) ''সুবোধ ঘোষের ভাষাশৈলী একটি অনন্য মাত্রায় উপনীত হয়েছে 'সুন্দরম' গল্পে।'' —আলোচনা করুন।

□ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক □

১) যতগুলি মেয়েকে সুকুমারের সম্ভাব্য পাত্রী হিসেবে দেখা হয়েছিল, তাদের কী কী ছুতো দেখিয়ে অমনোনীত করা হয়?

২) সুকুমারের 'ব্রহ্মচর্য' কীভাবে চলত, বলুন।

৩) 'পুরুতমশাই' এবং 'দৈবজ্ঞী' সুকুমারের বিয়ে সম্পর্কে কী কী অভিমত দিয়েছিলেন বলুন।

৪) কানাইবাবুর তালিমে সুকুমারের কী পরিবর্তন ঘটেছিল?

□ নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক □

১) ''অদ্ভুত আত্মিক শক্তির রেচকস্পর্শ'' সুকুমার কোথায় কোথায় অনুভব করেছিল?

২) সুকুমার সম্পর্কে তার বাবা কী বলতেন?

৩) কানাইবাবু সুকুমারকে কোন সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন?

৪) বনলতারা কোথায় থাকত?

৫) সিনেমায় কার নাচ পছন্দ করত সুকুমার?

৬) তুলসীরা কোথায় থাকতে চেয়েছিল?

৭) অনুপমা সম্পর্কে রাণু কী মন্তব্য করেছিল?

৮) সুকুমার কোথায় চাকরি করতে যাবে বলেছিল?

৯) কৈলাসবাবুর ডিসপেনসারী থেকে কী হারিয়েছিল?

১০) শেষ পর্যন্ত কার সঙ্গে সুকুমারের বিয়ের ঠিক হয়?

১১) কৈলাস ডাক্তার কিসের পাকা জহুরী?

১২) পোখরাজের দানার সঙ্গে কিসের তুলনা করা হয়েছে?

১৩) 'সুন্দরম' গল্পের ঘটনাকাল কখন?

১৪) তুলসী কবে মারা গিয়েছিল?

১৫) তুলসী কার মেয়ে?

১৬) ক্লোমরসে মাখা কিসের পিণ্ড পাওয়া গিয়েছিল?

৬৭.৮ উত্তরমালা

বিস্তৃত আলোচনামূলক

১) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম পর্যায়ের শেষাংশ অনুসরণে উত্তর করুন।

২) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম পর্যায়ের প্রথম অংশ অবলম্বনে উত্তর দিন।

৩) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম পর্যায়ের এ সম্পর্কে আলোচনা আছে। সেটি অনুসরণ করে উত্তর দিন।

৪) মূলপাঠ এবং আলোচনার প্রথম পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা আছে। তার সাহায্য নিয়ে উত্তর তৈরী করুন।

৫) প্রাসঙ্গিক আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা আছে। তার সাহায্যে উত্তর দিন।

৬) প্রাসঙ্গিক আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ের এ সম্পর্কে আলোচনা আছে। তার সাহায্যে উত্তর দিন।

৭) কৈলাস ও সুকুমারের বিপ্রতীপ অবস্থানের কারণ দু'জনের বয়স ও জীবন সম্পর্কে ধ্যান ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথমজন ডাক্তার ও লাসকাটা তার অন্যতম কাজ। তিনি মন-নিয়ে চর্চার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবনকে দেখেছেন। সুকুমার অস্বাভাবিক ধ্যান ধারণার বশবর্তী। আশৈশব সনাতন জীবন যাপন করেছে— কতকগুলি অন্ধ প্রত্যয় নিয়ে। বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে শেষে উপলব্ধি করেছে —মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

৮) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম পর্যায়ে 'সুন্দরের' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ অবলম্বনে উত্তর তৈরী করুন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক

১) মূলপাঠ অনুসরণে বনলতা, দেবপ্রিয়া, মমতাকে দেখে সুকুমারের আচরণ ব্যাখ্যা করে উত্তর দিন।

২) ৩),৪) — মূলপাঠ অনুসরণে উত্তর করুন।

নির্দিষ্ট আলোচনামূলক

সংকেত নিষ্প্রয়োজন। মূলপাঠ ভাল করে পড়লেই উত্তর করতে পারবেন। অবশ্যই একটি পূর্ণ বাক্যে উত্তর লিখবেন।

৬৭.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১) সুবোধ ঘোষ — *শ্রেষ্ঠ গল্প (জগদীশ ভট্টাজার্য সম্পাঃ)*

২) অরিন্দম গোস্বামী — *সুবোধ ঘোষাঃ কথা সাহিত্য*

৩) উত্তম ঘোষ — *সুবোধ ঘোষাঃ বড় বিস্ময় জাগে*

৪) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় — *কালের পুত্তলিকা*

৫) সরোজ মোহন মিত্র — *ছোট গল্পের বিচিত্র কথা।*

৬) সুবোধ ঘোষ সংখ্যা — *উজাগর ; সম্পাদনা : উত্তম পুরকাইত।*

একক ৬৮ ❑ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ টোপ

গঠন

৬৮.১ উদ্দেশ্য

৬৮.২ প্রস্তাবনা

৬৮.৩ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

৬৮.৪ মূলপাঠ ঃ টোপ

৬৮.৫ সারাংশ

৬৮.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

৬৮.৭ অনুশীলনী

৬৮.৮ উত্তরমালা

৬৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৬৮.১ উদ্দেশ্য

প্রতিভাধর কথা সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প পাঠকচিত্তকে চকিত ও বিস্মিত করে। তাঁর প্রতিভার দীপ্তি নক্ষত্রের দ্যুতির মত ভাস্বর। কাহিনী, বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা ও রসবৈচিত্র্যে তার গল্পে অসামান্য কৃতির স্বাক্ষর আছে। তাঁর রচনার পরিবেশ ও পটভূমি — তরাই-ডুয়ার্সের শ্যামল বনানী, নিম্নবঙ্গের নদী মোহানা, নোনামাটির চরে নতুন গড়ে ওঠা উপনিবেশ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। পদ্মা-মেঘনা, আত্রাই-মহানন্দা, সম্রাট-শ্রেষ্ঠী সবই তাঁর গল্পে স্থান অধিকার করে আছে।

'টোপ' গল্পে রামগঙ্গা স্টেটের রাজা বাহাদুর নিজে শিকারীর গৌরব প্রতিস্ঠায় আদিম হিংস্রতায় মানব-শিশুকে টোপ দিয়ে বাঘ শিকারেও পরান্মুখ নন। গল্পের এই বিষয়বস্তু উপস্থাপনের দক্ষতায়, সমস্ত মনপ্রাণকে ভয়াল ভয়ঙ্কর এক অনুভূতিতে আলোড়িত করে। এমন নৃশংস গল্প বাংলা সাহিত্যে বিরল। গল্পটি পড়ে আপনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিষয়-ভাবনা ও রূপসৃষ্টির অভাবনীয় কৃতির যে পরিচয় পাবেন তা হ'ল —

১) একদিকে প্রকৃতির অপরূপ লাবণ্য অপরদিকে এক আদিম আরণ্যক পরিবেষ্টনীর পরিচয় উভয় ক্ষেত্রেই লেখকের সমান দক্ষতা।

২) গল্পটিতে দুটি ভিন্ন শ্রেণী চরিত্রের পরিচয় আছে, যথা — এক গল্প কথকের — তাঁর চরিত্রের মধ্যে মধ্যবিত্ত সুলভ দোলাচল চিত্তবৃত্তি অত্যন্ত প্রকট। অপর চরিত্রটি বনেদী, অভিজাত বংশীয় রাজাবাহাদুর — যিনি মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী প্রতাপের দম্ভে বুঁদ তাঁর নৃশংস দানবমূর্তি টোপ-এর কাহিনীতে উঠে এসেছে লক্ষ্য করতে পারবেন।

৩) লেখক গল্পটিতে হিউমার এবং স্যাটায়ারের ঠাস বুনুনিতে একটি নক্‌শা ধীরে ধীরে ফুটিয়েছেন। রচনার ভাষায় গদ্য কবিতার স্পন্দন পাওয়া যায়।

৬৮.২ প্রস্তাবনা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্প 'টোপ'। এই গল্পটি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনাপর্বেই যথেষ্ট খ্যাতি এনে দেওয়ায়, তিনি অনতিবিলম্বে গল্পকার হিসেবে মান্য ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'টোপ' — বিষয়-ভাবনা ও রোমাঞ্চকর ঘটনার চমৎকারিত্বে সকলকে আকৃষ্ট করেছে। এ গল্পের কাহিনী উপস্থাপনায় গল্পের কথক, শিকার-বিলাসী রাজা-বাহাদুর ও গহন গভীর অরণ্যের ভয়াল পরিবেশ একটি অদৃশ্য সূত্রে আবদ্ধ। কাহিনীটি বিশেষ বড় না হলেও, ঘটনার অভাবনীয়তায় ও বর্ণনায় সৌকর্যে সংহত ও দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ পেয়েছে।

টোপ গল্পের নাম ব্যঞ্জনাধর্মী ও সবিশেষ মর্মান্তিক। রাজা বাহাদুরের শখ হোল শিকার। আর সে শিকারের জন্য, ছাগশিশু নয়, একটি জীবন্ত মানব-শিশুকে ব্যবহার করার মধ্যে যে অ-মানবিক নিষ্ঠুর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা ভয়ঙ্কর। বাঘ শিকারের জন্য এই হিংস্রতম আয়োজন কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সম্ভব কিনা তা ভাববার বিষয়। কিন্তু সত্য অনেক সময় কল্পনার চেয়েও অদ্ভুত হয়।

গল্পটিতে লেখক মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রাজা-বাদ্‌শা-জমিদারদের বিকৃত খেয়ালি চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। আরণ্য পরিবেশ ও ভাবমণ্ডল সৃষ্টিতে যে বর্ণনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা অসাধারণ শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর। গল্পটি লেখকের অসাধারণ শক্তিমত্তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৬৮.৩ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) 'নারায়ণ' নামে প্রখ্যাত হলেও তাঁর প্রকৃত নাম ছিল তারকনাথ। ঐ নামে পূর্বসূরী এক বিশিস্ট কথা সাহিত্যিক ছিলেন বলে ('স্বর্ণলতা' গ্রন্থের রচয়িতা), পোশাকী নামটির পরিবর্তে এই নামেই তিনি লিখতে শুরু করেন ছাত্র বয়স থেকেই। পরিণত বয়সে 'সুনন্দ' এই ছদ্মনামেও তিনি 'দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত একটি কলাম লিখেছেন বহুদিন ধরে। জন্ম দিনাজপুরের বালিয়াডাঙিতে। আদি বাস বরিশালে। পুলিশ অফিসার বাবা প্রমথনাথের বদলির চাকরির সূত্রে বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছে নারায়ণকে তাঁর অল্পবয়সে। দারোগা হওয়া সত্ত্বেও প্রমথনাথ ছিলেন অত্যন্ত সাহিত্যপ্রেমী মানুষ. এই পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিতেই নারায়ণও সাহিত্যানুরাগী হয়ে উঠেছিলেন বাল্যকাল থেকেই। তারই পরিণতি, সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হওয়া।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেকর্ড নম্বর পেয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজ এবং কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং বাকি জীবন সেই কাজেই অতিবাহিত করেন। অধ্যাপক হিসেবে তাঁর মনীষা এবং বক্তা হিসেবে তাঁর বাচনরীতি প্রায় প্রবাদকল্প হয়ে উঠেছিল ছাত্রমহলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ. ডি. উপাধিও অর্জন করেন তিনি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবন কাটে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে। এই সূত্রে তিনি বাংলার নিম্ন ও উত্তরবঙ্গের নদনদী, পল্লীজনপদ, চা-বাগান ও আরণ্যক প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। তাঁর গল্পে উপন্যাসে এর প্রতিফলন আছে। সৃষ্টিশীল সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি প্রতিভায় যেমন স্বাক্ষর রেখেছেন, তেমনি সমালোচক ও সাংবাদিক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছল। 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় তিনি ছদ্মনামে 'সুনন্দর জার্নাল' লিখতেন।

স্কুলছাত্র-থাকা অবস্থাতেই সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। সারাজীবনে প্রায় পনের-ষোলোটি উপন্যাস এবং তেরোটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন। মোট গল্পের সংখ্যা একশ উনিশটি। এগারো খণ্ডে তাঁর রচনাবলী পরবর্তীকালে সংকলিত হয়েছে। ছোটদের লেখাতেও তাঁর খ্যাতি সুপ্রচুর। তাঁর রূপায়িত টেনিদা অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং টাইপ চরিণত্র, বিশেষ করে কিশোর পাঠকদের কাছে।

বিখ্যাত উপন্যাস হল এইগুলি — 'উপনিবেশ'; 'পদসঞ্চার'; 'বিদূষক'; 'অমাবস্যা'র গান'; 'কাচের দরজা' আর গল্প সংকলনের মধ্যে 'বীতংস', 'কালাবদর', 'গন্ধরাজ', 'ছায়াতরী', 'বনজ্যোৎস্না' অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। এই 'টোপ' গল্পটি 'কালাবদর' সংকলনের অন্তর্গত। তাঁর লেখার মূল উপজীব্যগুলি হল ইতিহাস চেতনা, সমাজভাবনা, ব্যক্তিমানুষের মনোবিশ্লেষণ। সরস অথচ ঋজু গদ্যশৈলী তাঁর রচনাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে বলে সমালোচকরা মনে করেছেন।

৬৮.৪ মূলপাঠ ঃ টোপ

সকালে একটা পার্সেল এসে পৌঁছেছে। খুলে দেখি একজোড়া জুতো।

না, শত্রুপক্ষের কাজ নয়। একজোড়া পুরোনো ছেঁড়া জুতো পাঠিয়ে আমার সঙ্গে রসিকতার চেষ্টাও করেনি কেউ। চমৎকার ঝকঝকে বাঘের চামড়ার নতুন চটি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, পায়ে দিতে লজ্জা বোধ হয় দস্তুরমতো। ইচ্ছে করে বিছানায় শুইয়ে রাখি।

কিন্তু জুতোজোড়া পাঠাল কে? কোথাও অর্ডার দিয়েছিলাম বলেও তো মনে পড়ছে না। আর বন্ধুদের সব কটাকেই তো চিনি, বিনামূল্যে এমন একজোড়া জুতো পাঠাবার মতো দরাজ মেজাজ এবং ট্যাক কারো আছে বলেও জানি না। তাহলে ব্যাপারটা কি?

খুব আশ্চর্য হব কিনা ভাবছি, এমন সময়, একখানা সবুজ রঙের কার্ড চোখে পড়ল। উইথ্ বেস্ট্ কমপ্লিমেন্টস্ অব রাজাবাহাদুর এন: আর চৌধুরী, রামগঙ্গা এস্টেট্।

আর তখনি মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল আট মাস আগেকার এক আরণ্যক ইতিহাস, একটি বিচিত্র শিকারকাহিনী।

রাজাবাহাদুরের সঙ্গে আলাপের ইতিহাসটা ঘোলাটে, সূত্রগুলো এলোমেলো। যতদূর মনে হয়, আমার এক সহপাঠী তাঁর এস্টেটে চাকরি করত। তারই যোগাযোগে রাজাবাহাদুরের এক জন্মবাসরে আমি একটা কাব্য-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলাম। ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাস চুরি করে যে প্রশস্তি রচনা করেছিলাম তার দুটো একটা লাইন এই রকম ঃ

ত্রিভুবন প্রভা কর ওহে প্রভাকর,
গুণবান্ মহীয়ান্ হে রাজেন্দ্রবর।
ভূতলে অতুল কীর্তি রামচন্দ্র সম—
অরাতিদমন ওহে তুমি নিরুমপ।

কাব্যচর্চার ফলাফল হল একেবারে নগদ নগদ। পড়েছি — আকবরের সভাসদ আবদুর রহিম খানখানান হিন্দী কবি গঙ্গের চার লাইন কবিতা শুনে চার লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। দেখলাম যে নবাবী মেজাজের ঐতিহ্যটা গুণমান

মহীয়ান অরাতিদমন মহারাজ এখানো বজায় রেখেছেন। আমার মতো দীনাতিদীনের ওপরেও রাজদৃষ্টি পড়ল, তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, প্রায়ই চা খাওয়াতে লাগলেন, তারপর সামান্য একটা উপলক্ষ্য করে দামী একটা সোনার হাতঘড়ি উপহার দিয়ে বসলেন এক সময়ে। সেই থেকে রাজাবাহাদুর সম্পর্কে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে আছি আমি। নিছক কবিতা মেলাবার জন্যে যে বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছিলাম, এখন সেগুলোকেই মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।

রাজাবাহদুরকে আমি শ্রদ্ধা করি। আর গুণগ্রাহী লোককে শ্রদ্ধা করাই তো স্বাভাবিক। বন্ধুরা বলে, মোসাহেব। কিন্তু আমি জানি ওটা নছক গায়ের জ্বালা, আমার সৌভাগ্যে ওদের ঈর্ষা। তা আমি পরোয়া করি না। নৌকো বাধতে হলে বড় গাছ দেখে বাঁধাই ভালো, অন্তত ছোটখাটো ঝড়-ঝাপটার আঘাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

তাই মাস আষ্টেক আগে রাজাবাহাদুর যখন শিকারে তাঁর সহযাত্রী হওয়ার জন্যে আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন, তখন তা অআমি ঠেলতে পারলাম না। কলকাতার সমস্ত কাজকর্ম ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে পড়া গেল। তাছাড়া গোরা সৈন্যদের মাঝে মাঝে রাইফেল উঁচিয়ে শকুন মারতে দেখা ছাড়া শিকার সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই আমার। সেদিক থেকেও মনের ভেতরে গভীর এবং নিবিড় একটা প্রলোভন ছিল।

জঙ্গলের ভেতর ছোট একটা রেললাইনে আরো ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি থামল। নামবার সঙ্গে সঙ্গে সোনালী তকমা আঁটা ঝকঝকে পোশাক পরা আর্দালি এসে সেলাম দিল আমাকে। বললে — হুজুর, চলুন।

স্টেশনের বাইরে মেটে রাস্তায় দেখি মস্ত একখানা গাড়ি — যার পুরো নাম রোলস্ রয়েস, সংক্ষেপে যাকে বলে ‘রোজ’। তা ‘রোজ’ই বটে। মাটিতে চলল, না রাজ হাঁসের মতো হাওয়ায় ভেসে গেল সেটা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলাম না। চামড়ার খট্‌খটে গদী নয়, লাল মখমলের কুশন। হেলান দিতে সংকোচ হয়, পাছে মাথা সস্তা নারকেল তেলের দাগ ধরে যায়। আর বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় — সমস্ত পৃথিবীটা চাকার নিচে মাটির ডেলার মতো গুঁড়িয়ে যাক — আমি এখানে সুখে এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারি।

হাঁসের মতো ভেসে চলল ‘রোজ’। মেটে রাস্তায় চলেছে অথচ এতটুকু ঝাঁকুনি নেই। ইচ্ছে হল একবার ঘাড় বার করে দেখি গাড়িটা ঠিক মাটি দিয়েই চলেছে, না দুহাত ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ওর চাকাগুলো।

পথের দুপাশে তখন নতুন একটা জগতের ছবি। সবুজ শালবনের আড়ালে আড়ালে চা-বাগানের বিস্তার, চকচকে উজ্জ্বল পাতার শান্ত, শ্যামল সমুদ্র। দূরে আকাশের গায়ে কালো পাহাড়ের রেখা।

ক্রমশ চা-বাগান শেষ হয়ে এল, পথের দুপাশে ঘন হয়ে দেখা দিতে লাগল অবিচ্ছিন্ন শালবন। একজন আর্দালি জানাল, হুজুর, ফরেস্ট এসে পড়েছে।

ফরেস্টই বটে! পথের ওপর থেকে সূর্যের আলো সরে গেছে, এখন শুধু শান্ত আর বিষণ্ণ ছায়া। রাত্রির শিশির এখনও ভিজিয়ে রেখেছে পথটাকে। ‘রোজে’র নিঃশব্দ চাকার নিচে মড়মড় করে সাড়া তুলছে শুকনো শালের পাতা। বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মতো শালের ফুল ঝরে পড়ছে পথের পাশে, উড়ে আসছে গায়ে। কোথা থেকে চকিতের জন্যে ময়ূরের তীক্ষ্ণ চীৎকার ভেসে এল। দুপাশে নিবিড় শালের বন, কোথাও কোথাও ভেতর দিয়ে খানিকটা খানিকটা দৃষ্টি চলে, কখনো কখনো বুনো ঝোপে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে এক এক টুকরো কাঠের গায়ে লেখা ১৯৩৫, ১৯৪০। মানুষ

বনকে শুধু উচ্ছন্ন করতে চায় না, তাকে বাড়াতে চায়। এইসব প্লটে বিভিন্ন সময়ে নতুন করে শালের চারা রোপণ করা হয়েছে, এ তারই নির্দেশ।

বনের রূপ দেখতে দেখতে চলেছি। মাঝে মাঝে ভয়ও যে না করছিল এমন নয়। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ যদি গাড়ির এঞ্জিন খারাপ হয়ে যায়, আর তাকে বুঝে যদি লাফ মারে একটা বুনো জানোয়ার তা হলে ঃ

তা হলে পকেটের ফাউন্টেন পেনটা ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোন অস্ত্রই সঙ্গে নেই।

শেষটায় আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলাম — হাঁরে, এখানে বাঘ আছে?

ওরা অনুকম্পার হাসি হাসল।

— হাঁ, হুজুর।

— ভালুক?

রাজা-রাজড়ার সহবৎ, কাজেই যতটুকু জিজ্ঞাসা করব ঠিক ততটুকুই উত্তর। ওরা বলল — হাঁ হুজুর।

— অজগর সাপ?

জী মালিক।

প্রশ্ন করবার উৎসাহ ওই পর্যন্তই এসে থেমে গেল আমার। যে রকম দ্রুত উত্তর দিয়ে যাচ্ছে তাতে কোনো প্রশ্নই যে 'না' বলে আমাকে আশ্বস্ত করবে এমন তো মনে হচ্ছে না। যতদূর মনে হচ্ছিল গরিলা, হিপোপোটেমাস, ভ্যাম্পায়ার কোনো কিছুই বাকি নেই এখানে। জুলু কিংবা ফিলিপিনোরও এখানে বিষাক্ত ব্যুমেরাং বাগিয়ে আছে কিনা এবং মানুষ পেলে তার বেগুণপোড়া করে খেতে ভালোবাসে কিনা এজাতীয় একটা কুটিল জিজ্ঞাসাও আমার মনে জেগে উঠেছে ততক্ষণে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম।

খানিকটা আসতেই গাড়িটা ঘস্ ঘস করে ব্রেক করল একটা। আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম — কিরে, বাঘ নাকি।

আর্দালিরা মুচকি হাসল — না হুজুর, এসে পড়েছি।

ভালো করে তাকিয়ে দেখি, সত্যিই তো। এসে পড়েছি সন্দেহ নেই। পথের বাঁ দিকে ঘন শালবনের ভেতরে একটুখানি ফাঁকা জমি। সেখানে কাঠের তৈরী বাংলো প্যাটার্নের একখানি দোতলা বাড়ি। এই নিবিড় জঙ্গলের ভেতরে যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত।

গাড়ির শব্দে বাড়িটার ভেতর থেকে দু-তিন জন চাপরাশী বেরিয়ে এল ব্যতিব্যস্ত হয়ে। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার দেখলাম বাড়ির সামনে চওড়া একটি গড়খাই কাটা। লোকগুলো ধরাধরি করে মস্ত বড় একফালি কাঠ খাদটার ওপরে সাঁকোর মতো বিছিয়ে দিল। তারই ওপর দিয়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল রাজাবাহাদুর এন, আর চৌধুরীর হান্টিং বাংলোর সামনে।

আরে, আরে কী সৌভাগ্য! রাজাবাহাদুর যে স্বয়ং এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন আমার অপেক্ষায়। এক গাল হেসে বললেন, আসুন, আসুন, আপনার জন্য আমি এখানো চা পর্যন্ত খাইনি।

শ্রদ্ধায় আর বিনয়ে আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। মুখে কথা জোগাল না, শুধু বেকুবের মতো কৃতার্থের হাসি হাসলাম একগাল।

রাজাবাহাদুর বললেন — এত কষ্ট করে আপনি যে আসবেন সে ভাবতেই পারিনি। বড় আনন্দ হল, ভারি আনন্দ হল। চলুন চলুন ওপরে চলুন।

এত গুণ না থাকলে কি আর রাজা হয়। একেই বলে রাজোচিত বিনয়।

রাজাবাহাদুর বললেন — আগে স্নান করে রিফ্রেশড হয়ে আসুন, টি ইজ গেটিং রেডি। বোয়, সাহাবক্যে গোসলখানামে লে যাও।

চল্লিশ বছরের দাড়িওয়ালা বয় নিঃসন্দেহে বাঙালী। তবু হিন্দী করে হুকুমটা দিলেন রাজাবাহাদুর, কারণ ওটাই রাজকীয় দস্তুর। বয় আমাকে গোসলখানায় নিয়ে গেল।

আশ্চর্য, এই জঙ্গলের ভেতরেও এত নিখুঁত আয়োজন। এমন একটা বাথরুমে জীবনে আমি স্নান করিনি। ব্রাকেটে তিন চারখান, সদ্য-পাট-ভাঙা নতুন তোয়ালে, তিনটে দামী সোপ, কেসে তিনি রকমের নতুন সাবান, র‍্যাকে দামী দামী তেল, লাইমজুস। অতিকায় বাথটাব — ওপরে ঝাঁঝরি। নিচে টিউব ওয়েল থেকে পাম্প করে এখানে ধারাস্নানের ব্যবস্থা। একেবারে রাজকীয় কারবার — কে বলবে এটা কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল নয়।

স্নান হয়ে গেল। ব্রাকেটে ধোপদুরস্ত ফরাসডাঙার ধুতি, সিলকের লুঙ্গি, আদ্দির পাজামা। দামের দিক থেকে পাজামাটাই সস্তা মনে হল, তাই পরে নিলাম।

বয় বাইরেই দাঁড়িয়েছিল, নিয়ে গেল ড্রেসিং রুমে। ঘরজোড়া আয়না, পৃথিবীর যা কিছু প্রসাধনের জিনিস কিছু আর বাকি নেই এখানে।

ড্রেসিং রুম থেকে বেরুতে সোজা ডাক পড়ল রাজাবাহাদুরের লাউঞ্জে। রাজাবাহাদুর একখানা চেয়ারে চিত হয়ে শুয়ে ম্যানিলা চুরুট খাচ্ছিলেন। বললেন, আসুন চা তৈরী।

চায়ের বর্ণনা না করাই ভালো। চা, কফি, কোকো; ওভ্যালটিন, রুটি, মাখন, পনির, চর্বিতে জমাট ঠাণ্ডা মাংস। কলা থেকে আরম্ভ করে পিচ্ পর্যন্ত প্রায় দশ রকমের ফল।

সেই গন্ধমাদন থেকে যা পারি গোগ্রাসে গিয়ে চললাম আমি। রাজাবাহাদুর কখনো এক টুকরো রুটি খেলেন, কখনো একটা ফল। অর্থাৎ কিছুই খেলেন না, শুধু পর পর কাপ তিনেক চা ছাড়া। তারপর আর একট চুরুট ধরিয়ে বললেন — একবার জানালা দিয়ে চেয়ে দেখুন।

দেখলাম। প্রকৃতির এখন অপূর্ব রূপ জীবনে আর দেখিনি। ঠিক জানালার নিচেই মাটিটা খাড়া তিন চারশো ফুট নেমে গেছে, বাড়িটা যেন ঝুলে আছে সেই রাক্ষুযে শূন্যতার ওপরে। তলায় দেখা যাচ্ছে ঘন জঙ্গল, তার মাঝ দিয়ে পাহাড়ী নদীর একটা সঙ্কীর্ণ নীলোজ্জ্বল রেখা। যতদূর দেখা যায়, বিস্তীর্ণ অরণ্য চলেছে প্রসারিত হয়ে; তার সীমান্তে নীল পাহাড়ের প্রহরা।

আমার মুখ দিয়ে বেরুল — চমৎকার।

রাজাবাহাদুর বললেন — রাইট্। আপনারা কবি মানু, আপনাদের তো ভালো লাগবেই। আমারই মাঝে মাঝে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে মশাই। কিন্তু নিচের এই যে জঙ্গলটি দেখতে পাচ্ছেন ওটি বড় সুবিধের জায়গা নয়। টেরাইয়ের ওয়ান্ অব দি ফিয়ার্সেস্ট্ ফরেস্টস। একেবারে প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্ব।

আমি সভয়ে জঙ্গলটার দিকে তাকালাম। ওয়ান অব দি ফিয়ার্সেস্ট। কিন্তু ভয় পাওয়ার মতো কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না। চারশো ফুট নীচে ওই অতিকায় জঙ্গটাকে একটা নিরবচ্ছিন্ন বেঁটে গাছের ঝোপ বলে মনে হচ্ছে, নদীর রেখাটাকে দেখাচ্ছে উজ্জ্বল একখানা পাতের মতো। আশ্চর্য সবুজ, আশ্চর্য সুন্দর। অফুরন্ত রোদে ঝলমল করছে অফুরন্ত প্রকৃতি — পাহাড়টা যেন গাঢ় নীল রং দিয়ে আঁকা। মনে হয় ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ওই স্তব্ধ গম্ভীর অরণ্য যেন আদর করে বুকে টেনে নেবে রাশি রাশি পাতার একটা নরম বিছানার ওপরে। অথচ —

আমি বললাম — ওখানেই শিকার করবেন নাকি?

— ক্ষেপেছেন, নামব কী করে। দেখছেন তো, পেছনে চারশো ফুট খাড়া পাহাড়। আজ পর্যন্ত ওখানে কোনো শিকারীর বন্দুক গিয়ে পৌঁছোয়নি। তবে হ্যাঁ, ঠিক শিকার করি না বটে, আমি মাঝে মাঝে মাছ ধরি ওখান থেকে।

— মাছ ধরেন! — আমি হাঁ করলাম ঃ মাছ ধরেন কি রকম? ওই নদী থেকে নাকি?

— সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। দরকার হলে পরে দেখতে পাবেন — রাজাবাহাদুর রহস্যময় ভাবে মুখ টিপে হাসলেন ঃ আপাতত শিকারের আয়োজন করা যাক, কিছু না জুটলে মাছের চেষ্টাই করা যাবে। তবে ভালো টোপ ছাড়া আমার পছন্দ হয় না, আর তাতে অনেক হাঙ্গাম।

— কিছু বুঝতে পারছি না।

রাজাবাহাদুর জবাব দিলেন না, শুধু হাসলেন। তারপর ম্যানিলা চুরুটের খানিকটা সুগন্ধি ধোঁয়া ছড়িয়ে বললেন — আপনি রাইফেল ছুঁড়তে জানেন?

বুঝলাম, কথাটাকে চাপা দিতে চাইছেন। সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাকে দমন করে ফেললাম আমি, এর পরে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাটা সঙ্গত হবে না, শোভনও নয়। সেটা কোর্ট-ম্যানারের বিরোধী।

রাজাবাহাদুর আবার বললেন — রাইফেল ছুঁড়তে পারেন?

বললাম — ছেলেবেলায় এয়ার গান ছুঁড়েছি।

রাজাবাহাদুর হেসে উঠলেন — তা বটে। আপনারা কবি মানুষ, ওসব অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপার আপনাদের মানায় না। আমি অবশ্য বারো বছর বয়সেই রাইফেল হাতে তুলে নিয়েছিলাম। আপনি চেষ্টা করে দেখুন না, কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

উঠে দাঁড়ালেন রাজাবাহাদুর। ঘরের একদিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমি দেখলাম — এ শুধু লাউঞ্জ নয়, রীতিমতো একটা ন্যাচারাল মিউজিয়াম এবং অস্ত্রাগার। খাওয়ার টেবিলেই নিমগ্ন ছিলাম বলে এতক্ষণ দেখতে পাইনি, নইলে এর আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল।

চারিদিকে সারি সারি নানা আকারের আগ্নেয়াস্ত্র। গোটাচারেক রাইফেল, ছোট বড় নানা রকম চেহারা। একটা হুকের সঙ্গে খাপে আঁটা এক জোড়া রিভলভার ঝুলছে, তার পাশেই দুলছে খোলা একখানা লম্বা শেফিল্ডের তরোয়াল — সূর্যের আলোর মতো তার ফলার নিষ্কলঙ্ক রঙ। মোটা চামড়ায় বেল্‌টে ঝকঝকে পেতলের কার্তুজ — রাইফেলের, রিভলভারের। জরিদার খাপে খানতিনের নেপালী ভোজালী। আর দেওয়ালের গায়ে হরিণের মাথা, ভালুকের মুখ, নানা রকমের চামড়া — বাঘের, সাপের, হরিণের, গো-সাপের। একটা টেবিলে অতিকায় হাতীর মাথা — দুটো বড় বড় দাঁত এগিয়ে আছে সামনের দিকে। বুঝলাম — এরা রাজাবাহাদুরের বীর কীর্তির নিদর্শন।

ছোট একটা রাইফেল তুলে নিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন — একটা লাইট জিনিস। তবে ভালো রিপিটার; অনায়াসে বড় বড় জানোয়ার ঘায়েল করতে পারেন।

আমার কাছে অবশ্য সবই সমান। লাইট রিপিটার যা, হাউইট-জার কামানও তাই; তবু সৌজন্যরক্ষার জন্যে বলতে হল — বাঃ, তবে তো চমৎকার জিনিস।

রাজাবাহাদুর রাইফেলটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে; তা হলে চেষ্টা করুন। লোড করাই আছে, ছুঁড়ুন ওই জানালা দিয়ে।

আমি সভয়ে তিন পা পেছিয়ে গেলাম। জীবনে বেকুবি অনেক করেছি, কিন্তু তার পরিমাণটা বাড়াতে আর প্রস্তুত নই। যুদ্ধ-ফেরৎ এক বন্ধুর মুখে তাঁর রাইফেল ছোঁড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা শুনেছিলাম — পড়ে গিয়ে পা ভেঙে নাকি তাঁকে একমাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। নিজেকে যতদূর জানি — আমার ফাঁড়া শুধু পা ভাঙার ওপর দিয়েই কাটবে বলে মনে হয় না।

বললাম — ওটা এখন থাক, পরে হবে না হয়।

রাজাবাহাদুর মৃদু কৌতুকের হাসি হাসলেন। বললেন, এখন ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু একবার ধরতে শিখলে আর ছাড়তে চাইবেন না। হাতে থাকলে বুঝবেন কতবড় শক্তিমান আপনি। ইউ ক্যান ইজিলি ফেস অল দ্য রাস্কেলস্ অব্ — অব্ —

হঠাৎ তাঁর চোখ ঝকঝক করে উঠল। মৃদু হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে উঠলো মুখের পেশীগুলো ঃ অ্যাণ্ড এ রাইভ্যাল —

মুহূর্তে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। রাজাবাহাদুরের দুচোখে বন্য হিংসা, রাইফেলটা এমন শক্ত মুঠিতে বাগিয়ে ধরেছেন যে সামনে কাউকে গুলি করবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন তিনি। উত্তেজনার ঝোঁকে আমাকে যদি লক্ষ্যভেদ করে বসেন তা হলে —

আতঙ্কে দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি। কিন্তু ততক্ষণে মেঘ কেটে গেছে — রাজা-রাজড়ার মেজাজ। রাজাবাহাদুর হাসলেন।

— ওয়েল, পরে আপনাকে তালিম দেওয়া যাবে। সবই তো রয়েছে, যেটা খুসী আপনি ট্রাই করতে পারেন। চলুন, এখন বারান্দায় গিয়ে বসা যাক, লেটস্ হ্যাভ সাম এনার্জি।

প্রাতরাশেই প্রায় বিন্ধ্যপর্বত উদরাৎ করা হয়েছে, আর কী হবে এনার্জি সঞ্চিত হবে বোঝা শক্ত। কিন্তু কথাটা বলেই রাজাবাহাদুর বাইরের বারান্দায় দিকে পা বাড়িয়েছেন। সুতরাং আমাকেও পিছু নিতে হল।

বাইরে বারান্দায় বেতের চেয়ার, বেতের টেবিল। এখানে ঢোকবার পরে এত বিচিত্র রকমের আসনে বসছি যে আমি প্রায় নার্ভাস হয়ে উঠেছি। তবু যেন বেতের চেয়ারে বসতে পেরে খানিকটা সহজ অন্তরঙ্গতা অনুভব করা গেল। এটা অন্তত চেনা জিনিস।

আর বসবার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল এনার্জি কথাটার আসল তাৎপর্য কী। বেয়ারা তৈরীই ছিল, ট্রেতে করে একটি ফেনিল গ্লাস সামনে এনে রাখল — অ্যালকোহলের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে গেল বাতাসে।

রাজাবাহাদুর স্মিত হাস্যে বললেন — চলবে?

সবিনয়ে জানালাম, না।

— তবে বিয়ার আনবে? একেবারে মেয়েদের ড্রিঙ্ক! নেশা হবে না।

— নাঃ থাক। অভ্যেস নেই কোনোদিন।

— হুঁঃ, গুড কণ্ডাক্টের প্রাইজ পাওয়া ছেলে। রাজাবাহাদুরের সুরে অনুকম্পার আভাস ঃ আমি কিন্তু চৌদ্দ বছর বয়সেই প্রথম ড্রিঙ্ক ধরি।

রাজা-রাজড়ার ব্যাপার — সবই অলৌকিক। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউটের বাচ্চা। সুতরাং মন্তব্য অনাবশ্যক। ট্রে বারবার যাতয়াত করতে লাগল; রাজাবাহাদুরের প্রখর উজ্জ্বল চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে এল ক্রমশ, ফর্সা গাল গোলাপী রং ধরল। হঠাৎ অসুস্থ দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

— আচ্ছা বলতে পারেন, আপনি রাজা নন কেন?

এরকম একটা প্রশ্ন করলে বোকার মতো দাঁত বের করে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। আমিও তাই করলাম।

— বলতে পারলেন না?

— না।

— আপনি মানুষ মারতে পারেন?

— এ আবার কী রকম কথা। আমার আতঙ্ক জাগল।

— না।

— তা হলে বলতে পারবেন না। ইউ আর অ্যাবসোলিউটলি হোপলেস।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ালেন রাজাবাহাদুর। বলে গেলন ঃ আই পিটি ইউ।

বুঝলাম নেশাটা বেশ চড়েছে। আমি আর কথা বাড়ালাম না, চুপ করে বসে রইলাম সেখানেই। খানিক পরেই ঘরের ভেতরে নাক ডাকার শব্দ। তাকিয়ে দেখি তাঁর লাউঞ্জের সেই চেয়ারটায় হাঁ করে ঘুমুচ্ছেন রাজাবাহাদুর, মুখের কাছে কতকগুলো মাছি উড়ছে ভনভন করে।

★ ★ ★

সেই দিন রাত্রেই শিকারের প্রথম অভিজ্ঞতা

জঙ্গলের ভেতর বসে আমি মোটরে। দুটো তীব্র হেড-লাইটের আলো পড়েছে সামনের সঙ্কীর্ণ পথে আর দুধারের শাল বনে। ওই আলোক-রেখার বাইরে অবশিষ্ট জঙ্গলটায় যেন প্রেত-পুরীর জমাট অন্ধকার। রাত্রির তমসায় আদিম হিংসা সজাগ হয়ে উঠেছে চারদিকে — অনুভব করছি সমস্ত স্নায়ু দিয়ে। এখানে হাতীর পাল ঘুরছে দুরের কোন পাহাড়ের পাথর গুঁড়িয়ে, গুঁড়িয়ে, ঝোপের ভেতরে অজগর প্রতীক্ষা করে আছে অসতর্ক শিকারের আশায়, আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় উৎকর্ণ হয়ে আছে হরিণের পাল আর কোনো একটা খাদের ভেতরে জলজ্বল করছে ক্ষুধার্ত বাঘের চোখ। কালো রাত্রিতে জেগে রয়েছে কালো অরণ্যের প্রাথমিক জীবন।

রোমাঞ্চিত ভীত প্রতীক্ষায় চুপ করে বসে আছি মোটরের মধ্যে। কিন্তু হিংসার রাজত্ব শালবন ডুবে আছে একটা আশ্চর্য স্তব্ধতায়। শুধু কানের কাছে অবিশ্রান্ত মশার গুঞ্জন ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে — শালের পাতায় উঠছে এক একটা মৃদু মর্মর। আর কখনো কখনো ডাকছে বনমুরগী, ঘুমের মধ্যে পাখা ঝাপটাচ্ছে ময়ূর। মনে হচ্ছে এই গভীর ভয়ঙ্কর অরণ্যের ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলো যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে একটা নশ্চিন্ত কোনো মুহূর্তেরই প্রতীক্ষা করে আছে।

আমরাও প্রতীক্ষা করে আছি। মোটরের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে বসে আছি আমরা — একটি কথাও বলবার উপায় নেই। রাইফেলের একটা ঝকঝকে নল এঞ্জিনের পাশে বাড়িয়ে দিয়ে শিকারী বাঘের মতোই তাকিয়ে আছেন রাজাবাহাদুর। চোখদুটো উদগ্র প্রখর হয়ে আছে হেড লাইটের তীব্র আলোক রেখাটার দিকে, একটা জানোয়ার ওই রেখাটা পেরুবার দুঃসাহস করলেই রাইফেল গর্জন করে উঠবে।

কিন্তু জঙ্গলে সেই আশ্চর্য স্তব্ধতা। অরণয যেন আজ রাত্রে বিশ্রাম করছে, একটি রাত্রের জন্যে ক্লান্ত হয়ে জানোয়ারগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে খাদের ভেতরে, রোগের আড়ালে। কেটে চলেছে মন্থর সময়। রাজাবাহাদুরের হাতের রেডিয়াম ডায়াল ঘড়িটা একটা সবুজ চোখের মতো জ্বলছে, রাত দেড়টা পেরিয়ে গেছে। ক্রমশ উসখুস করছেন উৎকর্ণ রাজাবাহাদুর।

— নাঃ হোপলেস। আজ আর পাওয়া যাবে না।

বহুদূর থেকে একটা তীব্র গম্ভীর শব্দী হাতীর ডাক। ময়ুরের পাখা ঝাপটানি চলছে মাঝে মাঝে। এক ফাঁকে একটা প্যাঁচা চেঁচিয়ে উঠল, রাত্রি ঘোষণা করে গেল শেয়ালের দল। কিন্তু কোথায় বাঘ, কোথায় বা ভালুক? অন্ধকার বনের মধ্যে দ্রুত কতকগুলো ছুটন্ত খুরের আওয়াজ — পালিয়ে গেল হরিণের পাল।

কিন্তু কোনো ছায়া পড়ছে না আলোকবৃত্তের ভেতরে। মশার কামড় যেন অসহ্য হয়ে উঠছে।

— বৃথাই গেল রাতটা। — রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বরে পৃথিবীর সমস্ত বিরক্তি ভেঙ্গে পড়ল ঃ ডেভিল্ লাক। সীটের পাশ থেকে একটা ফ্লাস্ক তুলে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে ঢাললেন গলাতে, ছড়িয়ে পড়ল হুইস্কির উগ্র উত্তপ্ত গন্ধ।

— থ্যাঙ্ক হেভন্স্। — রাজাবাহাদুর হঠাৎ নড়ে বসলেন চকিত হয়ে। নক্ষত্রবেগে হাতটা চলে গেল রাইফেলের ট্রিগারে। শিকার এসে পড়েছে।

আমিও দেখলাম। বহুদূরে আলোর রেখাটার ভেতরে কী একটা জানোয়ার দাড়িয়ে পড়েছে স্থির হয়ে। এমন একটা

জোরালো আলো চোখে পড়াতে কেমন দিশেহারা হয়ে গেছে, তাকিয়ে আছে এই দিকেই। দুটো প্রদীপের আলোর মতো ঝিক ঝিক করছে তার চোখ।

ড্রাইভার বললে — হায়না।

— ড্যাম — রাইফেল থেকে হাত সরিয়ে নিলেন রাজাবাহাদুর, কিন্তু পর মুহূর্তেই চাপা উত্তেজিত গলায় বললেন — থাক, আজ ছুঁচোই মারব।

দুম করে রাইফেল গর্জন করে উঠল। কানে তালা ধরে গেল আমার। বারুদের গন্ধে বিস্বাদ হয়ে উঠল নাসারন্ধ্র। অব্যর্থ লক্ষ্য রাজাবাহাদুরের — পড়েছে জানোয়ারটা।

ড্রাইভার বললে — তুলে আনব হুজুর?

বিকৃতমুখে রাজাবাহাদুর বললেন — কী হবে? গাড়ি ঘোরাও।

রেডিয়াম ডায়ালের সবুজ আলোয় রাত তিনটে। গাড়ি ফিরে চলল হান্টিং বাংলোর দিকে। একটা ম্যানিলা চুরুট ধরিয়ে রাজাবাহাদুর আবার বললেন — ড্যাম্।

কিন্তু কী আশ্চর্য — জঙ্গল যেন রসিকতা শুরু করেছে আমাদের সঙ্গে। দিনের বেলা অনেক চেষ্টা করেও দুটো একটা বনমুরগী ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না — এমনকি একটা হরিণ পর্যন্ত নয়। নাইটশুটিংয়েও সেই অবস্থা। পর পর তিন রাত্রি জঙ্গলের নানা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে চেষ্টা করা হল, কিন্তু নগদ লাভ যা ঘটল তা অমানুষিক মশার কামড়। জঙ্গলের হিংস্র জন্তুর সাক্ষাৎ মিলল না বটে, কিন্তু মশাগুলোকে চিনতে পারা গেল। এমন সাংঘাতিক মশা যে পৃথিবীর কোথাও থাকতে পারে এতদিন এ ধারণা ছিল না আমার।

তবে মশার কামড়ের ক্ষতিপূরণ চলতে লাগল গন্ধমাদন উজাড় করে। সত্যি বলতে কী, শিকার করতে না পারলেও মনের দিক থেকে বিন্দুমাত্র ক্ষোব ছিল না আমার। জঙ্গলের ভেতরে এমন রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন কল্পনারও বাইরে। জীবনে এমন দামী খাবার কোনো দিন মুখে তুলিনি, এমন চমৎকার বাথরুমে স্নান করিনি কখনো, এত পুরু জাজিমের বিছানায় শুয়ে অস্বস্তিতে প্রথম দিন তো ঘুমুতেই পারিনি আমি। নিবিড় জঙ্গলের নেপথ্যে গ্র্যান্ড হোটেলের স্বাচ্ছেন্দ্যে দিন কাটাচ্ছি — শিকার না হলেও কণামাত্র ক্ষতি নেই কোথাও। প্রত্যেক দিনই লাউঞ্জে চা খেতে খেতে চারশো ফুট নিচেকার ঘন জঙ্গলটার দিকে চোখ পড়ে। সকালের আলোয় উদ্ভাসিত।

— হুম্। — অদৃষ্টকেও বদলানো চলে। — রাজাবাহাদুর উঠে পড়লেন ঃ আমার সঙ্গে আসুন।

দুজনে বেরিয়ে এলাম। রাজাবাহাদুর আমাকে নিয়ে এলেন হান্টিং বাংলোর পেছন দিকটাতে। ঠিক সেখানে — যার চারশো ফুট নিচে টেরাইয়ের অন্যতম হিংস্র অরণ্য বিস্তীর্ণ হয়ে আছে।

এখানে আসতে আর একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল। দেখি কাঠের একটা রেলিং দেওয়া সাঁকোর মতো জিনিস সেই সীমাহীন শুন্যতার ওপরে প্রায় পনেরো ষোল হাত প্রসারিত হয়ে আছে। তার পাশে দুটো বড় কাঠের চাকা, তাদের সঙ্গে হুক লাগানো দুজোড়া মোটা কাছি জড়ানো। ব্যাপাটা কী ঠিক বুঝতে পারলাম না।

— আসুন। — রাজাবাহাদুর সেই ঝুলন্ত সাঁকোটার ওপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমিও গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে। একটা আশ্চর্য বন্দোবস্ত। ঠিক সাঁকোটার নিচেই পাহাড়ী নদীটার রেখা, নুড়ি মেশানো সঙ্কীর্ণ বালুতট তার

দুপাশে, তাছাড়া জঙ্গল আর জঙ্গল। নিচে তাকাতে আমার মাথা ঘুরে উঠল। রাজাবাহাদুর বললেন, জানেন এসব কী?

— না।

— আমার মাছ ধরবার বন্দোবস্ত। এর কাজ খুব গোপনে — নানা হাঙ্গামা আছে। কিন্তু অব্যর্থ।

— ঠিক বুঝতে পারছি না।

— আজ রাত্রেই বুঝতে পারবেন। শিকার দেখতে আপনাকে ডেকে এনেছি, নতুন একটা শিকার দেখাব। কিন্তু কোনোদিন এর কথা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না।

কিছু না বুঝেই মাথা নাড়লাম — না।

— তা হলে আজ রাতটা অবধি থাকুন। কাল সকালেই আপনার গাড়ির ব্যবস্থা করব। — রাজাবাহাদুর আবার হান্টিং বাংলোর সম্মুখের দিকে এগোলেন ঃ কাল সকালের পরে এমনিতেই আপনার আর এখানে থাকা চলবে না।

একটা কাঠের সাঁকো, দুটো কপিকলের মতো জিনিস। মাছ ধরবার ব্যবস্থা। কাউকে বলা যাবে না এবং কাল সকালেই চলে যেতে হবে। সবটা মিলিয়ে যেন রহস্যের খাসমহল একেবারে। আমার কেমন এলোমেলো লাগতে লাগল সমস্ত। কিন্তু ভালো করে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, রাজাবাহাদুরকে বেশি প্রশ্ন করতে কেমন অস্বস্তি লাগে আমার। অনধিকার চর্চা মনে হয়।

শ্যামলতা দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে আছে অপরূপ প্রসন্নতায়। ওয়ান অব দি ফিয়ার্সেস্ট ফরেস্টস। বিশ্বাস হয় না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি বাতাসে আকার-অবয়বহীন পত্রাবরণ সবুজ সমুদ্রের মতো দুলছে, চক্র দিচ্ছে পাখীর দল — এখান থেকে মৌমাছির মতো দেখায় পাখিগুলোকে; জানালার ঠিক নিচেই ইস্পাতের ফলার মতো পাহাড়ী নদীটার নীলিমোজ্জ্বল রেখা — দুটো একটা নুড়ি ঝকমক করে মরিখণ্ডের মতো। বেশ লাগে।

তারপরেই চমক ভাঙে আমার। তাকিয়ে দেখি ঠোঁঠের কোণে ম্যানিলা চুরুট পুড়ছে, অস্থির চঞ্চল পায়ে রাজাবাহাদুর ঘরের ভেতরে পায়চারি করছেন। চোখে মুখে একটা চাপা আক্রোশ — ঠোঁট দুটোর নিষ্ঠুর কঠিনতা। কখনো একটা রাইফেল তুলে নিয়ে বিরক্তিভরে নামিয়ে রাখেন, কখনো ভোজালি তুলে নয়ে নিজের হাতের ওপরে ফলাটা রেখে পরীক্ষা করেন সেটার ধার, আবার কখনো বা জানালার সমানে খানিক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন নিচের জঙ্গলটার দিকে। আজ তিন দিন থেকে উল্লেখযোগ্য একটা কিছু শিকার করতে পারেন নি — ক্ষোভে তাঁর দাঁতগুলো কড়মড় করতে থাকে।

তারপরেই বেরিয়ে যান এনার্জি সংগ্রহের চেষ্টার। বাইরের বারান্দায় গিয়ে হাঁক দেন — পেগ।

কিন্তু পরের পয়সায় রাজভোগ খেয়ে এবং রাজোচিত বিলাস করে বেশি দিন কাটানো আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে। রাজাবাহাদুরের অনুগ্রহ একটা দামী জিনিস বটে, কিন্তু কলকাতায় আমার ঘর-সংসার আছে, একটা দায়িত্ব আছে তার। সুতরাং চতুর্থ দিন সকালে কথাটা আমাকে পাড়তে হল।

বললাম, এবার আমাকে বিদায় দিন তা হলে।

রাজাবাহাদুর সবে চতুর্থ পেয়ে চুমুক দিয়েছেন তখন। তেমনি অসুস্থ আর রক্তাভ চোখে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আপনি যেতে চান?

— হাঁ, কাজকর্ম রয়েছে —

— কিন্তু আমার শিকার আপনাকে দেখাতে পারলাম না।

— সে না হয় আর একবার হবে।

— হুম্। — চাপা ঠোঁটের ভেতরেই একটা গম্ভীর আওয়াজ করলেন রাজাবাহাদুর ঃ আপনি ভাবছেন আমার ওই রাইফেলগুলো, দেওয়ালে ওই সব শিকারের নমুনা — ওগুলো সব ফার্স?

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, না, না, তা কেন ভাবতে যাব। শিকার তো খানিকটা অদৃষ্টের ব্যাপার —

বাংলোর সামনে তিন চারটে ছোট ছোট নোংরা ছেলেমেয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে, হিন্দুস্থানী কীপারটার বেওয়ারিশ সম্পত্তি। কীপারটাকে সকালে রাজাবাহাদুর শহরে পাঠিয়েছেন, কিন্তু দরকারী জিনিসপত্র কিনে কাল সে ফিরবে। ভারী বিশ্বাসী আর অনুগত লোক। মাতৃহীন ছেলেমেয়েগুলো সারাদিন হুটোপুটি করে ডাক বাংলোর সামনে। রাজাবাহাদুর বেশ অনুগ্রহের চোফে দেখেন ওদের। দোতলার জানলা থেকে পয়সা, রুটি কিংবা বিস্কুট ছুঁড়ে দেন, নিচে ওরা সেগুলো নিয়ে কুকুরের মতো লোফালুফি করে। রাজাবাহাদুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন সকৌতুকে।

আজও ছেলেমেয়েগুলো হুল্লোড় করে তাঁর চারপাশে এসে ঘিরে দাঁড়ালো। বলল — হুজুর, সেলাম। — রাজাবাহাদুর পকেটে হাত দিয়ে কতকগুলো পয়সা ছড়িয়ে দিলেন ওদের ভিতর। হরির লুটের মতো কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

বেশ ছেলেমেয়েগুলি। দুই থেকে আট বছর পর্যন্ত বয়েস। আমার ভারি ভালো লাগে ওদের। আরণ্যক জগতের শাল শিশুদের মতো সতেজ আর জীবন্ত, প্রকৃতির ভেতর থেকে প্রাণ আহরণ করে বড় করে উঠেছে।

সন্ধ্যার ডিনার টেবিলে বসে আমি বললাম, আজ রাত্রে মাছ ধরবার কথা আছে আপনার।

চোখের কোণা দিয়ে আমার দিকে তাকালেন রাজাবাহাদুর। লক্ষ্য করেছি আজ সমস্ত দিন বড় বেশি মদ খাচ্ছেন আর ক্রমাগত চুরুট টেনে চলেছেন। ভালো করে আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেননি। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা ঘটে চলেছে তাঁর।

রাজাবাহাদুর সংক্ষেপে বললেন — হুম্।

আমি সসংকোচে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন হবে?

একমুখ ম্যানিলা চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে তিনি জবাব দিলেন — সময় হলে ডেকে পাঠাব। এখন আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। স্বচ্ছন্দে কয়েকঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারেন।

শেষ কথাটা পরিষ্কার আদেশের মতো শোনালো। বুঝলাম আমি বেশিক্ষণ আজ তাঁর সঙ্গে কথা বলি এ তিনি চান না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে বলাটা অতিথিপরায়ণ গৃহস্থের অনুনয় নয়, রাজার নির্দেশ। এবং সে নির্দেশ পালন করতে বিলম্ব না করাই ভালো।

কিন্তু অতি নরম জাজিমের বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছে না। মাথার ভেতরে আবর্তিত হচ্ছে অসংলগ্ন চিন্তা। মাছধরা, কাঠের সাঁকো, কপিকল, অত্যন্ত গোপনীয়। অতল রহস্য।

তারপর এপাশ ওপাশ করতে করতে কখন যে চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে এল তা আমি নিজেই টের পাইনি।

মুখের ওপরে ঝাঁঝাঁলো একটা টর্চের আলো পড়তে আমি ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। রাত তখন ক'টা ঠিক জানি না। আরণ্যক পরিবেশ নির্জনতায় আভিভূত। বাইরে শুধু তীব্রকণ্ঠ ঝিঁঝির ডাক।

আমায় গায়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা হাত পড়েছে কার। সে হাতের স্পর্শে পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল আমার। রাজাবাহাদুর বললেন — সময় হয়েছে, চলুন।

আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম — ঠোঁটে আঙুল দিয়ে রাজাবাহাদুর। — কোনো কথা নয়, আসুন।

এই গভীর রাত্রে এমনি নিঃশব্দে আহ্বান — সবটা মিলিয়ে একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাসের পটভূমি তৈরী হয়েছে যেন। কেমন একটা অস্বস্তি, একটা অনিশ্চিত ভয়ে গা ছমছম করতে লাগল আমার। মন্ত্রমুগ্ধের মতো রাজাবাহাদুরের পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলাম।

হান্টিং বাংলোটা অন্ধকার। একটা মৃতুযর শীতলতা ঢেকে রেখেছে তাকে। একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক — চারদিকে অরণ্যে কান্নার শব্দের মতো পত্রমর্মর। গভীর রাত্রিতে জঙ্গলের মধ্যে মোটর থামিয়ে বসে থাকতে আমায় ভয় করছিল, আজও ভয় করছে। কিন্তু এ ভয়ের চেহারা আলাদা — এর মধ্যে আর একটা কী যেন মিশে আছে ঠিক বুঝতে পারছি না, অথচ পাও সরতে চাইছে না আমার। মুখের ওপরে একটা টর্চের আলো, রাজাবাহাদুরের হাতের স্পর্শটা বরফের মতো ঠাণ্ডা, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নীরবতার সেই দুর্বোধ্য কুটিল সংকেত।

টর্চের আলোয় পথ দেখিয়ে রাজাবাহাদুর আমাকে সেই ঝুলন্ত সাঁকোটার কাছে নিয়ে এলেন। দেখি তার ওপরে শিকারের আয়োজন। দুখানা চেয়ার পাতা, দুটো তৈরী রাইফেল। দুজন বেয়ারা একটা কপিকলের চাকা ঘুরিয়ে কী একটা জিনিস নামিয়ে দিচ্ছে নিচের দিকে। এক মুহূর্তের জন্য রাজাবাহাদুর তাঁর নয় সেলের হান্টিং টর্চটা নিচের দিকে ফ্ল্যাশ করলেন। প্রায় আড়াইশো ফুট নিচে সাদা পুঁটলির মতো কী একটা জিনিস কপিকলের দড়ির সঙ্গে নেমে যাচ্ছে দ্রুতবেগে।

আমি বললাম, ওটা কি রাজাবাহাদুর?

— মাছের টোপ।

— কিন্তু এখনো কিছু বুঝতে পারছি না।

— একটু পরে বুঝবেন। এখন চুপ করুন।

এবারে স্পষ্ট ধমক দিলেন আমাকে। মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে হুইস্কির তীব্র গন্ধ বেরুচ্ছে। রাজাবাহাদুর প্রকৃতিস্থ নেই। আর কিছুই বুঝতে পারছি না আমি — আমার মাথার ভেতরে সব যেন গণ্ডগোল হয়ে গেছে। একটা দুর্বোধ্য নাটকের নির্বাক দ্রষ্টার মতো রাজাবাহাদুরের পাশের চেয়ারটাতে আসন নিলাম আমি।

ওদিকে ঘন কালো বনান্তের ওপরে ভাঙা চাঁদ দেখা দিল। তার খানিকটা ম্লান আলো এসে পড়ল চারশো ফুট নিচের জলে, তার ছড়ানো মণিখণ্ডের মতো নুড়িগুলোর ওপরে। আবছাভাবে যেন দেখতে পাচ্ছি —কপিকলের দড়ির

সঙ্গে বাঁধা সাদা পুঁটলিটা অল্প অল্প নড়ছে বালির ওপরে। এক হাতে রাজাবাহাদুর রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে আছেন, আর এক হাতে মাঝে মাঝে আলোটা ফেলছেন নিচের পুঁটলিটায়। চকিত আলোয় যেটুকু মনে হচ্ছে — পুঁটলিটা যেন জীবন্ত অথচ কী জিনিস কিছু বুঝতে পারছি না। এ নাকি মাছের টোপ। কিন্তু কী এ মাছ — এ কিসের টোপ?

আবার সেই স্তব্ধতার প্রতীক্ষা। মুহূর্ত কাটছে, মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে। রাজাবাহাদুরের টর্চের আলো বারে বারে পিছলে পড়ছে নিচের দিকে। দিগন্তপ্রসার হিংস্র অরণ্য ভাঙা-ভাঙা জ্যোৎস্নায় দেখাচ্ছে তরঙ্গিত একটা সমুদ্রের মতো। নিচের নদীটা ঝকঝক করছে, যেন একখানা খাপখোলা তলোয়ার। অবাক বিস্ময়ে আমি বসে আছি। মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে। টোপ ফেলে মাছ ধরছেন রাজাবাহাদুর।

অথচ সব ধোঁয়াটে লাগছে আমার; কান পেতে শুনছি — ঝিঁঝিঁর ডাক, দুরে হাতীর গর্জন, শালপাতার মর্মর। এ প্রতীক্ষার তত্ত্ব আমার কাছে দুর্বোধ্য। শুধু হুইস্কি আর ম্যানিলা চুরুটের গন্ধ নাকে এসে লাগছে আমার। মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে, রেডিয়াম ডায়াল ঘড়ির কাঁটা চলছে ঘুরে। ক্রমশ যেন সম্মোহিত হয়ে গেলাম, ক্রমশ যেন ঘুম এল আমার। তারপরেই হঠাৎ কানের কাছে বিকট শব্দে রাইফেল সাড়া দিয়ে উঠল — চারশো ফুট নিচে থেকে ওপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল প্রচণ্ড বাঘের গর্জন। চেয়ারটা শুদ্ধ আমি কেঁপে উঠলাম।

টর্চের আলোটা সোজা পড়ছে নুড়ি-ছড়ানো বালির ডাঙাটার ওপরে। পরিস্কার দেখতে পেলাম ডোরাকাটা অতিকায় একটা বিশাল জানোয়ার সাদা পুঁটলিটার ওপরে একখানা থাবা চাপিয়ে দিয়ে পড়ে আছে, সাপের মতো ল্যাজ আছড়াচ্ছে অন্তিম আক্ষেপে। ওপর থেকে ইন্দ্রের বজ্রের মতো অব্যর্থ গুলি গিয়ে লেগেছে তার মাথায়। এত ওপর থেকে এমন দুর্নিবার মৃত্যু নামবে আশঙ্কা করতে পারেনি। রাজাবাহাদুর সোৎসাহে বললেন — ফতে।

এতক্ষণে মাছ ধরবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। সোল্লাসে বললাম, মাছ তো ধরলেন, ডাঙায় তুলবেন কেমন করে?

— ওই কপিকল দিয়ে। এই জন্যেই তো ওগুলোর ব্যবস্থা।

ব্যাপারটা যেমন বিচিত্র, তেমনি উপভোগ্য। আমি রাজাবাহাদুরকে অভিনন্দিত করতে যাব, এমন সময় — এমন সময় — পরিষ্কার শুনতে পেলাম শিশুর গোঙানি। ক্ষীণ অথচ নির্ভুল। কিসের শব্দ।

চারশো ফুট নিচে থেকে ওই শব্দটা আসছে। হ্যাঁ — কোনো ভুল নেই। মুখের বাঁধন খুলে গেছে, কিন্তু বড় দেরীতে। আমার বুকে রক্ত হিম হয়ে গেল, আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল। আমি পাগলের মতো চীৎকার করে উঠলাম, রাজাবাহাদুর, কিসের টোপ আপনার। কী দিয়ে আপনি মাছ ধরলেন?

— চুপ — একটা কালো রাইফেলের নল আমার বুকে ঠেকালেন রাজাবাহাদুর। তারপরেই আমার চারদিকে পৃথিবীটি পাক খেতে খেতে হাওয়ায় গড়া একটা বুদ্বুদের মতো শূন্যে মিলিয়ে গেল। রাজাবাহাদুর জাপটে না ধরলে চারশো ফুট নিচেই পড়ে যেতাম হয়তো।

★ ★ ★

কীপারের একটা বেওয়ারিশ ছেলে যদি জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে থাকে, তা অস্বাভাবিক নয়, তাতে কারো ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রকাণ্ড রয়্যাল বেঙ্গল মেরেছিলেন রাজাবাহাদুর — লোককে ডেকে দেখানোর মতো।

তার আটমাস পরে এই চমৎকার চটিজোড়া উপহার এসেছে। আট মাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চটিজোড়া অতি মনোরম বাস্তব। পায়ে দিয়ে একবার হেঁটে দেখলাম, যেমন নরম তেমনি আরাম!

৬৮.৫ সারাংশ

চলচ্চিত্রের জগতে বহু ব্যবহৃত ফ্ল্যাশব্যাক রীতিতে রচিত 'টোপ' গল্পের মধ্যে সুদক্ষ শৈলীতে জনৈক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর আত্মকেন্দ্রিক সতর্কতা এবং বিবেকদংশনের দোলাচলতা একদিকে, অন্যদিকে কাঞ্চনগর্বী এবং প্রতাপদম্ভী এক অভিজাত পুরুষের দানবিক নির্মমতার রূঢ়, বাস্তবসম্মত চিত্রায়ণ করা হয়েছে। প্রথম থেকে অনেকদূর অবধি একটা আলতো পরিহাসের মাধ্যমে কুণ্ঠিত আত্মসমালোচক ভঙ্গীতে লেখক গল্পটিকে টেনে নিয়ে গেছেন। গল্পের শেষে আর লঘুতরল সেই পরিহাস মর্জিটুকুর অস্তিত্ব নেই। আত্মসমালোচনা তখন প্রায় এক ধরনের অনুক্ত অথচ তীব্র আত্মধিক্কারের রূপ ধরেছে বলা চলে।

উত্তর বাংলার তরাই অঞ্চলের ঘন জঙ্গলে ঘেরা একটি জমিদারী এস্টেট — রামগঙ্গা। তার মালিক রাজাবাহাদুর বলে পরিচিত এন. আর. চৌধুরীর সঙ্গে (গল্পের কথক) এক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর আলাপ, এবং ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হয়। বস্তুতপক্ষে, মনিব-মোসাহেব ধরনের যেন একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁদের ভিতরে — যদিচ, আপাতভাবে তা বন্ধুত্বের মোড়কেই বাঁধা!

এই হলো এ-গল্পের পটভূমিকা। এ-হেন রাজাসাহেবের আমন্ত্রণে তাঁর জমিদারীতে কথক আমন্ত্রিত হলেন শিকার দেখতে। প্রভূত আদর-আপ্যায়নের মধ্যেও অহংকারী এই ভূম্যধিকারীর চরিত্রের আরো নানান্ অন্ধকার তাঁর সামনে উদ্ঘাটিত হতে থাকে। অন্যদিকে বেশ কয়েক রাত জঙ্গলে কাটানোর পরেও শিকার বলতে গেলে মেলে না কিছুই। সেই 'ব্যর্থতা' রাজাসাহেবের সামন্ততান্ত্রিক অহমিকাকে প্রবলভাবে আহত করে তোলে। এবং তিনি 'কথা' দেন যে, নায়কের অরণ্যবাসের শেষরাত্রেই একটা অত্যাশ্চর্য শিকারের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হবেন গল্পের কথক।

শিকারের বিলি-ব্যবস্থা হলো সত্যিই অভিনব। রাজাসাহেবের হান্টিং বাংলোটা চারশো ফিট খাড়াই পাহাড়ের ওপরে। তার পিছন দিকে একটা কাঠের ঝুলবারান্দার মতো লম্বা পাটাতন থেকে নিশুতি রাতের স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে একজোড়া কপিকলের সাহায্যে সাদা পুঁটলিতে জড়ানো কি যেন একটা নিচের নদীর পাড়ে, জঙ্গলের ধারে নামিয়ে দেওয়া হলো। দীর্ঘসময় কাটবার পর হঠাৎ স্তব্ধতা ভাঙে গুলির আওয়াজে — রাজাবাহাদুরের অমোঘ রাইফেলের বুলেট গিয়ে বিঁধেছে ঐ পুঁটলিবাঁধা 'টোপ'-এর লোভে আসা বিশাল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের কপালে। ঠিক সেই মুহূর্তে মরণাহত ব্যাঘ্রের গর্জনের ভয়াল ধ্বনির মধ্য থেকেও ভেসে এল চারশো ফিট ওপরে ঐ ঝুলন্ত মাচান অবধি একটি শিশুর অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ। বিমূঢ় হয়ে, 'ও কিসের আওয়াজ', বাঘের জন্য কেমন 'টোপ' নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই প্রশ্ন সুধোতেই 'রাজা' এন. আর. চৌধুরীর বন্দুকের নল স্পর্শ করে কাহিনী-কথকের মধ্যবিত্ত বুকের দুর্বল ছাতি আর তাঁর কানে আসে চুপ করে থাকার জন্য প্রচণ্ড এক ধমক।

দীর্ঘ আটমাস পরে পার্শেলে পাঠানো একজোড়া বাঘের চামড়ার মহার্ঘ চটি উপহার পেয়ে, গল্প-কথক প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে না পারলেও, অচিরেই তাঁর স্মরণে এল ঐ তরাই জঙ্গলে 'টোপ' ফেলে বাঘ শিকারের কাহিনী

ঃ সমস্ত ঘটনাটা তাঁর মনে ভেসে উঠল স্মৃতি রোমন্থনের সূত্রে। তারপরে আবার আটমাস পরের নাগরিক পরিবেশে মানসিকভাবে ফিরে এসে তাঁর মনে হলো, ঐ রাতের ঘটনাটা 'স্বপ্ন' হয়ে থাকাই সম্ভবত শ্রেয়। 'বাস্তব' হয়ে থাকুক বরং এই মূল্যবান একজোড়া চটি।

৬৮.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

এই গল্পের মধ্যে আদিম আরণ্যক পরিবেষ্টনীর মধ্যে আত্মস্মন্য অহং-বোধ মাতাল এক স্বৈরাচারী সামন্ত প্রভুর ভয়াল চরিত্রটির যেমন উদ্ঘাটন হয়েছে, তারই পাশাপাশি এর মধ্যে মধ্যবিত্তের দুর্বল দোলাচলতার নিরুপায় রূপটিও সুদক্ষভাবে হয়েছে চিত্রায়িত। এই দুই ভিন্ন শ্রেণিচরিত্র — কাহিনীর দুটি মুল কুশীলবের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর মর্মান্তিক এবং ভয়ংকর একটি ট্র্যাজিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তারই সূত্রে। এরই সঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য বিষয় হলো নারায়ণবাবুর ভাষার স্টাইল। হিউমার এবং স্যাটায়ারের ঠাসবুনুনির নক্সার মধ্যে ধীরে ধীরে তিনি ফুটিয়েছেন গদ্য কবিতার স্পন্দনধর্ম আর তার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র শৈলীতে সৃষ্ট কয়েকটি চিত্রকল্প। এই সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে গল্পের ভয়াল পরিসমাপ্তি। আবার তার ঠিক পরেই লেখক ফিরে গেছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্যাটায়ারে; সুতীব্র এক আত্মধিক্কারে। তখন আর পরিহাসমর্জির কোনো প্রকাশ নেই; হিউমারের কোনো সংকেত সেখানে নিরস্তিত্ব।

রামগঙ্গা এস্টেটের এই 'রাজাবাহাদুর' এন. আর. চৌধুরী হলেন বনেদী, অভিজাতবংশীয় এক মধ্যবয়স্ক সামন্ত প্রভু — যিনি বিংশ শতাব্দীর অর্ধেকটা অতিক্রম করে এসেও মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী প্রতাপের দম্ভে বুঁদ হয়ে আছেন। চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি প্রথম মদ্যপান শুরু করেছিলেন, আর তারও দু-বছর আগে থেকে হাত মক্সো করেছেন রাইফেলের ট্রিগার টিপে। কৈশোর যাঁর আরম্ভ হয়েছিল এভাবে, প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হবার পর তাঁর দম্ভ এবং স্বৈরাচার কোথায় যে যেতে পারে, তা তো সহজেই অনুমেয়; কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই মানুষটির সামন্ততান্ত্রিক নৃশংসতাকে যে অতলান্ত গভীর একটি স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন তা কিন্তু স্বাভাবিক অনুমান-ক্ষমতার নাগালের বাইরে। সাধারণভাবে বন্দুকের পাল্লায় বাঘ পাওয়া যাচ্ছে না বলে, তাকে প্রলুব্ধ করে আনার জন্য দু-বছরের মানুষশিশুর হাতমুখ বেঁধে টোপ হিসেবে চারশো ফিট ওপর থেকে গহন অরণ্যের অন্ধকারে নামিয়ে দেবার পিছনে যে উদ্ভাবনী শক্তিই থাকুক না কেন, তা কিন্তু ভয়াবহরূপেই দানবিক। রাজাবাহাদুরের এই দানবমূর্তিটা মাঝে-মাঝেই অবশ্য কাহিনির মধ্যে আবছা ঝিলিক দিয়ে গেছে বাইরের সম্ভ্রান্ততার খোলসটুকু সরিয়ে। এই মানুষটির নৃশংসতার মাত্রা যে কতখানি ব্যাপক তার পরিচয় মেলে নিজের একান্ত অনুগত বিশ্বাসী এক কর্মচারীকে কাজের ছুতো করে সরিয়ে দিয়ে, তারই একটি মাতৃহীন সন্তানকে এমনভাবে বাঘশিকারের জন্য টোপ হিসেবে ব্যবহার করার ঘটনার মধ্যে। নিতান্ত কাছের মানুষ — যে সদাসর্বদা প্রভুর কাজেই নিয়োজিত প্রাণ — তারই প্রতি যদি এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, তাহলে সেই ব্যক্তিটির দানবীয়তা যে কোন পর্যায়ের, সেকথা তো আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই ধরনের মানুষেরা আন্তরিকভাবেই স্তাবকতা পছন্দ করে থাকে, এবং আলোচ্য রাজাবাহাদুরটিও সেই প্রবণতা থেকে মুক্ত নন। গল্পের কথককে তাঁর গুণগ্রাহীরূপে (প্রকৃতপক্ষে মোসাহেব হিসেবেই!) দেখে তাঁর মনের মধ্যে প্রকট হয়ে থাকা আত্মম্ভরিতার বোধটা পরিতৃপ্ত হয়। সোনার হাতঘড়ি উপহার (আসলে যা, তাঁর নামে স্তুতিমূলক 'পদ্য' লিখে দেবার জন্য পারিশ্রমিক, বা বখসিস।) দেওয়া, প্রায়ই চায়ের আসরে ডাকা কিংবা শিকার

দেখতে তরাইয়ের এস্টেটে নিমন্ত্রণ করা — এইসব 'সৌজন্য' বস্তুতপক্ষে রাজাসাহেবের বনোদীয়ানার মুখোস ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত রূঢ় দাম্ভিকতা ধরা পড়ে মাঝে-মাঝেই, কথা এবং আচরণের মাধ্যমে। হত্যা কিংবা মদের নেশায় যখনই তিনি বুঁদ হয়ে যান, তখনই তাঁর মুখোশটা পড়ে খসে। তখন তিনি সমাদরে নিমন্ত্রণ করে আনা অতিথিকে বিদ্রূপ-অপমান-টিট্‌কিরি—কোনো কিছুর দ্বারাই জর্জরিত করতে সংকোচ বোধ করেন না। আবার 'মুখোশ' খুলে যাবার সম্ভাব্য আশঙ্কায় নিজেই সেই আমন্ত্রিতকে প্রকারান্তরে 'বিদেয় হও' বলতেও রাজাবাহাদুর আকুণ্ঠিত; এবং যে মুহূর্তে শেষ 'মুখোশ' আচমকাই খাসে যায়, তখন তিনি তার বুকের ওপরে গুলিভরা বন্দুকের নল চেপে ধরতেও নির্দ্বিধ। সর্পিল-কুটিলতা এবং আদিম-হিংস্রতা তাঁর স্বভাবজ; আভিজাত্যের সদম্ভ আচরণ তাঁর পারিবারিক পরিবেশের সূত্রে প্রাপ্ত; মোসাহেবি-প্রিয়তা এবং 'দাতাকর্ণ' সাজাও তারই আনুষঙ্গিক ব্যাপার। এই সবটুকু মিলিয়েই তাঁর চরিত্রের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞানটুকুর সন্ধান মেলে।

॥ ২ ॥

এই রাজাসাহেবের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, এই গল্পের কথকের চরিত্রটি বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই নজরে পড়ে তাঁর চারিত্রিক দোলাচলতা — যা মধ্যবিত্তের একটা স্বাভাবিক শ্রেণিগত লক্ষণ বলা যেতে পারে। তাঁর স্বার্থবুদ্ধি এবং বিবেকবুদ্ধির মধ্যে যে টানাপোড়েন এই গল্পের মধ্যে দেখি — বিশেষত মূল গল্পের অন্তিম পর্যায়ে, সেটিই হলো মধ্যবিত্তের ঐ শ্রেণিচরিত্রের সার্থক অভিব্যক্তি।

এই মানুষটি সাধারণ মধ্যবিত্তের এক গড়পড়তা প্রতিনিধি; সংসারী এবং সাহিত্য সংস্কৃতিপ্রেমী। তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা যে খুব একটা স্বচ্ছল নয়, তা তাঁর সমপর্যায়ভুক্ত বন্ধুদের সম্পর্কে করা একটি মন্তব্যের সূত্রে বোঝা যায় ঃ ''সব কটাকেই তো চিনি, বিনামূল্যে এমন একজোড়া জুতো পাঠাবার মতো দরাজ মেজাজ এবং ট্যাঁক কারো আছে বলেও জানি না।'' এই মধ্যবিত্ততার আবারও একবার অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া গেল রামগঙ্গা এস্টটে পৌঁছিয়ে স্নান সারার পরে ঃ ''ব্রাকেটে ধোপদুরস্ত ফরাসডাঙ্গার ধুতি, সিল্‌কের লুঙ্গি, আদ্দির পাজামা। দামের দিক থেকে পাজামাটাই সস্তা মনে হল, তাই পরে নিলাম।''

রাজাবাহাদুরের বন্ধুত্ব অর্জনের নামে বস্তুতপক্ষে মোসাহেবীই যে করছেন তিনি, সেটাও কিন্তু এই ভদ্রলোক খুব স্বচ্ছভাবেই বোঝেন। তাই ঈশ্বরগুপ্তীয় ঢঙে রাজস্তুতি তিনি যা লখেছিলেন, সেটাকে তিনি সোনার হাতঘড়ি উপহার (ওরফে ইনাম, বা বকশিস) পাবার পর থেকে যে সম্পূর্ণ সত্য বলেই বিশ্বাস করার চেষ্টা চালাচ্ছেন, সে কথা সবিদ্রূপে নিজেই বলেছেন।

কিন্তু রাজাবাহাদুরের বারো বছর বয়সে বন্দুক চালানোয় রপ্ত হওয়া এবং চোদ্দ বছরে মদ ধরার ইতিবৃত্ত শুনে তাঁর মনে যে বিরূপতার সঞ্চার ঘটেছে, সেটার অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যঙ্গনৈপুণ্য সমানভাবেই সক্রিয়ঃ ''রাজারাজড়ার ব্যাপার — সবই অলৌকিক। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউটের বাচ্চা। সুতরাং মন্তব্য অনাবশ্যক।''

রাজকীয়-সুখভোগ এবং মোসাহেবী — এ দুটো যে প্রকৃতপক্ষে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে মানানসই নয়, সেটাও পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় না, যখন তিনি স্বগর্তোক্তি করেন ঃ ''পরের পয়সার রাজভোগ খেয়ে এবং রাজোচিত বিশ্বাস করে বেশি দিন কাটানো আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে। রাজাবাহাদুরের অনুগ্রহ একটা দামী জিনিস বটে, কিন্তু কলকাতায় আমার ঘর-সংসার আছে; একটা দায়িত্ব আছে তার। সুতরাং ....''

আর, ঠিক এই মধ্যবিত্তসুলভ বিবেকবৃত্তির লব্ধফল হিসেবেই তিনি রাজাবাহাদুরের অকল্পনীয় 'টোপ'টা যে আসলে কী, সেটা উপলব্ধি করে চিৎকার করে উঠেছিলেন এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই 'রাজা' এবং 'মধ্যবিত্তের' শ্রেণীগত বিপ্রতীপতাটুকু প্রকট হয়ে উঠল — যখন রাজাবাহাদুর সমস্ত ভব্যতার, সৌজন্য-শালীনতার মুখোশটা সরিয়ে ফেলে তাঁকে থামানোর জন্য বুকে রাইফেলের নলটা চেপে ধরলেন।

বলা যায়, ঐ ইস্পাতের শীতল আয়ুধ-স্পর্শেই গল্পকথকের কাছে নিজের শ্রেণীগত অবস্থানটা সুস্থিত হয়ে উঠল। ঘটনা-পরম্পরায় এই ভয়ঙ্কর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ঘোর গেল কেটে — যা শেষ পরিণামে সব মধ্যবিত্ত মানুষেরই কাটে, কাটতে বাধ্য হয়। কলকাতায় ফিরে আসার পরবর্তী আটমাসে তাঁর এবং এন. আর. চৌধুরী ওরফে রাজাবাহাদুরের মধ্যে আর কোনো যোগাযোগ থাকে না অত্যন্ত সহজবোধ্য কারণেই। বাংলা লোকপ্রবাদ ''বড়র পিরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ'' প্রায় হাতে হাতেই সত্য বলে প্রতীত হলো। রাজাবাহাদুরের আপাত-সম্ভ্রান্ত আভিজাত্যের অন্তরালে যে নিষ্ঠুর দানবীয়তা লুকিয়ে ছিল, সেটা অনাবৃত হয়ে পড়ার পর গল্পকথকের মধ্যেও মোসাহেবীর প্রবণতাটুকু হটে গিয়ে প্রবলতর হয়ে উঠল তাঁর বিবেকবুদ্ধিই; তাই আটমাস তিনি আর কোনো সম্পর্ক রাখেননি রাজাবাহাদুরের সঙ্গে। আটমাস পরে ডাকযোগে বাঘের চামড়ার ঐ মনোরম এবং মহার্ঘ চটি জোড়া যখন এসে পৌঁছয় তাঁর কাছে তখন কিন্তু একই সঙ্গে আবার মধ্যবিত্তের আপোষকামী এবং প্রতিবাদী দুটি সত্তাই তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে ঃ ''কীপারের একটা বেওয়ারিশ ছেলে যদি জঙ্গলে হরিয়ে গিয়ে থাকে, তা অস্বাভাবিক নয়, তাতে কারো ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রকাণ্ড রয়্যাল বেঙ্গল মেরে ছিলের রাজাবাহাদুর — লোককে ডেকে দেখানোর মতো। ...... তার আটমাস পরে এই চমৎকার চটিজোড়া উপহার এসেছে। আট মাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চটিজোড়া অত্যন্ত মনোরম বাস্তব। পায়ে দিয়ে একবার হেঁটে দেখলাম, যেমন নরম, তেমনি আরাম!'' ..... একটা অলক্ষ্য (কিন্তু অনুভব করা যায় এমন) বিদ্রূপের চোরাস্রোত এই বিবৃতির ছত্রে ছত্রে প্রবাহিত। সে বিদ্রূপ নিজের প্রতি তো অবশ্যই; কিন্তু সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীচরিত্রের উদ্দেশ্যেও তা সমপরিমাণে প্রযুক্ত। 'মনোরম'' এবং ''আরাম'' প্রদ ঐ চটিজোড়া যেন মধ্যবিত্তের পলায়নপর, আত্মসতর্ক, ভীরু শ্রেণীচরিত্রের প্রতিই সবেগে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ধিক্কার আর প্রতিবাদের নীরব প্রতীক হিসেবেই। এক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দ্বারাই।

রামগঙ্গা এস্টেটের এই 'রাজাবাহাদুর' এবং গল্পের কথক ছাড়া, খুব স্বল্পক্ষণের জন্য কাহিনীর মধ্যে এলেও আরও দুটি চরিত্র এ গল্পের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে, যারা গল্পের এই তির্যক ব্যঞ্জনাময় রূপটিকে সুপ্রকট করে তুলেছে। বাঘ এবং কীপারের ''বেওয়ারিশ'' শিশু — এ গল্পে এদের দুজনের ভূমিকা ক্ষণস্থায়ী বলে আপাতভাবে প্রতীত হলেও, বস্তুত তাদের গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম। সমাজ-মনোবিজ্ঞানীরা তো ঐ হিংস্র বাঘ এবং দরিদ্র শিশুকে দুটি বিশিষ্ট শ্রেণি-প্রতীক হিসেবেই বিচার করবেন। শ্রেণিবিভাজিত সমাজব্যবস্থায় চিরকালই নিচের তলার অসহায় মানুষেরা টোপ (অথবা, স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে শার্দুলতুল্য হিংস্র ওপরতলার প্রভুদের কাছে। এ গল্পেও সেটাই প্রতীকায়িত হয়েছে বাঘ এবং কীপারের শিশুর মাধ্যমে।

'টোপ' গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রকল্প রচনার এমন এক কবিতাসুলভ ভাষাশৈলী ব্যবহার করেছেন, যা কথাসাহিত্যে খুব সহজপ্রাপ্য নয়। অথচ এর ফলে এর ঋজু গদ্যধর্ম একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরঞ্চ, গল্পের উদ্দিষ্ট বক্তব্যটি এর ফলে যথেষ্ট ভাবগর্ভ ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয় অনেক সময়েই। এরই পাশাপাশি আবার ব্যঙ্গ-নিপুণ একটি বাগ্‌রীতিও প্রথম ও শেষ দিকে কাহিনির আস্বাদে বৈচিত্র্য এনেছে।

প্রথমে বরং এর কাব্যধর্মী স্টাইলটিকেই বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বেশ কয়েকবার এই বিশেষ শৈলীটি এমনকিছু চিত্রকল্প রচনার সহায়তা করেছে, যা কাহিনির পরিণতিকে ব্যঞ্জিত করে তুলেছে অলক্ষ্যেই। যেমন ঃ

''রাত তখন ক'টা ঠিক জানি না। আরণ্যক পরিবেশ নির্জনতার অভিভূত। বাইরে শুধু তীব্রকণ্ঠ ঝিঁঝির ডাক।

আমার গায়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা হাত পড়েছে কার। সে হাতের স্পর্শে পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল আমার। রাজাবাহাদুর বললেন — সময় হয়েছে চলুন। .... এই গভীর রাত্রে এমন নিঃশব্দ আহ্বান — সবটা মিলিয়ে একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাসের পটভূমি তৈরী হয়েছে যেন। কেমন একটা অস্বস্তি, একটা অনিশ্চিত ভয়ে গা ছমছম করতে লাগল আমার।..... হান্টিং বাংলোটা অন্ধকার। একটা মৃত্যুর শীতলতা ঢেকে রেখেছে তাকে। একটানা ঝিঁঝির ডাক — চারিদিকে অরণ্যে কান্নার শব্দের মতো পত্রমর্মর। গভীর রাত্রিতে জঙ্গলের মধ্যে মোটর থামিয়ে বসে থাকতে আমার ভয় করছিল, আজও ভয় করছে। কিন্তু এ ভয়ের চেহারা আলাদা — এর মধ্যে আর একটা কী যেন মিশে ঠিক বুঝতে পারছি না, অথচ পাও সরতে চাইছে না আমার। মুখের ওপরে একটা টর্চের আলো, রাজাবাহাদুরের হাতের স্পর্শটা বরফের মতো ঠাণ্ডা, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নীরবতার সেই দুর্বোধ্য কুটিল সংকেত।''

এই দীর্ঘ কাব্যধর্মী গদ্যভাষার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কুশলী শিল্পীর দক্ষতায় স্তব্ধ ভয়াল, শীতল, অন্ধকার এক মৃত্যুর প্রতিভাস তৈরী করেছেন। একটা ভয়ার্ত অস্বস্তি, ইংরেজি করে বললে যাকে বলা যায় "eerie uncanny সৃষ্টি হয়েছে এই বর্ণনার অন্তর্বিলীন উপজীব্য রূপে। মৃত্যুর এই চিত্রকল্পটি কাহিনীর শেষ পরিণামকে পূর্বসংকেতে ব্যঞ্জিত করে দিয়েছে পাঠকের কাছে। যে ভয়াল পরিণতি সমাসন্ন, তার প্রত্যক্ষ কোনো লক্ষণ নির্দেশ না-করেও শুধুমাত্র এই চিত্রকল্প নির্মাণের মাধ্যমেই তাকে পূর্বসূচিত করে দিয়েছেন নারায়ণবাবু।

এর অল্প পরেই আবার অন্য ধরনের ভাবব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ কাব্যিক ভাষায় কাহিনীর উদ্বর্তন ঃ

''আবার সেই স্তব্ধতার প্রতীক্ষা। মুহূর্ত কাটছে, মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে।.....দিগন্তপ্রসারী হিংস্র অরণ্য ভাঙা-ভাঙা জ্যোৎস্নায় দেখাচ্ছে তরঙ্গিত একটা সমুদ্রের মতো। নিচের নদীটা ঝকঝক করছে, যেন খাপখোলা তলোয়ার। ..... মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কারছে। ...... কান পেতে শুনছি ঝিঁঝির ডাক, দূরে হাতীর গর্জন, শালপাতার মর্মর।.... মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে ..... ক্রমশ যেন সম্মোহিত হয়ে গেলাম, ক্রমশ যেন ঘুম এল আমার।''

গল্প কথকের এই ''আচ্ছন্নতা', যেন 'হিপনোটাইজড' হবার মতন একটা অবস্থা সৃষ্টি করেছেন নারায়ণবাবু খুব সচেতনভাবেই, কেননা এরপরেই বিস্ফোরণ ঘটেছে গুলির, তার আচমকা আওয়াজে খানখান হয়ে গেছে সমস্ত আচ্ছন্নতা, সব স্তব্ধতা। আর সেটাই অভীপ্সিত এই কাহিনীর অমন আচম্বিত পরিণাম সূচিত করবার জন্য— অমল ভয়াল পরিণাম চিত্রিত করার প্রয়োজনে।

এই শৈলীদক্ষতা নারায়ণবাবুর সহজাত। আধুনিক বাঙালি কথাশিল্পীদের মধ্যে এজন্যেই তিনি অন্যদের থেকে পৃথক। কাহিনীর রূপমণ্ডলের জন্যই শুধু ভাষার কারুবিন্যাস যে নয়, এমনই একটা উপলব্ধি তাঁর ছিল বলেই এভাবে ভাষাকে কাহিনীর ভাব-পরিণামের সঙ্গে তিনি সমন্বিত করতে পেয়েছেন।

এই গল্পের একটি মুখ্য প্রবণতা হল মধ্যবিত্তের সদা সতর্ক-আত্মরক্ষার মানসিকতার জন্য অসহায় আত্মগ্লানি

এবং আত্মধিক্কার। এই ভাবটির সঙ্গে এর বিদ্রুপ-বঙ্কিম ভাষাশৈলীটিও খুব সুন্দরভাবে মানিয়ে গেছে। দুয়েকটি উদাহরণ এখানে বিবেচনা করাই যেতে পারে; যেমন ঃ

ক) ''নিছক কবিতা মেলাবার জন্য যে বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছিলাম, এখন সেগুলোকেই মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।''

খ) ''ব্রাকেটে ধোপদুরস্ত ফরাসডাঙার ধুতি, সিল্কের লুঙ্গি, আদ্দির পাজামা। দামের দিক থেকে পাজামাটাই সস্তা মনে হল, তাই পরে নিলাম।''

গ) ''আটমাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চটিজোড়া অতি মনোরম বাস্তব। পায়ে দিয়ে একবার হেঁটে দেখলাম, যেমন নরম, তেমনি আরাম।''

ঘ) ''শ্রদ্ধায় আর বিনয়ে আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। মুখে কথা জোগাল না, শুধু বেকুবের মতো কৃতার্থের হাসি হাসলাম একগাল।''

ঙ) ''আমার সৌভাগ্য ওদের ঈর্ষা তা, আমি পরোয়া করি না। নৌকো বাঁধতে হলে বড় গাছ দেখেই বাঁধা ভালো। অন্তত ছোট-খাটো ঝড়-ঝাপটার আঘাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ।''

এই ব্যঙ্গনৈপুণ্য গল্পটির শিল্পরূপ একটা বিশেষ মাত্রা নির্দেশ করেছে সন্দেহ নেই। এই বাচনভঙ্গী — আত্মকথনের শৈলীতে যা বিবৃত, এর মাধ্যমেই কিন্তু গল্পের কথকের ব্যক্তিচরিত্র এবং শ্রেণীচরিত্র — দুটিই সুচিহ্নিত হয়ে উঠেছে।

ফলত, একদিকে ভাষার মাধ্যমে লিরিক কবিতার মতো ছবি গড়ে ওঠা, আর অন্যদিকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবঙ্কিম বাগভঙ্গীর দ্বারা প্রতিনিয়ত; অত্যন্ত গদ্যময় রূঢ় বাস্তবতার কঠিন জমির ওপরে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করা এই দুই আপাত বিপ্রতীপতার দ্বান্দ্বিক অভিব্যক্তিতে এই গল্পের স্টাইল বা ভাষাশৈলী প্রকাশমান হয়েছে।

॥ ৪ ॥

সমস্ত আলোচনার পরিশেষে এই কাহিনির নাম-পরিচিতির বিষয়েও কিছু বলা বাঞ্ছনীয়। একটি জীবন্ত মানবশিশুর টোপ ফেলে বাঘ শিকার করা হলো — শুধুমাত্র এই কারণেই এ গল্পের এমন নামকরণ যে, তা নয়। গূঢ়তর কিছু একটা তাৎপর্যও নিহিত আছে এই নাম দেওয়ার মধ্যে। শুধু যে হিংস্র অরণ্যশার্দুলকে মানব-শিশু টোপ ফেলে শিকার করার ব্যাপারেই এই রাজাবাহাদুরটি পরম পারদর্শী, তা নয়; মধ্যবিত্ত এক বুদ্ধিজীবীকেও 'বন্ধুত্বের' টোপ ফেলে শকার করতে আগ্রহ আছে তাঁর — নিজের মদগর্বী অহংবোধকে তৃপ্ত করার জন্য মোসাহেব 'শিকার' করারও প্রয়োজন আছে এন. আর. চৌধুরী, রাজা অব রামগঙ্গা এস্টেট নামক এই দানবিক মানুষটির। কখনো সোনার হাতঘড়ি, কখনো চায়ের নেমন্তন্ন, কখনো বা বাঘ শিকারের সঙ্গী হবার 'সাদর' আমন্ত্রণ এবং আপ্যায়নে বুঁদ করে রাখার উদ্যম — এ সবও এক ধরনের টোপ যাতে করে নিজের বৈভব এবং প্রতিপত্তি দেখানো এবং একজন শিক্ষিত, মার্জিতবুদ্ধি ভদ্রলোকের আনুগত্য 'শিকার' করে তৃপ্তি লাভ করা যায়। মেগালোম্যানিয়া নামে মনোবিশ্লেষকরা একটি ব্যাধির কথা বলেন, যার লক্ষণ হচ্ছে নিজের অহম্মন্যতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে, সেটাকে চরিতার্থ করার জন্য যে কোনো কাজ করতে দ্বিধা না করা। সে কাজ গর্হিত, অনুচিত, নীতিবিরুদ্ধ, অমানবিক, ঘৃণ্য, হাস্যকর, লজ্জাকর — যাই কিছু হোক না কেন। রামগঙ্গা এস্টেটের এই মালিকটিও উচ্চন্ত একজন মেগালোম্যানিয়াক — তাঁর 'ইগো' বা অহংবোধকে তৃপ্ত করার জন্য তিনি যে কোনো 'টো' ফেলে যে কোনো 'শিকার' করতে (বা ধরতে) দ্বিধাহীন। 'টোপ' নামের গূঢ়তম তা ৎপর্য এটাই।

৬৮.৭ অনুশীলনী

□ বিস্তৃত আলোচনামূলক □

১) 'টোপ' গল্পের নামকরণ কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ বিচার করুন।

২) 'টোপ' গল্পের মধ্যে লেখকের আর্থ-সামাজিক শ্রেণীচেতনা কতখানি সার্থক হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, দেখান।

৩) 'টোপ' গল্পের কথকের মধ্যে মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রলক্ষণ কতখানি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বলুন।

৪) স্বৈরাচারী একজন অভিজাত ধনী হিসেবে এন. আর. চৌধুরীকে সম্ভাব্য একটি বাস্তব চরিত্র হিসেবে কতখানি গণ্য করতে পারেন।

৫) ব্যঙ্গনৈপুণ্য এবং লিরিকধর্মিতা — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার এই দুটি বৈশিষ্ট্য কীভাবে 'টোপ' গল্পের সমন্বিত হয়েছে, দেখান।

৬) 'টোপ' গল্পের মুখ্য চরিত্র কে, বুঝিয়ে বলুন।

□ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক □

১) 'টোপ' গল্পের কথক রাজাবাহাদুর সম্পর্কে কী কী কাব্যিক বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন?

২) রামগঙ্গা এস্টেটের অতিথিশালার স্নানঘরটি কতখানি সৌখিনতার সাক্ষ্য বহন করত?

৩) রাজাবাহাদুরের 'লাউঞ্জ' কীভাবে সাজানো ছিল?

৪) রাজাবাহাদুরের শিকার করার জন্য টোপটি কীভাবে কার্যকরী করা হয়েছিল?

৫) হান্টিং বাংলোর যাবার আগে গল্প কথকের কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

৬) স্টেশন থেকে রামগঙ্গা এস্টেটের 'রাজবাড়ি'-তে যাবার পথে গল্পকথক আরণ্যক পরিবেশটি কেমন দেখেছিলেন, আর কী ভেবেছিলেন?

□ নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক □

১) আকবর বাদশা কাকে চার লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন?

২) রাজাবাহাদুরের কী গাড়ি ছিল?

৩) চায়ের টেবিলে কতরকমের ফল ছিল?

৪) হান্টি বাংলোর পিছনের জঙ্গল সম্পর্কে রাজাবাহাদুরের মত কী?

৫) প্রাতরাশের পরিমাণের সঙ্গে কিসের তুলনা করা হয়েছে?

৬) রাজাবাহাদুরের কাজে 'এনার্জি' লাভ করার মানে কী?

৭) মাতাল হয়ে রাজাবাহাদুর তাঁর অতিথিকে কী প্রশ্ন করেছিলেন?

৮) জঙ্গলের মধ্যে রাজাবাহাদুর কী শিকার করেছিলেন?

৯) হান্টিং বাংলোটা কত উঁচুতে ছিল?

১০) হান্টিং বাংলোর নিচের নদীটাকে কেমন দেখাচ্ছিল?

১১) কীপারের বাচ্চাদের দেখে গল্পকথকের কী মনে হয়েছিল?

১২) জঙ্গল থেকে হায়না মেরে কখন ফেরা হয়েছিল?

৬৮.৮ উত্তরমালা

বিস্তৃত আলোচনামূলক

১) প্রাসঙ্গিক আলোচনার চতুর্থ অংশের সাহায্যে উত্তর করুন।

২) প্রাসঙ্গিক আলোচনার দ্বিতীয় অংশ পড়ে উত্তর লিখুন।

৩) প্রাসঙ্গিক আলোচনার দ্বিতীয় অংশ পড়ে উত্তর লিখুন।

৪) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম ও চতুর্থ অংশ ভাল করে পড়ে উত্তর দিন।

৫) প্রাসঙ্গিক আলোচনার তৃতীয় অংশের সাহায্যে উত্তর করুন।

৬) আলোচনার প্রথম ও চতুর্থ অংশ অবলম্বনে উত্তর দিন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক

১) গল্পকথক 'টোপ' গল্পে রাজাবাহাদুর সম্পর্কে যে কাব্যিক বিশেষণগুলি ব্যবহার করেছিলেন তার হোল ঃ

ক) 'ত্রিভুব প্রভাকর ওহে প্রভাকর' অর্থাৎ সূর্যের মত সমস্ত ত্রিভুবন তথা স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালকে আলোকদান করেন।

খ) রাজশ্রেষ্ঠ (রাজাবাহাদুর) গুণবান ও মহীয়ান,

গ) রামচন্দ্রের মত তাঁর অতুলনীয় কীর্তি;

ঘ) শত্রুদমনে তিনি তুলনাহীন।

২) রামগঙ্গা এস্টেটের অতিথিশালাটির স্নানঘরে সৌখিনতা রাজকীয় — কলকাতার গ্রান্ড হোটেলের মত। এর ব্রাকেটে তিন-চারখানা সদ্য পাট-ভাঙা নতুন তোয়ালে। তিনটে দামী সোপকেসে তিনরকমের সাবান, র‍্যাকে দামী তেল, লাইমজুস, অতিকায় বাথ টাব-এর ওপরে ঝাঁঝরি — নিচে টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে ধারাস্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্রাকেটে ছিল ধোপদুরস্ত ফরাসডাঙার ধুতি, সিল্কের লুঙ্গি আর আদ্দির পাজামা।

৩) রাজা বাহাদুরের লাউঞ্জটি যেন রীতিমত একটা ন্যাচারাল মিউজিয়াম এবং অস্ত্রাগার। নানা আকারের আগ্নেয়াস্ত্র — ছোট বড় নানা রকম গোটা চারেক রাইফেল। খাপে আঁটা একজোড়া রিভলবার। লম্বা নিষ্কলঙ্ক শেফিল্ডের তরোয়াল। মোটা চামড়ার বেল্টে নানা অস্ত্রের পেতলের কার্তুজ। জড়িদার খাপে খানতিনেক নেপালি ভোজালি। দেওয়ালে হরিণের মাথা; ভালুকের মুখ, বাঘের, সাপের গো-সাপের, হরিণের চামড়া। টেবিলে অতিকায় হাতির মাথা দিয়ে সাজান।

৪) দুজন বেয়ারা একটি কপিকলের চাকা ঘুরিয়ে সাদা পুঁটলির মতো একটা জিনিস কপিকলের দড়ির সঙ্গে বেঁধে দ্রুতবেগে নামিয়ে দিয়েছিল। ভাঙা চাঁদ উঠলে তাঁরা দেখলেন যেন জীবন্ত সাদা পুঁটলিটা অল্প অল্প নড়ছে। পরিশেষে টর্চের আলোয় দেখা গেল ডোরাকাটা অতিকায় বাঘ পুঁটলিটার ওপর থাবা দিতেই, রাইফেলের গুলিতে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

৫) আর একবার মূলপাঠ ভাল করে পড়ে উত্তর করুন।

৬) আর একবার মূলপাঠ ভাল করে পড়ে উত্তর করুন।

নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক

উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন। মূলপাঠ ভাল করে পড়লেই উত্তর করতে পারবেন। একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যরচনা করে উত্তর দেবেন।

৬৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১) জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাঃ) — *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প ।*

২) ড. বীরেন্দ্র দত্ত — *বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ।*

৩) ড. সুবোধ সেনগুপ্ত (প্রধান সম্পাদক) — *সংসদ বাঙালি চরিত্রাভিধান।*

৪) ড. শিপ্রা দে — *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প।*

৫) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা ; উজাগর, সম্পা ঃ উত্তম পুরকাইত।